সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী
শরৎজন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী

(পঞ্চম বর্ষ/ সপ্তম খণ্ড)

শরৎজন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদক

অশোক কুণ্ডু
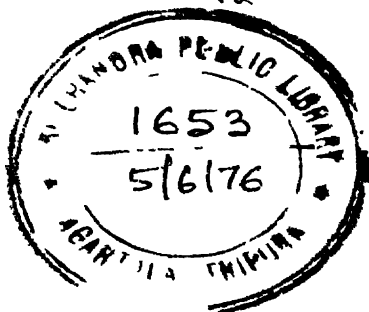
পুস্তক-বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

॥ উৎসর্গ ॥

'বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)' রচনা ক'রে যিনি বাঙালী জাতির পূর্ব-পরিচয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন, 'রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠের ভূমিকা'য় যিনি রবীন্দ্রসাহিত্যসাগর মন্থন করে অমৃতের আস্বাদ এনেছেন, যাঁর বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্য বাঙালী জাতির গর্বের বিষয়, সেই জ্ঞানতাপস পণ্ডিত মনীষী

ড. নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়কে

এই গ্রন্থ শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে

নিবেদন করা হল।

৩১শে ভাদ্র
পোঃ—কানপুর
জেলা—হাওড়া

অশোক কুণ্ডু
সম্পাদক
সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী

সম্পাদকীয়

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রেব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী'র এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলাম। শরৎচন্দ্র যে আজও কত সজীব এবং প্রয়োজনীয় তার মূল্যায়নই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

শরৎচন্দ্রকে আমরা দরদী শিল্পী ব'লে আখ্যা দিয়ে থাকি। দরদ না থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না, তাই সব সাহিত্যিকই কমবেশী দরদী। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে এই বিশেষ আখ্যায় বিশেষভাবে বিশেষিত করার অন্য কি কারণ থাকতে পারে তা, আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

সাহিত্যিকের জগত মোটামুটিভাবে ত্রিস্তরকেন্দ্রিক—ঈশ্বব, পৃথিবী, ও ভালোবাসা। কেউ পাঠককে জীবনেব জটিলতা থেকে আধ্যাত্মিকতার শান্তি-স্বর্গে নিয়ে যেতে চান; কেউ চান পৃথিবীর হাসি-কান্না, শীত বসন্ত যুক্ত জীবনের বোধ জন্মাতে; আর কেউ চান সৃষ্টিব আদি থেকে যে মানুষের মনে ভালো-বাসা জন্ম নিয়েছে তার নিরবধি রহস্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে।

শরৎচন্দ্রকে কেউ আধ্যাত্মিকতার নিরীখে বিচার করতে চাইবেন না, কারণ শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে নিছক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে কোন আলোচনা করেননি, কিম্বা কোন আদর্শকে সামনে রেখে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হননি। বঙ্কিমের মত তিনি 'আনন্দমঠ', 'দেবী-চৌধুরাণী' বা 'সীতারাম' লেখেননি। রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় যে বিশ্বমানবতাবোধের কথা ব'লেছেন—শরৎচন্দ্রেও তা দুর্লভ। হয়তো অনেকে বলবেন—কেন, 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন', 'চরিত্রহীন,' 'বিপ্রদাস', 'গৃহদাহ' প্রভৃতি উপন্যাসেও তো শরৎচন্দ্রের এক বিশেষ আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে, সে আদর্শ কি লেখকের বিশেষ চেতনায় অধ্যাত্মন্তর স্পর্শ করেনি? সহৃদয় পাঠককে অনুরোধ জানাই তাঁরা এই উপন্যাসগুলি আর একবার পড়ে দেখুন। তা' হলেই বুঝতে পারবেন, সেখানে যেটুকু আদর্শবাদ আছে—তা গল্পের খাতিরে, চরিত্রের নিজস্ব প্রয়োজনে। সেখানে লেখকের সচেতন প্রয়াস কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রিত করেনি।

এই বৈশিষ্ট্যটিকে শরৎচন্দ্রের দোষ না গুণের পর্যায়ে ফেলব, তা বুঝতে পারছি না। কারণ শরৎচন্দ্রের এই সহজ-সাধারণ গল্প বলার ক্ষমতার জন্য তাঁকে যেমন জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে স্থাপন করা হয়েছে, তেমনি আবার এই সহজবোধ্যতার দরুণই তাঁকে 'গভীরতাহীন', 'মেয়েদের সাহিত্যিক' বা 'গল্প-কার' ব'লে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য অবশ্য শরৎচন্দ্রের বিনয়ও কম দায়ী নয়। শোনা যায়—কোন পাঠক নাকি শরৎচন্দ্রকে ব'লেছিলেন—আপনার

লেখা প'ড়ে আমরা যেমন বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথের লেখা প'ড়ে তেমন বুঝতে পারি না। শরৎচন্দ্র তার উত্তরে ব'লেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন আমাদের জন্য, আর আমরা লিখেছি তোমাদের জন্য। রবীন্দ্রনাথ যেমন বঙ্কিমচন্দ্র নন, তেমনি শরৎচন্দ্রও যে রবীন্দ্রনাথ হবেন না, এতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু সূর্যের আলো ধার করেছে বলেই কি চাঁদের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেল। তার স্নিগ্ধতা, তার সৌন্দর্য কি আমাদের মনকে মুগ্ধ করে না?

করে বইকি। তা' নইলে—যে রবির প্রভাবে বাংলা-সাহিত্য মধ্যাহ্নসূর্য্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ছিল, সেখানে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব এমন মনোহরণ করল কি করে? 'ভারতী'তে 'বড়দিদি'র প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হ'ল নামহীনভাবে। 'ভারতী' সম্পাদিকা সরলাদেবী পাঠককে 'stunt' দেবার জন্যই এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। লোকে ভাববে রবীন্দ্রনাথের লেখা। পরে জানা গেল—ইনি রবি নন, চন্দ্র। তারপর একে একে উপন্যাসের আবির্ভাবে বর্মাপ্রবাসী কোন্ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালী পাঠকের একান্ত আপনজন হ'য়ে উঠলেন। চাকুরী ফেলে তাঁকে চলে আসতে হ'ল এদেশে।

শরৎচন্দ্রকে 'দরদী' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল বোধহয় এইজন্যে যে, শরৎচন্দ্রের পূর্বে এমন ক'রে দরদ দিয়ে আর কেউ আমাদের কথা ভাবেননি, বা আমাদের কথা বলেননি। এই 'আমরা' কারা? এই আমরা—জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েসা নই, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী নই, নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনী, সূর্য্যমুখী নই, ভ্রমর, গোবিন্দলাল, রোহিণী নই। তারা আমাদের অনেকটা চেনা চেনা হলেও একটু দূরের মানুষ। আমাদের নিরানব্বই জনের মত সাধারণ নয়, নিরানব্বই জনের চেয়ে ব্যতিক্রমী একজন। এই আমরা—গোরা নই, এমন কি অমিত রায়ও নই। তারা যে ঠাকুরবাড়ির এক উত্তুঙ্গ মানস-পরিমণ্ডলে লালিত-পালিত। এই 'আমরা' হলাম—'পল্লীসমাজ'-এর গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্মদাস, দীনু ভট্চায্-এর দল, এই আমরা হলাম—বিরাজবৌ, নীলাম্বর, বিন্দুর ছেলে, বড়দিদি, বামুনের মেয়ে, অরক্ষণীয়া। এমন ক'রে আমাদের কথা শরৎচন্দ্রের আগে আর কে বলেছেন? কার লেখনীতে এমনিভাবে আমাদের সুখদুঃখ, হাসি-কান্না, ঘরগেরস্থালীর সমস্যা ফুটে ওঠেছে। বাঙালীর ঘরে ঘরে বিবাহযোগ্যা কন্যা যে পিতামাতার কাছে দুর্বিষহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে। দারিদ্র্য যে কি দুর্বিষহ প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনযাপনের গ্লানি তা' বুঝিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পূর্বে তাদের এমন বাণীমূর্তি দিতে কে সমর্থ হয়েছেন?

শরৎচন্দ্র ভালোবাসার ক্ষেত্রে, আমাদের বাঙালী সেন্টিমেণ্টকেই পুরোমাত্রায়

প্রকাশ করেছেন। 'দেবদাস'-এর বাল্যপ্রণয়, 'দেনা-পাওনা'য় ষোড়শী-জীবানন্দের সংঘাতময় প্রেমকাহিনী কিংবা শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেম—স্বরূপধর্ম ও সমস্যায় পৃথক হলেও, কতকগুলি ক্ষেত্রে একটি সাধারণ সূত্রকে মেনে চলে। যেমন—শরৎসাহিত্যে প্রণয়ে সুখ অপেক্ষা দুঃখভোগ বেশি। এর কারণ হয়ত —সেকালীন সমাজব্যবস্থা। কিন্তু আজকের সমাজে প্রণয় ব্যাপারটা অনেকটা সাবলীল হলেও সমস্যা কি কমেছে? শরৎচন্দ্রের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—"এ বিবাদ যে দিন মিটিবে, সংসারের সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য সেদিন তিক্তবিষ হইয়া উঠিবে।" অথবা 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।'

শরৎচন্দ্র সবক্ষেত্রে হয়তো তাঁর প্রেম-সমস্যার বলিষ্ঠ সমাধান করতে পারেননি। 'বিষবৃক্ষ', 'চোখের বালি' বা 'গৃহদাহ'-র সমস্যাগুলি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো, তিন কালের এই তিন লেখক একই সমস্যার বৃত্তে আবর্তিত হয়েছেন, কিন্তু বাঁধন ছেড়ে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে আসতে পারেননি। রাজলক্ষ্মীর মত বাঈজীকে শ্রীকান্ত স্ত্রীহিসাবে স্বীকার করলেও, তাদের সামাজিক মিলন ঘটাতে পারেননি শরৎচন্দ্র। কিন্তু বাহ্যিক মিলন না হলেও অন্তরের দিক থেকে তাদের মিলন সার্থক। বিশেষতঃ বাঙালী নারীর আত্ম-নিবেদনের একনিষ্ঠতা নারীচরিত্রগুলিকে সার্থক ক'রে তুলেছে। অপরদিকে এই প্রেমচেতনা মানবিক বোধে উজ্জ্বল। জীবানন্দের ভাষায় বলতে পারি—"আমি সন্ন্যাসী? মিছে কথা। সংসারে আর আমি কিছুই নষ্ট করতে পারব না। এখানে আমি বাঁচতে চাই—মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচতে চাই। বাড়ি চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, ছেলেপুলে চাই—আর মরণ যেদিন আটকাতে পারব না, সেদিন তাদের চোখের উপর দিয়েই চলে যেতে চাই।" শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নারীই সেবাপরায়ণা, বিশেষ ক'রে খাওয়ানোর ব্যাপারে তাদের যত্নের তুলনা হয় না। বাঙালী গৃহজীবনের কেন্দ্রে নারীর যে স্নেহ-মধুর ব্যক্তিত্বটি বিরাজমান, তা' শরৎচন্দ্রের মত নারীর মর্যাদা কে আর এমন-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

শরৎচন্দ্র আমাদের সমাজজীবনের অনেক সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। সেই সমস্যা—তাঁর যুগ অতিক্রান্ত হলেও ভিন্নরূপে বেড়েছে বই কমেনি। জমিদারী প্রথা আজ বিলুপ্ত। কিন্তু দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার আজ অন্যরূপে বিদ্যমান। দুর্গত দুর্বলের জন্য আমরা কতটা কি করতে পেরেছি, তা বিচার করার দিন আজ এসেছে। গ্রামবাংলার জন্য শরৎচন্দ্রের দরদের অন্ত ছিল না। শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক দুরবস্থা—গ্রামবাংলার প্রাণের প্রবাহটিকে শুষ্ক

ক'রে ফেলেছিল। আজও আমরা যদি গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার উন্নয়ন না করতে পারি, তাহলে জাতীয় উন্নতির উপায় নেই, পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্বকুটিলতা আমাদের শক্তিকে অনেক পরিমাণে খর্ব করেছে। তা' থেকেও আমাদের মুক্তি পেতে হবে। অরক্ষণীয়া কন্যার জন্য পিতা-মাতাকে একঘরে করার রেওয়াজ আজ হয়তো নেই, কিন্তু আজও পণপ্রথার নিদারুণ অভিশাপ আমরা বহন করব কেন? নারীর মর্যাদা নিয়ে আমরা সভা-সমিতে বড়ো বড়ো গালভরা বুলি উচ্চারণ ক'রে থাকি, কিন্তু গৃহজীবনে কি নারীর যথার্থ মর্যাদা দিতে পেরেছি?

আসুন, আমরা শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে একবার শপথ গ্রহণ করি—শরৎসাহিত্যের এই দিকগুলি আমরা অনুধাবন করি এবং আমাদের সমাজজীবনের এই অভিশাপগুলি দূরীভূত করার চেষ্টা করি।

বর্তমান সংখ্যায় যে সব প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ নূতন ভাবে রচিত। শরৎসাহিত্য আলোচনার বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রবন্ধের বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আরও বহু প্রবন্ধ দেওয়া গেল না। যাঁরা প্রবন্ধ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সূচীপত্র

লেখক-পরিচিতি

অচল ভট্টাচার্য/শিশুসাহিত্য রচয়িতা ও শিশুসাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

অনির্বাণ রায়চৌধুরী/গবেষক। বহু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের রচয়িতা। কবি ও ছোট গল্পকার।

ডঃ অমিয়কুমার সেন/পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণায় উল্লেখযোগ্য নাম। গবেষণাধর্মী ও মৌলিক বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়/কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের রীডার। আধুনিক সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

ডঃ অরুণ বসু/রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণায় বিশেষজ্ঞ। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও রচিত গ্রন্থ আছে। কবি ও সঙ্গীতজ্ঞরূপেও খ্যাত।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান, ইউ জি. সি. অধ্যাপক, ডীন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তক। উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা-সাহিত্যের বিবিধ দিক নিয়ে বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

ডঃ তুষারকান্তি মহাপাত্র/শরৎ-পত্রে সাহিত্য-ভাবনা ও সমালোচনা। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। রবীন্দ্রকাব্যে চিত্রকল্প (১৮৯০-৯৬) নিয়ে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. উপাধি পান। অন্যান্য বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

দীনবন্ধু ঘোষ/দেবানন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা। দেবানন্দপুর পল্লীসেবক সমিতির সঙ্গে যুক্ত ও শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে বিভিন্ন উদ্যোগে উৎসাহী।

ডঃ নিতাই বসু/শরৎসাহিত্যের উপর গবেষণা ক'রে ডিগ্রীলাভ করেছেন। শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করকে নিয়ে কয়েকটি গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

নীরেন্দু হাজরা/অধ্যাপক। ইংরাজী ও বাংলাসাহিত্যে এম. এ.। গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচয়িতা। কবি, কাব্যগ্রন্থ—'মহুয়ার মন', 'আত্মার করতলে সূর্যপ্রতীক্ষা'।

পরিমল চক্রবর্তী/অধ্যাপক। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহী ও প্রবন্ধ-রচয়িতা; গ্রন্থও আছে।

ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত/অধ্যাপক। নাটকের উপর গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. উপাধি পান।

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য/ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। এককালে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনা ক'রে বাংলাসাহিত্যে আলোড়ন এনেছেন। 'বিশ্বসাহিত্য ও শরৎচন্দ্র' নামে শরৎসাহিত্য সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ আছে।

বিনয় সরকার/'ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন'-এর অধ্যক্ষ ও বাংলা সাহিত্য একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক বহু প্রবন্ধের রচয়িতা।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়/সাহিত্যিক মহলে সুপরিচিত, বাংলা সাহিত্যে গবেষকের অপরিহার্য সহায়ক। পঞ্জীকার, কবি ও শিশুসাহিত্যিক।

বীরেন্দ্র দত্ত/ঔপন্যাসিক। শরৎচন্দ্রের শেষজীবনের বাসস্থান সামতাবেড়-এর আদি বাসিন্দা ও শরৎচন্দ্রের জীবন নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধের রচয়িতা।

রতনকুমার দাস/কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। 'গ্রন্থপঞ্জী' রচনায় অভিজ্ঞতা ও প্রবন্ধ আছে।

ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত/অধ্যাপক। রবীন্দ্রসাহিত্যে সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। কবি ও বহু কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা। পত্রিকা সম্পাদনাও করেন।

ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়/শরৎসাহিত্যের উপর গবেষণা করে ডি. লিট্ উপাধি প্রাপ্ত। অধ্যাপক ও বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণেতা।

ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু/অধ্যক্ষ। বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণেতা। রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষজ্ঞ। কবি হিসাবেও সুনাম আছে, বহু কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা।

সনৎকুমার মিত্র/অধ্যাপক। বহু গ্রন্থ প্রণেতা। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর গবেষণা করেছেন। গ্রামজীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আছে।

স্বপ্না কুণ্ডু/শিক্ষিকা। গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় আগ্রহী।

সুনীল দাস/বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সঙ্গে যুক্ত। গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় আগ্রহী।

ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত/রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর গবেষণা করে ডি. লিট উপাধি প্রাপ্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর উপর গবেষণায় পি. এইচ. ডি। বহু গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচয়িতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত। কবি ও কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা। শিশুসাহিত্য রচয়িতা।

ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়/সমালোচক ও প্রাবন্ধিক শরৎচন্দ্র কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের সহ সম্পাদক। পি. আর. এস. ও পি. এইচ. ডি.। লোকসংস্কৃতির ওপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ আছে।

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র/কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক। বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ রচয়িতা। কবি হিসাবেও সুপরিচিত ও বহু কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আছে।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়/রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও রিটায়ার্ড আই. সি. এস.। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা। উপনিষদ ও ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ও গ্রন্থ আছে।

ডঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়/প্রবীণ কথাসাহিত্যিক, কবি ও অনুবাদক। পুরাকালের বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিকের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর জীবনের ঘটনাপঞ্জী

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

১৮৭৬ দেবানন্দপুরের (হুগলি) এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম (১৫ই সেপ্টেম্বর, বঙ্গাব্দ ১২৮৩, ৩১ ভাদ্র)। পিতা মতিলাল। মাতা ভুবনমোহিনী। শরৎচন্দ্র জ্যেষ্ঠ।

১৮৮১ গ্রামের প্যারী পণ্ডিতের (বন্দ্যোপাধ্যায়) পাঠশালায় ভর্তি। এক বৎসর পরে পরিবারের সঙ্গে বিহারের ডিহিরিতে গমন।

১৮৮৬ পিতার চাকরি শেষ হলে ডিহিরি থেকে ভাগলপুরে পিতার সহিত প্রত্যাবর্তন। এখানে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে ভর্তি।

১৮৮৭ ছাত্রবৃত্তি পাশ। তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি।

১৮৯০ দেবানন্দপুরে প্রত্যাবর্তন। হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি। ১৮৯৩ সালে যখন ২য় শ্রেণীর (ক্লাস নাইন) ছাত্র তখন সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত। দারিদ্র্যের জন্যে কিছুদিন পড়া বন্ধ। পরে পুনরায় ভাগলপুরে গিয়ে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে (বর্তমানের ১০ম শ্রেণী) ভর্তি।

১৮৯৪ মাতুলালয় ভাগলপুর থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। সাহিত্য-সভার সৃষ্টি ও নেতৃত্ব। 'শিশু' নামক হাতে-লেখা মাসিক পত্রের পরিচালনা।

১৮৯৫-৯৬ তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তি। মাতা ভুবনমোহিনীর মৃত্যু (সেপ্টেম্বর)। পরীক্ষার ফী সংগৃহীত না হওয়ায় এফ. এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নি।

১৮৯৬-৯৯ বনেলী এস্টেটে কিছুদিনের জন্য চাকরি গ্রহণ। ভাগলপুরে আদমপুর ক্লাবে যোগদান। অভিনয়, খেলাধূলা, সাহিত্যচর্চা ও গানবাজনায় মেতে ওঠেন।

১৯০১ ভাগলপুর থেকে যোগেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'ছায়া' নামে হাতে-লেখা পত্রিকার প্রকাশ। শরৎচন্দ্র উক্ত পত্রিকার সঙ্গে জড়িত এবং অন্যতম লেখক। 'ছায়া'য় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'ক্ষুদ্রের গৌরব'। St. C. Lara [(St.=শরৎ, C.=চট্টোপাধ্যায়, এবং

Lara=ন্যাড়া (তাঁর ডাক নাম)] ছদ্মনাম গ্রহণ। বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। সন্ন্যাসিবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ। মজঃফরপুরে অবস্থিতি, প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

১৯০২ মজঃফরপুরে অবস্থানকালে পিতা মতিলালের মৃত্যুসংবাদ শুনে ভাগলপুরে গমন। অর্থের সন্ধানে কলকাতায় আগমন। মাসিক ৩০ টাকায় আত্মীয় লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট কর্ম গ্রহণ।

১৯০৩ 'মন্দির' নামক গল্প কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রেরণ এবং প্রথম পুরস্কার লাভ। গল্পটি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে ছাপা হয় (১৩১০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে)। রেঙ্গুনে মেশোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে গমন (জানুআরি)। বর্মা রেলওয়েতে চাকরি গ্রহণ।

১৯০৫ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু (৩০ জানুআরি)। মাসীমা অন্নপূর্ণা দেবী রেঙ্গুনের বাস উঠিয়ে দিলে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গভর্নমেণ্ট হাউসের ওভারসীয়ার অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বাড়িতে ওঠেন। রেলওয়ের চাকরি পরিত্যাগ করে বর্মার একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস একাউণ্টস্ অফিসে চাকরি গ্রহণ (জুলাই)। কিছুদিন পরে উক্ত চাকরি পরিত্যাগ করে পেগুতে। পেগু-ডিভিশনের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে ৫০ টাকা বেতনে চাকরি গ্রহণ। আড়াই মাস এই অফিসে চাকরি করার পর বেকার হন।

১৯০৬ পুনরায় বর্মার একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস্ একাউণ্টস্ অফিসে চাকরি গ্রহণ (এপ্রিল)। শান্তি দেবীকে বিবাহ। ছবি আঁকার চর্চা। প্রথম ছবির নাম 'রাবণ-মন্দোদরী'।

১৯০৭ 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশ (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩১৪)। এটিই স্বনামাঙ্কিত প্রথম রচনা।

১৯০৮ স্ত্রী শান্তিদেবীর প্লেগে মৃত্যু।

১৯১০ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং মেদিনীপুর-নিবাসী কৃষ্ণদাস অধিকারীর (চক্রবর্তী ?) কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ। স্ত্রীসহ পুনরায় বর্মায় গমন।

১৯১২ কলিকাতায় আগমন (ডিসেম্বর)। 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সহিত পরিচয়। যমুনায় 'বোঝা'র শুভাগমন।

১৯১৩ যমুনায় নিয়মিত রচনা দানের স্বীকৃতি। 'রামের সুমতি', 'পথ-নির্দেশ' প্রকাশ, 'বড়দিদি' প্রকাশ (সেপ্টেম্বর)। ভারতবর্ষে 'বিরাজ-বৌ'।

১৯১৪ যমুনার সম্পাদক (জুন)। 'বিরাজ-বৌ' প্রকাশ (মে)। 'বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশ (জুলাই), 'পরিণীতা' (আগস্ট), 'পণ্ডিত মশাই' (সেপ্টেম্বর) প্রকাশ।

১৯১৫ যমুনার সংপর্ক ত্যাগ, ভারতবর্ষে যোগদান, 'মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশ (ডিসেম্বর)।

১৯১৬ 'পল্লীসমাজ' (জানুআরি), 'চন্দ্রনাথ' (মার্চ) প্রকাশ। অসুস্থ অবস্থায় রেঙ্গুন থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বরাবরের জন্য এদেশে আসেন (১১ই এপ্রিল)। 'বৈকুণ্ঠের উইল' (জুন), 'অরক্ষণীয়া' (নভেম্বর) প্রকাশ। হাওড়ার বাজে শিবপুরে বসবাস। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়।

১৯১৭ 'শ্রীকান্ত' ১ম পর্ব (ফেব্রুআরি), 'দেবদাস' (জুন), 'নিষ্কৃতি' (জুলাই), 'কাশীনাথ' (সেপ্টেম্বর), 'চরিত্রহীন' (নভেম্বর) গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯১৮ 'স্বামী' (ফেব্রুআরি), 'দত্তা' (সেপ্টেম্বর), 'শ্রীকান্ত' ২য় পর্ব (সেপ্টেম্বর) গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯১৯ 'বসুমতী' কর্তৃক গ্রন্থাবলী প্রকাশের সূচনা।

১৯২০ 'ছবি' (জানুআরি), 'গৃহদাহ' (মার্চ) গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯২১ কংগ্রেসে যোগদান।

১৯২২ শ্রীকান্ত ১ম পর্ব, ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)

১৯২৩ 'নারীর মূল্য' (এপ্রিল), 'দেনা-পাওনা' (আগস্ট) গ্রন্থের প্রকাশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দান।

১৯২৪ 'নববিধান' (অক্টোবর) গ্রন্থ প্রকাশ। নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সহযোগে 'রূপ ও রঙ্গ' নামক পত্রিকার সম্পাদনা (অক্টোবর)।

১৯২৫ কাশীতে বিশ্বনাথ লাইব্রেরির নবম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব (২৫ জানুআরি)। মুন্সিগঞ্জে (ঢাকা) অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি (১১-১২ এপ্রিল)। পানিত্রাসে গৃহনির্মাণ।

১৯২৬ 'হরিলক্ষ্মী' (মার্চ), 'পথের দাবী' (আগস্ট) গ্রন্থ প্রকাশ। শিলচর ছাত্রসংঘ কর্তৃক মানপত্র দান। মধ্যম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যু।

১৯২৭ 'শ্রীকান্ত' ৩য় পর্ব (এপ্রিল), 'ষোড়শী' [দেনা-পাওনার নাট্যরূপ] (আগস্ট), 'বামুনের মেয়ে' গ্রন্থ প্রকাশ। শিবপুর সাহিত্য সংসদ কর্তৃক সংবর্ধনা (১৩ ফেব্রুআরি)। 'শ্রীকান্ত' ১ম পর্বের ইতালীয় অনুবাদ প্রকাশ। রমাঁ রলাঁ কর্তৃক বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসিকের সম্মান দান।

১৯২৮ 'রমা' [পল্লীসমাজের নাট্যরূপ] গ্রন্থ প্রকাশ। ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে দেশবাসী কর্তৃক সংবর্ধনা।

১৯২৯ মালিকান্দা অভয় আশ্রমে বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতিত্ব (১৫ই ফেব্রুআরি)। রংপুরে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব (৩০ মার্চ)। 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রকাশ (এপ্রিল)।

১৯৩০ লাহোর-প্রবাসী বাঙালীগণ কর্তৃক অভিনন্দন।

১৯৩১ 'শেষ প্রশ্ন' (মে) প্রকাশ। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে মানপত্র রচনা এবং সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতিত্ব গ্রহণ (ডিসেম্বর)।

১৯৩২ 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থ প্রকাশ (আগস্ট)। কলকাতার টাউন হলে নাগরিক ও সাহিত্যিকগণের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন (১৮ সেপ্টেম্বর)।

১৯৩৩ 'শ্রীকান্ত' ৪র্থ পর্ব (মার্চ) গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৩৪ ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভাপতি (২৭ জানুআরি)। 'অনুরাধা, সতী ও পরেশ' গ্রন্থ প্রকাশ (মার্চ)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য মনোনীত (জুলাই)। 'দত্তা'র নাট্যরূপ 'বিজয়া' গ্রন্থাকারে প্রকাশ (ডিসেম্বর)। কলকাতার ২-নং অশ্বিনী দত্ত রোডে নতুন বাড়িতে প্রবেশ।

১৯৩৫ 'বিপ্রদাস' গ্রন্থাকারে প্রকাশ (ফেব্রুআরি)।

১৯৩৬ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলের সভায় উদ্বোধন বক্তৃতা (১৫ জুলাই)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. উপাধি লাভ। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজে সভাপতিত্ব (৩১ জুলাই)।

১৯৩৮ কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে মৃত্যু (১৬ জানুআরি, ২ মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪)।

শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

একই সময় দুজন দিকপাল সাহিত্যিকের যুগপৎ আবির্ভাব সাহিত্যের ইতিহাসে দৈবাৎ ঘটে। বাংলা সাহিত্যের গৌবব সেই দুর্লভ সৌভাগ্য তার ভাগ্যে ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁব অনুজ শরৎচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে সমকালীন মানুষ হয়ে দীর্ঘকাল সাহিত্যসেবা করে তাকে অসামান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা বিশ্বের কবিদের মধ্যেও তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিশ্বজনীন আবেদন পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। তাঁরা যেন ছিলেন বঙ্গসাহিত্যগগনের সূর্য এবং চন্দ্র।

এইভাবে দুজন অসামান্য প্রতিভাধর সাহিত্যিকেব যুগপৎ আবির্ভাব ঘটলে, তাঁদের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁদের ভক্ত সাহিত্যরসিকগণও তাই আকাঙ্ক্ষা করেন। যেমন ইংরাজি সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের মধ্যে একটি সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। এমন ক্ষেত্রে বয়সের ব্যবধান যে দুর্লঙ্ঘ্য নয় তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় কম শক্তিধর এবং বয়সে অনেক ছোট হয়েও সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহ আকর্ষণেব দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কতখানি স্নেহ করতেন, তার পরিচয় পাই —সত্যেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় লিপিবদ্ধ শোকবার্তাখানি। তা ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল মণি বলে পরিগণিত হয়।

শরৎচন্দ্রও সত্যেন্দ্রনাথের মত রবীন্দ্রনাথের অনুজ ছিলেন এবং তাঁর আগেই পরলোক গমন কবেছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথের শোক ভাষা পেয়েছিল একটি ক্ষুদ্র চতুষ্পদী কবিতার মধ্য দিয়ে :

> যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
> ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
> দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
> দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।

এ কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তৃপ্তি পান নি; কারণ এ কবিতা বুদ্ধিশক্তি দিয়ে লেখা, সুগভীর শোকে ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হতে তা উৎসারিত হয় নি; যেমন হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে।

অথচ দেখা যায় তাঁদের দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে ওঠবার অনুকূল

অবস্থা ছিল। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে তুলতে প্রধানত দুটি অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। প্রথম, যাঁদের মধ্যে সে সম্বন্ধ গড়ে উঠবে তাঁরা সমধর্মী হবেন; এবং দ্বিতীয়, উভয়েরই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি থাকবে। এ দুটি অবস্থাই এখানে বর্তমান ছিল।

শরৎচন্দ্রের দিক হতে দেখি রবীন্দ্রনাথেব প্রতি যেমন তাঁর সীমাহীন ভক্তি ছিল, তেমন তাঁর লেখনীর শক্তির জন্য তিনি তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ঠিক বলতে কি, তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলেই মেনে নিয়েছিলেন এবং একলব্যের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথকেই তাঁর অজানিতে গুরু করে নিয়ে উপন্যাসরচনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সাধনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'কে তিনি উপন্যাসরচনায় আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে শরৎচন্দ্রের দু একটি স্বীকৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অমল হোমকে লিখিত ২৮শে পৌষ ১৩৩৮ তারিখ চিহ্নিত এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখছেন :

"কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়—এ যেমন সত্যি, এও তেমনি সত্যি, যে আমার চাইতে বড় ভক্ত কেউ নেই, আমার চাইতে কেউ তাঁকে বেশী মানেন নি গুরু বলে।" এখানে ভক্তির তথা গুরুপদে বরণের কথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত।

অপর পক্ষে উপন্যাসরচনায় রবীন্দ্রনাথ যে উচ্চমান স্থাপন করেছিলেন তা দেখেই যেন মনে হয়, শরৎচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ দীর্ঘকাল বিলম্বিত হয়েছিল। ছোট বেলায়ও তিনি অনেক উপন্যাস লিখেছিলেন। তাদের মধ্যে 'দেবদাস' বা 'চন্দ্রনাথে'র মত অপূর্ব কাহিনীও রচিত হয়েছিল; কিন্তু প্রতিষ্ঠা লাভ করবার আগে সেগুলি প্রকাশ করতেও তিনি সাহস পান নি। 'কুন্তলীন' পুরস্কারের জন্য যে গল্পটি দিয়েছিলেন তাই তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা; কিন্তু তা দিয়েছিলেন মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বে-নামিতে। তার কয়েক বছর পরে 'সাধনা'য় তাঁর 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয় তাঁর অজানিতে এবং সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সরলা দেবীর আগ্রহাতিশয্যে। তা বাংলা সাহিত্যজগতে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। প্রথমে লেখকের নাম অপ্রকাশিত থাকায় অনেকে তা রবীন্দ্রনাথের রচিত বলে ভুল করেছিলেন। এ খবরে শরৎচন্দ্রের আত্মবিশ্বাস বাড়া উচিত ছিল। তবু বাড়ে নি। তিনি তখনও নিজের রচনা প্রকাশ করতে সাহস পেতেন না।

ঠিক এই সময়েই তাঁর বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য তাঁকে উপন্যাস প্রকাশ করতে

অনুরোধ করেন। কিন্তু তখনও তিনি সে সাহস সঞ্চয় করতে পারেন নি। সে কথা তাঁর প্রমথনাথকে লিখিত চিঠিতেই স্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রমথনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে এই কথাগুলি আছে :

"প্রমথ, একটা অহংকার করব, মাপ করবে ? যদি কর, ত বলি। আমার চেয়ে ভাল নভেল কিম্বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবেন না। যখন এই কথাটি মনে প্রাণে সত্য বলে মনে হবে, সেই দিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাস লেখার অনুরোধ কোরো।"

সুতরাং দেখা যায় যে বড়দিদির সাফল্যও তাঁকে আত্মবিশ্বাস এনে দিতে পারে নি ; তার কারণ রবীন্দ্রনাথের পাশে তাঁর প্রায় সমকক্ষ হয়েছেন, এই ধারণা তখনও অর্জিত হয় নি। এই মন্তব্যটি অতিরিক্ত ভাবে দেখায়, উপন্যাস-রচনাতেও শরৎচন্দ্র নিজেকে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং দেখা যায়, শরৎচন্দ্রের দিক হতে তাঁর মতিগতি রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের অনুকূল ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে শুধু ভক্তি করতেন না, তাঁর রচনার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। শরৎচন্দ্র তাঁর কাছে নবীন আগন্তুক। তবু তাঁর বিচক্ষণ ধীশক্তি শরৎচন্দ্রের মধ্যে অনন্যসাধারণ শক্তিধর এক ঔপন্যাসিককে আবিষ্কার করেছিল। তা না হলে তাঁর রচিত 'শেষ সপ্তক' কাব্যসংকলনের এক কবিতায় তিনি শরৎচন্দ্রকে এক সাধারণ বাঙালী মেয়ের হয়ে অনুরোধ জানাবেন কেন, মেয়েটির প্রেমাস্পদের হৃদয় জয় করবার অসম প্রতিযোগিতায় এক অসামান্য রূপধারিণী বিদেশিনী প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে হারিয়ে দিতে ?

শরৎচন্দ্রের প্রতিভার রবীন্দ্রনাথের বাণীতে স্বীকৃতির আরও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ২৫শে আশ্বিন ১৩৪৩ সালে রবিবাসর আয়োজিত শরৎচন্দ্রের সংবর্ধনাসভায় কবির অভিনন্দন হতে। তার এক জায়গায় তিনি বলেছেন :

"কবির আসন থেকে আমি বিশেষ ভাবে এই স্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন, তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে গুণে, ভালোয় মন্দয়— চমৎকারজনক, শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।"

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এমন অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ আর কোনও সাহিত্যিককে করেন নি।

তবু একথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা গড়ে

ওঠে নি। এমনও একটা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ঈর্ষাহেতু রবীন্দ্রনাথের মন তাঁর প্রতি বিরূপ ছিল বলে এমন ঘটেছে। অন্তত এই ধরনের একটা কথা রবীন্দ্রনাথের কানে গিয়ে পৌঁচেছিল কোনও পত্রলেখক মারফত। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে যে চিঠি দিয়েছিলেন (৩রা বৈশাখ, ১৩৩৩) তাতে তিনি দৃঢ় ভাষায় সে অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এই :

"শরৎ আমার সম্বন্ধে কোন অপরাধই করে নি, প্রথম থেকেই আমি তাকে প্রশংসাই করে এসেছি। অনেকে গল্পরচনা সম্বন্ধে শরৎকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে থাকে; তাতে আমার ভাবনার কারণ এই জন্যে নেই যে, কাব্য-রচনা সম্বন্ধে আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে কথা অতি বড় নিন্দুকও অস্বীকার করতে পারবে না। ভাবীকালের লোকের কাছে নিজের স্থায়ী পরিচয়ের দলিল রেখে যাওয়া যদি লোভনীয় হয় তা হলে কোনো একটামাত্র পাকা দলিলই কি যথেষ্ট নয়?"

রবীন্দ্রনাথের এই অকপট উক্তি বিশ্বাস না করবার কোনও সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। সুতরাং অনায়াসে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে তিনি শরৎচন্দ্রের খ্যাতিহেতু তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন নি।

তবে মনে হয় দুটি ঘটনা ঘটেছিল যা শরৎচন্দ্রের মনকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিক্ত করেছিল। অন্তত তার ফলে তিনি যে ভীষণ বেদনা পেয়েছিলেন, সে কথা ঠিক। সেই কারণেই সম্ভবতঃ তাঁরা পরস্পর আরও কাছাকাছি এগিয়ে আসতে পারেন নি।

প্রথমটি ঘটে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসকে নিয়ে। ইংরাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব অভিযান ছিল কাহিনীর বর্ণনীয় বিষয়। তা ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গবাণী'তে ১৩২৯ হতে ১৩৩৩ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। তার পর ওই বছরেরই আশ্বিনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সরকার তা বাজেয়াপ্ত করেন। কারণ, তাঁদের ধারণায় গ্রন্থখানির প্রতিপাতায় অতি শক্তিশালী ভাষায় বিদ্রোহের বাণী প্রচারিত হয়েছে।

এই অবস্থায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন ইংরেজ সরকারকে প্রতিবাদ করে চিঠি লিখতে। রবীন্দ্রনাথ রাজী হন না। তাঁর এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তিগুলি ২৭শে মাঘ ১৩৩৩ সালে শরৎচন্দ্রকে লিখিত চিঠিতে তিনি পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি হল ইংরেজ সরকার তুলনায় সহনশীল। তার স্বার্থের বিরুদ্ধে যে বই যাবে তাকে বাজেয়াপ্ত করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কাজেই এখন তার কাছে করুণা আশা করা উচিত নয়।

ভাষাটা কিছু কড়া হয়ে গিয়েছিল। যেমন তিনি লিখেছিলেন : "নিজের জোরে নয়, পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই, তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র।"

বলা বাহুল্য এ চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র মর্মাহত হয়েছিলেন এবং একটি প্রতিবাদপত্রও লিখেছিলেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৌজন্যবোধবশত কবিকে তা আর পাঠান নি। তাতে এই কথাগুলি ছিল : "আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি।"

অন্য ঘটনাটি ভিন্ন ধরনের। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসটিকে শরৎচন্দ্র নাটকে রূপান্তরিত করে 'ষোড়শী' নাম দেন। শিশির ভাদুড়ী তাকে মঞ্চস্থ করেন এবং শরৎচন্দ্র প্রচুর সুখ্যাতি পান। তারপর তিনি তার এক কপি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে তাঁর অভিমত প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৪ তারিখে লিখিত এক চিঠিতে এ বিষয় তাঁর মন্তব্য পাঠিয়ে দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর মন্তব্যটি অনুকূল হয় নি। তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"তোমার নাট্য লেখবার শক্তি আছে। ·

তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবি ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে ভুলতে না পারো, তা হলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।··

জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম।···

তুমি উপস্থিত কালের কাছে দাম আদায় করে সুখী থাকতে পারো ; কিন্তু সকল কালের জন্য কী রেখে যাবে ?"

বলা বাহুল্য প্রতিকূল সমালোচনা কারও ভাল লাগে না। শরৎচন্দ্রেরও ভাল লাগে নি। তিনি প্রতিবাদ করে চিঠি দিয়েছিলেন। তবে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ দ্বেষপরবশ হয়ে এই মন্তব্যগুলি করেন নি। তাঁর ধারণায় 'ষোড়শী'র মধ্যে সর্বকালীন আবেদনের অভাব ছিল। তবু এর ফলে নিশ্চিত শরৎচন্দ্রের মন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।

সৌভাগ্যক্রমে রবিবাসরের উদ্যোগে প্রায় দশ বছর পরে এই দুই মহারথীকে কাছাকাছি আনবার রীতিমত চেষ্টা হয়েছিল। ৩রা শ্রাবণ ১৩৪৩ তারিখে। শরৎচন্দ্রের দক্ষিণ কলিকাতায় অবস্থিত পি ৫৬৬ নং অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে 'রবিবাসরে'র বৈঠক হয়। রবীন্দ্রনাথ তাতে নিমন্ত্রিত হন এবং শরৎচন্দ্রের পাঠানো গাড়ি করে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। সেদিন

একটি ভাষণ দেন। সেই উপলক্ষে যে আলোকচিত্র তোলা হয়, তাতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ মাঝে উপবিষ্ট, তাঁর বামদিকে শরৎচন্দ্র এবং ডানদিকে রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন উপবিষ্ট আছেন। সুতরাং এইভাবে বাঙালী সাহিত্যরসিকের উভয় দিকপালকে পাশাপাশি দেখার অভিলাষ চরিতার্থ হয়।

তারপর ওই বছর ১১ই আশ্বিন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আহ্বানে ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবিবাসরের পৃষ্ঠপোষকতায় শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্রনাথ সে সভায় যোগ দিতে পারেন নি, কারণ ঠিক সেই সময় কয়েক জন বিশিষ্ট অতিথির শান্তিনিকেতনে আসবার কথা ছিল। সে কথা চিঠি লিখে তিনি জানিয়েছিলেন।

পক্ষকাল পরে রবীন্দ্রনাথেরই প্রস্তাবমত ২৫শে আশ্বিন তারিখে অনিল কুমার দের বাগানবাড়িতে রবিবাসরের আর-একটি সভা আহ্বান করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ দেন এবং শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন করে একটি অভিনন্দন বাণী পাঠ করেন। সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ভাবে 'রবিবাসরে'র উদ্যোগে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অনেকখানি কাছে এসে পড়েছিলেন। আরও কিছু কাল কাটলে হয়ত তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠত। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র পরের বছরই মারা যান। তাই কাছাকাছি এসেও তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথও ভাবতে পারেন নি যে শরৎচন্দ্র তাঁর আগেই চলে যাবেন। তাই জন্য ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে নি বলে তাঁরও অনুশোচনার অন্ত ছিল না। সে কথা তিনি ভারতবর্ষের চৈত্র ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করা যেতে পারে :

"কোন কোন মানুষ আছে, প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত, তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-শোনা, কথাবার্তা হয় নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয়, যদি চেনাশোনা হোত তবে ভালো হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হত।"

বাসি ফুলের মালা

ড. অরুণ বসু

একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একজাতীয় অবচেতন ঈর্ষাবোধ ছিল, শরৎচন্দ্রের জীবৎকালে কবি কখনই তা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রও অভাবিত খ্যাতির মুকুট পরে অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তার সিংহাসনে বসে বিশ্ববন্দিত মহাকবির প্রতিস্পর্ধীর ভূমিকায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবতীর্ণ হয়েছেন একাধিকবার। ফলে সমকালীন এই দুই মহৎ সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বারবার বিড়ম্বিত বিঘ্নিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অতর্কিতে আঘাত করে অনুতপ্ত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের স্নেহপ্রীতি লাভের জন্য একাধিকবার প্রার্থনার করপুট প্রসারিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথও স্বভাবসৌজন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে আবার দুজনেই দুদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছেন। মৈত্রীবিবোধের এই নেপথ্য ইতিহাস বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে পাঠকের মনে পড়তে পারে পুনশ্চ কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে' (২৯ শ্রাবণ ১৩৩৯) কবিতার কথা। রবীন্দ্রনাথের নায়িকা সাধারণ মেয়ে মালতী এখানে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিল তার প্রণয়ী-বঞ্চিত জীবন নিয়ে একটি গল্প লেখার জন্য। মালতী শরৎচন্দ্রের যে শেষ বইটি পাঠ করেছিল তার নাম নাকি 'বাসি ফুলের মালা'। হয়ত যে সমাজনিগৃহীত নির্যাতিত ভাগ্যবিড়ম্বিত নারী শরৎসাহিত্যের নায়িকা, তাদেরই কবি বাসি ফুলের মালার সঙ্গে উপমিত করে শরৎসাহিত্যের মূল্যায়ন করেছেন। শরৎসাহিত্য সম্পর্কে কবির এই আলোকপাত স্বল্পাক্ষরে সম্পূর্ণ, কিন্তু যেন কোনো অবচেতনার ইঙ্গিতে দ্বিধান্বিত। এর কারণ সন্ধান করার জন্য কিঞ্চিৎ অতীতাভিযানের প্রয়োজন।

২

১৯১২-১৩ সাল থেকে শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসগুলি যমুনা, সাহিত্য, ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মন লুঠ করে নেয়। গল্প বলার প্রসন্ন ভাবালু আবেদনে, ভাষার স্পষ্ট সংকেতবর্জিত প্রকাশভঙ্গিতে, প্রত্যাশা পূরণের সার্বভৌম কৌশলে, ঘরোয়া জীবনের অনাড়ম্বর ছবিতে, লাঞ্ছনা-নিপীড়ন-অবমাননার প্রতি অশ্রুবাষ্পাতুর সমবেদনায়, এবং সর্বোপরি

নারীজীবন সম্পর্কে সুমহান দরদে এই আগন্তুক কথাশিল্পী বাঙালি পাঠকের হৃদয়রাজ্যের রাজাধিরাজ হয়ে গেলেন। অথচ তখন তিনি সুদূর ব্রহ্মদেশে প্রবাসী, ফলে নাগরিক শিক্ষিতসমাজে অপরিচিত। তাঁকে জানার দেখার কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা যতই বাড়তে লাগল ততই তাঁর সম্পর্কে নানা সত্য-মিথ্যাজড়িত সম্ভব অসম্ভব জনশ্রুতি স্ফীত হতে লাগল। এদিকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারা প্রায় অবসিত, কবির জীবনে চলেছে ব্রহ্মবিদ্যালয় গঠন, শান্তিনিকেতনে আশ্রম-সাধনা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও গীতাঞ্জলির পর্ব। তারপর দীর্ঘ বিদেশবাস (১৯১২ মে—১৯১৩ সেপ্টেম্বর), প্রত্যাবর্তন, নোবেল পুরস্কার, দেশ-বিদেশে উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়া, প্রথম মহাযুদ্ধ, বলাকা কাব্যরচনা ইত্যাদি ঘটনা-পরম্পরায় কবি ঠিক জনগণের কবি হয়ে উঠতে পারেননি। ক্রমাগত তিনি হয়ে উঠছিলেন দূরবর্তী সংকেতবাচী বিদগ্ধের সূক্ষ্মতর অভিনিবেশের সামগ্রী, বুদ্ধিজীবীর অভিজ্ঞান, সমকালের অগ্রবর্তী। এরই মধ্যে শরৎচন্দ্র অপরাজেয়-তার যশোগৌরব হরণ করে বসে আছেন - যা ছিল একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের। কাশীনাথ, রামের সুমতি, চরিত্রহীন, পথনির্দেশ, বিন্দুর ছেলে, চন্দ্রনাথ, বিরাজ বৌ, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, নিষ্কৃতি, পল্লীসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, শ্রীকান্ত ১ম পর্ব, দেবদাস -শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থগুলি ১৩১৯-২৩-এর মধ্যেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেল। এর অনেকগুলি শরৎ-চন্দ্রের অপরিণত বয়সে ভাগলপুর-বাসকালীন ১৯০২-এর আগের রচনা, কিন্তু তীব্র অনলস্রাবী নির্বিচার জনপ্রিয়তায় প্রবাসী শরৎচন্দ্র এগুলিরও আশাতীত মূল্য পেতে লাগলেন। একান্নবর্তী সংসারের হৃদয়বৃত্তির লীলা স্নেহ প্রেম বাৎসল্য ঈর্ষাকলহ, পল্লীসমাজের দলাদলি কুশ্রীতা, সমাজশাসনের নিষ্ঠুর বিধানে কেমন করে জীবনের সুখশান্তি, তরুণ যৌবনের স্বপ্ন প্রেমিকের প্রেম চূর্ণ হয়, সতীত্বের যথার্থ সংজ্ঞা কী, বিধবার ভালবাসার অধিকার আছে, নারীত্বের মূল্য কোথায়, পতিতা জীবনের অন্তর্নিহিত বেদনা- এক কথায় শরৎসাহিত্যের যাবতীয় লক্ষণগুলি পাঠকদের চেনা হয়ে গেল। বাঙলা সাহিত্যের এই আগন্তুক নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ান নি। স্বর্ণকুমারী-সম্পাদিত ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত বড়দিদি পড়ে রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন, "যেমন করে পারো তাঁকে আনাও ··তাঁকে ধরে এনে লেখাও। বাংলা দেশে এঁর জোড়া লেখক পাবে না।" (শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)। স্বর্ণকুমারী অবনীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী শরৎচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ শরৎসাহিত্য সম্পর্কে উদাসীন বা নিস্পৃহ ছিলেন মনে করার হেতু নেই। তাঁর প্রকাশিত প্রতি রচনার সঙ্গেই কবি পরিচিত ছিলেন, হয়ত বা

আপনার বহু গল্প উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত আখ্যানপ্রকল্প চরিত্রচিত্রণের ছায়াপাতও দেখেছিলেন তার মধ্যে। তৎসত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের নিজস্ব রীতি-মৌলিকতা-স্বকীয়তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু লেখকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেনি। ১৯১৬ সালে বিদেশযাত্রার পথে মে মাসে রেঙ্গুনে কবিকে সে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল সেখানে শরৎচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। কবির মানপত্রটিও তিনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত স্বভাবকুণ্ঠ শরৎচন্দ্র কবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ গ্রহণ করেন নি। সেই সময়েই শরৎচন্দ্র পাকাপাকি কলকাতা চলে আসেন এবং সাহিত্যকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। মনে হয় অল্পকালের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরী বা অমল হোমের মাধ্যমে কবির সঙ্গে তাঁর জানাচেনা হয়ে যায় ও তিনি জোড়াসাঁকো বিচিত্রাভবনে যাতায়াত শুরু করে দেন। কলকাতার সাহিত্যিক মহল তাঁর নামে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু সেই তুলনায় রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত সংযত। এটা শরৎচন্দ্রের নজর এড়াবার কথা নয়। এখন তাঁর নামেই জনরব। গ্রন্থের সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত, লক্ষ লক্ষ পাঠকের তিনি জপমন্ত্র, অন্তঃপুরিকাদের গোপন নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগ, ছাত্রসম্প্রদায়ের ধ্যানজ্ঞান। এখন তিনি বিপুল বিতর্ক বিচিত্র রহস্যকেন্দ্র, বিমুগ্ধ বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনামূলক আলোচনায় জনমত শরৎচন্দ্রের দিকেই হেলে পড়েছিল। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতার অসীম কাহিনীও পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। যে কারণে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে আক্ষেপ করে কবি এক পত্রে লিখেছিলেন যে শরৎরবীন্দ্রসম্পর্ক বিষয়ে "অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে···এইজন্য মরতে আমার সংকোচ হয়। তখন বাঁধ-ভাঙা বন্যার যত ঘোলা জল প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে, আটকাবে কে ?" (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৬) এই কারণেই কবির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক গভীর সখ্যে স্নেহবন্ধনে নিয়মিত সম্বন্ধের অচ্ছেদ্যতায় পরিণত হয়নি। শরৎচন্দ্রের নিজস্ব আত্মকেন্দ্রিকতা, কবির অবচেতন ঈর্ষা এবং উভয়ের ভক্তমণ্ডলীর প্ররোচনা এর জন্য কমবেশি দায়ী ছিল। শরৎচন্দ্র তখন তৎকালীন কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন এবং দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ প্রীতি লাভ করেছিলেন। দেশবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকা, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকা, এবং দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক হৃদ্য সম্পর্ক, অথচ এগুলির চারপাশে তখন কিছু রবীন্দ্র-সমালোচক বা রবীন্দ্র-অসহিষ্ণু মানুষের আনাগোনাই ছিল বেশি। তাঁরাই শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিস্পর্ধী এক সাহিত্যান্দোলনের নেতৃপদে বসালেন,

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর একজন কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ঘোষণার সুস্পষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তবু দুই সাহিত্যিকের মধ্যে বাহ্য সৌজন্যমূলক সম্পর্ক অক্ষুন্ন রইল।

১৩২৬-এর ২৪শে পৌষ রবীন্দ্রনাথকে কোন সাহিত্যসভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগে (৩০শে মে ১৯১৯) তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। সাহিত্যসৃষ্টি, উপন্যাসের বিষয়বস্তু ইত্যাদি বিষয় নিয়েও শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য অনুভবের চেষ্টা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যাশিত সুফল তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। বামুনের মেয়ে লেখার পূর্বে তিনি কবির সঙ্গে আলোচনা করেন। কবি নাকি বলেছিলেন, এখন তো আর কৌলীন্যপ্রথা নেই, একজনের শতাধিক স্ত্রীও নেই। সুতরাং এই প্রসঙ্গ উথাপনের কী প্রয়োজন ? "তবে যদি সাহস থাকে লেখো, কিন্তু মিছে কল্পনা কোরো না।" (চন্দননগরে আলাপসভায় লেখকের কথা, শরৎসাহিত্যসংগ্রহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড)। কবির আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কিন্তু সে সাহসের জোরেই শরৎচন্দ্র এগিয়ে চললেন, তাঁর আত্মপ্রসাদ ছিল—"নিজে যা দেখেছি তাই লিখেছি।"

৩

কবির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক বিঘ্নিত হওয়ার ব্যাপারে আরো একটি কারণ ছিল। ১৯১৬ থেকে ১৯২২—এই ছয় বৎসরের মধ্যে সাকুল্যে প্রায় দু-বছর কবি পর্যায়ক্রমে জাপান, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জার্মানি প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং মধ্যবর্তী সময়ে ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও দীর্ঘকাল সফর করেন। সুতরাং বাঙলায়, বিশেষ কলকাতায়, তাঁর অবস্থান ছিল অত্যন্ত স্বল্পকালস্থায়ী। শরৎচন্দ্রের মত ঘরকুনো (অন্তত প্রৌঢ় বয়সে) আত্মবিলাসী মানুষের পক্ষে সে সময় নিয়মিত রবীন্দ্র-নাথের নাগাল পাওয়া ছিল রীতিমত অসাধ্য। এজন্যও তাঁর চিত্তে একটি ক্ষোভ ছিল। বহুবার এই ক্ষোভ কটুভাষায় কোনো উপলক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে—"বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস যিনি থাকেন বিলাতে দেশের আবহাওয়া তিনি জানেন কতটুকু।" (শরৎসাহিত্যসংগ্রহ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৫০) কবির ব্যস্ততা, নানা কাজের চাপ, সামান্য বিষয়ে মনোযোগের অভাব—এই ধরনের উক্তি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রে হামেশাই চোখে পড়ে। "রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্য—আমি লিখি তোমাদের জন্য", এইজাতীয় উক্তিতে কবিকে গৌরবের আসনে বসানোর ছদ্মবেশে জনসাধারণের সঙ্গে কবির অভিজ্ঞতা বা যোগসূত্রহীন দূরত্বের দিকেই শরৎচন্দ্র ইঙ্গিত করেছেন।

তাই বিরোধ ঘনিয়ে উঠতে দেরি হল না। ১৯২০-২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব পেশ করে গান্ধীজি ছাত্রছাত্রীদের এক বছরের জন্য পাঠ-বিরতির আহ্বান দিলেন এবং চরকা ধরতে বললেন। ভবিষ্যদ্বাণী করে তিনি জানালেন, এই পন্থায় একবছরের মধ্যেই স্বরাজলাভ ঘটবে। অসহযোগ আন্দোলন দেশ জুড়ে হিংসা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হল। বিদেশ থেকে ফিরেই কবি গান্ধীজির এই সংকীর্ণ আহ্বানকে সমালোচনা করে লিখলেন বিখ্যাত 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ (আশ্বিন ১৩২৮)। কবি ন্যাশনালিজমের কৃত্রিম বহিরাশ্রয়ী সমন্বয়কে সমর্থন না করে বললেন, জাতিবিশেষের মুক্তি নয়, চাই নিখিল মানবের মুক্তি এবং তার জন্য বিশ্বের নিয়মের সঙ্গে বুদ্ধির নিয়মের যোগ। কিন্তু স্বরাজপ্রাপ্তির আশু সম্ভাবনায় দেশবাসী উন্মত্ত। সেই উত্তেজিত অবিবেচক জনমতের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদের জন্য শরৎচন্দ্রকেই প্ররোচিত করা হল। কবিকে আক্রমণ করে তিনি লিখলেন 'শিক্ষাব বিরোধ'; এতে তিনি বললেন—

"ইউরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করিনে, যে হাতি পাঁকে পড়ে গেছে তাকে নিয়ে আস্ফালন করবারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে ভূতের ওঝা ও মারণ-উচাটনের মন্ত্রতন্ত্রের ইঙ্গিতও নির্বিবাদে হজম করতে পারিনে।" (শরৎসাহিত্যসংগ্রহ, ১০ম খণ্ড)।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন, আমাদের পরাধীনতার গ্লানি আমাদের জাতিগত ত্রুটিতে -আমাদের যুক্তিহীন সংস্কারান্ধতায়; অনৈক্য, দৈবনির্ভরতা ও বুদ্ধির বিসর্জনে। তার উপর বিদ্যালয় বর্জন করে ইংরাজি শিক্ষা স্থগিত রেখে বিশ্বের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ ঘুচিয়ে আমরা কোন্ স্বাধীনতা সুলভে অর্জন করতে পারব? শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যই কবির দিকে ছুঁড়ে মারলেন—"গোরা বলে বাংলা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে; কবি যদি একবার সেখানি পড়ে দেখেন তো দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ এবং, স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অতি অল্পই আছে।" শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে এই আক্রমণের জন্য কবি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বিরক্ত হলেন এবং পুনরায় 'সত্যের আহ্বান' লিখে তাঁর উদার স্বচ্ছ মানবতান্ত্রিক জাতীয়তাবিরোধী দৃষ্টি ব্যাখ্যা করলেন। শরৎচন্দ্র অবশ্য আর কোন বাদানুবাদে জড়ালেন না। কারণ প্রথম প্রবন্ধও তাঁর স্বভাববিরোধী বা ইচ্ছাবিরোধী ছিল সে বিষয়ে অনুমানের হেতু আছে। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার জন্যই শরৎচন্দ্রকে এই অপ্রীতিকর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হতে হয়।

অথচ রাজনীতির সঙ্গে কবির তখন কোনো সংশ্রবই ছিল না। পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্র তখন দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্র হেমন্ত সরকার নির্মলচন্দ্র যতীন্দ্রমোহনের প্রিয় পাত্র। অসংখ্য ছোটবড় রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের উচ্ছ্বসিত বিমুগ্ধ অভিনন্দনে চরিতার্থ। কিন্তু সাহিত্যিকের পক্ষে রাজনীতির মদিরা বেশিদিন পান করা যায় না, সে অভিজ্ঞতা ঘটতে শরৎচন্দ্রের দেরি হল না। ১৯২২ সালে হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করে তিনি যে অভি-ভাষণ দিলেন তা 'শিক্ষার বিরোধে'র প্রায়শ্চিত্ত মাত্র, কবির সত্যের আহ্বান প্রবন্ধের প্রতিধ্বনি—

"কাজ করব না, মূল্য দেব না, অথচ পাব, প্রার্থনার এই অদ্ভুত ধারাই যদি আমরা গ্রহণ করে থাকি তাহলে নিশ্চয় বলছি আমি, কেবলমাত্র সমস্বরে ও প্রবল কণ্ঠে বন্দেমাতরম ও মহাত্মার জয়ধ্বনিতে গলা চিরে আমাদের রক্তই বার হবে, পরাধীনতার জগদ্দল শিলা তাতে সূচ্যগ্র ভূমিও নড়ে বসবে না।" (শরৎসাহিত্যসংগ্রহ ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৪)

৪

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্র তাঁর সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে চেষ্টা করলেন। ১৩৩০-এর ১৬ই আষাঢ় শিবপুর ইনস্টিটিউটের সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আমন্ত্রণে সভাপতির পদও গ্রহণ করলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে (২ আষাঢ় ১৩৩২) রাজনীতির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। তাই কিছুদিন পরে তিনি অকপটে তাঁর পূর্ববর্তী সংকীর্ণ-তার সংশোধন করে বলতে পারলেন—

"সেদিন কেন যে কবি এতবড় দুঃখ করিয়াছিলেন আজ তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু এখনো এ মোহ সকলের কাটে নাই, প্রায় তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহারও বহু নিদর্শন বক্তৃতায় প্রবন্ধে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখা যায়।" (নতুন প্রোগ্রাম, শ্রীপরশুরাম ছদ্মনামে লেখা। সংগ্রহ ১০ম)।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, শরৎচন্দ্রের এ সম্পর্কও বেশিদিন অক্ষুণ্ণ রইল না। ১৩৩০ সালের বঙ্গবাণীতে এবং ১৩৩৩ সালে গ্রন্থাকারে পথের দাবী প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা আবার তীব্র হয়ে উঠল। বিপ্লবীয়ানার এই লেলিহান রোমান্স স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী দেশবাসীকে পাগল করে দিল। রবীন্দ্রনাথ এ কাহিনীর সাহিত্যগুণ ও সত্যমূল্য কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন আমাদের জানা নেই। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হল (১৯২৩-এর ৩১ আগস্ট)। রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ হওয়ায় পথের দাবী সম্পর্কে বিপ্লবী বাঙালীর আকর্ষণ অপ্রতিরোধনীয় হয়ে উঠল। শরৎচন্দ্র স্বদেশভক্ত

নিগৃহীত পরাধীন দেশবাসীর প্রাতঃস্মরণীয় নামে পরিণত হলেন। সরকারি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র সবিনয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিবাদোক্তি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উত্তর তাঁকে শুধু হতাশ করল না, বিমূঢ় ও রীতিমত বিরক্ত করল। সংগত কারণেই শরৎচন্দ্রের মনে হল কবি এই 'উত্তেজক' গ্রন্থের উপর শাসকের নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করেছেন। এরপর "তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে, শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।" (২৭ মাঘ ১৩৩৩)---এই সান্ত্বনা শরৎচন্দ্রের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয় নি। অসহিষ্ণু ভাষায় শরৎচন্দ্র দীর্ঘ পত্রে তাঁর আশাহত মনোবেদনা জ্ঞাপন করেছিলেন, অবশ্য শেষ পর্যন্ত নানা কারণে সে চিঠি পাঠানো হয় নি। ফলে বুক ভরে ক্ষত রয়েই গেল। মহাকবির সঙ্গে লোকবরেণ্য কথাশিল্পীর সুস্থ সম্পর্ক পুনর্বার বিড়ম্বিত হল। অন্তরঙ্গদের কাছে শরৎচন্দ্র উষ্মাভরে জানালেন, "ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে?" (রাধারানী দেবীকে, ১০ অক্টোবর ১৯২৭)

৫

এই বিরোধ অচিরেই বিস্ফোরিত হল আর-একটি ঘটনায়, আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির কিছু মতামতকে উপলক্ষ করে। ঠিক একই সময়ে (১৯২৭) দিল্লিতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে অমল হোম অতি-আধুনিক কথাসাহিত্যের কোনো প্রবণতা সম্পর্কে কিছু তির্যক আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। সে কটাক্ষ শরৎচন্দ্রের গায়ে বাজল। ইতিমধ্যে কল্লোল, কালি-কলম প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে শক্তিমান তরুণ লেখকদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর শরৎচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দশকের মধ্যে বাঙালী কথাসাহিত্যিকদের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য - চোখের বালির (১৯০২) কথা মনে রেখেও বলা চলে। শরৎচন্দ্রই ব্যাপকভাবে বাস্তবতার আন্দোলনে নিগৃহীত নিপীড়িত মানুষের প্রতি সমবেদনায়, দারিদ্র্য ও বঞ্চনার দৃশ্যরূপায়নে, পতিতা নারীর প্রতি গভীর সহানুভূতিতে, গ্রাম্যজীবনের কুশ্রী পরিবেশ উদঘাটনে এবং নারীত্বের নবমূল্যায়নে নবীনকালের সাহিত্যিকদের গুরুরূপে পরিগণিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ সত্য অস্বীকার করার উপায় ছিল না। এবং এর মর্মবেদনাও তিনি নিঃশেষে মুছে ফেলতে পেরেছিলেন, এমন প্রশান্তি তাঁর

নিজ্ঞ্জান মনে ঘটেনি। তাই তরুণ কথাসাহিত্যের ঔদ্ধত্য ও অভিনয়ের প্রতি কবির সতর্কবাণী ঈষৎ রূঢ় হয়েই দেখা দিল। ১৯২৭ সালে জুলাই মাসে (১৩৩৪ আষাঢ়) পূর্বদ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণে যাবার পূর্বে 'সাহিত্যধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে কবি ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "যৌনমিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে।" সাইকো-অ্যানালিসিসের নামে 'বৈজ্ঞানিক অপক্ষপাত কৌতূহল'কে কবি সমর্থন জানাতে দ্বিধাবোধ করলেন, প্রেয়োবোধের সীমানা লঙ্ঘনকে তিনি প্রশ্রয় দিতে চাইলেন না। রুচিবোধ ও শুভবুদ্ধির গুরুত্বকে বজায় রাখবার অনুরোধ জানিয়ে তরুণ লেখকগোষ্ঠীকে কবি বললেন—

"মানুষের রসবোধই যে উৎসবের মূল প্রেরণা, সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনুষ্যত্বকে এক্ষেত্রে অসংগত বলে আপত্তি করব, অসত্য বলে নয়।"

স্বভাবতই কবির এই সংযত অথচ ভর্ৎসনাজনক উৎসাহবর্জিত মন্তব্য রবীন্দ্রবিরোধী শিবিরে প্রবল শোরগোল তুলল। শরৎচন্দ্র আবার তাঁদের দ্বারা প্ররোচিত হলেন। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (সাহিত্যধর্মের সীমানা, বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৩৪ ; কৈফিয়ৎ, বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪) দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (সাহিত্যধর্মের সীমানাবিচার, বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৪), শরৎচন্দ্র (সাহিত্যের রীতিনীতি, বঙ্গবাসী, আশ্বিন ১৩৩৪) এঁরা জড়িয়ে পড়লেন কবির উক্তির প্রতিবাদে, বাদবিতর্কে, অভিযোগখণ্ডনে বা অভিযানে। পথের দাবীর ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের মন বিক্ষিপ্ত হয়েই ছিল, তারই প্রতিক্রিয়া ঘটল 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে। পরে রাধারানী দেবীর কাছে তিনি স্বীকার করেছিলেন—"ঠিক বলতে পারিনে হয়ত এই কথা (অর্থাৎ পথের দাবী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কটূক্তি) মনের মধ্য অলক্ষ্যে ছিল যখন সাহিত্যের রীতিনীতি লিখি। তাতেই বোধহয় কোথায় কোন জায়গায় একটু আধটু তীব্রতার ঝাঁঝ এসে গেছে।" (১০ই অক্টোবর ১৯২৭, সংগ্রহ ১০ম, পৃঃ ৩৯১)। শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ ফুটে উঠল, তার মধ্যে সাহিত্যাদর্শের বিরোধ বিশেষ ছিল না। মনস্তাত্ত্বিক কারণেই তিনি তরুণ অভিযুক্তদের সপক্ষে মামলার নথিপত্র তুলে নেওয়ার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিলেন। প্রবন্ধের গোড়াতেই স্বীকার করে বসলেন এটি প্ররোচিত রচনা।—

"এদিকে বিপদ হইয়াছে এই যে, কালক্রমে আমারও দুই-চারিজন ভক্ত জুটিয়াছেন; তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে তুমিই বা

কোন্ কম ? দাও না তোমার অভিমত প্রকাশ করিয়া।" (সংগ্রহ ৮ম, ৩৪৩)। সুতরাং উত্তেজিত শরৎচন্দ্র তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন এই বলে।—

"কবি তো থাকেন বারোমাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি, কে আছেন তোমাদের খড়্গহস্তা, শুচিধর্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশীধারী অশুচিধর্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল কল্লোল-কালিকলমের দল ? এসকল অধ্যয়ন করিবার মত ধৈর্য এবং প্রবৃত্তি কোনোটাই কবির নাই। তাঁহার অনেক কাজ।···আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।" তারপর প্রবীণ কথাশিল্পী সাহিত্যে 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' 'মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ' ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ-উত্থাপিত প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু যুক্তিতর্কের অবতারণা করলেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে যুক্তি তাঁর মূলধন ছিল না, উষ্মাই ছিল প্রবলতর। তাই রবীন্দ্রনাথের চেয়ে উদারতর সহানুভূতির অধিকারে আক্রান্ত তরুণদের অবিসংবাদিত নেতৃপদ গ্রহণ করে বললেন, "আমাদের দিন গত হইতে বসিয়াছে। এখন একদল নবীন সাহিত্য-ব্রতী সাহিত্যসেবার ভার গ্রহণ করিতেছেন। সর্বান্তঃকরণে আমি তাঁহাদের আশীর্বাদ করিব এবং যে কয়টা দিন বাঁচিব শুধু কাজটকু নিজের হাতে রাখিব।

"কিন্তু কিছুদিন হইতে দেখিতেছি ইহাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড অভিযান শুরু হইয়াছে। ক্ষমা নাই ধৈর্য নাই, বন্ধুভাবে ভ্রমসংশোধনের বাসনা নাই, আছে শুধু কটুক্তি, আছে সুতীব্র বাক্যশেলে ইহাদের বিদ্ধ করিবার সংকল্প। ···মতের অনৈক্য মাত্রই বাণীর মন্দিরে সেবকদিগের এই আত্মঘাতী কলহে না আছে গৌরব না আছে কল্যাণ।" শরৎচন্দ্র এই প্রবন্ধের শেষ দিকে লিখেছিলেন, 'ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তিনি বিরূপ"—এই উক্তি নিশ্চয় কবিকে প্রীত করেনি। সেদিন তরুণ লেখকদের মুখপাত্র হলেও কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর বিরোধও কম ছিল না। মনের দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঐক্য ও সম্মিলন দৃঢ় হয়নি। প্রগতিশীল বা তথা-কথিত আধুনিকদের উগ্রতা তাঁকেও অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। তবু প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের উপায় অন্তত তখন ছিল না ; পরন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হবার গ্লানি শরৎচন্দ্র অন্তরে অবশ্যই অনুভব করেছিলেন। পুনর্বার রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-সান্নিধ্য অর্জনের জন্য তিনি খানিকটা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। সুযোগও জুটে গেল। দেনাপাওনার নাট্যরূপ ষোড়শী (১৯২৭ আগস্ট) কবির কাছে পাঠিয়ে তিনি মতামত প্রার্থনা করলেন। অভিমত আসতে দেরি হল না। কিন্তু প্রত্যাশিত প্রশংসার বদলে শরৎচন্দ্র পেলেন কিছু সমালোচনা, কিছু স্তুতি, সব মিলিয়ে একটি মিশ্র মনোভাব। কবি লিখলেন—

"তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে। তার ওপরে এদেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত।···ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েছ এবং তার দামও পেয়েছ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ।···সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চলতি সেণ্টিমেণ্ট-মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়···" (৪ ফাল্গুন ১৩৩৪)।

শরৎচন্দ্র হয়ত এবারও ক্ষুণ্ণ হলেন, কিন্তু উত্তেজিত অসংযত হন নি। তিনি সবিনয়ে কিছুটা কৈফিয়ত স্বরূপ ষোড়শী সম্পর্কে কবির সমালোচনা স্বীকার করে নিলেন এবং বিষণ্ণকণ্ঠে জানালেন, তাঁর সাহিত্য অনেকখানিই মিথ্যা, কালের অভিজ্ঞতায় অচিরস্থায়ী। শরৎকণ্ঠে অভিমানই তীব্র ছিল। কিন্তু কবির বিরাগ বহুলাংশে প্রশমিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। পরের বৎসর শরৎ-জয়ন্তী উপলক্ষে কবি শরৎচন্দ্রকে আশীর্বাণী পাঠালেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আরও অন্তরঙ্গ হবার জন্য প্রকাশ্যেই কল্লোল গোষ্ঠীর বিরোধিতায় নামলেন। ৫৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে তিনি তরুণ লেখকদের সরাসরি আক্রমণ করে বললেন—"রবীন্দ্রনাথ যত কড়া করে বলেছেন তত কড়া করে বলবার শক্তি আমার নেই, থাকলে হয়ত তেমন করেই বলতাম। সত্যই খারাপ হচ্ছে। এখন তাদের সংযত হওয়া দরকার। আর রসবস্তু যে কি, বাস্তবিক কি হলে মানুষ আনন্দবোধ করে, মানুষ বড় হয়, তার হৃদয়ের প্রসার বাড়ে—এসব চিন্তা করা দরকার ভাবা দরকার" (সংগ্রহ ১২শ, পৃঃ ৩৪৭)। সেই সঙ্গে আরো একটি প্রবন্ধে মহান শিল্পী তাঁর রবীন্দ্রবিরোধিতার প্রায়শ্চিত্ত করেই যেন লিখলেন—"আজকাল অনেকেই লিখছে; কিন্তু তাদের অনেককেই ঠিক লেখক বলা চলে না। তাদের লেখায় সংযম দেখা যায় না। যৌন সম্বন্ধ নিয়ে তারা এমন একটা গোলমাল করছে যে তাদের লেখা সাহিত্যপদবাচ্য কিনা সন্দেহ। এ সমস্ত লেখার অধিকাংশই বাহির থেকে আমদানি করা। নিজেদের অভিজ্ঞতা নেই—তাই পরের ধার করা জিনিষ চালাতে গিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে তুলছে।"

১৩৩৮ সালের রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে (অনুষ্ঠিত হয় ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩১) শরৎচন্দ্রের উৎসাহ উদ্দীপনা কবিকে খুশী করল। এই উৎসবে শরৎচন্দ্র স্বয়ং সভাপতি হয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ প্রণতি নিবেদন করে আপনাকে প্রকাশ্যে সৌরগ্রহ ঘোষণা করলেন, যেন নবীনদের সঙ্গে নিজের সম্পর্কচ্ছেদের সুযোগেই জানালেন "সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি"। (সংগ্রহ ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩২)। উৎসবের পর শরৎচন্দ্র স্বীকার করলেন—কবির
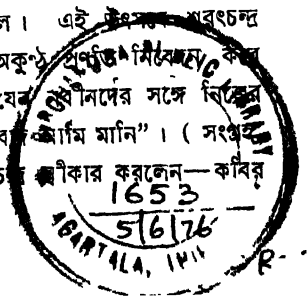
সম্বন্ধে মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায় একথা যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে আমার চাইতে তাঁর ভক্ত কেউ নেই—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশি মানেনি গুরু বলে।"

কবির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে অমল হোমের দৌত্য অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল। পর বৎসর (১৩৩৯) ঐ টাউন হলেই শরৎচন্দ্রের জন্মজয়ন্তীসভায় কবি উপস্থিত হবার সানন্দ সম্মতি জানালেন, যদিও অনিবার্য কারণে শেষ মুহূর্তে তিনি আসতে পারেন নি। কিন্তু শরৎ-চন্দ্রের প্রতি সূর্যের প্রসন্নতা বিকিরিত হল অনেকগুলি ঘটনায়। প্রথমত, কবির কাব্যজীবনের তখন চলেছিল পুনশ্চের পালা, সাধারণ মানুষের ধূলিধূসর প্রাত্যহিক জীবনের কাব্যবেদিকা নির্মাণ—নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডির প্রতি আকর্ষণ। তাই 'বিধাতার শক্তির অপব্যয়' সামান্য মেয়ে মালতী তাকে নিয়ে গল্প লেখার জন্য শরৎবাবুকে অনুরোধ করল—'উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী' এই বলে। শরৎচন্দ্রের প্রতি কবির অবচেতন ঈর্ষা সত্ত্বেও এখানে শরৎসাহিত্যের জনস্বীকৃতির অবমূল্যায়ন কবি করেননি। দ্বিতীয়ত, শরৎচন্দ্রের নামে সদ্যরচিত 'কালের যাত্রা' নাটিকাটি উৎসর্গ করে কবি জন্ম-দিনের অর্ঘ্যদান করলেন এবং নাটিকাটির মর্মকথা ব্যাখ্যা করে লিখলেন—"কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক।" তৃতীয়ত, উৎসব উপলক্ষে আর-একটি বাণীতে কবি আরো নিরাবিল চিত্তে শরৎপ্রশস্তি করলেন এই বলে—"তোমার প্রতিভার দ্বারা দেশের চিত্তকে তুমি জয় করেচ, দেশের গভীর অন্তরে তোমার প্রবেশাধিকার। তোমার লেখনী বাঙালির চিত্ততন্ত্রকে হাসি ও অশ্রুর নবতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করে তুলেছে। যেখানে তার মনোমন্দিরে পূণ্যবেদিকা সেইখানে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যপ্রদীপ বাঙলা সাহিত্যের জ্যোতিঃশিখায় দীর্ঘ আয়ু সঞ্চার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই স্বাভাবিকতা স্থায়ী হয়নি। এর জন্য পারি-পার্শ্বিক অবস্থা, ভক্ত ও বন্ধুমণ্ডলী, উভয় সাহিত্যিকের উপগ্রহের প্রকোপ কত খানি দায়ী ছিল সম্পূর্ণ নিরূপণ করা এখন দুঃসাধ্য। ১৩৪০ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি প্রকাশিত হয় সাহিত্যের মাত্রাবোধ সম্বন্ধে। চিঠিটি সম্পর্কে অতুলানন্দ রায় শরৎচন্দ্রের মতামত জানতে চান। এখানেও কবির প্রতি শরৎচন্দ্রের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল। শরৎচন্দ্র উক্ত পত্রে কবির অভিযোগের আলোচনায় নিজেকে জড়িত করে দুঃখ পেলেন এবং লিখলেন যে কবি—

"যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন তোমাদের সন্দেহ তাদের মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে কবির অভিযোগের বিষয় হল ওরা 'মত্ত হস্তী', 'ওরা বুলি আওড়ালে', 'পালোয়ানি, করলে', 'কসরৎ কেরামতি দেখালে', 'প্রব্লেম সলভ্ করলে', অতএব ওদের ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এই কথাগুলো যাদেরকেই বলা হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিসুখকরও নয়। শ্লেষ-বিদ্রূপের আমেজে মনের মধ্যে একটা ইরিটেশন আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে, অথচ ক্ষোভপ্রকাশ যেমন বাহুল্য, প্রতিবাদ তেমনি বিফল। কার তৈরি করা বুলি পাখির মত আওড়ালুম কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি খেল্ দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে এসকল জিজ্ঞাসা অবান্তর।" (সংগ্রহ ৮ম, পৃঃ ৩৫৭)

শরৎচন্দ্রের এই মনোভাব কবির কাছেও অগোচর রইল না— তাঁর প্রসন্নতাও সংকুচিত হল। শরৎচন্দ্র আবার বিপন্নবোধ করলেন। ইতিমধ্যে দিলীপকুমার শরৎচন্দ্রের রচনাবলী ইংরাজিতে তর্জমা করতে বসে শরৎচন্দ্রকে জানালেন কবি যদি এর কোনো মুখবন্ধ লিখে দেন ভালো হয়। হতাশ শরৎচন্দ্র তাঁকে জানালেন—

"রবীন্দ্রনাথ আমাকে introduce করে দিতে চাইবেন বলে ভরসা করিনে। আমার প্রতিও তিনি প্রসন্ন নন। তা ছাড়া তাঁর এত সময়ই বা কই ? সাহিত্যসেবার কাজে তিনি আমার গুরুকল্প।·· কিন্তু ভাগ্য বাদ সাধলো —আমার প্রতি তাঁর বিমুখতার অবধি নেই।" (১৩৪১, ৩ মাঘ)।

সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথও যথাসম্ভব ব্যবহারে শোভন সৌজন্য রক্ষার ত্রুটি ঘটাননি। গান্ধীজির সঙ্গে ইংরাজ শাসকদের পুনা চুক্তির বিরোধিতা করে কলকাতায় যে রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৬ সালের ১৫ই জুলাই, তাতে রবীন্দ্রনাথকে অংশগ্রহণ করার জন্য শরৎচন্দ্র স্বয়ং শান্তিনিকেতন গিয়ে কবিকে অনুরোধ করে এসেছিলেন এবং কবি সে অনুরোধ রক্ষা করেন। ঐ সভার পর শরৎচন্দ্রের গৃহে রবিবাসরের আলোচনাচক্রেও রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন (১৯ জুলাই)। তার তিন মাস পরে শরৎজয়ন্তীতেও কবি যোগ দিলেন। কবির উপস্থিতির খাতিরেই অনুষ্ঠান ৩১ ভাদ্রের বদলে ২৫ আশ্বিন (১৩৪৩) করা হল। শরৎচন্দ্রের প্রতি অকুণ্ঠিত অভিনন্দন জানিয়ে কবি যা বললেন, তা তাঁর দীর্ঘকালের অন্তরেরই কথা—

"জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত

বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি।···এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।" (সংগ্রহ ১৩১১ পৃঃ ৪৬২)।

'আমাদের ঈর্ষাভাজন' এই সংক্ষিপ্ততম বাক্যেই শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকের ছবিটি ধরা পড়েছে। এই অভিনন্দনে শরৎচন্দ্রের অন্তর থেকে কি সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে গিয়েছিল? ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ শরৎচন্দ্রের রোগজীর্ণ ব্যাধিদূষিত শরীর মৃতুর সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত হল। শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে মহাকবি তখনি একটি শোকস্তবকে তাঁর শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন—

যাহার অমর প্রাণ প্রেমের আসনে
[illegible] তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।

বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তি-জীবন ও শরৎচন্দ্র

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

এদেশে পাঠকসমাজে লেখকসমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে, কল্লোল (১৯২৩) পত্রিকা-গোষ্ঠীভুক্ত তরুণ লেখকরাই বাংলা গল্প-উপন্যাসে প্রথম খাঁটি বাস্তব জীবনচিত্র উপস্থিত করেন। বস্তি-জীবনের প্রথম সার্থক ছবি তাঁরাই দিয়েছেন।

এই প্রচলিত অভিমত যুক্তিসিদ্ধ বা তথ্যসমর্থিত নয়। কল্লোল-গোষ্ঠীর, অন্যতম লেখক শ্রীমণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) বস্তিজীবনের প্রথম সার্থক শিল্পী, এ দাবি উপস্থিত করেছেন গোষ্ঠীভুক্ত অপর লেখক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তাঁর কথায়,

"বলতে গেলে, মণীশই কল্লোলের প্রথম মশালচী। সাহিত্যের নিত্যক্ষেত্রে এমন সব অভাজনকে সে ডেকে আনল যা একেবারে অভূতপূর্ব। যে জীবন ভগ্ন, রুগ্ন, পর্যুদস্ত, তাদেরকে সে সরাসরি ডাক দিলে। জায়গা দিলে প্রথম পংক্তিতে।...দেখালে তাদের ঘা, তাদের নির্লজ্জতা। সমস্ত কিছুর পিছনে দয়াহীন দারিদ্র্য।" (কল্লোলযুগ, ৫ম সং, পৃ ৯৮)

যে সব গল্পের জন্য মণীশ ঘটককে 'প্রথম মশালচী' বলা হয়েছে, সেইসব গল্পের নাম 'গোষ্পদ', 'কালনেমি', 'রাতবিরেতে', 'মৃত্যুঞ্জয়', 'মন্বন্তর শেষ'। সমাজের 'তলানি' কানা খোঁড়া ভিক্ষুক গুণ্ডা চোর আর পকেটমারদের বস্তিতে সন্ধানী আলো ফেলেছেন লেখক। এইসব গল্পের সংকলন-গ্রন্থ 'পটলডাঙার পাঁচালি' (১৯৫৬)। গল্পগুলির রচনাকাল ১৯২৩ ২৬-২৭ খ্রী। 'বিকৃত' মানুষের দল যেখানে থাকে সেই পরিবেশের বর্ণনা :

সার-সার মাটি লেপা অন্ধকূপ। বিশ্রী গন্ধ। নোংরা। একটা ঘর থেকে অনবরত ধোঁয়া বার হয়ে দম ফেলবার উপায়টুকু বন্ধ করেছে। একটা ঘরে কে মরেছে। মড়াটা টান দিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে। একটু ঢাকাও নেই — সর্বাঙ্গ মাছি ও পোকায় ছাওয়া।' (গোষ্পদ)

মণীশ ঘটক দেখিয়েছেন এই শ্বাসরোধকারী পরিবেশে মানবিক মূল্যবোধের কোনো প্রতিষ্ঠা নেই। স্নেহ মমতা দয়া ঔদার্য প্রেম বাৎসল্য — কোনো কিছুরই মূল্য নেই। বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। আহার নিদ্রা মৈথুন ছাড়া এখানে আর কিছুর দাম নেই। আর কোনো মহৎ আদর্শ বা নীতির জায়গা নেই। আহার

'ও মৈথুনের জন্য মানুষ কতদূর নামতে পারে তা এইসব নির্মম নিপুণ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন।

একটিমাত্র উদাহরণেই একথার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

'কালনেমি' গল্পের ডাকু আর ময়না স্বামী স্ত্রী। জোয়ান মরদ ডাকু রেলে পা কাটা পড়ায় বাধ্য হয়ে ভিক্ষে করে দিন কাটায়। দুজনে আশ্রয় পায় খেঁদি পিসির পটলডাঙার আস্তানায়। এখানে মনুষ্যত্বের, মানবিক মূল্যবোধের কোনো দাম নেই, এ কথাটা তাদের ঠেকে শিখতে হল। পা-কাটা ভিখারী ডাকুর স্ত্রী রূপে ময়নাকে বেঁচে থাকতে দেওয়া হল না। বস্তির অন্যান্য মরদের কাছে দেহ দিতে সে বাধ্য হল। এতে ময়না ভেঙে পড়ে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে খেঁদিপিসি বলেছে :

"তা-ও বলি যেকানকার যে নিয়ম তা মানতে হবে ত ? পেট চালাবার জন্যে পতেই বেরুতে হচ্ছে যকন, তকন কি আর সোয়ামী ইস্তিরী ওসব ভড়ং চলে ? ভদ্দরলোকি করতে হলে তার ঠাঁই আলাদা।"

এখানেই লাঞ্ছনার শেষ নয়, মনুষ্যত্বের অবমাননা আরো অনেকদূর গেছে। ডাকু আর এখন একনিষ্ঠ পতিপ্রেমসোহাগিনী ময়নাকে চায় না। স্ত্রীর সতীত্বকে বেচে দিয়ে সে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে।

বেশিরভাগ গল্পেই মনুষ্যত্বের এই লজ্জাকর বেদনাদায়ক অবমাননা। দুয়েকটি গল্পে আহার-মৈথুন-সর্বস্বতার তলায় প্রেম ও মমত্ববোধের প্রবহমান ফল্গু হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। 'মৃত্যুঞ্জয়' গল্পের নায়ক চণ্ডু গুণ্ডা একটা রোগা বোবা মেয়েকে নিয়ে দল ও বস্তি ছেড়ে গেল। 'মন্নুশেষ' গল্পের কুরূপা 'বিন্দী' চুরি করে আনা শিশুকে দেখে বদলে যায়, বাৎসল্যের কাছে পরাজয় মেনে তাকে ফেরত দিতে যায়। বলা বাহুল্য, এই ধরনের আদর্শবাদ আর আবেগের বিজয় প্রায় সব গল্পেই ঘোষিত।

একথা স্বীকার্য, মণীশ ঘটকের গল্পের পরিবেশ কঠোর রুক্ষ বাস্তব। শুকনো-খোসা-ওঠা মুখ আর কোটরে-ঢাকা চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে যেসব মানুষ তারা সুস্থ নয়, 'বিকৃত' মানুষ। তাদের ব্যবহার যেমন নিষ্ঠুর, ভাষা তেমন জোরালো। পরিবেশের অন্ধকার তাদের গ্রাস করেছে। আহার-মৈথুন-সর্বস্ব এইসব বিকৃত বীভৎস মানুষের আলেখ্য রচনায় লেখক চড়া সুর প্রয়োগ করেছেন। এসব গল্পে আছে উগ্রতা, আতিশয্য। তাঁর সমাজসচেতনতা মনুষ্যত্বের পরাভবকে দেখিয়েছে বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মানুষের মধ্যে।

তার চেয়ে বরং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের হাতে কয়লাকুঠির ধাওড়ার ছবি আতিশয্যবর্জিত উগ্রতাবিহীন ছবি হয়েছে। 'কয়লাকুঠি' (১৩২৯ কার্তিক,

মাসিক বসুমতী), 'রেজিং রিপোর্ট' (১৩২৯ ফাল্গুন, প্রবাসী) গল্পে আতিশয্য নেই, সংযত ছবি আছে, আবেগের উন্মত্ততা বা প্রকাশের উগ্রতা নেই, নিরাসক্ত দৃষ্টি আছে। বাস্তবতা নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মাতামাতি নেই। 'আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লার খনি এবং চারধারে সব সাঁওতাল কুলি-মজুর।' লেখকের এই বর্ণনায় পাই তাঁর অভিজ্ঞতা-নির্ভরতা (দ্র. 'গল্প লেখার গল্প')। ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমবেদনা।

প্রেমবঞ্চিতা বাউড়ী মেয়ে বিলাসীর বেদনা 'কয়লাকুঠি' গল্পের পরিণতিতে প্রাধান্য পেয়েছে। বিলাসী ভালবেসে সাঙা করেছিল সাঁওতাল নানকুকে। তারা জোড়জানকী কয়লাখনিতে কাজ কবত। হঠাৎ একদিন নানকু মাইনু নামে একটি মেয়েকে নিয়ে পালাল। অনেক দিন বাদে নানকু ফিরে এল, কিন্তু বিলাসী তাকে জীবিত ফিবে পায়নি। খনিতে কযলা চাপা পড়ে মরেছে নানকু। তাকে জড়িয়ে ধরে বিলাসীর সে কী কান্না।

বিলাসী-নানকুর মতো অনেক সাঁওতাল-বাউড়ী যুবক-যুবতীর ছবি শৈলজানন্দ এঁকেছেন। ভুলি, টুরনী, পীবু ('নারীব মন') তার প্রমাণ। ('বধূ-বরণ' বা 'নাবীমেধ'-এর মতো নিষ্ঠুর নিপুণ গল্পেব কথা বাদ দিচ্ছি, কারণ সেগুলিতে কুলি-ধাওড়ার ছবি নেই)। শৈলজানন্দ বর্ধমান-বীরভূমের গ্রামের চাষী আর কয়লাখনির কুলিদের জীবনের যে আলেখ্য এঁকেছেন তা বস্তুচিত্র হিসেবে নিখুঁত, তাঁর বর্ণনা ত্রুটিহীন। কিন্তু তা বৃহত্তর জীবনবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। মনে পড়ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য 'শৈলজানন্দেব গ্রাম্য-জীবন ও কয়লাখনিব জীবনেব ছবি হয়েছে অপরূপ—কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে বৃহত্তব জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসেনি।' ('লেখকের কথা')। একারণেই উপন্যাসে শৈলজানন্দ এই নীচুতলার মানুষেব জীবনচরিত্রকে বৃহত্তর বাস্তবপটে যুক্ত করতে পারেন নি।

সন্দেহ নেই, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' (১৩৩৩, 'কল্লোল') আর শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের 'যাযাবর' (১৯২৮) শ্রীকান্ত-অনুবর্তী চরিত্র। শ্রীকান্তের ভবঘুরে বন্ধন-অসহিষ্ণু চরিত্র বাংলা কথাসাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, একথা অবশ্যস্বীকার্য। 'আমি বড়লোক নিয়ে কিছু লিখতে পারতুম না। আমি লিখতুম মজুর জেলে রাজমিস্ত্রি গাড়োয়ান মুদি প্রভৃতি, এইসব চরিত্র নিয়ে, কারণ তাদের জীবনযাত্রাটা চোখে দেখতে পেতুম।' (গল্প লেখার গল্প—প্রবোধকুমার সান্যাল)। এই ধরনের স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে এঁরা ছিলেন অভিজ্ঞতার লেখক। কিন্তু সে অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত রোমান্টিক বোহেমীয় প্রবৃত্তি, যার মূল সব সময় এদেশের মাটিতে প্রোথিত নয়।

কল্লোলগোষ্ঠীর স্কাণ্ডেনেভীয় সাহিত্য-প্রীতি নিরর্থক নয়। এখানেই আছে বোহেমীয় প্রবৃত্তির সমর্থন। 'যাযাবর-প্রিয়বান্ধবী-আঁকাবাঁকা'র বোহেমীয় রোমান্টিক বন্ধন-অসহিষ্ণু যৌবনের অভিযান স্পষ্টতঃই বাস্তব থেকে দূরবর্তী।

'বেদে'র নায়ক পচা ওরফে কাঁচা ওরফে কাঞ্চন চলেছে জোয়ারের জলে ভেসে। তার অতীত সে জানে না, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে স্থিরলক্ষ্য নয়। তার জীবনের মূল্যবোধ চলার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। কোথাও তার শিকড় নেই। কোথাও সে নোঙর ফেলে না। ন্যুট হামসুন্-এর 'প্যান্, ও 'ভ্যাগাবণ্ড'-এর কথা 'বেদে' প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

ভবঘুরে বোহেমীয় জীবনের প্রতি ঝোঁক, মিথুনাসক্তি, প্রেমে একনিষ্ঠতার অভাব আর তারুণ্যের উদ্দেশ্যহীনতা ও দায়িত্বহীনতা 'বেদে' বা 'যাযাবর'কে সার্থক বাস্তবালেখ্য হতে দেয়নি। 'বেদে'র ভবঘুরে নায়ক বস্তিতে দিন কাটিয়েছে, কিন্তু সে বস্তির কেউ নয়। আহ্লাদী, আসমানী, বাতাসী, মুক্তা, বনজ্যোৎস্না, মৈত্রেয়ী—পর পর ছয়টি মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে কৈশোর থেকে যৌবনে। আসলে জীবনেব প্রতি দাযিত্বহীনতা ও উদ্দেশ্যহীনতা এখানে সক্রিয়। 'বাস্তবতা' এখানে রোমান্টিকতার রকমফের।

কল্লোল-গোষ্ঠীভুক্ত অপর প্রধান লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র গল্প-উপন্যাসে অসংযত আবেগ আর রোমান্টিক চড়া সুর বাদ দিয়েছিলেন। 'পাঁক' (১৯২৬) উপন্যাস আর 'শুধু কেরানী' (চৈত্র ১৩৩০ প্রবাসী), 'ভবিষ্যতের ভার', 'পুন্নাম', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পগুলি তার পরিচয়স্থল। নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের নৈতিক ভ্রষ্টতা আর মানসিক ইতরতার বিশ্লেষণে লেখক অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সোজাসুজি বস্তিজীবনে তিনি গিয়েছেন 'পাঁক' উপন্যাসে—দরিদ্র শ্রীহীন মুচিপাড়ায় পঙ্কিল পরিবেশে হাঁফিয়ে উঠেছে কালাচাঁদ, পাঁচী, নিত্য, তিনকড়ি মুচি, আহ্লাদীর মা—তারা মুক্তি খুঁজে ব্যর্থ হয়ে আবার এই মুচিপাড়ায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। লেখকের শত ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি মধ্যবিত্তসুলভ ভাবপ্রবণতা ও সংস্কার আর রোমান্টিক ভাবালুতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। মজা এইখানে যে, এঁরা বস্তিজীবন নিয়ে লিখতে গিয়ে গরিব মানুষের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারে মধ্যবিত্তসুলভ ভাবপ্রবণতা সঞ্চার করে দিয়েছেন। নিত্য আর কালাচাঁদের প্রেমে আছে রোমান্টিক ভাবালুতা, পাঁচীর জীবনে সক্রিয় মধ্যবিত্তসুলভ সংস্কার আর অভিমান। একারণেই 'পাঁক' পুরোপুরি বস্তিজীবনের কঠিন বাস্তবধর্মী উপন্যাস হতে পারেনি।

ইচ্ছে করলেই গর্কীর 'লোয়ার ডেপথস'-এর মানসিকতায় পৌঁছানো যায় না। এইসব গল্প-উপন্যাস তার প্রমাণ।

এই পটভূমিতে শরৎচন্দ্রের মতো আবেগপ্রবণ শিল্পীর হাতে বস্তিজীবনের ছবি কতোদূর সার্থকতা পেয়েছে তা দেখা যাক। তাঁর 'পথের দাবী' (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ৩১ অগস্ট ১৯২৬) 'বঙ্গবাণী' মাসিকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় (১৩২৯ ফাল্গুন——১৩৩৩ বৈশাখ, ১৯২৩-১৯২৬ খ্রী)। সময়ের বিচারে শরৎচন্দ্র এখানে 'কল্লোল'-এর লেখকদের সহযাত্রী। এমনকি অগ্রবর্তী লেখক। এই উপন্যাসে গরিব মেহনতী মানুষের জীবনালেখ্য অঙ্কনে শরৎচন্দ্র যে বাস্তববোধ ও শিল্পসংযম দেখিয়েছেন, তা সুলভ নয়। আশ্চর্য, 'পথের দাবী' উপন্যাসে বস্তিজীবনচিত্র পাঠক ও সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। অথচ, আমার বিশ্বাস, এখানেই আছে শরৎচন্দ্রের বাস্তব চিত্রায়নের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

'পথের দাবী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথকে এক কপি বই দিয়ে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অভিমত চেয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল——সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানাবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে আশা পূরণ করেন নি। তাঁর জবাবে (২৭ মাঘ ১৩৩৩) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসকদের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে —কারণ লেখক যদি ইংরেজ রাজকে গ্রহণীয় মনে না করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজ রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই।"

এই কড়া জবাবে শরৎচন্দ্র মর্মাহত হন। তিনি প্রত্যুত্তরস্বরূপ যে চিঠি লিখেছিলেন, তা 'বন্ধুদের পরামর্শে' পাঠানো হয় নি। এই চিঠিতে শরৎচন্দ্র দেশ-জাতির প্রেক্ষিতে লেখকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন।

এই চিঠির অংশবিশেষ –

"আপনি লিখেছেন ইংরেজ রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম তাহলে লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুই-ই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে politicianদের propaganda হত, কিন্তু বই হত না। নানাকারণে বাঙলা ভাষায় এ ধরনের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা

বিচারের ভাণ করে কয়েদ নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমিই যে অব্যাহতি পাব, অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা বলা উচিত মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরেজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্যসেবাটাই এই ধরনের। যা উচিত মনে করেছি তা'ই লিখে গেছি।" (২ ফাল্গুন ১৩৩৩)

সন্দেহ নেই, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কড়া জবাবে উত্তেজিত হয়ে এ চিঠির খসড়া করেছিলেন। তবে এখানে তিনি যা বলেছেন তাতে সত্য আছে। পরাধীন দেশের লেখকের দেশপ্রেম ও আন্তরিকতা এতে প্রকাশ পেয়েছে।

'পথের দাবী' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অগস্ট। ১৯২৯-এর ঈস্টারের ছুটিতে জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় যুবসম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। 'তরুণের বিদ্রোহ' নামে সেই ভাষণ ১৯২৯-এর ১৮ই এপ্রিল প্রকাশিত হয়। সব্যসাচীর অনেক উক্তির সঙ্গে সভাপতির ভাষণের অনেক অংশ হুবহু মিলে যায়। এই সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে বর্তমান নিবন্ধকারের 'পথের দাবী' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় (দ্রষ্টব্য 'শরৎচন্দ্র ঃ পুনর্বিচার' গ্রন্থ)।

এই পটভূমি থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, পথের দাবী উপন্যাসে শরৎচন্দ্র বাস্তব রাজনৈতিক উপাদানকে ব্যবহার করেছেন। সব্যসাচী, পথের-দাবী-র প্রেসিডেন্ট সুমিত্রা, রামদাস তলওয়ারকর, ভারতী, কৃষ্ণ আইয়ার, হীরা সিং : এইসব দীক্ষিত মানুষ ইংরেজশাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন। পথের দাবী সেই প্রতিজ্ঞার ছবি। আবেগ ও ভাবাতিরেকের প্রশ্রয় এখানেও আছে, কিন্তু মূল ব্যাপারটায় শরৎচন্দ্র আপোস করেন নি। এখানেই শিল্পী হিসেবে তাঁর সততা।

'পথের দাবী'র দুটি পরিচ্ছেদে রেঙ্গুনের উপকণ্ঠবর্তী ভারতবর্ষীয় কুলি-লাইনের বস্তুনিষ্ঠ ছবি এঁকেছেন শরৎচন্দ্র। এখানে তিনি অভিজ্ঞতা ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করেছেন, সবরকম আবেগ, রোমান্টিক ভাবাকুলতা, মধ্যবিত্তসুলভ সংস্কার ও অভিমান পরিহার করেছেন। মধ্যবিত্ত মনোভাবের প্রতিনিধি অপূর্ব সংগ্রামী মনোভাবের প্রতিনিধি ভারতীর সঙ্গে কুলি-লাইনে গিয়েছে। এই বস্তিজীবন দেখে অপূর্বর প্রতিক্রিয়া যেমন বাস্তব, ভারতীয় মানসিক স্থৈর্য ও মেহনতী মানুষের জন্য সমবেদনা তেমনি বাস্তব; মজুরদের ভীরুতা, নীচতা, রুক্ষতা ও সুবিধাবাদ তেমনি বাস্তব।

রেঙ্গুনের বড় রাস্তা ধরে উত্তরে বর্মী ও চীনা পল্লী পার হয়ে বাজারের পাশ দিয়ে দুজনে প্রায় মাইলখানেক পথ হেঁটে একটা প্রকাণ্ড কারখানা-এলাকা উপস্থিত হল। সেদিনটা ছিল রবিবার, ছুটির দিন।

"ডানদিকে সারি সারি করোগেট লোহার গুদাম ও তাহারই ও-ধারে কারিগর ও মজুরদিগের বাস করিবার ভাঙা কাঠ ও ভাঙা টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি, সুমুখ দিয়া সারি সারি কয়েকটা জলের কল এবং পিছন দিকে এমনি সারি সারি টিনের পায়খানা। গোড়াতে হয়ত দরজা ছিল, এখন থলে ও চট-ছেঁড়া ঝুলিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষীয় কুলী-লাইন। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বর্মা, বাঙালী, উড়ে, হিন্দু, মুসলমান স্ত্রী ও পুরুষে প্রায় হাজারখানেক জীব এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিযাছে।

"ভারতী কহিল, আজ কাজের দিন নয, নইলে এই জলের কলেই দু'একটা রক্তারক্তি কাণ্ড দেখতে পেতেন।

"অপূর্ব ঘাড় নাড়িযা বলিল, ছুটির দিনের ভিড় দেখেই তা অনুভব করতে পারচি।

"এই জনতার সম্মুখেই একজন মাদ্রাজী স্ত্রীলোক পর্দা ঠেলিয়া পায়খানায ঢুকিতেছিল, পর্দার অবস্থা দেখিয়া অপূর্ব লজ্জায় রাঙা হইযা উঠিয়া বলিল, পথের দাবী করতে হয়ত আর কোথাও শীঘ্র চলুন, এখানে আমি দাঁড়াতে পারব না।

"ভারতী নিজেও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি হাসিল। অর্থাৎ মানুষের ধাপ হইতে নামাইয়া যাহাদের পশু করিযা তোলা হইয়াছে তাহাদের আবাব এসকল বালাই কেন ?" (পরিচ্ছেদ ১৫)

মধ্যবিত্তসুলভ রোমান্টিকতা, আদর্শবাদ, সংস্কার ও আবেগ-ভরা অপূর্বকে এক অপরিচিত জগতে ভারতী হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠককে শরৎচন্দ্র এমন এক জগতে প্রবেশাধিকার দিচ্ছেন যেখানে ভাবালুতার স্থান নেই। বড় বড় কারখানার ক্রোড়পতি মালিকেরা মজুরদের জন্য যে লাইনবন্দী নরককুণ্ড তৈরী করে দিয়েছে, সেইখানেই পথের দাবীর সত্যিকারের কাজ। একথা পূর্বেই অপূর্বকে জানিয়েছে ভারতী। এবার কঠোর নগ্ন বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়সাধন।

পর পর কয়েকটি দৃশ্য আর চরিত্র উপস্থিত করে লেখক অপূর্বর মতো মধ্যবিত্ত পাঠকের স্বপ্নাবেশ ভেঙে দিয়েছেন। মানিক মিস্ত্রী—যার বৌ পালিয়েছে অন্যের সঙ্গে, যার ছোট মেয়ে তার জন্যে কিনে আনে টুপি-মার্কা মদ, কারণ

ঘোড়া-মার্কা মদ ফুরিয়ে গিয়েছে ; দিনমজুর পাঁচকড়ি কারিগর—পুলির শেকল পড়ে যার ডানহাতটা জখম হয়েছে, ফলে কাজ নেই, পয়সাও নেই, কুলি-লাইনে থাকার নিশ্চয়তা নেই ; ওড়িয়া মিস্ত্রী কালাচাঁদ—যারে ঘরে ছুটির দিনে জনপনের মজুর-মজুরনী মদ খাচ্ছে, গানবাজনা করছে, যারা ভারতীকে সামনে বলে আগামী কাল ফয়ার মাঠে তাদের ভালোর জন্য আহূত সভায় নিশ্চয়ই যাবে, আর আড়ালে বলে, তারা অত বোকা নয়, সুমিতা-ভারতীর মতো ক্রীশ্চান মেয়েগুলির দৌড়টাই দেখছে, বিশ্বাস করছে না। এদেরই নিয়ে 'পথের দাবী'র কাজ। এইসব মজুরদের বেইমানি, ইতরতা, কৃতঘ্নতা ও পশুবৎ জীবন-যাপনপ্রথা দেখে মধ্যবিত্ত অপূর্বকুমার হালদার তাদের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করেছে, বলেছে—'পাজি নচ্ছার হারামজাদা মাতালের দল।' ভারতী বিন্দুমাত্র উত্তে-জিত না হয়ে বলেছে—'মানুষের প্রতিমানুষে কত অত্যাচার করেচে চোখ মেলে দেখতে শিখুন। কেবল ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে নিজে সাধু হয়ে থেকে ভেবেচেন পুণ্য সঞ্চয় করে একদিন স্বর্গে যাবেন ? মনেও করবেন না।···আজ আমি নিশ্চয় জানি, এই নরককুণ্ডে যত পাপ জমা হবে তার ভার আপনাকে পর্যন্ত স্বর্গের দোর থেকে টেনে এই নরককুণ্ডে ডোবাবে। সাধ্য কি আপনার এই দুষ্কৃতির ঋণ শোধ না করে পরিত্রাণ পান। আমরা নিজের গরজেই আসি অপূর্ববাবু, এই উপলব্ধিই আমাদের 'পথের দাবী'র সবচেয়ে বড় সাধনা।" দু ঘণ্টার কুলি-লাইন-পরিদর্শনে অপূর্বর বহুকালের ধ্যানধারণা স্বপ্ন ভেঙে চুর-মার হয়ে গেছে। (পরিচ্ছেদ ১৫)।

এই দরিদ্র বঞ্চিত শ্রমিক সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে নয় তাদের দুঃখ-বেদনাকে উপলব্ধি করে তাদের সঙ্গে একান্ত হয়ে শাসক শোষক ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে ; এই উপলব্ধিতে অপূর্ব উপনীত হয়েছে একদিনে নয়, দিনে দিনে সঞ্চয় করেছে অভিজ্ঞতা, বারবার পিছিয়ে গিয়েছে, ভুল করেছে, শেষপর্যন্ত এগিয়ে চলেছে। মধ্যবিত্তের সঙ্গে সর্বহারার সংগ্রামী ঐক্যের পথেই আসবে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি : এই বক্তব্য জোরের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছে পথের দাবী উপন্যাসে। আশ্চর্য, এই ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র তাঁর শিল্পিস্বভাবের বিরুদ্ধে গেছেন। ভাবালুতা, আতিশয্য, অতিরঞ্জন, অসংযম পরিহার করে নিষ্ঠুর শীতল সংখ্যা-ও-তথ্যনির্ভর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন।

'পথের দাবী' বিপ্লবী সংস্থার বাইরের ছদ্মবেশ। এই সংস্থার সংকল্প—দুনিয়া বদলে দেব, ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়ে চলব না। পাঁচকড়ি মিস্ত্রির অন্ধকার ঘরে মলিনসজ্জায় রোগগ্রস্ত মৃতকল্প ছেলেমেয়ে দুটিকে দেখে অপূর্ব বেদনার্ত। এই পরিবেশে অপূর্বর স্বগতচিন্তায় শুনি তার প্রতিধ্বনি :

"লোকে বলে, এই ত দুনিয়া! এমনি ভাবেই ত সংসারের সকল কাজ চিরদিন হইয়া আসিয়াছে! কিন্তু এই কি যুক্তি! পৃথিবী কি শুধু অতীতেরই জন্য! মানুষ কি কেবল তাহার পুরাতন সংস্কার লইয়া অচল হইয়া থাকিবে! নতুন কিছু কি সে কল্পনা করিবে না! উন্নতি করা কি তাহার শেষ হইয়া গেছে! যাহা বিগত, যাহা মৃত, কেবল তাহারই ইচ্ছা, তাহারই বিধান মানুষের সকল ভবিষ্যৎ, সকল জীবন, সকল বড় হওয়ার দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিয়া চিরকাল ধরিয়া প্রভুত্ব করিতে থাকিবে।" (পরিচ্ছেদ ১৫)

যা চলে আসছে, তাকে মানি না, তাকে বদলে দেব, দরকার হলে বল-প্রয়োগ করব : সব বিপ্লবচিন্তার মূলে থাকে এই সংকল্প। সব্যসাচীর সেই সংকল্প ভারতী মারফত দ্বিধান্বিত অপূর্বকেও বদলে দিচ্ছে, এখানে তারই আভাস পাই।

মধ্যবিত্ত-সুলভ দয়া-মায়া দেখিয়ে মজুরদের ভালো করা যায় না- এই কঠিন সত্যে অপূর্বকে পৌঁছে দিয়েছে ভারতী। পাঁচকড়ি মিস্ত্রির রুগ্ন ছেলে-মেয়ের জন্য অপূর্ব পাঁচটাকা দান করতে যাচ্ছিল, ভারতী তার হাত চেপে বাধা দিয়েছে। ভারতী তাকে জানিয়েছে, পাঁচটা টাকা হাতে পেলে পাঁচকড়ি মিস্ত্রি এখনি মদ খেতে শুরু করত, সারা রাত বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকত। রুগ্ন সন্তানের চিকিৎসার টাকায় বাপ মদ কিনে খাবে—একথা শুনে অপূর্ব বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছে। ভারতী হেসে বলেছে, 'হাতে টাকা পেলে মদ খায় না, এমন অসাধারণ ব্যক্তি সংসারে কে আছে?'

লেখক অপূর্বকে মধ্যবিত্ত-সুলভ ভাবাবেগ, উচ্ছ্বাস ও বাস্তববর্জিত স্বপ্ন-কল্পনার প্রতিনিধিরূপে আর ভারতীকে কঠিন বাস্তব ও সংগ্রামী সংকল্পের প্রতিনিধিরূপে দেখিয়েছেন।

কালাচাঁদ-দুলাল প্রমুখ মাতাল মজুরদের ভালো করতে যাওয়া নিরর্থক বলে অপূর্ব মনে করেছে। সে গর্জন করে উঠেছে

"এমনি শয়তানি? এমনি কৃতজ্ঞতা? এদের চাও তুমি দলে আনতে? দলবদ্ধ করতে? এদের চাও তুমি ভাল?"

অপূর্বর উত্তেজনা ভারতীকে স্পর্শ করেনি। শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে, মলিন হাসি হেসে ভারতী উত্তর দিয়েছে,

"এরা কারা অপূর্ববাবু? এরা ত আমরাই। এই ছোট্ট কথাটুকু যখনি ভুলেচেন, তখনি আপনার গোল বাধচে। আর ভাল? ভাল-করা বলে যদি সংসারে কোন কিছু থাকে, তার যদি কোন অর্থ থাকে সে তো এইখানে।"

(পরিচ্ছেদ ১৫)

ফয়ার মাঠে পরদিন অপরাহ্নে যে সভা হয়েছে তাতে বেশি সংখ্যায় মজুররা আসেনি, কিন্তু সুমিত্রার রূপযৌবন ব্যক্তিত্বের প্রশংসা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। তার ফলে বিশ-পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে যত কারখানা ছিল, সেগুলিতে সাড়া পড়ে গেল, দলে দলে লোক পরবর্তী জনসভায় যোগ দিল। সেই সভায় মজুররা এসেছিল কেন? এখানেও শরৎচন্দ্র কারখানার মজুরদের মানসিকতার চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। মনে রাখতে হবে, ১৯২০ সালের কাছাকাছি সময়ের ঘটনা। সংঘবদ্ধ শ্রমিক-আন্দোলনের সবে পত্তন হয়েছে। এ. আই. টি. ইউ. সি.র প্রথম অধিবেশন হয় ১৯২০ সালেই। বর্মা তখন ভারতের অধীন, রেঙ্গুনের শ্রমিকসমাজ তখনো সংগঠিত নয়। মজুররা এসেছিল ত্রাণকর্ত্রীর সন্ধানে। "চিরদিন সংসারে অত্যাচারিত, পীড়িত, দুর্বল বলিয়া মানুষের সহজ অধিকার হইতে যাহারা সবলের দ্বারা প্রবঞ্চিত, নিজের উপর বিশ্বাস করিবার কোন কারণ যাহারা দুনিয়ায় খুঁজিয়া পায় না, দেবতা ও দৈবের প্রতি তাহাদেরই বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি।" (পরিচ্ছেদ ১৬)। তাই তারা দলে দলে সভায় এসেছে। সেই বিপুল জনতার সামনে পুলিশের রক্ত-চক্ষু অগ্রাহ্য করে অপূর্ব কিছু বলতেই পারেনি। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় যে ভয় ত্রাস সংকোচ আছে তা-ই তাকে গ্রাস করেছে। তার বদলে রামদাস তলওয়ারকার উত্তেজনা-ভরা বক্তৃতা দিয়েছে, পুলিশের হাতে গ্রেফতারের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার ডাক দিয়েছে। মাত্র বিশ-পঁচিশজন ঘোড়ায়-চড়া পুলিশের চাবুক চালানো ও ঘোড়া ছোটানোর ফলে লাখখানেক "অবমানিত অভিভূত সন্ত্রস্ত শ্রমিকের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে কে যে কাহার ঘাড়ে পড়িল এবং কে যে কাহার পদতলে গড়াইতে লাগিল তাহার ঠিকানা রহিল না।" (পরিচ্ছেদ ১৭)। এখানেও শরৎচন্দ্র তীক্ষ্ণ বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। অসংগঠিত অদীক্ষিত জনতা মূঢ় নির্বোধ, তারা সহজেই অভিভূত ও সন্ত্রস্ত হয় এবং বিপদের মুখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালায়। সংগঠিত শ্রমিক-শক্তির সাহস এদের নেই।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের এই তিনটি পরিচ্ছেদ বস্তিজীবন ও শ্রমিক-জীবনের বস্তুনিষ্ঠ আলেখ্য। কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যবিত্তসুলভ রোমান্টিকতা ও সংস্কারকে পরিহার করেই শরৎচন্দ্র গড়ে তুলেছেন বাস্তব জীবনালেখ্য।

শরৎচন্দ্রের মনোজগৎ

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

শিল্পীর সৃষ্টি তাঁর মনোজগতের আলেখ্য, মনোজগতের প্রকাশই স্রষ্টার শিল্পকর্ম। সেই জন্যেই শিল্পকর্মকে বুঝতে হলে শিল্পীর মনোজগৎই সর্বাপেক্ষা বড় দিগ্‌দর্শন। যুগধর্ম ও পারিপার্শ্বিক জগতের গতিশীল প্রবাহের মাঝে শিল্পীমন তার বীক্ষণ, মনন ও কল্পনাশক্তির দ্বারা আপনার জীবনদর্শন গড়ে তোলে এবং সেই জীবনদর্শনের সৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিই তার সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই সমারসেট মম বলেছেন, bias বা idiosyncrasy, এবং টুর্গেনিভ বলেছেন "seen through a temperament' লেখকের চিত্তবৃত্তিই তার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। জীবনের পথে মানুষ অনেক কিছুই দেখে, কিন্তু বিশেষ চিত্তবৃত্তির জন্যে কতকগুলি মনের অন্তরালে চলে যায় এবং যা তার অন্তরের সামগ্রী তা দৃঢ়ভাবে মনোজগতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সেই হেতুই লেখকের সৃষ্টির মাঝে তার দেখা জগৎটাই প্রতিফলিত হয়।

মানুষের মন সাধারণতঃ তিনটি জিনিসকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে — এক, তার যুগের চিন্তাধারা ও ধর্ম, দ্বিতীয়তঃ তার পরিবেশ, এবং তৃতীয়তঃ তার বংশানুক্রমিক চিত্তবৃত্তি। এই তিনটির সমন্বয়ে লেখকের চেতন, অবচেতন ও অচেতন মনের সৃষ্টি হয় এবং তাই তার bias। শিক্ষা মস্তিষ্কবৃত্তিকে সূক্ষ্মতর করে মাত্র কিন্তু মনোজগতের অন্তর্নিহিতকে প্রভাবিত করে না। সেই জন্যেই মানুষ অনেকসময় বুদ্ধিদ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, অন্তরে তা গ্রহণ করে না।

১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলীর গণ্ডগ্রাম দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্ম। তাঁর জন্মের যুগটি সংঘাতমুখর। তখন ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হয়েছে, শিল্পায়নের ফলে ভাগীরথীর উভয় তীর চটকলের ধোঁয়ায় কলুষিত হয়েছে, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগকেন্দ্রিক চিন্তাধারার ঢেউ গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। রেলগাড়ি, স্টীমার চলেছে—মানুষ তাতে চড়ে দূর দেশে, নগরে ছুটেছে অর্থবান হয়ে 'মানুষ' হতে,—গ্রামের মানুষ অমানুষ হয়ে পড়ে রয়েছে। তখন ত্যাগধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সমাজ ও পরিবার ভাঙতে শুরু করেছে, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের কুটিরশিল্প ধ্বংস করে কারখানার সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ম থাকে না জেনেও গফুর যে চটকলে এসেছিল সেই

চটকলকেন্দ্রিক ধর্মহীন নগরের পত্তন হয়েছে, এবং পরিবারের মধ্যেও একদিকে গিরীশ ও সিদ্ধেশ্বরী এবং অন্যদিকে হরিশ ও নয়নতারার আবির্ভাব হয়েছে, এবং অন্তরের দিক থেকে অচলা ও সুরেশের অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ রয়েছে। সনাতন হিন্দুধর্মের কঠোর শৃঙ্খলা, নীতিবোধ ও ত্যাগধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজ ও পরিবার তখন পাশ্চাত্ত্য জড়বাদী চিন্তাধারার আঘাতে ভাঙতে শুরু করেছে—হৃদয়বৃত্তি ও মানবীয় চিত্তবৃত্তির ঊর্ধ্বে তখন স্থান করে নিচ্ছে বস্তুজগতের লাভ লোকসান—বস্তুজগতের পাওনার হিসাব অন্তরজগতের পাওনাকে নির্বাসন দিয়ে দিয়েছে জীবন থেকে।

ইউরোপে নবজাগরণের যুগ এসেছিল ম্যাকিয়াভেলির যুগে -তারা যুক্তির দ্বারা সব কিছু বিশ্লেষণ করতে শুরু করল। বাংলায় নবজাগরণের যুগ এসেছিল রামমোহন থেকে। এই নবজাগরণ বা রেনেসাঁর যুগে মানুষ স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা নিয়ে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করতে চাইল। এই ব্যক্তির জাগরণ, ধর্মনীতির শৃঙ্খলমোচন ও তৎসহ অহং-এর প্রকাশই রেনেসাঁ নামে বন্দিত। বাংলাদেশও ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইল ধর্মের বাধা নিষেধ ও নীতিকে। এবং যুক্তির ঘায়ে ধর্মের শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা দেখা দিল বাংলার বুকে। কিন্তু ইউরোপে নবজাগরণ ও শিল্পবিপ্লবের যুগের মাঝে তফাত তিনশ বছরের। বাংলায় এই দুই যুগের তফাত পঞ্চাশ বছরেরও কম। ইউরোপে মানুষ ধর্মশৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে আপনাকে ও দেশ-সমাজকে নানা আদর্শের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝে গড়ে তুলেছিল তিনশ বছর ধরে—সেখানে বুদ্ধিজাত একটা নীতিবোধ গড়ে উঠেছিল কিন্তু বাংলার মানুষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠবার আগেই এবং বুদ্ধিজাত নীতিবোধ আয়ত্ত করার আগেই শিল্পায়নের ফলে তাকে সমাজ-পরিবারচ্যুত হয়ে পৃথিবীর উলঙ্গ বুকে এসে দাঁড়াতে হল। তার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে একদল লোক হয়ে উঠল সমাজচেতনাহীন এবং উলঙ্গভাবে আত্মকেন্দ্রিক এবং কাঞ্চনের পূজারী। এর ফলে সমাজে, পরিবারে ঘনিয়ে এল সংঘাত—মানুষে-মানুষে, সমাজে-মানুষে, দেহে-মনে। সংঘাতমুখর এই যুগসন্ধিক্ষণে শরৎচন্দ্র নতুন শিক্ষা লাভ করে দেখেছিলেন-- ব্যক্তিজীবন ঘিরে চলেছে আর্ত জিজ্ঞাসা, সংগ্রামে সংঘাতে মানবহৃদয় দুঃখবেদনায় ক্লিন্ন হয়ে উঠেছে। তাঁর হৃদয় এই ব্যক্তি-জীবন-সংগ্রামের দুঃখবেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। তাই ৫৭তম জন্মদিনে টাউন হলের সংবর্ধনার উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই···এদের বেদনাই দিল আমার মুখ খুলে। এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ

জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ সুবিচার।"

বাল্যকালে তাঁর জীবন কেটেছে অনাদরে ও দারিদ্র্যে, নিরানন্দ গৃহে। পিতা মতিলাল ছিলেন অনেকটা নিস্পৃহ ও উদাসীন ব্যক্তি ; অর্থোপার্জনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে দারিদ্র্য এসেছিল শরৎচন্দ্রের জীবনে। গৃহ ছিল দারিদ্র্যে দুঃখে নিরানন্দ, তাই তাঁর মন হয়ে উঠেছিল বহির্মুখী। নিরানন্দ গৃহ ও বহির্মুখী অন্তর বাল্য ও কৈশোরে তাঁকে খানিকটা উচ্ছৃঙ্খল ও ছন্নছাড়া করে তুলেছিল। ডিহিরী ও ভাগলপুর বাস, এবং পুনরায় দেবানন্দপুর থেকে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে অধ্যয়নকালে তাঁর এই দুরন্ত অসুখী মনের অভিব্যক্তি সমানভাবেই চলেছিল। যাত্রার দলে অভিনয়, বৈষ্ণব আখড়ায় গমন প্রভৃতি অকাজ-কুকাজের মধ্যে তাঁব অতৃপ্ত অন্তর পরিতৃপ্তি খুঁজে ফিরত। তাই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে ছন্নছাড়া মানুষগুলি তাঁর অন্তরের সমস্ত স্নেহ ও দরদে লালিত হয়েছে।

এই কৈশোরে একটি গ্রাম্য বালিকা তাঁকে বৈঁচিব মালা দিত, তার প্রতি একটা বালখিল্য প্রেমও গড়ে উঠেছিল। নিরানন্দ গৃহ থেকে পলাতক শরৎচন্দ্র এই সখীর কাছে এসে না পাওয়ার ক্ষতিপূরণ কবতে চাইতেন। এই বৈঁচি-মালার কিশোরীই একদিন রাজলক্ষ্মীরূপে আত্মপ্রকাশ কবে সাহিত্যের দিগন্ত আলোকিত করে দিয়েছিল।

পক্ষান্তরে তাঁর মাতা ভুবনমোহিনী ছিলেন সর্বংসহা ধরিত্রীর মত একটি নারীচরিত্র। মাতার নির্বাক কর্মজীবন, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগভিত্তিক সেবা-ধর্ম তাঁর অন্তরে একটি মহীয়সী মাতৃমূর্তি সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় ত্যাগ-ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত সীতা-সাবিত্রীর মত একটি নারীকে শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর মায়ের মাঝে। নারীর পক্ষে ত্যাগ সহিষ্ণুতা সেবাপরায়ণতা, কর্মে ও বাক্যে মাধুর্য যে একান্তই প্রয়োজন। এবং এরাই যে নারীচরিত্রের ভূষণ—একথা তাঁর মনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর মাতা ভুবনমোহিনীর প্রভাবে।

হুমায়ুন কবির বলেছিলেন,—"শরৎচন্দ্রের মধ্যে বিপ্লবাত্মক প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে একটা রক্ষণশীলতার ভাব আছে। যার জন্য সময়ে সময়ে মানুষ অবাক হয়ে যায়।" শরৎচন্দ্রের চিন্তাধারা বিপ্লবাত্মক হওয়া সত্ত্বেও যে তাঁর নারীচরিত্রগুলি সনাতন ধর্মের গুণাবলীর অধিকারী তার কারণ ভুবন-মোহিনীর চরিত্রমাধুর্য তার মনে যে বাধ (inhibition) সৃষ্টি করেছিল তাকে তাঁর বিদ্রোহী অন্তরও অতিক্রম করতে পারে নি। শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহ ছিল মানুষের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে, আত্মকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে, নব্য যুগের হৃদয়হীন

স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে। তাই নতুন যুগের হৃদয়হীন নতুনদাদের তিনি চাবুক মেরে রক্তাক্ত করতে কসুর করেন নি। পক্ষান্তরে সমাজচ্যুতা, ভ্রষ্টা নারীর হৃদয়ের ঐশ্বর্যকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে, অপরিসীম কারুণ্য ও দরদের রক্তিমায় মহীয়সী করে তুলেছেন। তাঁর বিদ্রোহ সমাজের হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে, মানুষের অমানুষোচিত ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে। তিনি সমাজকে ভাঙতে বলেন নি। তার অনুশাসনকে উপেক্ষা করতেও বলেন নি। তিনি শুধু চেয়েছিলেন সমাজ-চিত্ত হৃদয়বান হোক। তাঁর আবেদন মানুষের হৃদয়ের কাছে। আপন অন্তরের করুণা দিয়ে, অপরিসীম দরদ দিয়ে তিনি সমাজচিত্তে সমবেদনা সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন—মানুষ হৃদয়বান হলে, অন্তর দিয়ে বুঝতে শিখলে তার হৃদয় বিস্তৃতি লাভ করে সমস্ত অসত্য ও অনাবশ্যক অনুশাসনকে দূর করতে পারবে। তাঁর 'সমাজধর্মের মূল্য' প্রবন্ধে তিনি বলেন, "সমাজের সংস্কার অসঙ্গতি ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা যায় কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া সুফল পাওয়া যায় না", "ব্যক্তিস্বাধীনতা সমাজের জন্য সঙ্কুচিত হইতে পারে না। এবং সমাজকেই স্বাধীনতার স্থান যোগাইবার জন্য প্রসারিত করিতে হয়।"

কৈশোর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তাঁর মনে সনাতন হিন্দুধর্ম ও ত্যাগগত সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহীয়সী নারীমূর্তি এবং বৈষ্ণব আখড়ায় যাত্রাদলের ছন্নছাড়া লোকগুলির মাঝেও তাঁর বহির্মুখী অন্তর হৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছিল। হৃদয়ের প্রসারতাকেই তিনি শ্রদ্ধেয় মানবীয় গুণ বলে গ্রহণ করেছিলেন।

ভাগলপুরের জীবনে আর-একটি সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পিতা ছিলেন শ্বশুরালয়ে আশ্রিত। কিন্তু বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সমাজ পরিবার তখন ভাঙতে শুরু করেছে। নতুন বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিস্বার্থ তখন প্রবলতর হয়েছে। তার ফলে ক্ষুদ্র স্বার্থ, আত্মকেন্দ্রিকতা দেখা দিয়েছে সমাজ ও পরিবার জীবনে এবং ব্যক্তিসংঘাত প্রবলতর হয়ে উঠেছে। একান্ন-বর্তী পরিবার ভাঙতে শুরু করেছে। যেখানে ভাঙার সুযোগ হয় নি সেখানে ব্যক্তিজীবনে অতৃপ্তি দুঃখ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। মাতার মৃত্যুর পরে খঞ্জর-পুর বাস এই ব্যক্তিসংঘাতজনিত দুঃখের পরিণতি। এই সময় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন—মানবজীবনে যে দুঃখ ঘনীভূত হয়ে ওঠে তার বেশীর ভাগই—এই ব্যক্তিসংঘাতজনিত বেদনা। খাওয়া-পরায় জগতের দুঃখটা অকিঞ্চিৎ-কর,—মানুষের জীবনে মানুষের দেওয়া বেদনাই সর্বাপেক্ষা বেশী এবং এই বেদনার মূল মানুষের হৃদয়হীনতা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই সংঘাত চলেছে

পৃথিবীব্যাপী, সর্বক্ষেত্রে এবং মানুষ দুঃখ-বেদনায় আর্ত চিৎকার করে উঠছে প্রতিক্ষণে। তিনি আপনার দরদী অন্তরে এই আর্ত চিৎকার শুনেছিলেন এবং হৃদয়ের অপরিসীম কারুণ্য সিক্ত করে এই বেদনার্ত মানবজীবনকে আপনার সৃষ্টিতে স্থান দিয়েছেন।

মানুষের যৌনজীবনের পরিণতির শেষ স্তবে নারীপ্রেম অবশ্যম্ভাবী রূপেই আসে। এই প্রেমজীবনটা সর্বদাই বাস্তব নয়, অনেক ক্ষেত্রেই কাল্পনিক। ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের জীবনেও এসেছিল এমনি এক প্রেম কৈশোরের প্রান্ত-ভাগে এবং যৌবনের প্রারম্ভে। এবং এই প্রেম মানবচিত্তকে উদ্বেলিত মথিত করে তাকে পরিণত করে দেয়—অথচ এই মানসিক প্রেম সর্বদাই বিয়োগান্ত। তাই শরৎচন্দ্র দেবদাসের মাঝে বলেছেন, "বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে।" এমনি একটা প্রেমজীবন এসেছিল তাঁর, ভাগলপুরের ভট্টবাড়ীর বুড়ী বা নিরুপমা দেবীকে কেন্দ্র করে। নিরুপমা দেবী সনাতনপন্থী সংসারের নিষ্ঠা-বতী বালবিধবা, সতীত্ববোধে সচেতন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও মেলামেশা সম্ভব ছিল না। শরৎচন্দ্রের উদ্বেলিত উন্মুখ হৃদয় বারবার সতীত্ব বাধের প্রাচীরে আঘাত পেয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু ভুবনমোহিনীর প্রভাব-পুষ্ট তাঁর মন হিন্দু নারীর সতীত্ববুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছিল।

মনস্তত্ত্বের ভাষায় কাব্যসাহিত্যকে যৌনজীবনেব ঊর্ধ্বগমনের দান (sub-limation of sex) বলে অভিহিত করা হয়। এই সময়ের এই ঝঙ্কৃত হৃদয়ানুভূতির সময়েই তাঁর লেখক-জীবনের সূত্রপাত। প্রথম যৌবনেব এই প্রেম ছিল খণ্ডিত ; দ্বিধা ও বাধায় বেদনাময়। তাঁর এই উন্মুখ ব্যর্থ প্রেম ও ও সতীত্ব সম্বন্ধে একটা সশ্রদ্ধ সংস্কারই তাঁর সৃষ্ট বালবিধবা-চরিত্রগুলিকে সহানুভূতি ও করুণায় আর্দ্র করে, ত্যাগগত সেবাধর্মে দীক্ষিত করে মহৎ ও সুন্দর রূপে উপস্থাপিত করেছে। শুধু তাই নয় এই বালবিধবা চরিত্রগুলি যেন তাঁর হৃদয়রক্তে সঞ্জীবিত। হরিদাস শাস্ত্রীকে লিখিত পত্রে তিনি বলেছিলেন, "শুধু নিজেদের কথা নয়। ভাবী সন্তানের কথাটা সবচেয়ে বড়কথা। তাদের ঘাড়ে অপরের বোঝা চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা অতিবড় প্রেমেরও নাই।" শরৎ-চন্দ্রের জীবনে এই প্রেমানুভূতি ও ব্যর্থতাই সম্বল হয়ে রইল, ব্যক্তিজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বই সত্য হয়ে রইল,—তাই রাজলক্ষ্মী, রমা কেউই এই বাধাকে অতিক্রম করতে পারে নি। কিরণময়ী যখন করলো তখন আর সে প্রকৃতিস্থ রইল না। এই বেদনা ও ব্যর্থতা দেবদাসে আত্মনিগ্রহে পরিণত হল।

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিজীবনের সংঘাত লেখককে করেছিল ছন্নছাড়া, দেব-দাসের মতই আত্মনিগ্রহে সে তৃপ্তি পেতে চাইল। এই আত্মনিগ্রহের প্রবণতা

তাঁকে নিয়ে গেল সুদূর রেঙ্গুনে। যে সমাজ ও সংসার তাঁর জীবনের সব কিছু হরণ করে তাঁকে ছন্নছাড়া করে রেঙ্গুনে পাঠিয়েছিল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে এবং সেই সঙ্গে এল উচ্ছৃঙ্খল আত্মনিগ্রহ। কিন্তু এইখানে তিনি দেখলেন কতকগুলি মানুষ যারা স্বদেশ সমাজ ও সংসার থেকে নির্বাসিত। ছিন্নমূল সমাজের উচ্ছিষ্ট। তাদের তিনি প্রশংসা করতে পারলেন না। কাম্য বলেও মনে করলেন না। কিন্তু তাদের জীবনের গভীর দুঃখ, উত্থানপতন সত্ত্বেও তাদের অন্তরের ঔদার্য, তাঁর দরদী অন্তরকে বেদনার্ত করে দিল। তিনি তাদের হৃদয়ের বেদনাকে আপন হৃদয়রক্তে রঞ্জিত করে অক্ষয় করে রেখেছেন।

এই রেঙ্গুনে তিনি প্রচুর পড়াশুনার অবসর পেয়েছিলেন। যমুনা সম্পাদক ফণীন্দ্র পালকে ১৯১৩ সালের জানুয়ারির চিঠিতে লিখেছিলেন—"রাত্রে অবশ্য পড়তে পাই কিন্তু নোট করা হয়ে উঠছে না।···আর একটা ইচ্ছা আছে H. Spencer এর Synthetic Philosophy-র একটা বাংলা সমালোচনা ······ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি।"

এই সময়ে তিান Herbert Spencerএর বিবর্তনবাদের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তাঁর মনের গঠনও এই বিবর্তনবাদকে গ্রহণ করার উপযোগী ছিল। হার্বার্ট স্পেন্সার Laplaceএর জ্যোতিষিক বিবর্তন, Charles Lyellএর ভূতাত্ত্বিক বিবর্তন, Lamarkএর জৈব বিবর্তন, Von Bairএর জীব-বিবর্তনের বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে পৃথিবীতে অনাদিকাল থেকে একটা সর্বজাগতিক বিবর্তন চলেছে। গ্রহ, সূর্য ভূত্বক, উদ্ভিদ, প্রাণী, মানবমন, সমাজ-মন, রাষ্ট্র, সরকার, অর্থনীতি, চারুকলা, ভাষা, ধর্মনীতি—সর্ব জগতেই এই বিবর্তন চলেছে অনাদিকাল ধরে।

স্পেন্সার ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নি, শরৎচন্দ্রও বলেছেন, —"তাই কতকটা শৃঙ্খলের প্রয়োজন। অপরপক্ষে শৃঙ্খল একবারে কাড়িয়া ফেলিয়া দিলে পুরুষেরাও যে কত অবিচারী উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, এই ভারতবর্ষেই সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।" (নারীর মূল্য) স্পেন্সারের নীতি-বাদের মূলভিত্তি হিতবাদ এবং তাঁর মানবচরিত্রে হৃদয়ের বিস্তৃতিই good conduct বলে বর্ণিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র বলেছেন,—বিদ্যার উদ্দেশ্য যদি হৃদয় প্রশস্ত করা হয় ইত্যাদি।

স্পেন্সারের বিবর্তনবাদ পরবর্তী যুগে ভুল বলে গণ্য হয়েছে। তথাপি তাঁর যুক্তির অকাট্যতা শরৎচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বিবর্তনবাদ সমাজ, ভাষা, শিল্পায়ন, কলাবিদ্যা, সঙ্গীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। শরৎচন্দ্র তাঁর

বিবর্তনবাদ সামাজিক পরিধির মধ্যে প্রয়োগ করেছেন। ফ্রয়েড়ীয় মনস্তত্ত্ব আবিষ্কারের পরে সমাজ প্রসঙ্গেও বিবর্তনবাদ অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়েছে। যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা মানুষ হৃদয়বান হয়ে উঠতে পারে, একথা আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

এই সময়ে তিনি টলস্টয়, জোলা, ডিকেন্স প্রভৃতি বিদেশী বাস্তববাদী লেখকের লেখা পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা তাঁর নিত্য সহায় ছিল। রবীন্দ্রনাথের গোরা ও চোখের বালি তিনি বহুবার পড়েছেন। বিশেষতঃ টুর্গেনেভের Father and Childrenএর দ্বারা প্রভাবিত চোখের বালি শরৎচন্দ্রকে নতুন আলো দিয়েছিল। এই ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবি তখন মুখর হয়ে উঠেছে তাঁর মনে, সেই জন্যেই স্পেন্সারের বিবর্তনবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করে। চরিত্রহীনে কিরণময়ী চরিত্রের মলে যে প্রখর যুক্তির প্রবাহ দেখা দিয়েছে তার প্রায় সবই স্পেন্সারের যুক্তির প্রবাহ থেকে গৃহীত। একটা উদাহরণই এখানে যথেষ্ট মনে হয়।

গৃহত্যাগের পরে অনুতপ্ত দিবাকরকে কিরণময়ী বলেছিল, "এতটা মন ভারি করে থাকবার প্রয়োজন হত না ঠাকুরপো, যদি একবার এই কথাটি ভেবে দেখতে যে আমাকে বাড়ীর বাইরে এনে কারো সত্যিকারের অধিকারে পা দিয়েছ কিনা"।

Spencer defines justice as, "The right of each man to do as he pleases so long as he does not trespass upon the equal freedom of every other man."—History of Modern Philosophy—W. K. Wright. p. 472

এই বিদ্রোহবাণীর সঙ্গে কিন্তু শরৎচন্দ্র আর-একটি দিকও প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে সমাজশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সুফল আশা করা যায় না। তাঁর সমাজসংস্কারের পথ ভিন্ন। তিনি বলেন,—"মনুপরাশরের বিধিব্যবস্থা আমাদের কি সম্পদ দান করিয়াছে সে তর্ক তুলিয়া নয়, কি বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে শুধু সেই সমালোচনা করিয়া সমাজের দোষগুণ বিচার করা উচিত। অতএব আজও যদি, আমাদের মনুপরাশরের সংস্কার করাই আবশ্যক হয় তবে ঐ ধারা ধরিয়াই করিতে হইবে।"

শরৎচন্দ্র সমাজশৃঙ্খলাকে ভাঙতে চান নি। তিনি সমাজকে প্রসারিত হয়ে মহত্তর হতে বলেছেন। তিনি সমাজবিদ্রোহী নন, সাহিত্যেও বিদ্রোহী নন, বরং রক্ষণশীল। সমাজচিত্তকে তিনি করুণায় উদ্বুদ্ধ করে তাকে মহত্তর, প্রাণময় ও উদার করতে চেয়েছেন। তাঁর সমস্ত পতিতা ও বিধবা চরিত্র তাই

সমাজবিধি লঙ্ঘন করেনি, তারা নীরবে সহ্য করেছে, দুঃখ পেয়েছে। গোরায় যে ব্যক্তিবাদের বিদ্রোহ দেখা যায়, শরৎসাহিত্যে সে বিদ্রোহ প্রকট হয়নি।

এই সংরক্ষণশীলতার জন্যেই তিনি জোলার প্রকৃতিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন নি বরং টলস্টয়ের আর্টের সংজ্ঞার সঙ্গে তাঁর আর্টের একটা হৃদয়গত ঐক্য দেখা যায়। টলস্টয় বিশ্বাস করতেন, আর্ট কেবল আনন্দের জন্যেই নয়—মানুষে মানুষে মিলন, মানবসমাজ ও ব্যক্তির মঙ্গলই আর্টের কাম্য। টলস্টয়ের মত, "Art is not the production of pleasing objects, it is not pleasure but a means of union among men, joining them together in the same feelings and indispensable for the progress towards well-being of individuals and of humanity." যারা পতিত, অধম, মুহূর্তের ভুলে সমাজ-জীবন থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের ভুলই কি সত্য হয়ে থাকবে! তাদের হৃদয়কে কেউ বিচার করবে না? এই অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ। মানুষের ভিতরের বস্তুটিকে বিচার কর, হৃদয় দিয়ে বিচার কর, তাতেই মানব-মঙ্গল। তাতেই মানুষে মানুষে মিলন সম্ভব—এই নীতিবাদই শরৎচন্দ্রের মূল তত্ত্ব। এই তত্ত্বই তাঁর মানবতাবাদ, তাঁর দরদী অন্তরের মানবপ্রেম, তাঁর হৃদয়-গত শিল্পকর্ম। চন্দননগর সাহিত্য-সভায় তিনি তাই বলেছিলেন, "আসল বস্তু তার সত্তা বা মন যাহাই বলুন—সেটা মানুষের ভিতরটা।"

এই নৈতিকতত্ত্ব ও হৃদয়ধর্ম তিনি লাভ করেছিলেন জীবনের অভিজ্ঞতায়। তাঁর এই অভিজ্ঞতার পরিপোষক বলেই স্পেন্সারের সার্বিক বিবর্তনবাদ তাঁর বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁরও অভিপ্রায় ছিল মানবহৃদয় যুগের বিবর্তনে প্রসারিত হোক্। প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে সমাজ এগিয়ে চলুক মানবতার দিকে।

ভাগলপুর ও দেবানন্দপুর থাকতে তিনি যে ছন্নছাড়া জীবন যাপন করেছেন তারই কলঙ্ক তাঁর সামাজিক জীবনে সত্য হয়েছিল, কিন্তু সমাজের হৃদয়হীনতাজনিত যে মর্মবেদনায় তাঁর জীবন এই ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল তা কেউ দেখল না। তাঁর হৃদয়ের অপরিসীম প্রেমকে কেউ মর্যাদা দিল না। এই ব্যর্থতাই তার প্রধান চরিত্রগুলিতে ধ্বনিত হয়েছে—কখনো identification কখনও projection প্রক্রিয়ায়।

ভারত সত্যম্-শিবম্-সুন্দরমের দেশ—সেই দেশে শরৎচন্দ্রের জন্ম। যা সুন্দর তাই সত্য ও কল্যাণময়—এই বিশ্বাস তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। যা মানুষের অকল্যাণ ডেকে আনে তা সত্যও নয় সুন্দরও নয়—এ বিশ্বাস তাঁর ছিল বলেই তাঁর বিদ্রোহী চরিত্রগুলি কোন সময়েই নীতিকে তুচ্ছ করে এগিয়ে

যায় নি। 'সাহিত্য ও নীতি'তে তিনি তাই বলেছেন "art for art's sake কথাটা যদি সত্য হয় তবে তা কিছুতেই immoral এবং অকল্যাণকর হতে পারে না, এবং অকল্যাণকর এবং immoral হলে art for art's sake কথাটাও সত্য নয়। পুনরায় বলেছেন,—"Idea পশ্চিমের কি উত্তরের ইহা বড় কথা নয়। স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় নয়, বড় কথা ইহা ভাষা ও জাতির কল্যাণকর কি না।"

স্রষ্টার মনের যে বিশেষ গঠন বা বিশেষ চিত্তবৃত্তি, তারই সৃষ্টি তাঁর সাহিত্য। স্রষ্টা সেই বিশেষ চিত্তবৃত্তি দিয়েই জগৎকে, ব্যক্তিকে, সমাজকে সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়কে দেখেন। এই দেখা বা বীক্ষণই স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য। যুগে যুগে মানুষের বুদ্ধি এবং হৃদয় একসঙ্গে মিলে মানুষের সুখী হওয়ার পথ নির্দেশ করেছে। দার্শনিক দেখেছেন কোথায় সত্য, কোন্ সত্যকে গ্রহণ করলে মানুষ ব্যক্তি হিসাবে দেহে মনে মানবগোষ্ঠীর মাঝে সুখী হতে পারবে। ধর্ম-সমাজ-নীতি বিধিনিষেধের বাঁধে মানুষেব মনকে বেঁধে মানবতাবাদী করতে চেয়েছে। সাহিত্য মানবের অন্তরবেদনাকে, জীবনেব সমস্যাকে উদঘাটিত করে। মানুষের হৃদয়কে আঘাত করে তাকে পরার্থপর করে সমাজসচেতন করতে চেয়েছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্রষ্টা মানবমনকে আঘাত করে তাকে অনুভূতিপ্রবণ করতে চেয়েছেন হৃদয়বৃত্তিকে উজ্জীবিত করছেন। এই ক্রমবিবর্তনশীল জগতে মানুষের হৃদয় বিস্তৃত হয়নি একথা বলা যায় না, কিন্তু যতটুকু হৃদয়ের উন্মেষ হলে মানুষ সুখী হতে পারতো ততটুকু হয়নি — তাই মানুষ এই বৈজ্ঞানিক সমারোহের যুগেও অসুখী। ত্যাগে ভোগে সংঘাত চলেছে, মস্তিষ্ক হৃদয়ে সংঘাত চলেছে। মানুষের অহং, তার মানবাত্মা জগতে কাম্যবস্তুকে আয়ত্ত করে সুখী হতে চেয়েছে ; সে চেয়েছে স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠে কাম্যধন লাভ করতে, কিন্তু এই পাওয়া তার জীবনে হয়নি। পৃথিবী, মানুষ, সে নিজে একত্রে সে পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে--তার ফলে দেহের কারাগারে তার আত্মা বন্দী, তার সত্তা তার অন্তর বেদনার্ত হয়ে ক্রমাগত ক্রন্দন করছে। যে বুদ্ধি দিয়ে যাকে পেতে চেয়েছে, হৃদয় তাকে গ্রহণ করেনি। হৃদয় যাকে চেয়েছে বুদ্ধি দিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। শরৎচন্দ্রের সত্তা, তাঁর অন্তর বেদনার্ত হয়ে ক্রন্দন করেছে, বেদনায় হাহাকার করেছে। পৃথিবী দেয়নি তাঁর কাম্য, মানুষ দেয়নি প্রীতি, সমাজ দেয়নি স্বীকৃতি, প্রেম দেয়নি প্রতিদান, তাঁর অন্তর কেঁদেছে না-পাওয়ার দুঃখে। এই দুঃখমথিত অন্তর নিয়ে তিনি দেখেছেন—জগতে মানবহৃদয় তাঁর অন্তরের মতই হাহাকার করছে। মানবাত্মার সঙ্গে তাঁর অহং (ego)-র সঙ্গে সংঘাত চলেছে নিরন্তর। এই সংঘাত

চলেছে মানুষে মানুষে, চিত্তবৃত্তিতে-চিত্তবৃত্তিতে, সমাজে-মানুষে, পরিবেশে-মানুষে, মানুষের আপন অন্তরে, তার চেতন-অচেতন মনে। সংসার ও নীতির সঙ্গে, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে। তাঁর সাহিত্য তাই সংঘাত-বেদনাবিধুর মানবচিত্তের আলেখ্য।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব আবিষ্কারের বহুপূর্বে দস্তেয়ভস্কি ছিন্ন ব্যক্তিত্বকে (split personality) সাহিত্যে রূপায়িত করেছিলেন তাঁর প্রতিভাদীপ্ত বীক্ষণ-শক্তির দ্বারা। বাংলাদেশে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের পরিচিতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে কিন্তু শরৎ-প্রতিভা অহংএর সংগ্রামকে, চিত্তবিকারজনিত এই বেদনাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার অনেক আগে--আপনার জীবন-সমীক্ষা থেকে। মানব-জীবনের এই সংঘাতজনিত দুঃখ মানুষের জীবনকে পঙ্গু করেছে। স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে। মানবসত্তার বিকাশের অন্তরায় হয়েছে। মানব-জীবনের এই চিরন্তন সমস্যাকে তাঁর জীবনদর্শন, জীবনের নীতিবাদ বিচার করেছে হৃদয় দিয়ে, প্রেম দিয়ে সমবেদনা দিয়ে। তাঁর নীতিবাদ, তার জীবন-দর্শনের মূলতত্ত্ব—মানুষের হৃদয় ঔদার্যে ও মহত্ত্বে প্রসারিত হয়ে মানুষের দুঃখকে বুঝলেই মানবসত্তার এই জৈবিক দুঃখ দূর হতে পারে। মানুষের মূল্যায়ন হোক এই হৃদয় দিয়ে, তার অন্তরাত্মার উদারতা দিয়ে—চলতি সমাজ, সংস্কারনীতি ও ধর্ম দ্বারা তার মূল্যায়ন হয় না। শরৎ-সাহিত্য বেদনার্ত হৃদয় নিয়ে মানবাত্মার এই চিরন্তন দুঃখকে অনুভব করেছে, প্রকাশ করেছে, প্রাণময় করেছে।

মানবাত্মার এই চিরন্তন বেদনাকে দূর করতে যুগে যুগে মানুষের প্রয়াসের অন্ত নাই। কিন্তু রেনেসাঁর যুক্তিবাদের কৃপায় মানুষ যখন নীতি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সমস্ত আশ্রয় ত্যাগ করে মুক্তির আশায় ব্যক্তি হিসাবে রৌদ্রতপ্ত বৃষ্টিসিক্ত পৃথিবীর মুক্ত অঙ্গনে এসে দাঁড়ালো, সেই দিন থেকে ব্যক্তিজীবনের এই সংগ্রাম হল প্রবলতর। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অহমিকা জড় জগতের প্রাপ্যকে যখন বুঝে নিতে চাইল তখন মানুষ বন্দী হল জড়বাদের কারাগারে---এই ভোগের রাজ্যে সংগ্রাম বেড়ে গেল—মানুষ হল ব্যক্তিপ্রধান—একক। জড়বাদের স্বাভাবিক পরিণতি শিল্পায়ন মানুষকে গৃহসমাজবঞ্চিত করে তাকে করল নিঃসঙ্গ। ঊনবিংশ শতকে ভারতের বুকে এই ত্যাগ আর ভোগের দুই সভ্যতা এসে দাঁড়াল মুখোমুখি। তাই ভারতের বুকে আকস্মিকভাবে এই দ্বন্দ্ব প্রবলতর হয়ে উঠল। মানবের জীবন-সংগ্রামের বেদনাও প্রবলতর হল। শরৎচন্দ্র এই সংঘাতমুখর যুগের শিল্পী—এই সংঘাতজনিত-দুঃখময় তাঁর জীবন—এই সংঘাতের রূপকার তাঁর সাহিত্য, তাঁর সৃষ্টি। যৌথ পরিবারের

মধ্যে তাঁর কৈশোর ও প্রাক্‌যৌবন কেটেছিল,—তখন যৌথ পরিবার ক্ষয়িষ্ণু এবং সেখানে তখন ব্যক্তিসংঘাত আরম্ভ হয়েছে এবং যৌথ পরিবার ভাঙতে শুরু করেছে। সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, মানুষ একক নয়। তার সুখ দুঃখ আনন্দ একমাত্র তারই কার্য বা ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। মানুষকে চলতে গেলেই অন্যের অধিকার ও অন্তরের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। যেমন রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার গল্পে, রতনের বেদনা জগতে অপরিহার্য—'একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্ব-ব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল।' জীবনে চলার পথে এই বিশ্বব্যাপী মর্মবেদনা জীবনের নিত্যসঙ্গী। মানুষ চলার পথেই দুঃখ আনন্দ আহরণ করে। চলার পথেই দুঃখ আনন্দ দেয়। মানবসমাজে এই ব্যক্তিসংঘাত, চিরন্তন সমস্যা -শরৎচন্দ্র জীবনের গভীরে নেমে দেখেছিলেন মানবজীবনে এত বুদ্ধি বিদ্যা জ্ঞান থাকতেও মানুষ নিঃসঙ্গ একক এবং মানুষের কাছেই মানুষ বন্দী। তাই তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মাঝে এই ব্যক্তিসংঘাতজনিত বেদনা সর্বাপেক্ষা বেশী গতি ও শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং এই সমস্যার একমাত্র সমাধান,—মানুষ যদি হৃদয়বান হয়, মহত্ত্বে ঔদার্যে ত্যাগে সে মানবীয় গুণের অধিকারী হয়। তবেই মানুষের নিঃসঙ্গ জীবনের নিরন্তর দুঃখ-বেদনা দূর হতে পারে।

সেই জন্যেই, সকল পাপ, অভাব ও অধর্মের অন্তরালেও যখন সত্যিকার হৃদয় থাকে তখন তিনি তাকে ভালবেসেছেন, তাকে মূল্য দিয়েছেন, তাকে মহান করেছেন। তাঁর আত্মাকে সমীহ সহকারে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু যেখানে মানুষ হৃদয়হীন হয়ে নষ্টাত্মা হয়েছে, ব্যক্তিবাদের মোহে সংকীর্ণ ও আত্ম-কেন্দ্রিক হয়েছে, সেখানে তিনি তাদের ক্ষমা করেন নি। সেই জন্যেই পাশ্চাত্যের কাঞ্চনমোহের ভোগকেন্দ্রিকতাকে তিনি নির্মম তিরস্কার করেছেন। নতুনদা, রাসবিহারী, বিলাসবিহারী, হরিশ, নয়নতারা, তাঁর ব্যঙ্গশ্লেষে রক্তাক্ত হয়ে তুচ্ছ হয়ে গেছে। অন্যদিকে ছন্নছাড়া ইন্দ্রনাথ, সমাজের উচ্ছিষ্ট অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী আপনার হৃদযের ঔদার্যে, মহত্ত্বে, ত্যাগে মহীয়সী হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের হৃদয়ক্ষরিত সমস্ত স্নেহ ও কারুণ্য অকপটে এদের উপর বর্ষিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র মানুষকে বিচার করেছেন তার হৃদয়ের মাপকাঠিতে। মানুষের হৃদয় যখন ব্যাপ্তি লাভ করে, উদার ও মহৎ হয়ে উঠেছে তখনই দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। এই মানবপ্রেম, এই হৃদয়-ধর্মই শরৎ-সাহিত্যের মূলীভূত শক্তি। এই শক্তিই পাঠকচিত্তকে উদ্বেলিত করে মানবপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করে।

মানবতার পূজারী মানবদরদী শরৎ-সাহিত্যকে আজ বিংশ শতকের তৃতীয় পাদে এসে খর্ব করার একটা অযৌক্তিক প্রচেষ্টা চলেছে। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব প্রকাশের পরে, এবং নানা ইজমের প্রভাবে এবং সর্বোপরি সাহিত্যের মধ্যে আজ ব্যবসাবুদ্ধি প্রকট হওয়ায় সাহিত্যকে আজ নানা সংজ্ঞায় দূষিত করে নানারূপ প্রচার চলেছে। কিন্তু পৃথিবীতে দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবী আজ রুগ্ন এবং আজ যে সাহিত্য সাহিত্য বলে খ্যাতিলাভ করেছে তা প্রকৃত-পক্ষে রুগ্ন পৃথিবীর ছবি। A. C. Ward তাঁর Twentieth Century Literature-এ বর্তমান যুগ সাহিত্যের প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছেন,—"No previous generation had shown so close an interest in mental and spiritual disturbance as to create a growing assumption that most men and women are cases to be diagnosed, that the world is a vast clinic and that nothing but abnormalcy is normal."

Arthur Symonds তাঁর সুপ্রসিদ্ধ Studies in Prose and Verse-এ বলেছিলেন, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারই সাহিত্যকে নষ্ট করেছে। সাহিত্য ছিল রসিক জনের, এখন তা সাধারণের —কাজেই আজকার এই ব্যবসা-বুদ্ধিপ্রসূত যে সাহিত্য তা গতকালের খবরের কাগজের মতই মূল্যহীন। ব্যবসাবুদ্ধিজনিত অর্থের মোহে আজ সাহিত্যিক কুসাহিত্য অ-সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন। সমালোচক দুন্দুভিনিনাদে তাকে সাহিত্যের বিজয়মাল্য দিচ্ছেন। সাহিত্য সাধারণের অপুষ্ট, বিকৃত, যৌনতাপিপাসু মনকে ক্ষণিক আনন্দ দিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করছে। যদি তাই হয় তবে সাহিত্যের মূল্যায়ন হবে কিসের বিচারে? বহু সংজ্ঞায় বিভক্ত এই সাহিত্য। আদর্শবাদী, উদ্দেশ্যমূলক, রোমান্টিক, বাস্তববাদী, অতিবাস্তববাদী, কান্তিবাদী, চেতনা-প্রবাহী ইত্যাদি; কিন্তু কিসের তুলাদণ্ডে এদের বিচার হবে? এখানেই প্রশ্ন আসে আমাদের সভ্যতার মূল আদর্শ কী?

আদিম যুগ থেকে মানুষ দেহে মনে সুখী হওয়ার জন্যে সংগ্রাম করে চলেছে। কিন্তু মানুষ এই বর্তমান বৈজ্ঞানিক মহাসমারোহের যুগেও সুখী হয়নি, তার সংগ্রাম এখনও চলেছে। আত্মিক জগতের সুখানুসন্ধান যুগে যুগে ধর্ম, জাতি, সমাজনীতি, নীতিবাদ (ethics), কাব্যসাহিত্য, সমাজবিধি রচিত হয়েছে, বস্তুজগতে বিজ্ঞানের কারিগরী শক্তি এগিয়ে চলেছে। ধর্ম-দর্শনের নীতিবাদ প্রচারিত হয়েছে সাহিত্যের মাধ্যমে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ

বিশ্লেষণ করেছে নিজের হৃদয়কে, অন্যের হৃদয়কে। কিন্তু আজও মানুষ সুখী হয়নি কেন ?

প্রখ্যাত দার্শনিক সোয়াইৎসজার বর্তমান সভ্যতাকে একখানি দ্রুত থেকে দ্রুততর গামী জাহাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন যে জাহাজের steering-টি বিকল এবং যা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে প্রবল গতিতে ছুটেছে। অর্থাৎ আজ মানুষ মস্তিষ্কজাত বুদ্ধিবলে ভয়াবহ বৈজ্ঞানিক শক্তি লাভ করেছে কিন্তু সেই শক্তিকে যে হৃদয় বা অন্তর পরিচালনা করছে তা বিকল এবং রুগ্ন। সেই জন্যই এই সভ্যতা অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের দিকে দ্রুত গতিতে ছুটেছে। পক্ষান্তরে ডাঃ রাধাকৃষ্ণান তাঁর বিখ্যাত Oxford বক্তৃতায় বলেছিলেন, মানুষের সামনে একটি আদর্শ আছে—to be perfectly and profoundly human। অর্থাৎ মানবতা অর্জন করাই মানবসমাজের একমাত্র আদর্শ। মানবসমাজ এবং ব্যক্তি হিসাবে মানুষ এই মানবতা অর্জন করেনি বলেই আজকার এই সাড়ম্বর সভ্যতা ব্যর্থ হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক এই সমারোহের মাঝেও মানুষ অসুখী, নিপীড়িত, দুঃস্থ। কিন্তু যুগে যুগে মহামানবগণ জন্মেছেন, ধর্ম, জাতি, ন্যায়নীতির বাণী প্রচার করেছেন, সাহিত্য সেই বাণী বহন করে যুগে যুগে নিয়ে গেছে মানবহৃদয়ের কাছে। মানবহৃদয়কে বিস্তৃততর মহত্তর হয়ে মানুষকে ভালবাসতে বলেছে কিন্তু মানুষ ঐহিক জীবনের সুখকেই পরমার্থ মনে করে মানবতার বাণীকে নিস্ফল করে দিয়েছে। বস্তুজগতের প্রতি অত্যধিক মোহ মানুষকে তার আত্মিক জগতে নিম্নগামী করে তাকে ধ্বংসমুখী করে তুলেছে।

ইতিহাসেও দেখা যায় জনগণের মনের উপরে সাহিত্য প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। যুগে যুগে বিপ্লব হয়ে গেছে পৃথিবীতে, তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যায়, বিপ্লবের ক্ষেত্র হিসাবে জনগণের মনকে তৈরী করে দিয়েছে সাহিত্য—ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ার বিপ্লব, জার্মান জাতির উত্থান, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এর সাক্ষ্য। শুধু তাই নয় এই বিংশ শতকেও প্রবল বস্তুগত তথাকথিত প্রগতির যুগেও রামায়ণের আদর্শ হিন্দু গৃহে গৃহে বিদ্যমান। সীতার সতীত্বুদ্ধি ও সহিষ্ণুতা, রামলক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, পরিবার ও সমাজের জন্য রামের ন্যায় আত্মত্যাগ আজও হিন্দুসমাজ থেকে মুছে যায় নি। আজ দুই হাজার বছর পরেও রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব বিলুপ্ত হয়নি।

সুতরাং সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রেও আমরা এ কথা স্বীকার করে নিতে পারি, যে সাহিত্য মানুষকে মানবতা অর্জন করতে সাহায্য করে, যা মানুষের হৃদয়ে মহত্ত্ব, ঔদার্য ও মানবপ্রেম সঞ্চারিত করে তাই সভ্যতার, এবং

মানব-জীবনের আদর্শের সহায়ক এবং তাই সৎ সাহিত্য। এবং এই সাহিত্য যদি প্রকৃত ব্যঞ্জনাময় হয়ে, বেগবান ও শক্তিশালী হয়ে মানবহৃদয়ে আঘাত হানে এবং তাকে মানুষ হিসাবে উন্নীত করে তবে তাই রস-সাহিত্য। দার্শনিক হেগেলের কথার পুনরুক্তি করে বলা যায় একটা ছবির রং, রঙের উপাদান, বা ছবির প্রকৃতিজ বনস্পতি জল আকাশ, নরনারীর অবয়ব বা নিসর্গ বিশ্লেষণ করলেই ছবি দেখা হয় না। এই সমস্ত উপাদান অর্থাৎ রং রেখা নিসগ নরনারীর প্রতিকৃতি তার উপস্থাপন ও সন্নিবেশ সামগ্রিকভাবে একটা অনুভূতি দর্শক-অন্তরে সঞ্চারিত করে, এবং এই অনুভূতি যদি দর্শকমনে পুলকিত শিহরণ জাগায়, সুন্দরের মাধুর্যে ভরে দিয়ে রসসিক্ত করে দেয় তবেই সেই শিল্প-কর্মের সার্থকতা।

গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য। চরিত্র, ঘটনা, মনস্তত্ত্ব, চরিত্র-সংঘাতজনিত বিক্ষুব্ধ মানবচিত্তলোক, এই সব বিশ্লেষণই সাহিত্যসমীক্ষা নয়। এই সব বস্তুই একীভূত হয়ে সামগ্রিক ভাবে চিত্তলোকে একটি রূপ ও রসের সৃষ্টি করে —ব্যঞ্জনাময় এই রূপ ও রসই সাহিত্যের প্রাণবস্তু।

শরৎসাহিত্যের এই সামগ্রিক রূপ, ব্যক্তিসংঘাত, মানবহৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিষ্পিষ্ট মানবাত্মার করুণ বেদনাময় মুক্তিসংগ্রামের রঙে রসে ব্যঞ্জনাময় ও প্রত্যক্ষ সুন্দর। এই প্রত্যক্ষ মানবচিত্তলোকে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তাকে মহত্ত্ব ও ঔদার্যে মহত্তর করে বলেই শরৎসাহিত্য চিরন্তন সাহিত্যের মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী - টলস্টয়ের সাহিত্যের মত কল্যাণকামী, জোলার সাহিত্যের মত নিরপেক্ষ প্রকৃতবাদী নয়।

ক্রৌঞ্চমিথুনের খণ্ডিত ক্লিন্ন জীবনের বেদনায় অধীর হয়ে বাল্মীকিহৃদয় একদিন 'মা নিষাদ' বলে বেদনায় অধীর হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের নিষ্পিষ্ট নিগৃহীত মনোজগৎও এমনি করেই সমাজপরিত্যক্ত, সমাজের উচ্ছিষ্ট কতকগুলি নিগৃহীত ব্যক্তির ক্লেশখণ্ডিত জীবনের বেদনায় অধীর হয়ে উঠেছিল। এই বেদনা-অধীর মনোজগতের বেগবান প্রকাশই শরৎসাহিত্যের শিল্পকর্ম, -তাই শরৎসাহিত্যের মূল শক্তি ও শরৎমানসের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

আজকার ব্যবসা সাহিত্য ও সাংবাদিক সাহিত্য মস্তিষ্কভিত্তিক, সেখানে হৃদয়ের পরিচয় নস্যাৎ হয়ে গেছে কারণ মানুষ আজ জড়জগতের মাঝে, এই শিল্পায়নের যুগে, ব্যক্তিবাদের কৃপায় একক জীবনে সুখী হতে সংগ্রাম করে চলেছে। কিন্তু প্রামাণিক সত্য মানুষ ভুলতে বসেছে,—মানবজীবন একক নয়, তা পারস্পরিক, মানবসমাজের মাঝেই মানুষের জীবন পূর্ণতর হতে পারে। একক জীবনের মাঝে মানুষের পূর্ণতা অসম্ভব, তাই পূর্ণতর ব্যক্তিত্বের অধিকারী

হতে চাই হৃদয়, মানবতা অর্জন করতে চাই প্রবল অনুভূতি। অতএব যে সাহিত্য হৃদয়কে দিল না অনুভূতি, হৃদয়কে আঘাত করে মানবতাবাদী করল না, মানুষকে ভালবাসতে শেখাল না, তা সভ্যতার পরিপন্থী হয়ে থাকবে। অবচেতন মনের বিকারগ্রস্ত মানুষের মস্তিষ্কজাত আত্মবিশ্লেষণ যতই চমকপ্রদ হোক্ তবুও তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তা মানবজীবনের অগ্রগতির পরিপোষক নয়। পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরাও ভাবছি জড়জগতের প্রাচুর্য একদিন আমাদের আত্মিক জীবনসংগ্রাম থেকে মুক্তি দেবে কিন্তু পশ্চিম ও তার সদম্ভ বৈজ্ঞানিক শক্তি নিয়ে সে মুক্তি অর্জন করে নি। ব্যক্তিবাদের নামে মড্ রকার বিট্ল সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। একমাত্র মানবপ্রেমই এই মুক্তি দান করতে পারে। শরৎমানস সৃষ্ট শরৎসাহিত্য মানবপ্রেমের পরিপোষক বলেই তার আবেদন এত গভীর ও বেগবান।

মদীয় 'বিশ্বসাহিত্য ও শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছি।

শরৎচন্দ্র : বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তী

ড. নিতাই বসু

শরৎচন্দ্র এখনো কিংবদন্তী, রূপকথার রীতিমতো নায়ক।

প্রয়াণের প্রায় দেড় বছর পরে শুরু হয়েছিল বিধ্বংসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের প্রায় ছয় বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে পৃথিবীর রাজনীতি ও অর্থনীতিতে শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড ভাঙাগড়া, একদা অসীম শক্তিধর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভগ্নদশায় পৌঁছেছিল যুদ্ধের শেষ প্রান্তে এসে। তাই হিটলারের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি জিতলেও ব্রিটেন ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তৎকালীন দমন-পীড়ন, সরকার-সৃষ্ট কৃত্রিম ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, রাজনীতির কুশলী খেলোয়াড়দের পরিকল্পনামাফিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ক্ষমতালোলুপ নেতৃবৃন্দের আশু গদিদখলের আবশ্যিক অজুহাতে দেশভাগ, লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর পশ্চিম বাংলায় আগমন এবং আরো নানাবিধ ছোটবড়ো ঘটনা গত সাইত্রিশ বছরে ঘটেছে যার ফলে চিরকালীন মানবিক মূল্যবোধগুলির ভিত্তি ধ্বসে পড়েছে। একদিকে অর্থনৈতিক ভাঙনের ফলে শরৎসমকালীন পারিবারিক কাঠামোর অস্তিত্ব শহর ও শহরতলীতে বিলীয়মান, অন্যদিকে নাগরিক জীবনের শখ-শৌখীনতা ও অভ্যাসের প্রবল ধাক্কা গ্রামীণ আবহাওয়াকে রীতিমতো কলুষিত করেছে। জমিদারিতন্ত্রের জায়গা নিয়েছে নতুন নতুন কলকারখানা, জাতিভেদ ও ধর্মভেদজনিত সমস্যার ধারও অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে, সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসহায় মেয়েরা এখন রীতিমতো পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, অনূঢ়া মেয়ের জন্য কোনো বাবা-মাকে এখন সমাজে একঘরে হতে হয় না, বিলেত বা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যাওয়ায় এখন শাস্তি তো হয়ই না, বরঞ্চ এখন তা ব্যক্তিগত গৌরবের দ্যোতক।

তবু শরৎসাহিত্যের মূল্যমান এখনো হ্রাস হয়নি, রাষ্ট্র ও সমাজের বিরাট বিপুল ব্যাপক পরিবর্তনের পরেও জনপ্রিয়তায় শরৎচন্দ্র পাঠকদের কাছে এখনো কিংবদন্তী, রূপকথার প্রাজ্জ্বল নায়ক।

আমাদের প্রত্যহের অভ্যাসে লালিত একঘেয়ে দিনরাত্রির মধ্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান করি কখনো শিল্পচর্চার মাধ্যমে, কখনো কল্পকথার মধ্যে—দৈনন্দিনতার বহুল ব্যবহৃত পুনরাবৃত্তির হাত থেকে ছুটি পেতে, অনাস্বাদিত কোনো জগতের সন্ধান পেতে আমাদের ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে থাকে। শরৎসাহিত্যের কথা বাদ

দিলেও শরৎচন্দ্রের জীবনীর রহস্যঘন কুহেলিমণ্ডিত ইতিহাসে এই বৈচিত্র্য আছে, তাই শরৎচন্দ্র সৃজনের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে যত উপরে উঠেছেন, বিপর্যস্ত কৈশোর ও বিক্ষত যৌবনের বিষণ্ণতাকে দুহাতে ঠেলে যত দেশ ও সমাজের উতরোল আবহাওয়ায় নিজের প্রতিভাকে সমর্পণ করেছেন, সমকালীন রাজনীতি ও সংস্কৃতির খ্যাতকীর্তি নায়কদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে করতে মনোহরণ করেছেন, ততই তাঁর লুপ্তপ্রায় শৈশব-কৈশোর-যৌবনের ইতিহাস হাতড়াতে বাধ্য হয়েছেন তাঁর সমালোচক ও জীবনীকারেরা, প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুবীক্ষণ-যন্ত্রে তাঁরা তাঁর জীবনেতিহাসের অন্ধকার দিনগুলির সন্ধান করে এমন সব কাহিনীর মালমশলা সংগ্রহ করেছেন যা শরৎচন্দ্রকে পরিয়ে দিয়েছে এক চমকপ্রদ আবরণ। দেবদাস, নরেন বা সতীশের চেয়ে সেকালের শরৎচন্দ্র কম আকর্ষণীয় নন, সমকালীন অন্যান্য মনীষীদের সঙ্গে এখানেই তাঁর প্রথম ও প্রবল বৈসাদৃশ্য।

শরৎচন্দ্র নিজে পিতামহের কাছে কদাচ ঋণ স্বীকার না করলেও তাঁর বিদ্রোহী মনোভাবের বীজ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জীবনীকারেরা আবিষ্কার করেছেন জমিদারের অত্যাচারে তাঁর পিতামহের প্রাণবিয়োগের কাহিনী। তাঁর পিতার ছিল না সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রামী মনোভাব, পরন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে গিরিশ যাদব প্রিয়নাথ প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি যে অনাদান্ত শৈবরূপকে আবাহন করেছেন, মতিলাল ছিলেন ঠিক তাঁদেরই সমান্তরাল এক চরিত্র। পুত্রের শিল্পসাহিত্যের প্রতি অনুরাগের ক্ষেত্রে তাঁর পরোক্ষ প্রভাব ছিল নিশ্চয়ই, তবে তঁদানীন্তন সামাজিক কাঠামোর মধ্যে তাঁর জীবনযাত্রা এবং স্ত্রী, অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের জননীর মানসিকতা শরৎচন্দ্রের শিশুমনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, 'শুভদা' ও 'বিরাজ বৌ'যে পাঠকেরা তা সহজেই লক্ষ্য করে থাকবেন।

ভাগলপুরের ভদ্র পরিবারের সান্নিধ্যে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত এবং মাতুলালয়ে উপেন-গিরীন-সুরেনের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তার বিকাশ ঘটলেও তিনি কিন্তু মূলত প্রথমাবধি ভিন্নখাতে চলতে চেষ্টা করেছেন। পরিণত বয়সের বিচারে যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক, তিনি যে-বয়সে 'দেবদাস' বা 'কাশীনাথ', 'নিষ্কৃতি' বা 'অনুপমার প্রেম' লিখেছিলেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর। মাতা-পিতৃহীন হবার আগেই স্বভাবে তিনি ছিলেন বাউণ্ডুলে, উদাসীন, সর্বংসহ, তৎসহ সংযুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন রকমের নেশা—তাস দাবা সংগীত অভিনয় মদ্যপান, কোনো কিছুই তাঁর মনোযোগের অযোগ্য বলে মনে হয়নি। এখানেই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা সমকালীন খ্যাতনামা বাঙালীদের কাছ থেকে তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল—

জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গিয়ে নিজেকে নানাবিধ অভিজ্ঞতা ও পরি-বেশের মধ্যে বিলীন করেছেন। মাঝে মাঝে যত্রতত্র পরিভ্রমণ, খেয়ালের নেশায় গৃহত্যাগ, অসুস্থ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন, স্কুলে এবং সাময়িকভাবে কলেজে বিদ্যা-চর্চা, সর্বোপরি খ্যাতনাম্নী লেখিকা, বালবিধবা নিরুপমার সঙ্গে একতরফা নিরুচ্চার প্রণয়চর্চা– চাকরি এবং প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে বর্মায় যাওয়ার আগে ভাগলপুরে এইগুলোতে ছিল তাঁর মোটামুটিভাবে আগ্রহ ও আসক্তি। কিন্তু বর্মায় গিয়েই শরৎচন্দ্র সত্যিসত্যিই কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হলেন।

আমরা জেনেছি তিনি বর্মায় গিয়ে চিত্রাঙ্কনে উল্লেখ্য পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন এবং এজন্য তিনি বা থিন নামক জনৈক বর্মী চিত্রকরের কাছে চিত্রবিদ্যা শিখে কয়েকখানি অসামান্য ছবি এঁকেছিলেন। শুধু রাবণ-মন্দোদরী বা মহাশ্বেতার মতো উল্লেখযোগ্য তৈলচিত্র এঁকেই তিনি ক্ষান্ত হননি, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের ছবির সমালোচনায় তাঁর ব্যগ্রতা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। দেবানন্দপুর ও ভাগলপুরে অভিভাবকহীনতায় দিন কেটেছে তাঁর, অতএব আনুষঙ্গিক হিসেবে তাঁর চরিত্রে দেখা দিয়েছিল যাবতীয় নেশার প্রতি ঝোঁক, অগোছালো ও অনিয়ন্ত্রিত কাজকর্মের প্রতি প্রবণতা, আলস্য ও উদ্দেশ্য-হীনতা তাঁর জীবনে নিয়ে এসেছিল দুর্বার নিয়তিরূপিণী বিশৃঙ্খলা। বাষট্টি বছর বয়সে যখন তিনি লক্ষ লক্ষ অনুরাগী পাঠকদের কাছে ইতিহাস হয়ে গেলেন তখনো এই বিশৃঙ্খলার কবল থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। সুখ্যাতি তাঁকে সুশৃঙ্খল করতে পারেনি, কয়েক-দশক-ব্যাপী রবীন্দ্রনাথের নিবিড় স্নেহ তাঁকে দিতে পারেনি অগ্রজ মহানায়কের মতো নিয়মনিষ্ঠা। ভাবতে তাই বিস্ময় লাগে, প্রৌঢ়ত্বের ইতস্তত চর্চা রবীন্দ্রজীবনের শেষ দশকে তাঁকে চিত্রকর হিসেবে পূর্ণতায় পৌঁছে দিলেও, এমন কি, অনুজ তারাশঙ্করের বার্ধক্যের বাসনাবিলাসের অনুসারী হয়ে ছবির মধ্যে আত্মতৃপ্তির প্রকাশ ঘটলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু যৌবনেই চিত্রকর্মে অর্জন করেছিলেন পারদর্শিতা, আবার গৃহদাহে যখন সবকিছু ভস্মীভূত হলো, তারপর জীবনে মাত্র একবারের জন্য অন্তত তুলি ধরতে দেখা গেল না তাঁকে। ছবি পুড়েছিল, 'চরিত্রহীনে'র অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটিও পুড়েছিল --ছবি আর জীবনে আঁকলেন না, কিন্তু 'চরিত্রহীন' পুনশ্চ লিখতে হলো তাঁকে; তাঁর মতো উদাসীন খেয়ালী এবং অলস লেখকের পক্ষে ঐ বৃহত্তম সামাজিক উপন্যাসটি পুনর্লিখন না করে উপায় ছিল না। তিনি তখন নিয়তির হাতে বন্দী—সংগীত বা অভিনয় বা চিত্রকলা নয়, তিনি সম্ভবত তখনই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সার্থকতা কোন্ পথে আসবে। তাই পথিক আর পথ হারালেন না।

যখন সময়মতো মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলে সমাজে একঘরে হওয়া বাবা-মায়ের পক্ষে অবধারিত ও অনিবার্য ছিল, যখন বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র ও আইনের অনুমোদন লাভ করলেও সমাজের চোখে ছিল একটা গর্হিত কাজ, সেই পটভূমিতে বারাঙ্গনাকে বরাঙ্গনা করে তুলেছিলেন তিনি। যদিও তিনি তাঁদের কোনো সুখনীড়ের সন্ধান দেননি, তবে তিনি তাদের বিষপান করে মরতেও বলেন নি। এই বিংশ শতাব্দীর পড়ন্ত বেলায় এসেও ভাবা যায় না কী অসামান্য সাহস এবং ঋজু মানসিকতার ফলে তিনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পতিতালয়ে ঘুরেছেন নারীদেহসম্ভোগের তাড়নায় নয়, ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসায়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে চার-পাঁচ শো পতিতার ইতিহাস সন্ধান করা সম্পূর্ণ একক প্রয়াসে কী করে সম্ভব হয়েছিল, কেনই বা ব্যক্তিজীবনের এই দুঃসাহসী অভিযানের কদর্থক ভাষের অনশান্তাবিতা সত্ত্বেও তিনি প্রায়-নিঃসম্বল অবস্থায় কখনো বাংলায়, কখনো বর্মায়, রাতদিন ঘুরেছেন, তথ্য সংগ্রহ করেছেন, অসুস্থ স্বৈরিণীর শুশ্রূষায় ক্লান্তিবোধ করেননি, বসন্ত-রোগাক্রান্ত পতিতার অঙ্গস্পর্শ করতে ঘৃণাবোধ করেন নি, সমাজের চোখে যারা চরিত্রহীনা তাদের আশ্রয়ে থেকে 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি নতুন করে রচনা করেছেন—তাঁর শিল্পিমনের সেই প্রবণতার উৎস এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। যখন তিনি খ্যাতির মধ্যগগনে পৌঁছেছিলেন এবং বর্মার নির্জনতাকে অতিক্রম করে বাংলার আগ্রহী জনতার সরণীতে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, বয়সের হাত ধরে জনপ্রিয়তা দ্রুত লয়ে তাঁকে ক্রমশ কিংবদন্তীতে পরিণত করল, তখন সেই সুযোগে ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের প্রচারে এবং কিছুটা ব্যবসায়িক কৌশলের তাগিদে তাঁর কয়েকজন অনুগত ভক্ত অনুরক্ত শিষ্য এবং অনুগামী আত্মীয়স্বজন কয়েকটি বই লিখে তাঁর জীবনের কিছু মালমশলার সন্ধান দিলেন। কিন্তু সেখানে ঐ সব লেখকদের লক্ষ্য ছিল পাঠকদের চাহিদার দিকে—সেজন্য শরৎচন্দ্রের জীবনে পতিতাদের সংসর্গই সেখানে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ালো—কিন্তু সেই সংসর্গের পিছনে তাঁকে যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল কোনো সমকালীন জীবনীকার তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান নি। তাঁর একাধিক বিবাহের কিছু পরস্পরবিরোধী তথ্য আমরা পাই বটে কিন্তু তাঁর সমাজে পতিতা নারীদের জীবনযন্ত্রণা খুঁজতে গিয়ে কেন তিনি সমগ্র পৃথিবীর সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের গবেষক পাঠক হিসেবে নিজেকে তৈরী করেছিলেন, সে কথা চিরকাল ইতিহাস হয়ে রইল। আর কে না জানে যেখানে বিজ্ঞান স্তব্ধ হয়ে থাকে, যুক্তি ও তথ্য থাকে অন্ধকারের

দুশ্ছেদ্য আবরণে ঢাকা, সেখানে বেঁচে থাকে শুধু কল্পনা, ইতিহাসের নির্জন অলিন্দে ভেসে বেড়ায় কিংবদন্তী ?

সংগীতে তাঁর আসক্তি ছিল শৈশবাবধি কিন্তু গান তিনি কখনো কারো কাছে শেখেননি। অথচ দাশরথি রায় কিংবা নিধুবাবু, চণ্ডীদাস অথবা রবীন্দ্র-নাথ —সকলের গানেই ছিল তাঁর সমান অনুরক্তি। নিছক অনুরাগ নয় পরি-বেশনের গুণে তিনি উপার্জন করেছিলেন অসামান্য খ্যাতি, 'রেঙ্গুনরত্ন' উপাধি লাভ করেছিলেন স্বয়ং নবীনচন্দ্র সেনের কাছ থেকে। অথচ এই পুরস্কার তিনি যখন করায়ত্ত করছেন তখন তিনি প্রত্যূষে বা সন্ধ্যায়, নিরালা বাসায় বা নির্জন নদীতীরে, আনমনে বা বন্ধুদের অনুরোধে গান গাইছেন বা সঙ্গীতের চর্চা করছেন এব কোনো উদাহরণ বন্ধুরা, যাঁরা সমকালীন শরৎচন্দ্রের ছবি এঁকেছেন, আমাদের জানাতে পারেন নি। এমনিই আর-একটি ঘটনা হলো তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ। দুর্গতের সেবা এবং পতিতের প্রতি করুণাপ্রকাশের মাধ্যমে হিসেবে শুধু সাহিত্য-সৃষ্টিতেই তিনি যেন আজন্ম তৃপ্তি পাননি, তাই হোমিওপ্যাথিও শিখতে হলো তাঁকে। ব্যক্তিজীবনে উদাসীনতা ও খামখেয়ালিপনা সত্ত্বেও এসব ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাশীল। তাই দরিদ্র প্রতিবেশীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা ছিল তার আমৃত্যু অভ্যাস, কখনো কখনো রোগীর পরিচর্যা ও পথ্য যোগানো ছিল তাঁর কর্তব্যের অঙ্গ। আমরা জেনেছি বর্মায় তাঁর জীবন ছিল শৃঙ্খলাহীন, দুইবার বিবাহ সত্ত্বেও কোনো রমণীর রমণীয় প্রেম তাঁর প্রতিভাকে স্ফুরিত, সঞ্জীবিত ও বিকশিত করেনি, লাভ করেননি এমন কোনো সখা যিনি শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে কান পেতে শুনেছেন সৃজনশীল প্রতিভার পদধ্বনি। বারংবার কর্মচ্যুতি, অসহনীয় অর্থাভাব এবং অসুস্থতা নামক তাঁর আমৃত্যু সহচর ঐ দূরদেশে ছিল তাঁর যাবতীয় দুর্ভোগের কারণ। এই আবহাওয়ায় বাস করে তিনি কীভাবে চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করে-ছিলেন এবং পরিচিত মহলে চিকিৎসক হিসেবে আস্থা অর্জন করেছিলেন, তা আমাদের মনে সম্ভ্রমের সঙ্গে বিস্ময় জাগায়। মনে পড়ে আমাদের সেই চির-চেনা রূপকথার নায়ককে যাকে ষড়যন্ত্র করে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে ভিন্‌দেশী এক রাজপ্রসাদে অনন্ত কাল ধরে, কিন্তু যে মুহূর্তে সে জাগলো তখন কোনো প্রতিস্পর্ধী শক্তি সেই পরাক্রান্ত রাজপুত্রকে কি প্রতিহত করতে পারে ? সুরেন্দ্র-নাথ, নরেন্দ্রনাথ, দেবদাস ও দ্বিজদাসের স্রষ্টা শরৎচন্দ্র তো ইন্দ্রনাথ, ব্রজানন্দ, রাজেন এবং সর্বোপরি সব্যসাচীকে সৃষ্টি করেছিলেন। উদাসীন বিশৃঙ্খল ও অলস শরৎচন্দ্র প্রয়োজনে প্রচণ্ড নিয়মতান্ত্রিক হতে পারতেন। এই পরস্পর-বিরোধিতার জন্যই তিনি রূপকথার নায়ক।

সাহিত্যের নিরালা আঙিনা থেকে রাজনীতির উতরোল প্রাঙ্গণে তাঁকে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করেন স্বয়ং দেশবন্ধু। কিন্তু রাজনীতির নিয়মশৃঙ্খলায় বন্দী হতে চাননি তিনি। রাজনীতির যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয় দেশসেবা, তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে তাকে সার্বজনীন মানবসেবায় নিয়োজিত করতে চেয়েছেন, দলীয় নিষ্ঠাকে দেশপ্রেমে রূপান্তরিত করেছেন, কংগ্রেসের হাওড়া শাখার সভাপতি শরৎচন্দ্রকে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র অতিক্রম করেছেন। জাতির জনকের পথ ও মতের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য না জানিয়ে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন'নি, চরকা ও খদ্দরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেও তিনিই এর সারবত্তায় সংশয় প্রকাশ করেছেন, দলীয় মতামত অগ্রাহ্য করে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি বারবার প্রকাশ্যে অভিনন্দন ও গোপনে অর্থ সাহায্য করেছেন, দলীয় লোকের হাতে পৌরপ্রশাসনের দায়িত্ব থাকলেও নিজেই হাওড়া পুরসভার ধাঙড় ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়ে সি. এফ. এণ্ডুজের মধ্যস্থতায় তাদের জিতিয়ে দিয়েছেন এবং সর্বোপরি সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি নিজের অকুণ্ঠ প্রীতি জানিয়ে 'পথের দাবী' লিখে দেশব্যাপী তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছেন। শরৎচন্দ্র জীবনে কখনো সোজা রাস্তায় চলেন নি, সর্বদা বঙ্কুর পথে ছিল তাঁর অভিসার। তাই প্রতিবন্ধকতা যখনই এসেছে তখনই তিনি আপন প্রত্যয়ে তাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। তাঁর পদ প্রতিষ্ঠা অনুরাগ ও আনুগত্য জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁকে পরস্পরবিরোধী কাজ করতে বাধা দেয়নি,' কারণ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিরঙ্কুশ নিষ্ঠা তিনি কোনো অবস্থাতেই অবিচল রাখতে পারেননি। তাই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রধান প্রেরণাদাতা, জীবনের (অবশ্যই বর্মার পরবর্তী দিনগুলোর) প্রত্যেক কার্যে যাঁর প্রেরণা ছিল অপরিহার্য, সেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি 'পথের দাবী'কে কেন্দ্র করে বা 'শিক্ষাব মিলন' প্রবন্ধটিকে সূচনা করে তাঁর মাত্রাতিরিক্ত বিরূপতা এখন ইতিহাসের সামগ্রী।

রবীন্দ্রনাথের ভূগোল-নিরপেক্ষ উদার বিশ্বজনীনতা অথবা সমকালীন সমাজমানসের প্রতি গভীর সংসক্তি কিংবা প্রবহমান রাজনৈতিক অভিঘাতে চিরন্তন মূল্যবোধগুলিকে কষ্টিপাথরে যাচাই করার ধ্রুপদী শিল্পীসুলভ অভিজ্ঞান শরৎচন্দ্রের ছিল না। রাজনীতির পরিভাষায় যাকে 'কমিটেড' লেখক বলে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র—কেউই তা নন, তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় সমকালীন বাংলাদেশকে যেভাবে ধরেছেন সেখানে দেশকালনিরপেক্ষ চরিত্রগুলি একটা চিরকালীনতার চেহারা পেয়েছে কারণ তাদের সমস্যার মধ্যে একটা চিরন্তনতার ছাপ আছে। শরৎচন্দ্রের সমস্যাগুলি কিন্তু সে তুলনায় দেশকালের

সীমানায় চিহ্নিত, তাঁর সামাজিক সমস্যাগুলি এখন সম্পূর্ণ বিশেষত্ববর্জিত। তবু জনপ্রিয়তার বিচারে এখনো কেন তিনি আমাদের আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ? ('জাপানী জর্নালে' বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, জাপানে নাকি এখন তিনজন ভারতীয় শিল্পী সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় : সত্যজিৎ রায়, লতা মঙ্গেশকর এবং শরৎচন্দ্র)। কারণ তাঁর উপন্যাসে ও গল্পে গৃহীত সামাজিক সমস্যাগুলির সঙ্গে সৃষ্ট চরিত্রগুলির এমন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকতো না যে ঐ সমস্যাগুলির গুরুত্বহীনতায় তাঁর রচনাও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। 'পথের দাবী'র রাজনৈতিক প্রসঙ্গ পরিবর্তনশীল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বিবেচিত হলেও অপূর্ব-ভারতীর হৃদয়গত সম্পর্ক, শশী-নয়নতারার রোমান্টিক প্রেম কিংবা সব্যসাচী ও সুমিত্রার কঠিন শীতল নিবৃচ্ছার সম্বন্ধের মধ্যে একটা চিরন্তনতার ছাপ আছে। 'শেষ প্রশ্নে'র উত্তর দেওয়া এখন আবশ্যিক নয় তবু শিবনাথ কমল-অজিতের ত্রিমুখী টানাপোড়েনের বিশ্লেষণভঙ্গিমার জন্য তা এখনো পাঠকের অটুট মনোযোগ আকর্ষণ করে। হিন্দুধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের সংঘাত এখন ইতিহাসের সামগ্রী—'পথনির্দেশ' এবং 'দত্তা' এমনভাবে রচিত, এমন কি, 'গৃহদাহ' উপন্যাসেও এই প্রসঙ্গ সুরেশ বা কেদারবাবুর দৃষ্টিতে এমন ভাবে দেখানো হয়েছে, যেখানে ঐ বইগুলির বয়স অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করলেও এখনো সেগুলি পাঠকের কাছে নিষ্প্রভ হয়নি। এর প্রধানতম কারণ, উপকরণ যা-ই হোক না কেন, শরৎচন্দ্র মধুর ও বাৎসল্যরসের বৃত্তে তাঁর চরিত্রগুলিকে সযত্নে সংস্থাপিত করতেন এবং যে কোনো সামাজিক সমস্যা তাঁর গল্প-উপন্যাসে হৃদয়গত সমস্যায় পরিণত হতো। সকলেই জানেন, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে ভারতীয় পাঠকদের মনোহরণ করে আছে মধুর ও বাৎসল্য রস—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে শ্রীরাধা ও যশোদার লীলাকাহিনীতে ভারতীয়েরা তো চিরকাল নিমজ্জিত। উপকরণের এই আবহমান প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শরৎচন্দ্রের স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ভাষার রমণীয় জাদু, যার মায়াবী স্পর্শে অর্ধশিক্ষিত বাঙালী পাঠকও পুলকিত হন। বাংলা শব্দের ভাণ্ডার তাঁর করায়ত্ত ছিল না—সেই অজ্ঞতাই হয়ে উঠেছিল তাঁর আশীর্বাদ। বাংলাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি যখন ভাষার মধ্যে 'হীরামুক্তা-মাণিক্যের ঘটা, যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা'র বহুবর্ণরঞ্জিত ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেও দেশবাসীর কাছে অগম্য থেকে যান এবং উৎসারিত হাস্যস্রোতের অনাবিল ধারায় অবগাহনের জন্য আবাহন করেও প্রমথ চৌধুরী পাঠকের গরিষ্ঠ সংখ্যার কাছে অপরিচিত থেকে যান, তখনো অর্ধশত বর্ষ ধরে শরৎচন্দ্র গ্রন্থাগারিকদের কাছে অপরিহার্য, প্রকাশকদের কাছে অনিবার্য। শুধু সাহিত্যে নয়, মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে

এখনো তিনিই প্রধান নায়ক, তাঁরই সৃষ্ট দেবর ভ্রাতৃবধূ, সৎমা এমন কি, পতিতারা মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে মৌরসীপাট্টা নিয়ে বসে আছে, মনে হয় যেন তাঁর পরোক্ষ অনুমোদন না পেলে মঞ্চে বা চলচ্চিত্রে কোনো কাহিনী আর্থিক সাফল্য পাবে না। বিরল ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে কিন্তু ব্যতিক্রম প্রথা নয়।

শরৎচন্দ্রকে বলা হয় নারীদরদী। কোন লেখক আমাদের দেশে নারী-দ্বেষী তা জানি না, তবু শরৎচন্দ্রকে এই অভিধায় চিহ্নিত করা হয় কেন? কারণ, তাঁর সাহিত্যে নারীচরিত্র মুখ্য, কুমারী সধবা বিধবা ও বারবণিতারা তাদের নানা সম্ভাব্য সমস্যা নিয়ে তাঁর অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করেছে বার বার। 'পণ দেব না, পণ নেব না' শ্লোগান দিয়ে সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ছবি তুলে যাঁরা ধন্য হলেন সম্প্রতি, তাঁরা জানেন শরৎচন্দ্রের দ্বিশততমজন্ম-জয়ন্তীবর্ষেও তাঁরা অর্থাৎ তাঁদের উত্তরকালের মানুষেরা পণ নেবেন এবং পণ দেবেন, কারণ সামাজিক অবস্থার আমূল সংস্কার না হলে যাঁরা পণপ্রথার উৎসাদন দাবি করে সেদিন মিছিল বের করেছিলেন তাঁদের মুখে হাসি দেখতে পেলেও কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ-মায়ের মুখে হাসি ফুটবে না। শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় এই সমস্যাটির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেমন বিধবার বিবাহ-জনিত সমস্যা তাঁর সাহিত্যে একটি মুখ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। রমা কিংবা রাজলক্ষ্মী, হেমনলিনী কিংবা কমল এবং অবশ্যই কিরণময়ী বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে জন্মালেও এবং শাস্ত্রীয় ও আইনগত বিচারে বিধবাবিবাহের সামাজিক স্বীকৃতি থাকলেও রমেশ শ্রীকান্ত গুণীন কিংবা শিবনাথের মধ্যে নেই কোনো শিবনাথ শাস্ত্রীর বলিষ্ঠ প্রত্যয়, প্রণয়িণীকে গৃহিণী হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার জন্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সংগ্রামের জন্য দৃপ্ত সাহস। অথচ রমেশ, শ্রীকান্ত, গুণীন, ও শিবনাথের পিছনে ছিল না কোন যৌথ একান্নবর্তী পরিবারের অপ্রতিরোধ্য প্রাচীর, ব্যক্তিজীবনে তারা সকলেই স্বাধীন ও সর্ববন্ধনমুক্ত, গুণীনের যেটুকু পারিবারিক বন্ধন ছিল তা গুণীন ও হেমনলিনীর প্রেমে সহায়ক। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর জাতীয় জীবনে শৌর্যাভাবের আভাস প্রকট হয়ে উঠেছে শরৎচন্দ্রের পুরুষচরিত্রে, তারা উদাসীন অন্যমস্ক অলস খেয়ালি অপরিণত। সব্যসাচী ও বিপ্রদাসকে বাদ দিলে এবং গৌণ চরিত্র হিসেবে রাজেন বজ্রানন্দ এবং ইন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ ব্যতিক্রম হিসেবে ধরলে সমগ্র শরৎসাহিত্যের প্রধান পুরুষচরিত্রগুলি জননী, জায়া, প্রেমিকা ও পতিতাদের অঙ্গুলিহেলনে নিয়ন্ত্রিত 'বড়দিদি' থেকে 'শেষ প্রশ্ন' একই ধারার অনুবর্তন।

অথচ, এহেন নারীদরদী শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে জনৈকা বিধবা নারীর

পুনর্বিবাহে সহায়তা করলেও সাহিত্যের আঙিনায় এই প্রচণ্ড সমস্যাটিকে সমকালীন সমাজের অবশ্যম্ভাবী বিরূপতার কথা লক্ষ্য রেখে প্রবেশ করতে দেন নি। তিনি চোখের জল ফেলেছেন, শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষীকে একই গৃহে দিনের পর দিন বসবাসের অনুমতি দিয়েছেন, রমার সিক্ত বসনাবৃত দেহের দিকে রমেশকে তাকিয়ে 'উদ্দাম যৌবনশ্রী' দেখতে দিয়েছেন, দিবাকরের মতো ছেলেমানুষকে নিয়ে কিরণময়ীকে অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার নিবিড় সুযোগ করে দিয়েছেন, অনুপমার প্রেমিকের পালঙ্কে শয্যাগ্রহণে আপত্তি করেন নি, এমন কি, হেমনলিনীকে গুণীনের সঙ্গে একটা সম্পর্কের জোড়াতালি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন কিন্তু এদের কাউকে সঠিক পথনির্দেশ করেন নি। বরঞ্চ, তাঁর সাহিত্যে কোন কোন বিধবা পথভ্রষ্ট হয়ে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, যেমন রাজলক্ষ্মী। কিন্তু বিধবাদের পুনর্বিবাহে যেমন তিনি আগ্রহ দেখান নি, পতিতাদের তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে বিন্দুমাত্র উৎসাহী হন নি। তাদের সবাই কোন কোন পুরুষের চিত্ত জয় করেছে কিন্তু সেই পুরুষেরা এবং তাদের স্রষ্টা শরৎচন্দ্র তাদের কাউকে গৃহলক্ষ্মীর মর্যাদা দিতে সাহসী হন নি। তাই, এই ধরনের উপন্যাস ও গল্পের পটভূমি নায়ক ও নায়িকাদের অশ্রুতে প্লাবিত এবং বাংলাসাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের পটভূমিতে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিতে পারলে পাঠক-পাঠিকার মনোহরণের কাজটা খুব সহজসাধ্য হয়। ইবসেনের অনুরক্ত পাঠক শরৎচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে নোংরাকে আমদানি করতে চান নি, কীণতর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কমল বার্ণার্ড শর মিসেস ওয়ারেন নয়। কমলের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মৃণাল সত্যিকারের বিদ্রোহিনী, 'তত্ত্বকথার আতসবাজি' নয়। তবু শরৎচন্দ্র আমাদের কাছে কিংবদন্তীর নায়ক, কারণ নারীপুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণবিকর্ষণের বর্ণনায় ও মনোবিশ্লেষণের সূক্ষ্মদর্শিতায় তাঁর ক্ষমতা অনস্বীকার্য। এবং মুখ্যত এই কারণেই অনুবাদের মাধ্যমে এখনো তিনি ভারতবর্ষের জনপ্রিয়তম লেখক, ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার অনেক পাঠক জানেন না শরৎচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন।

শরৎসাহিত্যে যে কোন সমস্যাই উত্থাপিত হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের ভূমিকাই সেখানে মুখ্য স্থান অধিকার করতো। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর খ্যাতির প্রধানতম কারণ। যে কোনো রাজনীতি সচেতন মানুষ জমিদারিতন্ত্রের বিরোধিতা করবেন, শরৎচন্দ্রও করেছেন, কিন্তু অত্যাচারী জীবানন্দকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে অলকার প্রেমে আত্মসমর্পণ করালেন সেখানে জমিদারিতন্ত্রের বিরুদ্ধে পাঠক ক্রুদ্ধ হবার অবসর পায় না। বিপুল অর্থব্যয়ে বিজয়ার

ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠায় নরেনের প্রতি পাঠকসম্প্রদায়ের মনে ক্ষোভ দেখা দেওয়ার সুযোগ নেই কারণ 'দত্তা'র চব্বিশটি পরিচ্ছেদের প্রান্তদেশে এসেও নরেনের সঙ্গে বিজয়ার মিলনের জন্য পাঠকেরা রীতিমতো উৎকণ্ঠিত থাকেন (বিশেষত এই উপন্যাসটি যিনি প্রথমবার পড়েছেন)। বেণী ঘোষাল এবং তার ষড়যন্ত্রের শিকারী রমার বিরুদ্ধে প্রজারা যতই ক্রুদ্ধ হোক না কেন কিন্তু সেই ক্রুদ্ধ প্রজারা সম্মিলিত ভাবে রমেশের প্রতি এতটা শ্রদ্ধাপরায়ণ যে মনে হয় শরৎচন্দ্র যেন শ্রেণীসংঘর্ষকে শ্রেণী সামঞ্জস্যে পরিণত করে স্বস্তি পেতেন এবং এজন্যই যারা প্রবলভাবে প্রজাদের সংঘবদ্ধ করে জমিদারদের বিরুদ্ধে অন্তত একটা সংঘর্ষের জমি তৈরী করতে পারতো সেই অলকা নরেন রমেশ প্রভৃতিরা জীবানন্দ বিজয়া রমা প্রভৃতির সঙ্গে হৃদয়ের জটিল সমস্যার জট পাকিয়ে তুলেছে। পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র দেশ ও জাতির জন্য ক্রমবর্ধমান উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, রূপকারের বৃত্তি থেকে আনুপাতিক হারে নিজেকে সংযত ও সংহত করে ভিন্নতর পথে দেশের উপকারে প্রবৃত্ত হতে চেয়েছিলেন, দেশবন্ধু রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীর সখ্যতায় অনুপ্রেরণায় ও সান্নিধ্যে তাঁকে অধিকতর সমাজনীতি রাজনীতি ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট হতে হয়েছিল এবং প্রয়োজনের পরিপূরক হিসেবে তাঁকে অর্জন করতে হয়েছিল সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা। তবু একথা সত্যি, অক্টোবর বিপ্লবের পরে প্রায় বিশ বছর বেঁচে থাকলেও তিনি কখনো কার্ল মার্কস বা লেনিনের নাম উল্লেখ করেন নি। এই অসতর্কতা তাঁর স্বেচ্ছাকৃত নয়, মজ্জাগত। এইজন্য বাংলাসাহিত্যের অপ্রাপ্তমনস্ক পাঠকদের রাজত্বে তিনি 'চিরকালের রূপকথার কিংবদন্তীর নায়ক — সময়ের সিঁড়ি থেকে তিনি পা পিছলে পড়ে যান নি।

শরৎচন্দ্রের পশুপ্রীতি

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

শরৎচন্দ্রের পশুপ্রীতি ছিল অকৃত্রিম। শিবপুরে যখন তিনি বাস করতেন, তখন তিনি C. S. P. C. A-র হাওড়া শাখার সভাপতি হয়েছিলেন, এবং তিনি সত্যিই গাড়িটানা গোরু-মোষের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে কি না—তা দেখতেন। বড় বয়সে শহরে তাঁকে বেশী সময় থাকতে হতো বলে বোঝা যেত না—তাঁর পশুপ্রীতি কত গভীর, পোষা কুকুর-বেড়াল ছাড়া অন্য প্রাণী আব এখানে কোথায়, কিন্তু সামতাবেড়ে যখন তিনি থাকতেন, তখন সাপকে পর্যন্ত তিনি করুণা দেখাতেন। শীতকালে দুপুবে তাঁর উঠানে কেউটে গোখরো প্রভৃতি বিষধর সাপ এসে রোদ পোহাতো, তিনি সেই সাপগুলিকে তাড়া দিতে দিতেন না, মেরে ফেলার কথা তো দূরস্থান।

শরৎচন্দ্রের পশুপ্রীতি ছোট বয়স থেকেই দেখা গিয়েছিল। জীবজন্তু সম্পর্কে তাঁর অদম্য এক কৌতূহল ছিল। এখানে দু-একটি কৌতূহলের উল্লেখ করি। কোকিল কেমন করে কুহু ডাক দেয়—তা জানার জন্য একবার এক বুড়ো কোকিলের মৃত্যুর কারণ তিনি হন। তখন তিনি ভাগলপুরে মামাব বাড়িতে। সেখানে এক বুড়ো কোকিল ছিল খাঁচায় বন্দী হয়ে, বড় একটা ডাকতো না, চুপচাপ থাকতো। শরৎচন্দ্র ভাবলেন— কোকিলের ডাক না শুনলে তো আব চলছে না। তিনি ও তাঁর সাকরেদদের সবাই কিছু কচি কচি আমপাতা থেঁতো করে তাতে বেশ করে খানিকটা মিহি করে মরিচবাটা মিশিয়ে দিয়ে কোকিলটাকে খাইয়ে দিলেন। কিন্তু কোকিলের পঞ্চম স্বব শোনা গেল না, তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটলো। ভাগলপুরে গঙ্গায় ভাঁটার সময় জল অনেকটা নেমে যেত, ভিজে তীরে গাঙশালিখ এসে গর্ত খুঁড়ে বাচ্চাকে রেখে যেত, শরৎচন্দ্র ঘুরে ঘুরে তা দেখতেন, কেমন করে বুড়ো শালিখেরা এসে ছানাকে খাওয়ায়, জোয়ার এলে ঠোঁটে করে নিয়ে কোথায় যায়।

একবার একটা গাঙশালিখের ছানাকে তাঁর সাকরেদবৃন্দ ধরে এনে বাড়িতে পুষতে শুরু করে দেয়। শরৎচন্দ্র নিজের হাতে এই শালিখছানাকে খাওয়াতেন, এর ভালমন্দ দেখতেন। হঠাৎ বাড়িরই পোষা একটা হুলো বেড়াল সুযোগ পেয়ে পাখির ছানাটিকে খেয়ে ফেলে। শরৎচন্দ্রের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। তিনি তো রাগ করে বিড়ালটাকে মেরেই ফেলবেন ঠিক করেন—তবে

তাব আব দবকাব হয নি, দু-একদিনেব মধ্যেই বেড়ালটি একটা দবজা চাপা পড়ে মাবা গেল।

মাঠে, বাগানে, বনে বাদাড়ে ঘুবে ঘুবে ছোট বযসে তিনি ফড়িং ধবে বেড়াতেন, হাতে থাকতো একটা কাঠেব বাক্স। একবাব সুন্দব একটা ফড়িং ধবে ফেলেন, কিন্তু ধবাব সময নষ্ট হযে গেল তাব একটা পাখা। শবৎচন্দ্রেব মন ভাবী খাবাপ হযে উঠলো, দু চোখ বেযে টপ টপ কবে জল পড়তে লাগলো। তাঁব বাবা ছেলেকে খুঁজতে এসে দেখেন যে মাঠেব একধাবে দাঁড়িযে আহত ফড়িঙটাব দিকে চেযে শবৎ নীববে কাঁদছেন।

তাঁব পিতা মতিলাল এগিযে এসে জিজ্ঞাসা কবলেন কী হয়েছে বে ন্যাড়া?

ন্যাড়া হলো শবতেব ডাকনাম। অতি শিশুকালে মাথায একবাব কযেকটা ফোড়া হলে সব চুল উঠে যায, তখন ঠাকুবমা আদব কবে শবৎচন্দ্রকে ন্যাড়া বলে ডাকতেন, সেই থেকে তাঁব ডাকনাম ন্যাড়া হযে গেল।

ন্যাড়া ডানাভাঙা ফড়িঙটা দেখিযে দেয।

মতিলাল বললেন—ও, এই কথা, তুই বাক্স থেকে ওকে মাটিতে ছেড়ে দে, আপনা থেকেই ওব পাখা ফেব গজাবে, কাল এসে দেখিস, ও উড়ে চলে গেছে।

ফড়িঙটাকে ছেড়ে দিযে করুণ মুখে পিতাব হাত ধবে ন্যাড়া বাড়ি ফিবে এল। বাড়ি এসেই সে ডুকবে কেঁদে উঠল।

কী হল বে আবাব? মতিলালেব ব্যাকুল প্রশ্ন।

আমি সব ফড়িঙ উড়িযে দেব বাবা, বাক্সে একটাও ফড়িঙ আব বাখবো না— বলে ন্যাড়া কাঠেব বাক্সে যত ফড়িঙ ছিল, সব উড়িযে দিলে।

সামান্য একটা ফড়িঙেব দুঃখে বালক ন্যাড়াব সে কি মনঃকষ্ট।

ভাগলপুবে থাকাব সময বালক শবৎচন্দ্র মামাব বাড়িতেই একটা চিড়িযাখানা কবেছিলেন, বাজ, কোকিল, বেড়াল, খবগোশ, বেজি, লাল নীল মাছ, গাঙশালিখ, কতবকমেব পোকামাকড়, এমন কি নিবীহ জাতের সাপও নাকি একটা ছিল সেই পশুশালায। শবৎচন্দ্র নিজেই সেই চিড়িযাখানাব তদাবকি কবতেন। পশুব প্রতি শবৎচন্দ্রেব দবদ তখন থেকে খুব বেশী হতে থাকে।

এ সম্পর্কে তাঁব জীবনীকাব টুকবো টুকবো অনেক কাহিনীই লিপিবদ্ধ কবেছেন। গোপালচন্দ্র বাযেব 'শবৎচন্দ্র' প্রথম খণ্ডে আছে এমন একটি কাহিনীব উল্লেখ এখানে কবছি—শবৎ একদিন কলকাতায কর্নওযালিশ স্ট্রীট

দিয়ে হেঁটে শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ এক বড় লোকের বাড়ির ভিতরে একটা পাখির আর্ত চীৎকার শুনতে পেলেন। পাখির এই করুণ কণ্ঠস্বর শুনেই শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত বড় লোকের বাড়িব ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। গিয়ে দেখেন, উঠানে একটা কাকাতুয়া পাখি তার দাঁড়ে ঘুরতে ঘুরতে কিভাবে লম্বা চেনে তার গলা জড়িয়ে ফেলেছে এবং জড়ানো ফাঁস থেকে উদ্ধাব পাবার জন্যই সে ঐভাবে কাতরকণ্ঠে চীৎকার করছে।

শরৎচন্দ্র তখনই পাখিটির কাছে গিয়ে তার গলার ফাঁস খুলে দিলেন।

এই সময় বাড়ির মালিক এসে গেলে, শরৎচন্দ্র তাঁকে বললেন এ পাখি আপনার? জীবজন্তু পুষতে হলে অন্তরে মমতা থাকা চাই, বুঝলেন! পাখিটা কতক্ষণ ধরে যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে, সেদিকে কারুরই হুঁশ নেই।

শরৎচন্দ্র নিজেও পাখি পুষতেন। রেঙ্গুন থেকে শরৎচন্দ্র একটি নুরি পাখি কিনে এনেছিলেন। রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, মালয় প্রভৃতি দেশে টিয়াজাতীয় এক রকম পাখি পাওয়া যেত—তাকে সে দেশের লোক নুরি বলতো। শরৎচন্দ্র তাঁব নুবি পাখিটিব নাম বেখেছিলেন বাটু। কখনো সখনো আদর করে তিনি বলতেন বাটুবাবা। তাব বাটুও সেই ডাক শুনে সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে বলতো-- বাবা।

বাটু কথা বলতে বেশ ভালই শিখেছিল। শরৎচন্দ্রের বাড়ি কেউ এলেই বাটু তার খোঁজখবর নিত, বলতো এসো, এসো, বসো।

বাটুকে শরৎচন্দ্র খুব যত্ন করতেন, নিজের হাতে আঙুর, আনারস, কিসমিস প্রভৃতি খাওয়াতেন!

তাঁর একটি লেখা 'দেওঘরের স্মৃতি'তে বিবিধ পাখির আনাগোনাব কথা আছে। সকালে দেওঘরে বুলবুলি, শ্যামা, টুনটুনি আসতো—তিনি জসিডিতে যে বাড়িতে থাকতেন, তারই আশেপাশে বিবিধ গাছে ঐসব পাখির মেলা বসতো। ঐসব পাখির ডাক তাঁর একান্ত চেনা ছিল। তিনি চোখে না দেখে ডাক শুনেই কোন্ পাখি কখন আসে পাশের বাড়ির আমগাছে কি বকুলকুঞ্জে—তা বলে দিতে পারতেন। প্রতিদিন ডাক শোনার এমন অভ্যাস হয়েছিল যে একদিন ওদের ডাক না শুনলে তাঁর তৃপ্তি হতো না। তিনি লিখছেন—"হলদে রঙের একজোড়া রঙ্গীন পাখি একটু দেরী করে আসতো। প্রাচীরের ধারে ইউক্যালিপ-টস গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালটায় বসে তারা প্রত্যহ হাজিরা হেঁকে যেতো। হঠাৎ কি জানি কেন দিন দুই এলো না, দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম—কেউ ধরলো

না তো ? এদেশে ব্যাধের অভাব নেই,—পাখি চালান দেওয়াই তাদের ব্যবসা, কিন্তু তিন দিনের দিন আবার দুটিকে ফিরে আসতে দেখে মনে হলো যেন সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল।"

ঐ গল্পেই তিনি একটি কুকুরের কথা লিখেছেন। দেওঘরের কাছে একলা ভ্রমণে বেরিয়ে কিছুদূর যেতেই দেখেন তাঁর পিছন পিছন আসছে একটা কুকুর। তিনি বললেন—"কিরে, যাবি আমার সঙ্গে ? অন্ধকার পথটায় বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিতে পারবি ?" সে দূরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। সে রাজী আছে বুঝে শরৎচন্দ্র তাকে কাছে ডেকে নিলেন। কুকুরটার বয়স হয়েছিল, রোগে পিঠের লোম উঠে গেছে, সে একটু খুঁড়িয়ে চলে। বাড়ি পৌঁছে তিনি কুকুরটাকে গেটের ভিতরে ডাকলেন, সে এলো না। চাকর এসে গেট বন্ধ করতে চাইলে তিনি বললেন- -গেট যেন খোলা থাকে, যদি ভেতরে আসে—তবে, ওকে যেন খেতে দেওয়া হয়। রাত্রে আর সে ভেতরে ঢোকে নি, পরদিন সকালে ফের এসে হাজির। তিনি তাকে অতিথির সম্মান দিয়ে আহারের ব্যবস্থা করতে বললেন ভৃত্যকে—রোজ যেন তাকে খেতে দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়তি খাবারগুলো যে যুবতী মালিনী নিয়ে যায়—তা তাঁর জানা ছিল না। মালিনীর যুক্তি ছিল—মানুষ খেতে পায় না, পথের কুকুরকে ডেকে খাওয়ানোর কি কোনো মানে হয়।

শরৎচন্দ্র মনে বড় ব্যথা পেলেন, কুকুরটার সঙ্গে তিনি কথা বলতেন, প্রশ্ন করে তার সুবিধে-অসুবিধেব কথা জিজ্ঞাসা করতেন, কুকুরটি শুধু লেজ নাড়তো। দেওঘর থেকে ফেরার দিনেও তিনি কুকুরটিকে স্টেশনে দেখতে পেলেন--তার জন্যে মন-কেমন-করা এক বিষণ্ণ অনুভূতি নিয়েই কলকাতার ট্রেনে চেপে বসলেন। এই কুকুরটিকে তিনি অতিথি বলতেন, অতিথির মর্যাদাতেই তাকে যত্ন করতেন। জসিডি স্টেশন থেকে আসবার সময় তিনি লিখছেন--"ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বক্‌সিস পেলে সবাই, পেল না কেবল অতিথি। গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে ; যাবার আগে তারই মধ্যে দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম—স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি। ট্রেন ছেড়ে দিলে, বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না ! কেবলই মনে হতে লাগল অতিথি আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ,-ঢোকবার জো নেই। পথে দাঁড়িয়ে দিন দুই তার কাটবে, হয়ত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা,—তার-পরে পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে।"

এই প্রসঙ্গে 'শ্রীকান্তে'র চতুর্থ পর্বের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। যশোদা বৈষ্ণবীর পরিত্যক্ত আস্তানায় তারই অতি প্রিয় অনাহারে শীর্ণ কুকুরটির কথা মনে পড়ে,—কার ফেরার প্রত্যাশায় সে সেখানে ঘরদোর আগলাচ্ছিল, শ্রীকান্তকে এগিয়ে দিতে এসে তার করুণ চাহনিতে কেমন করে মানবিক বেদনার ছায়া লেখক লক্ষ্য করেছিলেন—তাঁব অপরিসীম পশুপ্রীতির জন্যেই তা সম্ভব হয়েছিল।

তাঁর কুকুর-প্রীতির কথা যখন উঠলো—তখন এ বিষয়ে আরো দু-চারটে ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শরৎচন্দ্র তখন বাজে শিবপুরে থাকতেন। বাড়ি ফেবাব সময একদিন তিনি দেখতে পেলেন যে পথে চারটে কুকুরছানা কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছে। ছোট্ট কুকুরছানা—ভালো করে হাঁটতেও শেখেনি। পাড়ার কয়েকটি কৌতূহলী ছেলে দাঁড়িয়ে সেই অসহায় কুকুর-ছানাগুলির দিকে দেখছিল। শবৎচন্দ্র তাদেব জিজ্ঞাসা কবলেন—"এদের মা কোথায় রে?"

"জানি না"—একটি ছেলে জবাব দিলে।

"একটু খুঁজে দেখ না—"

বেশ খানিকটা এদিক ওদিক খোঁজা গেল, কোথাও সেই বাচ্চা কুকুরগুলির মাকে পাওয়া গেল না—অগত্যা শরৎচন্দ্র তাদের কোলে করে বাড়িতে নিয়ে এলেন। চাকর ভোলাকে ডেকে বললেন—"একটা বস্তা পেতে দে, আব খানিকটা দুধ গরম কবে আন, এদের খেতে দিতে হবে।"

শরৎচন্দ্রের বাড়িতে ছিল তাঁরই পোষা কুকুর ভেলু। ভেলু নবাগত স্বজাতি শাবকদের দেখে তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিলে। শরৎচন্দ্র ধমকে দিয়ে ভেলুকে বারণ করলেন হাঁকডাক না কবতে। এদিকে ওই বাচ্চাগুলিব মাকে খোঁজ করার কাজ সমানে চলেছে; পরদিন পাড়ার ছেলেরাই বললে—"এদের মা হলো কালো রঙের একটা কুকুর। কোথাও তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।"

শেষে শরৎচন্দ্রই তাকে খুঁজে পেলেন—কাছেই একটা পোড়ো বাড়ির অগভীর এক কূপের মধ্যে সেই কালো কুকুরকে দেখতে পাওয়া গেল। বাজার থেকে নারকোলদড়ি কিনে আনিয়ে তাকে তোলা হলো, সন্দেশ আর বিস্কুট খাইয়ে তাকে চাঙ্গা করে নিয়ে আসা হলো সেই বাচ্চাগুলির সামনে; হ্যাঁ—সত্যিই কালো কুকুরটা তাদের মা; হারানো মাকে পেয়ে কুকুরছানা চারটের সে কী আনন্দ! শরৎচন্দ্র তা দেখে খুশী হলেন।

কুকুরের প্রতি তাঁর কি অপরিসীম ভালবাসা ছিল—তা তাঁর দু-একটি চিঠি পড়লে বোঝা যায়। তাঁর পোষা প্রিয় কুকুরের নাম ছিল ভেলি। ভেলির

কথা বলার আগে তাঁর প্রথম জীবনে আর-একটি পোষা কুকুর ছিল,—তার নাম কানা। তার মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র একটি ইংরাজী কবিতা লেখেন শোক প্রকাশ করে। তবে ভেলির মতো কানা বিখ্যাত হয় নি। ভেলি শরৎসাহিত্য-পাঠকের কাছে খুবই পরিচিত।

ভেলিকে শরৎচন্দ্র আদর করে ডাকতেন ভেলু বলে। এই ভেলু একবার অসুস্থ হয়ে পড়ে, শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাকে বেলগাছিয়ার পশু চিকিৎসালয়ে রেখে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, মানুষের মতোই তাকে আদর করতেন তিনি, নিত্য যেতেন, দেখে আসতেন, তার যত্নের এতটুকু ত্রুটি যাতে না হয়—তার ব্যবস্থার জন্যে চিকিৎসালয়ের কর্তৃপক্ষকে বারবার অনুরোধ করতেন। এই সময় তাঁকে ঢাকা আর মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে যেতে হয়। ঢাকায় তিনি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন।

মাত্র কয়েকদিন ঢাকায় থেকে তিনি কোলকাতায় ফিরে এলেন। ফিরে এসেই তিনি ছুটলেন বেলগাছিয়ায়- ভেলুর খবর নিতে। না, ভেলু ভালো নেই. মনটা তাঁর খারাপ হয়ে গেল। ভেলিকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে রেখে চিকিৎসা করালে বোধহয় ভেলি ভালো হয়ে উঠবে —এই ভেবে তিনি ভেলিকে বাড়িতে নিয়ে এলেন -তখন শরৎচন্দ্র ওই বাজে শিবপুরেই থাকতেন।

ভেলি একটা সাধারণ দেশী কুকুর, দেখতেও তেমন সুশ্রী নয়, তবে শরৎচন্দ্রের বড় বাধ্য। প্রভুর কথা সে যেমন বুঝতে পারতো. তেমনি আভাসে ইঙ্গিতে তাকে যা করতে বলা হতো, সে তাই করতো। শরৎচন্দ্র তাকে খুবই স্নেহ করতেন।

বাচ্চা অবস্থায় ভেলিকে তিনি রেঙ্গুন শহরে মাত্র আট আনায় কেনেন। গোলগাল ধরণের চেহারা, গায়ের রঙ সাদা-কালোয় মেশানো। ১৯১৪ সালে যখন কিছু দিনের জন্যে রেঙ্গুন থেকে তিনি কোলকাতায় আসেন সস্ত্রীক, ভেলিকে সঙ্গে আনেন। হঠাৎ তাঁকে ফিরে যেতে হয় রেঙ্গুনে, ভেলি থাকে কোলকাতায়—হিরণ্ময়ী দেবীর তত্ত্বাবধানে। রেঙ্গুনে পৌছেই শরৎচন্দ্র পত্র লেখেন —'ভেলিকে ছেড়ে থাকা যাচ্ছে না'। তিনি কাশীতে বেড়াতে গেছিলেন একবার, সেখানেও এই ভেলিকে সঙ্গে নিয়ে যান। ভেলির গল্পও তিনি করতেন সকলের কাছে, পরিবারের একজন সভ্য হিসাবেই তিনি দেখতেন ভেলিকে। সেই ভেলির অসুখে তিনি ত' বিচলিত হবেনই।

রুগ্ন ভেলিকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনে শরৎচন্দ্র চিকিৎসার কোনো ত্রুটি

করেন নি। কিন্তু "বাড়ীতে সম্ভাব্য সব রকমের চিকিৎসাই করা গেল, দুহাতে অর্থ ব্যয় করেও ভেলিকে বাঁচানো গেল না।"

ভেলির মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের দুখানা চিঠিতে তাঁর শোকার্ত হৃদয়ের খানিকটা পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখছেন—"বাড়ীতে নিয়ে এলাম বৃহস্পতিবারের পরের বৃহস্পতিবার। সকাল ছটায় ভেলি মারা গেল। আমার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী আর নেই। সংসারে এত বড় ব্যথাব ব্যাপারও আছে, এ আমি ঠিক বুঝতাম না। বোধ হয়—তাই এটা আমার প্রয়োজন ছিল। আর একটা জিনিস টের পেলাম চারু, পৃথিবীর 'অবজেক্টিভ'টা কিছুই নয়, 'সাবজেকটিভ'টাই সমস্ত। নইলে একটা কুকুর বই ত নয়। রাজা ভরতের উপাখ্যান কিছুতেই মিথ্যে নয়।"

আব-একটি চিঠি লেখেন তিনি তাঁব মামা সুবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে —"ভেলি বেঁচে নেই। শেষ দিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে। বুধবাবে জোর করে কড়া ওষুধ খাওয়াবাব চেষ্টা করি, চামচে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা কবেও ওষুধ পেটে গেল না; কিন্তু রাগের ওপর আমাকে কামড়ালে। সেদিন সমস্ত রাত আমাব গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না। ভোর বেলায় সে কান্না তার থামলো।

আমার ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিল। যখন কামড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে, তখন রবিবাবুর এই কথাটাই শুধু মনে হ'তে লাগলো—'তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেলা।' তার আঘাত ছিল, কিন্তু অবহেলা ছিল না। এর পূর্বে এত ব্যথা আমি আর পাই নি।"

ভেলির শোবার জন্যে শরৎচন্দ্র তক্তপোশ তৈরি করিয়েছিলেন,—কার্পেট, তাকিয়া কিনে দিয়েছিলেন—যাতে ভেলির কোনো কষ্ট না হয়।

ভেলির পর শরৎচন্দ্র আর-একটা কুকুর পুষেছিলেন—তার নাম দিয়েছিলেন বাঘা। বাঘার যত্নও কম ছিল না, তবে ভেলির মতো নয়। গ্রামের কুকুর বলে সে সর্বদা ছাড়া থাক'তো। একবার একটা পাগলা শিয়ালে তাকে কামড়ালে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শরৎচন্দ্র সম্ভবমতো তার চিকিৎসাও যথাসাধ্য করিয়েছিলেন, কিন্তু বাঘা বাঁচলো না।

সামতায় তিনি আর-একটা কুকুর পুষেছিলেন—তার নাম ছিল টৌব। সেও শরৎচন্দ্রের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

একবার বেনারসে গিয়ে 'উত্তরা' কাগজের সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে (ভেলুপুরায়) কিছুদিন ছিলেন। সে সময় ভেলুপুরায় বেশ কিছু পথের কুকুর ছিল; শরৎচন্দ্র তাদের জন্য বড় ব্যথিত বোধ করতেন। তিনি

দোকান থেকে খাবার কিনে ঐ সব কুকুরদের নিজে হাতে করে খাওয়াতেন। একবার তো মোটা অঙ্কের টাকায় লুচি মেঠাই কিনে মুটের মাথায় করে খাবার এনে কুকুরদেব খাইয়েছিলেন—তাতে পথচারী সব লোকেরা বিস্মিত হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র বলতেন—পথেব কুকুরগুলো দেখলেই আমার যেন কেমন কষ্ট হয়। এদের দেখবার কেউ নেই। কেউ এদেব আদর করে কোন দিনই খেতে দেয় নি। বরং দেখতে পেলে অনেকেই এদের দূব দূর করে তাড়িয়ে দেয়। বেচারাদের জীবন সত্যিই বড দুঃখের। আমাব যদি টাকা থাকত, তাহলে আমি এদের জন্য একটা অন্নসত্র খুলে দিতাম।

ভাগলপুব থেকে স্টীমাবে কলকাতা আসার পথে কহলগাঁ স্টীমার স্টেশনে নেমে শরৎচন্দ্র উনিশ কুড়িটি কুকুবকে ছুটে আসতে দেখে তাঁর মনে হলো ওরা বুঝি অভুক্ত; তিনি দোকান থেকে দই চিঁড়ে কিনে তাদেব খাওযাতে লাগলেন, ওদিকে স্টীমার ছাড়ে ছাড়ে, ভোঁ শুনেও শরৎচন্দ্রেব খেয়াল নেই, শেষে কোনো রকমে দৌড়ে এসে তিনি স্ট।মারে উঠলেন।

যে কোনো পশুকেই শরৎচন্দ্র ভালোবাসতেন। পোষা জীব বা জানো-যারই যে তাঁব প্রিয পাত্র—তা নয়, যে কোনো মূক পশুব প্রতিই তাঁব অন্তরে একটা করুণার স্থান ছিল।

রেঙ্গুনে যখন তাঁব ঘরদোব পুডে যায, সেই সময একটা ছাগলছানাকে বাঁচাতে তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন—সে কথা আমরা কখনো ভুলতে পারি না।

রেঙ্গুনে কাঠের বাড়িই বেশী। শবৎচন্দ্র যেখানে সস্ত্রীক থাকতেন, সেটাও ছিল কাঠের বাড়ি। একবার কী কবে যেন সেই বাড়িতে আগুন লেগে গেল। তাড়াতাডি তিনি পোষা পাখি আর হিরণ্ময়ীদেবীকে নীচে পাঠিয়ে দিয়ে কিছু বই-পত্তর নিয়ে নিজে নেমে এলেন, আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো। পাশে ছিল একটা ধোপার ফ্ল্যাট, আগুন বোধ হয় সেখান থেকেই লাগে। ধোপার বউ গাধাটিকে নিয়ে এসেছে, আনতে পারেনি তার সাধের ছাগলটাকে। শরৎচন্দ্রের দুখানি হাত চেপে ধরে সে কেঁদে উঠলো—ছাগলটা তার পুড়ে যাবে।

হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রকে বাধা দিলেন—না, তুমি যেয়ো না ঐ আগুনের মধ্যে। দাঁড়াও।

একটা মূক পশু—ধোপানীর আদরের ছাগলটি—আগুনে পুড়ে মরবে—আর কয়েকজন লোক তা দেখবে আর কপাল চাপড়াবে! শরৎচন্দ্র কোনো

বাধা মানলেন না, মুহূর্তেই লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে ঢুকে ছাগলটাকে বের করে আনলেন কোলে করে।

অথচ নিজের ঘরের গোটা লাইব্রেরি গেল পুড়ে, তাঁর আঁকা ছবিগুলিও রক্ষা পেল না।

ছাগলের প্রতি তাঁর মমতা কম ছিল না, কেউ পাঁঠা কি খাসী কাটছে দেখলে তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তো। তিনি একবার একটা ছাগল পুষেছিলেন—বলা যায় কতকটা দায়ে পড়েই। সে ঘটনাও তাঁব পশুপ্রীতির একটা জ্বলন্ত প্রমাণ।

বাজে শিবপুর ছেড়ে তিনি সামতাবেড়ে বাস করছিলেন। একদিন পথে দেখতে পেলেন যে দু-চারজন মিলে মাংস বানাবার চেষ্টায় বেশ পুষ্ট একটা খাসীকে কাটার জন্যে তৈরী হচ্ছে। খাসীটার দিকে চোখ পড়তেই শরৎচন্দ্রেব মনটা কেমন করে উঠলো, তিনি লোকগুলির কাছে গিয়ে বললেন—তোমাদের আমি এই খাসীটার জন্যে কিছু বেশী দাম দিচ্ছি, এটি আমাকে দাও ; এমন অসহায় জীবটাকে তোমরা কেটো না বাপু।

লোকগুলি শরৎচন্দ্রকে জানতেন, দ্বিরুক্তি না করে কেনা দামেই খাসীটি শরৎচন্দ্রের হাতে দিয়ে দিলেন। শরৎচন্দ্র এই খাসীটি বাড়িতে এনে পুষেছিলেন। যত্নে লালিত হওয়ার জন্যে খাসীটা অল্পকালের মধ্যেই বেশ নধরকান্তি হয়ে উঠলো। এর গায়ের রঙ ছিল গেরুয়া—তাই শরৎচন্দ্র এর নাম রেখেছিলেন—স্বামীজী।

স্বামীজী বলে শরৎচন্দ্র একবার ডাকলেই খাসীটি তাঁর কাছে এসে হাজিব হতো। মূক অজ পর্যন্ত স্নেহের ডাক বুঝতে পারতো।

বেড়ালছানার প্রতিও তাঁর ভালবাসা ছিল, তবে বেড়ালকে তিনি ভালবাসলেও বাড়িতে পুষতে পারতেন না, কুকুরের ভয়ে বেড়াল পালিয়ে যেত। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে সতীর আদরের বেড়ালটির জন্যে মন কেমন করার কথা পর্যন্ত শরৎচন্দ্র বিস্মৃত হন নি, সতী যখন স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন সেই বেড়ালটির কথা সে ভেবেছে।

সাপকে পর্যন্ত শরৎচন্দ্র ভালবাসতেন—কথাটা একটু অবাস্তব শোনাতে পারে, কিন্তু 'তাজ্জব কী বাত' হলেও কথাটা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি ; বিষধর সাপকে তিনি সত্যিই ভালবাসতেন। সামতাবেড়ের বাড়ির চারপাশে ছিল গোখরো সাপের আড্ডা। শীতের দিনে দুপুরে সামতাবেড়ের বাড়ির পরিষ্কার উঠোনে কিছু গোখরো সাপ এসে রোদ পোহাতো, নির্ভীক পশুদরদী

শরৎচন্দ্র পাহারা দিতেন—কেউ যেন না সাপকে মারে বা তাড়া দেয়। সন্ধ্যার আগেই আশপাশের জঙ্গলে চলে যেত সাপগুলি!

তাঁর পশুপ্রীতির উজ্জ্বলতম নিদর্শন 'মহেশ' গল্পটি। হিন্দুর কাছে গোধন দেবতা, অথচ হিন্দুপ্রধান গ্রামেই এই গো-দেবতার কী চরম নির্যাতন, 'মহেশ' গল্পের মাধ্যমে তিনি তা ভালো করেই জানিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। মহেশ গরু হলেও প্রায় মানবিক মর্যাদায় ঐ গল্পে একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। অতি দরিদ্র মুসলমান চাষী গফুর, তারই ষাঁড়েব নাম মহেশ। ভোলা মহেশ্বরের বাহনের উপযুক্ত নামই বটে; তর্করত্ন এই নাম শুনে ব্যঙ্গ করে গেছে, কিন্তু ক্ষুধার্ত এই অবলা পশুর খাদ্যের জন্যে দু আঁটি খড় ধার দিতে পারে নি তার চারচারটে খড়ের গাদা থেকে। ক্ষুৎপীড়িত মহেশের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় লেখকেব এই মূক পশুটির প্রতি কী গভীব দরদ। লেখক গফুরের মুখ দিয়ে বলেছেন—"ও আমার অবলা জীব—কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।" মহেশেব গভীব কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভবা,—তা দেখে গফুরের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগলো, মহেশকে সে তাব ছেলের মতোই ভালবাসে, মহেশকে সে তার ছেলে বলেই জানে!

শরৎচন্দ্র শুধু যে নিপীড়িত মানবাত্মাব দবদী লেখক- তা নয়, তিনি মূক পশুরও দরদী সংবেদনশীল বন্ধু।

শরৎচন্দ্রের পতিতা

ড. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

পতিতা শব্দটির ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। 'পতিত' শব্দটির যে অর্থ, স্ত্রী-লিঙ্গে 'পতিতা' হলেও পতিতা শব্দটি ঠিক সেই সব অর্থ বহন করে না। অভিধান বলে পতিত অর্থাৎ নিম্নগত, অধোগত, চ্যুত, স্খলিত। কিন্তু পতিতা হচ্ছে কুচরিত্রা, কুলটা, বেশ্যা। সমাজ থেকেই শব্দের জন্ম, সমাজ যেমন, শব্দগঠনও তেমনি। 'পতিত' শব্দটি পুরুষের চরিত্র অর্থে আমাদের সমাজে ব্যবহৃত হত না, হয় না, অভিধানেও তাই সেই অর্থ নেই। অন্যদিকে পতি, পত্নী, সতী, পতিত্ব, সতীত্ব, পতিতা প্রভৃতি শব্দগুলি যেন ছন্দ ও অর্থ মিলিয়ে পিঠোপিঠি এসেছে। শরৎসাহিত্যেও পতিতা শব্দটি কুচরিত্রা, কুলটা, বেশ্যা প্রভৃতি অর্থ বুঝিয়েছে। কিন্তু এই অর্থেই তিনি থেমে থাকেননি, এই অর্থের নীচতার পরিধি অতিক্রম করে যুগান্তকারী মহনীয়তায় গেছেন বলেই শরৎ-সাহিত্যের চিরন্তন মূল্য ধার্য হয়েছে। শরৎসাহিত্য শুধু যুগান্তকারীই নয়, নারীর নবমূল্যায়নকারী। পতিতা নারীরও।

বাংলাদেশে এবং বাংলা সাহিত্যে নারীমুক্তির চিন্তা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই দেখা দিয়েছে। সেই প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নারীসমাজের ঐতিহ্য ও ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। বেদ, পুরাণ, মহাকাব্য, ধর্মশাস্ত্র অন্বেষণ করে নারীর প্রাচীন পরিচয় উদঘাটন করতে চেয়েছে। বেদবাদিনী নারীদের যত মর্যাদাই দেওয়া হোক না কেন, তাঁরা নিজের কথা বলেন নি, বলেছেন ব্রহ্মকথা, অমৃত-আখ্যান। রামায়ণ-মহাভারতেও নারী বীরভোগ্যা এবং পুত্রার্থে ক্রিয়তে। মনুসংহিতায় নারীর বন্ধন দৃঢ় হয়েছে, কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে যিনি এমন কাব্যবাণী রচনা করেন তিনিই কেন নারীর প্রতি এমন অন্ধভাবে নির্মম! সব উত্তর সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় না। উত্তর আছে এইখানে যে তৎনারীরা স্বকীয় কথা স্বকণ্ঠে বলার সুযোগ পাননি, বলেন নি। নারীর কথা বলেছে পুরুষ, নারী নয়। নারী কি সত্যই কোনদিন নারীর কথা ভেবেছে? জনা, দ্রৌপদী, সীতা ভাষা পেয়েছেন আধুনিক যুগে, কিন্তু পুরুষের লেখনীতে, স্বলেখনীতে নয়। বাংলা সাহিত্যে নারী নিজের কথা নিজে বলতে

শুরু করেছে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের পাতায়। তারা, সূর্পণখা, দ্রৌপদী, জনা, শকুন্তলা, জাহ্নবী—এঁরা সকলেই বাকপটু, কিন্তু মুখরা নন, যদিও মুখে ও মনে দ্বিধা ছিল না এঁদের। অন্তরসত্যকে ভাষা দেবার সমস্ত শক্তি এঁরাই প্রথম অর্জন করেছেন। আর নারী-পুরুষের সম্বন্ধের বৈচিত্র্য ও বিকৃতি উভয়ই এই প্রথম সাহিত্যে স্বীকৃত হল। রবীন্দ্রনাথের 'মৃণাল' শুধু চরিত্রবৈচিত্র্যের প্রবক্তা নয়, নারীব্যক্তিত্বের সফলতা সম্বন্ধে চিন্তিত। বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকাদের সে সমস্যা ছিল না। তাঁরা প্রেমকে জীবনখণ্ডের বিশেষ পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে সার্থক করতে চেয়েছেন, না হলে পুরুষের সমালোচনা করেছেন, না হলে পুরুষনির্মিত প্রথাকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃণালই প্রথম, নারীব্যক্তিত্বের পূর্ণতা সম্বন্ধে চিন্তা করে স্বাধীনতাকে গ্রহণ করেছে, যদিও তার মনের রোমাণ্টিক ভাবনা ও ভাবালুতা তাকে শেষ পর্যন্ত সমাজলগ্ন করে তোলে নি। হৈমন্তী কথা বলেনি, কিন্তু মৃণাল কথা বলেছে, তারপর কথা বলেছে দামিনী, বলেছে সোহিনী। রবীন্দ্রনাথের 'সবলা' বলেছে 'যাবো না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী'। কিন্তু এই নেতিবাচক অভিমানে নারীর স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব স্বীকৃতি পায় না। তাই ইতিবাদী অভীপ্সা প্রকাশ করে প্রশ্ন করতে হয়েছে—'কেন নিজে নাহি লব চিনে সার্থকের পথ।' আর নৃত্যনাট্যের রাজেন্দ্রনন্দিনী দেবী চিত্রাঙ্গদা পূজা ও অবমাননা দুইই প্রত্যাখ্যান করে বলেছে—'যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,/সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে/পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।' কিন্তু এখানেও নাবী আপন ব্যক্তিত্বের সফলতা অর্জনের জন্য পুরুষের অপেক্ষা করেছে।

শরৎচন্দ্রের পূর্বে সাহিত্যে নারীরা নিজের কথা নিজেরা যত না বলেছে তার চেয়ে বেশী বলেছে অন্যে। অন্য নারী, না হয় অন্য পুরুষ। না হয় স্বয়ং লেখক। শরৎ-উপন্যাসেও উক্ত লক্ষণ বিদ্যমান। যেমন রমার কথা বলেছে বড়মা বিশ্বেশ্বরী। আর অচলার কথা বলেছে মৃণাল। কিন্তু শরৎসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নারীর কথা নারী নিজে বলায় বর্তমান। রাজলক্ষ্মী, অভয়া, অন্নদাদিদি, কমললতা, কমল, বিজলী, সবিতা, সারদারা নিজের কথা নিজেই বলতে চেয়েছে—বলতে পেরেছে। শরৎসাহিত্যের নারীরা অনেক বেশী কথা বলেছে। কিন্তু কথার সঙ্গে কাজ কী করেছে? সেটাও বিচার্য। কারণ শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের কথায় যতই আত্মসমীক্ষার সূক্ষ্মতা থাক, যতই জীবনদর্শনের বিশাল গভীরতা থাক, লেখকের কণ্ঠস্বর তার মধ্যে প্রায়শই শোনা যায়। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা একটি বিশেষ পরিধির বাইরে কেউই যেতে পারেনি, তারা লেখকের নির্দেশে যেন অনেকাংশে বন্দিনী। তাই

শরৎচন্দ্রের সব 'পতিতা'ই যেন এক কাঠামোয় গড়া। তারা সবাই সৌন্দর্যময়ী, উপবাসপরায়ণা, পুরুষের জন্য নিত্য মাধুর্যময়ী আশ্রয়, এবং বিদ্যায়-বুদ্ধিতে মানসতৎপরতায় অনন্যসাধারণ। তাদের ভাষাভঙ্গিমাও প্রায় এক।

নারী সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, এই প্রশ্নের একটি উত্তরসূত্র অন্বেষণ করা প্রয়োজন। তাঁর 'নারীর মূল্য' নামক গ্রন্থে সূত্রটি পাওয়া যেতে পারে। 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে নারীর মূল্যায়ন নয়, নারীর অবমূল্যায়নের আলোচনাই সুবিস্তৃত। কোন্ সমাজে কবে নারীর অবমূল্যায়ন কি ভাবে ঘটেছিল এবং আজও ঘটে চলেছে, তারই পৃথিবীব্যাপী উদাহরণের সমাহারে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। কিন্তু নারীর মূল্য কোথায় কখন কি ভাবে অর্জিত হতে পারে তা সুনির্ধারিত রূপে বলা হয়নি। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, মুক্তমনা যুক্তিবিন্যাস অবলীল গতিতে বিষয়-বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অনুসরণে একজন পুরুষ লেখকের দ্বারা নারীর অবস্থার ইতিহাস রচিত হয়েছে। কিন্তু তিনি ভারতীয় তথা বঙ্গীয় নারীসমাজের দুর্গতি ও দুর্গতিমুক্তির দিকগুলি সম-পরিমাণে আলোচন করেন নি। '.. আমি এতক্ষণ যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা এই যে, প্রায় কোন দেশেই পুরুষ নারীর যথার্থ মূল্য দেয় নাই এবং তাহাকে নির্যাতন করিয়াই আসিতেছে'—লেখকেব এই প্রতিপাদ্য নারীর সম্বন্ধে নেতিবাচক দিক। কী করলে নারীর মূল্য দেওয়া হয় তা সুস্পষ্ট ভাবে শরৎচন্দ্র বলেন নি বলে নারী-সমস্যার সমাধানবাচক দিকটি বুঝে নিতে অসুবিধা হয়। 'সংসারে নারী যদি বিরল হইতেন, তবেই নারীর যথার্থ মূল্য স্থির করা সহজ হইত'—লেখকের এই উক্তি তাঁব অসহায়ত্বেব ও তাঁর সিদ্ধান্তের অপূর্ণতাব উদাহরণ।

অবশ্য সমগ্র প্রবন্ধটি নিরন্তর অনুধাবন করে নারীর যথার্থ মূল্যের ইঙ্গিতগুলি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। 'আশ্চর্য, এত অত্যাচার, অবিচার, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা সহ্য করা সত্ত্বেও নারী চিরদিন পুরুষকে স্নেহ করিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, ভক্তি করিয়াছে এবং বিশ্বাস করিয়াছে। যাহাকে সে পিতা বলে, ভ্রাতা বলে, স্বামী বলে, সে যে এত নীচ, এমন প্রবঞ্চক, এ কথা বোধ করি সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। বোধ করি সেইখানেই তার মূল্য'। শবৎচন্দ্র প্রমাণ পেয়েছেন, নারীর অবহেলা যেখানে অধিক সেখানে নারীর দেহসৌন্দর্যও ঝরে যায়, সেখানে সন্তানের প্রতি অপব্যবহার অবহেলাও অধিক। অন্যদিকে এ উদাহরণও সংখ্যাতীত যে পুরুষ নারীকে সম্মান দিয়ে মূল্য দিয়ে কখনো ঠকেনি। যে সংসারে মাতা মূল্য পেয়েছে, যে সংসারে মাতৃচরিত্র যত বড়, সে সংসারে পুত্রচরিত্রও তত বড় হয়ে গড়ে উঠেছে। মধুর রসের ক্ষেত্রে

নারী ও নর উভয়েই সংযমের দায়বদ্ধ হতে চেয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভাষায় 'এই রস অক্ষুন্ন রাখিবার প্রযাসেই মানবের অজ্ঞাতসারে সতীত্বের সৃষ্টি, এই রস-মাহাত্ম্য গাহিয়াই মানুষ কবি।'

শরৎচন্দ্রের মতে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে সত্য, তবে সে স্বাধীনতারও সীমা থাকবে। 'অর্থাৎ পুরুষ সর্ববিষয়ে স্ত্রীলোকের কাজ করিতে গেলে যেমন করডোদের মত অকর্ম্মণ্য হীন হইয়া পড়ে তেমনি ডাহোমি রাজার স্ত্রীসৈন্যও যথার্থ unsexed হইয়াই তবে লড়াই করিতে পারে।' সর্বশেষে নারীর মূল্য দিতে গিয়ে তিনি পুরুষের উপরই নির্ভর করেছেন। কারণ নারী ও পুরুষের সমাহারেই মানবসমাজ। কিন্তু পুরুষ নারীকে মুক্তি দেবে কতখানি? লেখকের উত্তর—'তবে শৃঙ্খল একেবারে মুক্ত করিয়া দিবার কথা বলিতেছি না—তাহাতে আমেরিকার মেয়েদের দশা ঘটে। তাহাদের অবাধ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হইয়াছে। একদিন প্রাচীন রোমে আইন পাশ করিতে হইয়াছিল, 'to prevent great ladies from becoming public prostitute.' সর্বশেষে লেখক বলেছেন—'নারীর মূল্য নির্ভর করে পুরুষের স্নেহ, সহানুভূতি ও ন্যাযধর্মের উপর। ভগবান তাহাকে দুর্বল করিয়াই গড়িয়াছেন বলিয়াই সেই অভাবটুকু পুরুষ এই সমস্ত বৃত্তির মুখের দিকে চাহিয়াই সম্পূর্ণ করিয়া দিতে পারে, ধর্মপুস্তকের খুঁটিনাটি ও অবোধ অর্থের সাহায্যে পারে না।'

'নারীর মূল্য সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করার কারণ এই আলোচনা শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলির বাস্তবিক ও মানসিক রূপবৈচিত্র্য অনুধাবন করতে সাহায্য করবে। অবশ্য একথাও আমাদের মনে আছে যে 'নারীর মূল্য' শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের একটি থিয়োরি। থিযোরি দিয়ে চরিত্রবিচারের সুযোগ-সুবিধা সব সময় হয় না। চরিত্র জীবনলব্ধ এবং জীবন্ত। অন্তর মিশালে তবে তাদের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পতিতা চরিত্রগুলির কথা একটু স্বতন্ত্র। এই চরিত্রগুলি যতই না জীবন্ত হোক, এদের দেখার ও দেখানোর পিছনে সচেতন একটি অভিজ্ঞতাবদ্ধ মানসিকতা আদর্শের রূপ নিয়ে উপস্থিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শরৎচন্দ্রও সেখানে নীতিবাদী।

[২]

শরৎচন্দ্র তাঁর সমস্ত পতিতা চরিত্রকে দেখেছেন হিন্দু সমাজের দিক থেকে, সমগ্রভাবে পতিতার দিক থেকে নয়। তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাস 'শুভদা' থেকেই বারাঙ্গনাদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু নিছক বারাঙ্গনা-পল্লীর চিত্র অথবা বারাঙ্গনার জীবন নিয়ে উপন্যাস বা গল্প তিনি একটিও

রচনা করেন নি। পুশকিন, মোপাসাঁ বা এমিল জোলার মতো সম্পূর্ণ ভাবে পঙ্কের পরিচয় দেন নি। শরৎচন্দ্র সাময়িকভাবে পাঁকে নেমে পঙ্কজ তুলে এনেছেন। হুইটম্যান অথবা সত্যেন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্রও বারাঙ্গনা-পূজার একটি ভাববিহ্বল মনোভাব গোপন করতে পারেন নি। সমাজবিচ্যুতা বা কুলত্যাগী যারা, যারা সমাজে ফিরে আসতে চায় বা চায় না, যাদের সমাজ গ্রহণ করেনি বা করবে কি না প্রশ্ন জেগেছে তাদের জন্যই শরৎসাহিত্যের খোলা অঙ্গনে নানা আয়োজন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পাঠ করলে এই সমাধানে আসতে হয় যে পতিতা না হলে যেন নারীর চরিত্রমাধুর্য উৎসমুখ লাভ করে না। একবার দুবার স্খলন না হলে যেন নারী-ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা অর্জিত হয় না। শরৎচন্দ্রের সময়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। তখন সমাজের চোখে এরা ছিল ঘৃণ্য, ক্ষমার অযোগ্য এবং পতিতা, এখন সে মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের চেয়েও বেশী স্খলিত চরিত্রের বুক চিবে চিরে আজকাল ক্লেদ ও ক্লেদজ কুসুম তুলে আনা হয় সাহিত্যে। তাদের ভগ্ন দীর্ণ দশদশা দেখানো হয় কঠিন নির্মমতায়। কিন্তু শরৎচন্দ্র সহানুভূতির প্রলেপে তাঁর পতিতাদের অপূর্ব মূর্তি দিয়ে গেছেন। তারা কেউই কান্তিহীন কুশ্রী নয়, তারা কান্তিময়ী। কান্তিদুষ্ট চরিত্র যে নেই তা নয়, কিন্তু সেগুলি সবই অপ্রধান চরিত্র। একমাত্র অপরূপা বিরাজ বৌ শোকে দুঃখে আঘাতে অভিমানে কুল-ত্যাগ করে ফিরে এসেছে পঙ্গু ও অন্ধ হয়ে। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা উজ্জ্বল ও আনন্দময়ী এবং সংশয়হীন রূপে নারীরত্ন। নারীরত্ন হয়েও একমাত্র কিরণ-ময়ীর কিরণ নিভে গেছে পরিণতিতে, যদিও জানি তার চরিত্রের গড়নের মধ্যে শুধু হীন নয়, সুপ্রভ সত্তাও ছিল। তাঁর পার্বতী বধূধর্মে পতিতা কি না সে উত্তর যেমন স্পষ্ট নয়, তেমনি তার চারিত্রিক মহিমা পরিশেষে বিচূর্ণ বিস্রস্ত হল কি না তাও লেখক সঠিক জানান নি, পাগলামির একটি ইঙ্গিত দিয়েই যবনিকা ফেলে দিয়েছেন। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সতীরা যে সতী নয় এবং সতীরা যে কত হাস্যকর ও মর্মান্তিক পীড়াদায়ক তার উদাহরণ দেবার ভূমিকা হিসাবে পড়ে নেওয়া দরকার তাঁর 'সতী' গল্পটি।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা অনেক কিন্তু বক্তব্য অনেক নয়। প্রধানতঃ একটি বক্তব্যের রকমফেরেই প্রায় সমস্ত কাহিনীগুলি লেখা। মান-বিকতা হচ্ছে সেই বক্তব্য। বক্তব্যটির পরিধি ও পরিমাণ ছোট নয়। সার্বজনীন মানবিকতায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইয়ং-বেঙ্গলেরা যে ভাঙচুর আরম্ভ করেছিল, তারই একটি প্রবল দীর্ঘ অতিসচেতন প্রবণতা বিংশ

শতাব্দীর প্রথম ভাগে শরৎচন্দ্রের মনসভঙ্গীতে জেগে উঠেছিল। কিন্তু সেই ভাঙনের বিপ্লবধর্মের সঙ্গে, বিদ্রোহী প্রকৃতির সঙ্গে, নবায়মান সংগঠনের ইচ্ছা ও সংস্কারের মমতা যুক্ত হয়েই শরৎবাদী মানবিকতার সৃষ্টি হয়েছিল। শরৎ-বাদী মানবিকতা বিদেশ থেকে আহৃত নয়। তা নিজস্ব ভঙ্গিতে নিজ দেশোপযোগী করে প্রাণ লাভ করেছিলো। নারীসমস্যার দিকেই তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল সমধিক। বিবাহসমস্যা, নারীপুরুষের মিলন ও মিলিত জীবনসমস্যাই তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলির মৌল সমস্যা। নারীপুরুষের অতি-উদ্বেল হৃদয়সমস্যা, দেশজ আচার ও সমাজগত প্রতিষ্ঠাব সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধে বারবার ভাবতে বলেছেন তিনি। শবৎসাহিত্যের পতিতা চরিত্রগুলিব সৎ পরিচয় গ্রহণকালে এই সত্য আরো বেশী করে অনুধাবন করা যায়।

শুধু মানবিকতা নয়, আরও একটি দিকে বারবার চোখ টেনেছেন শরৎ-চন্দ্র। পতিতাদের প্রতি অন্ধ সহানুভূতির আবেগেই সাহিত্যে তাদের স্মরণীয় করে তুলেছেন—শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই উক্তিই সব নয়। শরৎচন্দ্রের পতিতা নারীরা ভালোবেসে, প্রেমের অমৃতেই পুনর্জন্ম লাভ করেছে। অভয়া, অন্নদা দিদি, বিজলী, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, কমললতা, চন্দ্রমুখী—এরা সকলেই প্রেমের আগুনে আপন আপন অতীত স্খলন পতন ত্রুটিকে দগ্ধ করে নিয়ে নতুন মূর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। সে দাহন, সে আলোক শরৎচন্দ্রের চোখে পড়েছে এবং সংস্কারান্ধ সমাজ না দেখতে পেলেও সহৃদয় পাঠক তা দেখতে পেয়েছে—এইখানেই শরৎপ্রতিভা প্রচেষ্টার সার্থকতা। প্রেম যে সর্বদোষহর এই সত্য স্বীকাবের সাধনা শরৎচন্দ্রের কতখানি ছিল তা জানা যায় রাজলক্ষ্মীর জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করলে। গ্রাম গঙ্গামাটিতে ও নগবে শহরে কলকাতায় পাটনায় কাশীতে এমন কি কমললতার বৈষ্ণব আশ্রমে কেউই তাকে ভুলেও একবার বারাঙ্গনা বা বাঈজী বলে ব্যঙ্গ বা ঘৃণা করেনি, নেপথ্য অপবাদও দেয়নি। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেমের চিত্র দেখে সকলেই ভুলেছে এবং একবারও প্রশ্ন তোলেনি এ প্রেম বৈধ না অবৈধ। এমন কি সুনন্দার মতো প্রখর নীতিবাদী আচারশীলা মেয়েও নয়। ষোড়শী সন্ন্যাসিনী। তাকেও প্রেমের আগুনে পুড়ে আলোকিত হতে হয়েছে। প্রচলিত অর্থে কুলত্যাগিনী সে নয়, পতিতাও নয়, কিন্তু প্রেমের পুনর্জন্মেই সম্ভব হয়েছে তার পুনর্জন্ম।

পতিতারা যে পতিতা নয়, এ কথা শতমুখে বললেও শরৎচন্দ্র কোন এক-জন পতিতাকে সংসারে, পরিচিত সাধারণ সমাজে ও ঘরে স্থান দেন নি। অভয়াকে থাকতে হয়েছে বর্মায়, সাবিত্রীকেও সতীশের গৃহবেষ্টনী ত্যাগ করে যেতে হয়েছে, রমাও অসময়ে ঘর সংসার সমাজ ছেড়ে চলে গেছে কাশীতে,

ষোড়শীকেও গোপনে নদীপথে পালাতে হয়েছে 'প্রথম' স্বামী জীবানন্দের সঙ্গে। বিজলীর স্থান হয়নি পরিবারে, চন্দ্রমুখীকে 'বৌ' বললেও দেবদাসের বিবাহিতা বধূ সে নয়, সবিতাও কোনদিন ব্রজবাবু অর্থাৎ স্বামীর ঘরে ফেরেনি নানা যোগাযোগ সত্ত্বেও। হেমনলিনী-নৃপেন্দ্র অবশেষে শিক্ষা দিয়েছে বিরহ বিচ্ছেদের পরম মহিমার এবং তাদেরও যেতে হয়েছে কাশীতে। বিরাজ বৌ অথবা 'স্বামী'র সৌদামিনী গৃহত্যাগ করলেও পতিতা নয়, তাদের ঘরে স্থান দিয়ে শরৎচন্দ্র খুব বড় কাজ করেন নি এবং সে স্থান দেওয়ার মধ্যে বিরাজের জীবনে মর্যাদা ফিরে আসেনি—এসেছে মৃত্যু, সৌদামিনীকে গৃহে গ্রহণের পিছনে গৃহত্যাগের সত্যটি কৌশলে চাপা দেওয়া হয়েছে। 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না দূরেও ঠেলে'—এই বিশ্বাস শরৎচন্দ্রকে গৃহবন্দী মিলনকাহিনী রচনায় বিরত করেছে।

তাঁর প্রেমকাহিনীর দুটি ধারা—একটি পথের প্রেম, অন্যটি ঘরের প্রেম। তাঁর ঘরের প্রেম ভেঙে যায়, ভেসে যায় কিন্তু পথের প্রেম জমে ওঠে। বিরাজ-বৌয়ের প্রেমপ্রতিষ্ঠা ভেঙে গেছে, কিন্তু কমললতার প্রেম পথেই সার্থক। রাজলক্ষ্মী, অভয়া, সাবিত্রী, ষোড়শী, কমল প্রভৃতির প্রেম পথের প্রেমের পরা-কাষ্ঠা ছাড়া আর কী! ঘরের প্রেমের সুখচিত্র বিভূতিভূষণের মতো শরৎচন্দ্র দেখাতে পারেন নি।

শরৎচন্দ্রের পতিতাদের সম্বন্ধে আলোচনাকালে বিধবাসমস্যা স্বভাবতই এসে পড়ে। কুন্দ-রোহিণীর মৃত্যু ঘটিয়ে সমস্যার সমাধান করেছেন বলে বঙ্কিম-চন্দ্রকে শরৎচন্দ্র ক্ষমা করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীকে তার পরে পাই। বিহারীর ভালোবাসার স্বীকৃতি নিয়ে সেও সমাজ-পরিবারের বাইরে কাশীতে চলে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তার বেশী কিছু সমাধান-সৌষ্ঠব দেখাতে পারেন নি। কিন্তু 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বিধবা দামিনীকে স্বামী দিয়েছেন, সংসারসুখ দিয়েছেন, দাম্পত্যপ্রেমের পূর্ণায়ত তৃপ্তি দিয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর কোন বিধবাকেই দাম্পত্যজীবনের স্পৃহণীয় সার্থকতা দিতে পারেন নি। প্রথম জীবনের 'ললনা' থেকে শেষ জীবনের সৃষ্টি 'সারদা' পর্যন্ত সকল বিধবার ঐ একই নিয়ম রক্ষিত হয়েছে। রাজলক্ষ্মীকে বেঁধেছেন তাঁর আপন অন্তরবাসী যে সংস্কারের গণ্ডীতে সেই অপ্রতিরোধ্য, অত্যাজ্য, অনতিক্রম্য সংস্কারেরই পশ্চাদ্‌বর্তী হতে হয়েছে রমা, সাবিত্রী, কমললতাকে। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের কমল-অজিতের বিবাহিত জীবনের সার্থকতা দান করার ইতিবৃত্ত সূচিত হয়েছে উপন্যাসটির শেষাংশে, কিন্তু আমাদের সংশয় সমূলে দূর হয় না। যে শরৎচন্দ্র দরদী, অভিযুক্ত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে—সেই

অভিযোগগুলিই কি ফিরে আসে না তাঁর নিজের দিকে? বিধবাদের তিনি হত্যা করেন নি, কিন্তু একটি চক্রাবর্তনের সমাপ্তিতে সেইখানেই তারা ফিরে এসেছে যেখানে থেকে আবর্তন শুরু হয়েছিল। মাঝখানে তাদের প্রেম হয়তো স্বীকৃতি পেয়েছে কিন্তু তার বেশী তারা কিছু পায়নি। না দেহসুখ, না মিলন, না স্বামী, না সন্তান। সফলতার বীজ হাতে নিয়ে তারা মানব-জমিন চাষের অধিকার পায়নি, ক্ষেত্রসীমা থেকে ফিরে যেতে হয়েছে। অথচ তারা ছিল পরম জীবনবাদী, সনিষ্ঠ জীবনচর্চায় বিশিষ্ট। শরৎচন্দ্রের একটি বিধবাও মরেনি বা আত্মহত্যা করে নি, আত্মহত্যা করতে গেলেও সফল হয়নি। ললনাও মরতে পারেনি, সারদাকেও বিষপানে মরতে দেওয়া হয়নি। তবে ললনাকে রক্ষিতা হয়েই থাকতে হয়েছে, সেইভাবেই সে সুখী এবং বঙ্কিমী ঢঙে সুরেন্দ্র নাথ মালা পরিয়ে তাকে তার বাগানবাড়িতে বিয়ে করেছে, কিন্তু মাননীয়া বধূ হয়ে ওঠেনি। বিদ্যাসাগর যেমন বিধবাসমস্যার সমাধান করতে পারেন নি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের পক্ষেও তেমনি সম্ভব ছিল না। নারীমুক্তি ঘটাতে গিয়ে রামমোহন অনেকদিন আগে ভেবেছিলেন, নারীকে আর্থিক প্রতিষ্ঠা দিতে হবে, এঁরা তেমন করে ভাবেন নি। নারীর আর্থনীতিক স্বাধীনতা তখনও আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই তাঁদের চিত্ত যুক্তি ও বোধের দিক থেকে মুক্ত হলেও তাঁদের বিধবা নায়িকারা মুক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পায়নি।

[৩]

শরৎসাহিত্যের পতিতা চরিত্রগুলি প্রায় সকলেই উজ্জ্বল ও নির্মল রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তারা রূপে রূপে রূপবতী। তারা গুণবতী। কেউ ক্লেদ বহন করে আমৃত্যু জীবনপ্রান্তরে হাঁটেনি। কারও সত্তায় আলো স্বাভাবিক রয়ে গেছে, কারও সত্তায় আলো এসেছে বিবর্তনের নিষ্ঠুর নিয়মে। রাজলক্ষ্মী পরিবর্তিত হয়েছে, পরিবর্তিত হয়েছে চন্দ্রমুখী। কমলের সত্তায় সর্বাধিক আলো ছিল, সাবিত্রীও আলোকময়ী, বিজলীর সত্তায় আলো বড় গোপন, বড় তির্যক, বড় তীব্র। একমাত্র সাবিত্রীই দুর্ভাগ্যবতী। সংসারের পুঞ্জীভূত পঙ্কে অঙ্গ বিভূষিত করে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেও মঙ্গল ও কল্যাণের আবহাওয়া অটুট রাখতে পারেনি। সে নিজে মঙ্গলময়ী, অন্তরনির্মলা, কিন্তু তার ত্যাজ্য স্বামী ব্রজবাবুর সংসারে কল্যাণ ঝরে গেল, মঙ্গলসৌন্দর্য মরে গেল।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে আবির্ভাবলগ্ন থেকেই রাজলক্ষ্মী শ্রীময়ী, মহিমাময়ী। একদিন অজ্ঞানে অভাবে পড়ে রাজলক্ষ্মী দেহবিক্রির কোন্ অন্ধতম রাজ্যে বাস করেছে সে চিত্র লেখক আমাদের কাছে তুলে ধরেন নি। রাজলক্ষ্মী সূচনা

থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত রূপে, গুণে সর্বেশ্বরী, মমতার ভালোবাসায় সর্বমঙ্গলা, রুচিতে বুদ্ধিতে অনন্যা। সুরের ভুবনে তার অধিষ্ঠান, সত্যের আনন্দ-অন্বেষণে তার জীবনচর্যা। তাই তার 'পিয়ারী' নামটা আমাদের মনে থাকে না। আমরা রাজলক্ষ্মীকেই স্মরণে রাখি, যে রাজলক্ষ্মী একাধারে রাজ্ঞী ও লক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মীর সত্তাস্বভাব ত্রিধারা-সমন্বিত। তার তিনটি নামে সেই দিকগুলি নির্দেশিত হয়েছে। পিয়ারী, রাজলক্ষ্মী আর লক্ষ্মী। পিয়ারী—প্রিয়া, রসিকা, সংগীতনিপুণা, সুন্দরী। যৌবনের সমস্ত আবেগ নিয়ে সে পরিপূর্ণ। সে ধনবতী। কিন্তু তার রাজলক্ষ্মী সত্তা বাঙালী তথা ভারতীয় রমণীর প্রকৃত পরিচয় বহন করতে চায়। সে দরদী, কল্যাণী, সুধীরা অথচ প্রগাঢ় প্রাণের অধিষ্ঠান তার আত্মায়। সেখানে বাঙালী নারীর সর্বপ্রকার সংস্কারও বিদ্যমান। বারব্রত, নিশিপালন, পূজা পবিত্রতা, দানধ্যান প্রভৃতি তার জীবনের নিত্যকর্মের তালিকা রচনা করেছে। উপরন্তু সে লক্ষ্মী। শ্রীকান্ত মাঝে মাঝে গভীর ভালোবাসার কণ্ঠে তাকে 'লক্ষ্মী' নামে সম্বোধন করেছে। লক্ষ্মী চায় সতী-সাধ্বীর মতো ঘর, স্বামী, সন্তান। সে তখন নায়িকা নয়, জননী। আনন্দময়ী পিয়ারী নয়, ঐশ্বর্যময়ী রাজলক্ষ্মী নয়, সে তখন কপোতীর মতো ভীরু, গোধূলির মতো বিষণ্ণ, নদীর মতো অনুগত।

অভয়া অসাধারণ মনঃশক্তিতে বীরাঙ্গনা। অভয়া সত্যই ভয়হীনা। জীবনের প্রতি তার যেমন একাগ্র নিষ্ঠা, অন্ধ সংস্কারকে ছিন্ন করে দিতে তার বুদ্ধি তেমনি ক্ষুরধার। 'আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী'-- এই তার অন্তরের বাণীমূর্তি আমরা ফললাভ করতে দেখেছি তার কর্মে। নিষ্ঠুর নীচ স্বামীকে ত্যাগ করে সত্য ভালোবাসার সংযত সৌন্দর্যে তার অকুণ্ঠ আত্ম-সমর্পণ আমাদের চমকিত করে। তীব্র ভাষায় বৃদ্ধ হিন্দু সমাজের অন্ধতাকে আক্রমণ করেই তার বিদ্রোহী আয়ু ফুরিয়ে যায়নি, নতুন সমাজ পত্তনে ও নব-জীবন রচনায় সে একাগ্র। বর্মার কদর্য পরিবেশ সত্ত্বেও অভয়া উড়িয়েছে প্রেমের বৈজয়ন্তী। অভয়া পতিতা নয়, প্রণম্যা। অভয়া সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন- -

> "আমি জানি কিছুই অভয়ার কঠিন নয়- -মৃত্যু, সেও তাহার কাছে ছোটই। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা এই সব প্রাচীন ও মামুলি বুলি দিয়া সেই অভয়ার জবাব হয় না। পৃথিবীতে কেবল-মাত্র বাহিরের ঘটনাই পাশাপাশি লম্বা করিয়া সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায় না।"

পচনশীল সমাজের বীভৎস প্রকাশ কমললতাকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল।

অল্প সময়ের জন্য পেলেও কমললতাকে আমরা ভালোবেসে ফেলি। অল্প বয়সে বিধবা হয় কমললতা। তারপর অন্য পুরুষের প্রলোভনে তার স্খলন। তার গর্ভের অবৈধ সন্তানকে বৈধ করার চেষ্টায় তাকে বৈষ্ণবী করা হল। কিন্তু মৃত সন্তান প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গে তার অতীতও মৃত্যুমুখে পতিত হল। আত্ম-প্রতারণার পিচ্ছিল পথ সে ত্যাগ করলো। দেহজ কামের স্বরূপ সে জেনেছে, তাই দেহাতীত প্রেম নিবেদন করলো সে তার দেবতাকে, মুসলমান গহরকে এবং শ্রীকান্তকে। পুনরায় সে বৈষ্ণব মঠ থেকে বিতাড়িত হল কিন্তু তার প্রাণের ঠাকুরকে সে আর ত্যাগ করলো না। তার জীবনে ক্লেদ অসীম, সেই অসীম ক্লেদ-দরিয়া পার হয়ে প্রশান্ত প্রেমের পথে নেমেছে কমললতা। এক শ্রীকান্ত (ইঙ্গিতে যা জানা যায়) তার স্বামী ছিল, আর এক শ্রীকান্ত তার বন্ধু, প্রেমিক, হৃদয়ের ঠাকুর, নতুন গোঁসাই। কমললতার জীবনশ্রীকে অন্তরকান্তিকে এমনই অম্লান রেখেছেন শরৎচন্দ্র। কমললতার চরিত্র দুঃখে পোড়া পথিক চরিত্র, কিন্তু ঘরকেও সে সুন্দর করতে পারে। বৈষ্ণবমঠের কাহিনী সেই গৃহসৌন্দর্যেরই কাহিনী।

অন্নদাদিদির আখ্যান 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেব প্রথম ভাগেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার আলোচনা শেষে করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ অন্নদাদিদির জীবন-কাহিনী ও সতীধর্মের অভিজ্ঞতা নিয়েই শবৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কমললতা চরিত্রের বিচার করতে চেয়েছেন। অন্নদাদিদি প্রথমে এসেও সর্বত্র আছে। স্বামিসঙ্গ লাভের আগ্রহে সে জাতি ধর্ম সমাজ সম্মান সবই ত্যাগ করেছিলো। লম্পট, নীচাশয়, সাপুড়ে স্বামীর জন্য অন্নদা তার জীবন যৌবন সবই দান করেছে, অরণ্যে দীর্ণ কুটিরে সর্পসংকুল জাহান্নামের মধ্যেও সে সত্যকে প্রেমকে পবিত্রতাকে ত্যাগ করে নি। অন্নদার সমস্যার সমাধান লেখক যেমন নিজে জানেন না, আমাদের প্রগতিপন্থী মনও সমাধানসূত্র খুঁজে পায় না। অথচ এই অভিমান কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না যে অন্নদাদিদি যে সমাজে স্থান পায় না সে সমাজ নিতান্তই করুণার পাত্র।

'দেবদাস' উপন্যাসের চন্দ্রমুখী ও 'আঁধারে আলো' গল্পের বিজলী—উভয়েই বারাঙ্গনা। উভয়েই প্রেমের নিয়মে পরিবর্তিত হয়েছে। চন্দ্রমুখীর প্রেম 'love at the first sight'এর পরম নিদর্শন। দেবদাস পার্বতীকে কি ভাবে জয় করলো আমরা আভাসে ইঙ্গিতে কিছু ঘটনায় বর্ণনায় জানি। কিন্তু দেবদাস এলো, দেখলো এবং জয় করল যাকে তার নাম চন্দ্রমুখী। বারাঙ্গনাবৃত্তির কালিমা তার মধ্যে কী আছে বা ছিল তা আমরা জানি না। দেবদাসের প্রাথমিক ঘৃণার কারণ তাই খুব স্পষ্ট নয়, যদিও শেষ ভালোবাসা

অত্যন্ত সঙ্গত। এমন মেয়েকে না ভালোবেসে পারা যায় না। শুধু মদ্যপ, হতভাগ্য, আত্মহননকারী দুঃখবাদী দেবদাসের ভালোবাসা নয়, অশথঝুরিগ্রামের মানুষদের মতো সব মানুষেরই ভালোবাসা পাবার যথার্থ যোগ্য এই চন্দ্রমুখী। কী প্রেম নয় তা জানতো বলেই, কী প্রেম তাকে চিনতে চন্দ্রমুখীর দেরি হয়নি। চন্দ্রমুখীর প্রেম চন্দ্রমুখীর আত্মশুদ্ধির উপায় মাত্র নয়, আত্মসমীক্ষারও উপায়। সে বলে—

> "তোমরা এসে যখন ভালোবাসা জানাও,—কত কথায়, কত ভাবে যখন প্রকাশ কর, আমরা চুপ করে থাকি। অনেক সময় তোমাদের মনে ক্লেশ দিতে লজ্জা করে, দুঃখ হয়, সংকোচ বাধে। মুখ দেখতেও যখন ঘৃণা বোধ হয় তখনও হয় লজ্জায় বলতে পারিনে—আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারবো না। তারপরে একটা বাহ্যিক প্রণয়ের অভিনয় চলে, একদিন যখন তা শেষ হয়ে যায়, পুরুষ মানুষ রেগে অস্থির হয়ে বলে, কি বিশ্বাসঘাতক।"

এই আত্মসমীক্ষার ইতিহাস বিজলী চরিত্রেও আছে। সে জানে নর্তকী হলেও সে নারী। প্রেমিকের পুত্রমুখ দেখে তার মনের আঁধার দূর হয়ে আলো ফুটে ওঠে। বিজলীর হৃদয়ে আত্মসমীক্ষার যে লিপি উৎকীর্ণ হয়ে আছে সেই লিপিই সমগ্র শরৎসাহিত্যের পতিতাদের প্রামাণ্য প্রতিবেদন। বিজলীকে ঘৃণা করে অপমানহত সত্যেন্দ্র যখন বারাঙ্গনা মজলিশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন বিজলী বলেছে—

> "যে-কথা অপরাধে মগ্ন থেকেও আমি বিশ্বাস করি, সে-কথা অবিশ্বাস করে যেন তুমি অপরাধী হয়ো না। বিশ্বাস কর, সকলের দেহতেই ভগবান বাস করেন এবং আমরণ দেহটাকে তিনি ছেড়ে চলে যান না।···সব মন্দিরে দেবতার পূজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা। তাঁকে দেখে মাথা নোয়াতে না পার, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যেতেও পার না।"

চন্দ্রমুখী ও বিজলী উভয়েরই মধ্যেকার বারাঙ্গনা অবশেষে মরেছে। নিঃশেষে মরেছে। তাদের বুকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে দেবতার, যে দেবতার অন্য নাম প্রেম। প্রেমের বৈদূর্যমণির আলোকে উভয়েরই চিত্ততল উদ্ভাসিত।

'গৃহদাহ' উপন্যাসের অচলা প্রকৃতই অচল অর্থে অচলা। সেকালেও যেমন অচল, একালেও তেমনি সে চলবে না। সবদিক বিবেচনা করলে বলা যায়, অচলাই একমাত্র চরিত্র থাকে 'পতিতা' বলা যায়। তার চরিত্র অপূর্ণ, সে মন বাঁধেনি কোথাও। কোন স্থিত মাধুর্য বা প্রখর শক্তি দিয়েই সে তার

নারীত্বের যথার্থ বিকাশ ঘটায়নি। রুগ্ন মহিমের সেবায় তার বিকশিত হৃদয়-মহিমা তাকে যতখানি স্বস্তি দিয়েছে ততখানি শক্তি দেয়নি। সে শক্তিমতী সুরেশকে প্রতিহত করতে পারতো। আপন হৃদয়ের নিভৃত সত্যকেও সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। হয়তো এই কারণেই যে সে ছিল পিতৃপালিত কন্যা। শরৎসাহিত্যে মাতৃহীন পিতৃপালিত কন্যা অনেকেই নায়িকার মর্যাদা লাভ করেও shadow girl রয়ে গেছে। যেমন 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের মনোরমা। অচলা নামের ইঙ্গিতটা বোধ হয় লেখক আমাদের লক্ষ্য করতে বলেছেন। রাজলক্ষ্মী, ষোড়শী, সাবিত্রী, কমল, চন্দ্রমুখী, অভয়া, শুভদা প্রভৃতি নামের আভিধানিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই অচলা নামটির তাৎপর্য বোঝা সহজ হয়। অচলা শুধু দুই প্রবল পুরুষ চরিত্রের মাঝে পড়েই এমন দোলাচলচিত্তবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে পড়েছে তা নয়। সে ক্রান্তিকালের মেয়ে। দুই কালের, দুই সমাজের মাঝখানে তার অস্থির অপ্রতিষ্ঠিত অবস্থান। দুই কাল, অর্থাৎ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী। দুই সমাজ, অর্থাৎ নগরসমাজ ও গ্রামসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজ। সুরেশের শয্যায় রাত কাটিয়ে তার মুখ কেন মড়ার মতো সাদা হয়ে গেল, বোঝা যায় না। পরপুরুষকে অকস্মাৎ দেহ দেওয়ার গ্লানি তাকে কেন এমন অভিভূত করলো? সুরেশ তো সত্যই পরপুরুষ নয়! আর দেহ-মিলনও একেবারে ধর্ষণের মতো অকস্মাৎ নয়। অচলার কাছে মহিম যতখানি পরপুরুষ সুরেশ ততখানি পরপুরুষ ছিল না। দেহ পবিত্র রাখার বা থাকার সমস্যা বিংশ শতাব্দীর বর্তমান ভাগের নারীর সমস্যাই নয়। অচলা যতবার সচলা হয়েছে, নিজের পথে নিজ অভিপ্রায়ে চলতে গেছে, ততবারই ভুল করেছে। সে লক্ষ্যহীনা। উপরন্তু সংস্কারাবদ্ধ। যে সংস্কারের মূল্য সে সচেতন ভাবে জানে না। লক্ষ্যহীনা বলেই শেষ পরিণাম-পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তার বিমূঢ় জিজ্ঞাসা মহিমের কাছে কোন উত্তর পায় না এবং আজকে ঐ জিজ্ঞাসা আরও মূল্যহীন। দেহেমনে চিন্তায় আদর্শে সে সত্যিকার কোথাও লগ্ন নয় বলেই তাকে আমাদের 'পতিতা' বলেই মনে হয়েছে। মৃণাল যতই তার পক্ষে ওকালতি করুক, জানি না এই পতিতাকে মহিম অবশেষে গ্রহণ করতে পারবে কি না, গ্রহণ করলেও উন্নত আধুনিক নারীত্বে অধিষ্ঠিত করে দিতে পারবে কি না।

সাবিত্রী যে পতিতা, এ খবর 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের অনেকখানি পাঠ করেও জানা যায় না। সে রসিকা, মমতাময়ী, পরিশ্রমী, নির্মলবুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্না, শুদ্ধাচারিণী--এই আমরা জানি। দোষের মধ্যে সে মেসের ঝি। আর জানতে পারি তার একমাত্র কদভ্যাস পানদোক্তা খাওয়া। ক্রোধের বশবর্তী

হতে তাকে বারবারই দেখা যায়। এই সব দোষের জন্য তাকে পতিতা নিশ্চয়ই বলা যায় না। গ্রন্থের শেষভাগে এসে জানতে পারি, ন'বছর বয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে থাকার সময় বড় ভগ্নিপতির প্রলোভনে ঘর ছাড়ে, কিন্তু দেহ অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করতে দেয়নি, তার মনও কেউ স্পর্শ করেনি সতীশ-বাবু ছাড়া। তাই সে পতিতা হলেও পতিতা নয়, সতী। ভালোবাসার একাগ্রতায় উত্তীর্ণ হল শুদ্ধতায়। কিন্তু সমাজপরিধির বাইরেই রয়ে গেল। কারণ যে পারস্পরিক ভালোবাসা সত্য হলেও শ্রদ্ধা পায় না, সেই ভালোবাসার আগুন জ্বেলে ঘর আলো করতে সে চাইলো না। দেহে মনে প্রাণে সতীশকে গভীর ভালোবেসে, মৃত্যুর মুখ থেকে সতীশকে ফিরিয়ে এনে, সতীশের আলিঙ্গন চুম্বন এবং প্রকাশ-উচ্ছ্বসিত একাগ্র প্রেম গ্রহণ করেও সতীশের বিবাহিত বধূ না হওয়ার নির্দেশ মেনে নিল।

অন্যদিকে ঐ দেহের অপবিত্রতার গ্লানিতে, মানস বিচ্যুতির পাপে, স্খলিত জীবনযাত্রার গ্লানিতে, অন্যায় অভিমানের উত্তাপে দগ্ধ হয়ে গেল কিরণময়ী। দেববিশ্বাসহীন, নাস্তিক, সুখবাদী, বুদ্ধিনির্ভর, দুর্ভাগা কিরণময়ী রূপে গুণে বিদ্যায় অসাধারণ হয়েও জীবনে সফল হল না। তার অন্তহীন আন্তরিক ভালোবাসাকে কেউ গ্রহণ করলো না—ধারণ করলো না বলে, তার ভালোবাসা মূল্য পেল না বলে, শেষ পর্যন্ত তার ঘটলো মস্তিষ্কবিকৃতি। অবশ্য কিরণময়ীর জীবনের ব্যর্থ পরিণতির জন্য তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যতখানি দায়ী, তার থেকে অনেক বেশী দায়ী তার একটানা দুর্ভাগ্য, তার অদ্ভুত জীবনের অভাবিত ঘটনা-পরম্পরা। কিরণময়ীকে নানা প্রখর বিপরীত উপাদানে নির্মাণ করা হলেও আমরা সহানুভূতিশীল মন নিয়ে বুঝতে পারি সে চরিত্রহীন নয়। কিন্তু তার ব্যর্থতা একটি দীর্ঘ বক্র প্রশ্নচিহ্ন আঁকে উভয়তঃ তার স্রষ্টার বিরুদ্ধে ও তার সমাজের বিরুদ্ধে। রোহিণীর মৃত্যু ঘটিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি অন্যায় করেছেন তার বিচার অন্যত্র হতে পারে, কিন্তু কিরণময়ীকে 'আধমরা' করে রেখে শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশী অপরাধ করেন না কি? বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের ভাষা ব্যবহার করেছেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র, সেই ভাষাতেই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলা যায়—'দুঃখে সমবেদনায় শরৎচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে; মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেচে।'

ষোড়শী প্রচলিত অর্থে পতিতা নয়। তবে পতিতা দুর্ণাম তার রটেছিল। সন্ন্যাসিনী হয়েও শঠ লম্পট নারীভোগী জমিদার জীবানন্দের 'শান্তিকুঞ্জ'-এ তাকে একরাত্রি আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়েছিল ঘটনাচক্রে। তাই দুর্ণাম। তারই

প্রতিক্রিয়ায়, উভয় দিক থেকে, তার নিজের দিক থেকে ও চণ্ডীগড়ের সমাজের দিক থেকে, জয়চণ্ডীর ভৈরবীপদ ত্যাগ। ছাব্বিশ বছর বয়স হলেও সে দেহের দিক থেকে পবিত্র, একথা সে নিজেই বলেছে। অবশ্য তার দুবার বিয়ে হয়েছিল। প্রথমবার তার মা তার বিয়ে দেয় যুবক প্রতারক জীবানন্দের সঙ্গে, বিয়ের পরেই যে যৌতুকের টাকা নিয়ে ষোড়শী অর্থাৎ অলকাকে ফেলে পালিয়ে যায়। দ্বিতীয়বার তার বিয়ে দেয় তার বাবা তারাদাস। সে বিবাহ চণ্ডীগড়ের ভৈরবী হবার নিয়মরক্ষার্থে। সে ক্ষেত্রেও বিবাহের তিন দিন পর থেকেই স্বামীর সঙ্গে তার চিরতরে বিচ্ছেদ হয়। সধবা হয়েও সন্ন্যাসিনী ষোড়শী নারীর কামনা-বাসনাকে রোধ করলো। দীর্ঘ এক যুগ পরে বীজগাঁয়ের কুখ্যাত জমিদার হয়ে জীবানন্দ ফিরে এলো অলকা অর্থাৎ ষোড়শীর জীবনে। পরিণতিতে দেখি সেই জমিদার স্বামীর সঙ্গে গোপনে ষোড়শী পালিয়ে যাচ্ছে বাবুইয়ের নদীপথে। জীবানন্দকে নিয়ে পালিয়ে গেল ষোড়শী স্বয়ং। সন্ন্যাসিনী ষোড়শী তখন মৃত, বধূ অলকা পুনর্জীবিত। এই শুদ্ধ পলায়নও তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করবে, কারণ সমাজপতিরা জানে যে জীবানন্দের রক্ষিতা হিসাবেই জীবানন্দের ও অলকার মধ্যে পারস্পরিক টান। কিন্তু সত্য হচ্ছে এই - অবহেলিত স্ত্রী পেল স্বামী, মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী ফিরে পেল ঘর, সংসার, স্ত্রী অর্থাৎ তার কাম্য জীবন। মনের দিক থেকে ষোড়শী এক-পুরুষ-কেন্দ্রিক প্রেমে লগ্ন না। হৈমর বর নির্মলকে সে ভালোবেসেছিল। কিন্তু এই প্রেম তাকে আরও বড় প্রেমের দিকে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছে, সেই বড় প্রেমের নাম জীবানন্দের অর্থাৎ তার স্বামীর প্রতি প্রেম। ষোড়শী পতিতা কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজনই তার তখন থাকে না।

'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলে-ছিলাম'—শরৎচন্দ্রের 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' নিবন্ধের উক্তিটি 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে গল্পরূপ লাভ করেছে। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস সম্বন্ধে লেখক স্বয়ং খোলাখুলি আলোচনা করেছেন 'চন্দননগরে আলাপসভায়'। তিনি সেখানে বলেছেন—

> "মানুষ কি, তা মানুষ না দেখলে বোঝা যায় না। অতি কুৎসিত নোংরামির ভিতরও এত মনুষ্যত্ব দেখেছি যা কল্পনা করা যায় না।"

শরৎচন্দ্রের দুটি উক্তি স্মরণ করে কমল চরিত্রের পরিচয় দিতে হবে। কমল দাসীর কন্যা, তার পিতৃ-মাতৃপরিচয়ও গৌরবের নয়। কিন্তু কমল সতী কি না, এ প্রশ্ন তোলার আগেই দেখতে হবে মনুষ্যত্বে সে কতখানি উজ্জ্বল। বিধবা হবার পর শিবনাথের 'শিবানী' হওয়া, তারপর অজিতের জীবনসঙ্গিনীরূপে

তার পরিবর্তন দেখে কমলের মানসিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের পূর্ণতাকেই উপলব্ধি করি। তবে কমল বড় বেশী কথা বলেছে। নারীপুরুষের সব সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব লেখক তারই উপর চাপিয়েছেন, সেইজন্য তাকে এত কথা বলতে হয়েছে। 'শেষ প্রশ্ন' রচনার সমসাময়িক সময়ে কমলকে বুঝতে হয়তো অনেকেরই অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু আজ কমলকে আমরা স্বতঃই বুঝি এবং বুঝি বলেই তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা সুগভীর হয়ে যায়। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র ভারতী বা রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনীর সঙ্গেও কমলের তুলনা হয় না, যদিও ব্যক্তিত্ব এবং প্রাণময়তার দিক থেকে তাদের মধ্যেকার ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাদের সঙ্গে তুলনা দিতে আমরা পিছন ফিরে শকুন্তলা ডেস্‌ডিমোনাদের অন্বেষণ করি, কিন্তু কমলের সঙ্গে তুলনা টানতে পিছন ফিরে সুবিধা হয় না। কমল চিরকাল ধরে সম্মুখবর্তিনী, আগামী ও অনাগত কালের নায়িকা। নারী যা হতে চায় এবং যা হবে, যা দিতে পারে যা নিতে পারে, যেমন করে সত্য হতে চায়, সুন্দর হতে চায়, কমলের প্রেমে ও প্রেমভাষ্যে তারই ইঙ্গিত ও ইতিহাস। কমল বলে—

> "একদিন যারা বলেছিল নর-নারীর ভালবাসার ইতিহাসটাই হচ্ছে মানবসভ্যতার সবচেয়ে সত্য ইতিহাস, তারাই সত্যের খোঁজ পেয়েছিল বেশি, কিন্তু যারা ঘোষণা করেছিল পুত্রের জন্যই ভার্য্যার প্রয়োজন তারা মেয়েদের শুধু অপমান করেই ক্ষান্ত হয় নি, নিজেদের বড় হবার পথটাও বন্ধ করেছিল এবং সেই অসত্যের পরেই ভিত্ পুতেছিল বলে আজও এ দুঃখের কিনারা হল না।"

কমল সাধারণ অর্থে পতিতা নয়, কিন্তু পতিতার কন্যা। তার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র পতিতা মনোভাবের কোন স্ফুরণ রাখেন নি। পারিপার্শ্বিক যতই চীৎকার করুক, কমল শরৎচন্দ্রের অন্যান্য চরিত্রের মতো কোন সময়েই রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী, কমললতা, ললনা, বিজলীর মতো নিজেকে পতিতা ভাবেনি। বিদেশী পিতার কাছে তার শিক্ষা বলে হিন্দু সমাজের ক্ষুদ্রতার স্পর্শ তার মনে পড়েনি। সে জীবনবাদী। একপত্নী হারালেই যে তার দুঃখে পুরুষকে সারা জীবন নিঃসঙ্গ কাটাতে হবে এ অভিমত সে পোষণ করে না। স্বামী হারিয়ে, প্রেমিক হারিয়েও সে ক্ষুব্ধ নয়, বিরাগী নয়, অন্য পাত্রে আপন সজীব প্রেমকে সম্পূর্ণ ও সার্থক দেখতে চায়। সর্বোপরি কমল ক্ষণবাদী। কিন্তু স্থূলভোগবাদী নয়। যে প্রেম জীবন-যাপনের পথ বেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, বিবাহোত্তর সেই দাম্পত্য প্রেমই যে মহামূল্যবান তা সে মনে করে না। কয়েক বছরের, কয়েক মাসের, এমন কি

কয়েকদিনের প্রেমের মধ্যে এমন দীপ্তি থাকতে পারে যা আমৃত্যু জ্বালানো গৃহবাসী প্রেমের প্রদীপও ছড়াতে পারে না। কমলের প্রথম বিবাহ একজন খ্রীষ্টানের সঙ্গে। তার মৃত্যুর পর কমলের দ্বিতীয় বিবাহ শৈব মতে, তার নতুন নাম তখন শিবানী। কিন্তু শিবনাথ শিবানীকে ত্যাগ করে মনোরমায় মগ্ন হলেও কমলের চিত্ত হাহাকারে ভরে গেল না অথবা আপন অধিকাব রক্ষায় কোন প্রকার নীচতার প্রশ্রয় দিল না। শরৎচন্দ্রের মনে নারীব্যক্তিত্বের পূর্ণতার সম্বন্ধে যে আদর্শ চিন্তা ছিল তারই অনাগত যুগসম্ভব প্রতিমূর্তি এই কমল। কমল আমাদের ভালোবাসতে শিখিয়ে গেছে, সুখী হতে শিখিয়ে গেছে। কমল শাশ্বত মানবপৃথিবীর শাশ্বত নারীরত্ন। আমাদের ,দেশের নারীরা আজ যা হতে চাইছে তা-ই কমল, যা হবে তাও কমল। কমলের চরিত্র এমনি যুগে যুগে পরতে পরতে খুলে খুলে দেখে নিতে হবে। শরৎচন্দ্র কমলকে এতখানি পরিধি ও পরিণতি দান করেছেন।

'শেষের পরিচয়' অর্ধসমাপ্ত উপন্যাস। উপন্যাসটিব শেষ বৃহৎ অংশ বাধারানী দেবী কর্তৃক রচিত। লক্ষণীয়, এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসে শরৎচন্দ্র যে দুটি প্রধান নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছেন সেই দুজনেই প্রচলিত অর্থে কুলটা, কুল-ত্যাগিনী। নতুন বৌ অর্থাৎ সবিতা প্রধান চরিত্র। স্বামী ও কন্যা থাকা সত্ত্বেও পরপুরুষের সঙ্গে রাত্রিবাসকালে ধরা পড়ে কুলত্যাগ কবে। পব পুরুষ রমণীবাবুর রক্ষিতা হিসাবে এক যুগ কাটাবার পবও তার চরিত্রে ম্লানিমা স্পর্শ করেনি। স্বামী ব্রজবাবুর প্রতি তার ভালোবাসা অটুট আছে, কন্যার প্রতি আন্তরিক আকুল আকর্ষণ তাকে নিত্য দগ্ধ করেছে। অন্যদিকে অল্প বয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ কবে এসেছে প্রতারক এক পুরুষের সঙ্গে আর এক নারী, যার নাম সারদা। আত্মহত্যা করতে গিয়েও সফল হয় নি সে। পুনর্জীবনে নতুন সত্তা নিয়ে দেখা দিয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসের পনের পরিচ্ছেদ মাত্র রচনা করলেও শরৎচন্দ্রের পতিতা চরিত্র সম্বন্ধে আদর্শানুভূতি পূর্ণ মর্যাদায় প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে। পরিচয়ের শেষ পরিধি পর্যন্ত নারী নারীই —এই শরৎচন্দ্রের প্রতিপাদ্য। সে একাধারে প্রিয়া, বধূ, মাতা, এবং মহীয়সী। 'মানুষ যে দুর্গম আপন অন্তরালে/তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে' —এই কবি-উক্তিটির নির্দেশ মান্য করে যেন নারীর দেহ মন জীবন মরণ কর্ম প্রবৃত্তির, বাহ্যিক ঘটনাবলীর অন্তরালে শেষ পরিচয়, শ্রেষ্ঠ পরিচয় উদ্ঘাটন ইচ্ছায় আপন প্রতিভা নিয়োগ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। মৃত্যুর আগে (এই উপন্যাস রচনাকালে শরৎচন্দ্রের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে) যেন শেষবার নারীকে

তার বিশুদ্ধ চৈতন্যে বিধৃত সত্তায় দেখে নিতে চেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। উপন্যাস অসম্পূর্ণ থাকলেও সফল হয়েছিলেন।

[8]

পতিতা নারীর নবমূল্যায়ন করেই শরৎপ্রতিভা সার্থক। Thomas Carlyle-এর একটি বাণী আছে 'The history of the world is but the biography of great men'. সমস্ত বিশ্বের ইতিহাসে এ কথা যতখানি সত্য, শরৎসৃষ্টির ইতিহাসেও এ কথা ততখানি সত্য। তাঁর পতিতা নারীরা আপাত 'গ্রেট উওমেন' নয়, প্রকৃত 'গ্রেট উওমেন'। তারা না জন্মালে শরৎসাহিত্যের জন্ম হত না। কিন্তু প্রথমেই যে প্রশ্ন তুলেছিলাম, তারা কী ভেবেছে—তার সঙ্গে দেখা দরকার তারা কী করেছে? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই। আলোকপন্থী, আশাবাদী উত্তর নেই। সমাজকে তারা কতখানি এগিয়ে দিয়েছে, পতিতাপল্লী থেকে তারা সমাজের সম্মানীয পীঠ-স্থানে ফিরে আসতে পেরেছে কি না—এই সব প্রশ্নের উত্তর এখনও নিবানন্দ-জনক।

তবু জানি তারা স্থান পেয়েছে সহৃদয়-হৃদয়সংবাদীর চিত্তভূমিতে, তারা অমরত্ব লাভ করেছে রসের ভুবনে। 'মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেশন্' হয়তো চিরদিনই থাকবে, এবং পুশকিন, ডিকেন্স, ডস্টয়ভস্কি, শ, শরৎচন্দ্রের মতো স্রষ্টা চিরকালই জন্ম গ্রহণ করবেন, যাঁরা বলবেন এই দেখ এঁরা 'পতিতা' কিন্তু অনন্ত রসস্বর্গবিচ্যুত নয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্যের অন্তঃশীলা

পরিমল চক্রবর্তী

॥ এক ॥

বাস্তবিক, বাংলা সাহিত্যের অগণিত পাঠক-পাঠিকার অন্তরলোকে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মহিমময় যে-ভাবমূর্তিটি পরম শ্রদ্ধায় অদ্যাবধি অধিষ্ঠিত, তা যে-কোনো আধুনিক বাঙালি সাহিত্যিকের পক্ষে, একাধিক অর্থেই, ঈর্ষণীয় বলে বিবেচিত হতে পারে। সাহিত্যিক জীবনের ঊষালগ্নে বিপুল বিস্ময়ে আমাদের সচকিত ক'রে তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব একদা যেমন আমাদের সাহিত্যে 'নিউজ' হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলো, তেমনি প্রায় রাতারাতি দিগ্বিজয় করে ফেলার মতো তাঁর ব্যাপক প্রতিষ্ঠাও পরিণত হয়েছিলো 'লিজেণ্ড'-এ; এবং তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ও সার্বজনীন স্বীকৃতির মধ্যে সময়সীমার যে-ব্যবধান, হ্রস্বতায় তা যোগ্য কারণেই বাংলা সাহিত্যের অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলীর অন্যতম বলে বিবেচিত হতে পারে; কেননা একটিমাত্র হস্তের অঙ্গুলিমেয় সামান্য যে-ক'টি বৎসরের পরিসরে তিনি নিজের সৃষ্টির মূলকে বাংলা সাহিত্যের উর্বর মৃত্তিকায় বহুধাবিভক্ত ক'রে দৃঢ়প্রোথিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার সমকক্ষ দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেও আমরা খুব বেশী লাভ করি না। অন্য কোনো দেশের সাহিত্য বা সাহিত্যিকদের কথা এ-প্রসঙ্গে ওঠাতে চাই না, (কেননা সে-সম্পর্কে আলোচনার যোগ্য ক্ষেত্র বর্তমান প্রবন্ধ নয়), আমি শুধু আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করাতে চাই; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অনুসন্ধিৎসুরা সহজেই লক্ষ্য করবেন যে আবির্ভাবের আকস্মিকতায় ও প্রতিষ্ঠার দ্রুতিতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন ব্যক্তিত্ব সমগ্র বাংলা সাহিত্যে আর মাত্র একজনই আছেন, তাঁর নাম নজরুল ইসলাম; অন্য কেউ নেই, এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নন। আমি বেশ ভাবতে পারছি যে আমার এ-সিদ্ধান্তে কেউ-কেউ রীতিমতো বিচলিত বোধ করবেন। তাঁদের সঙ্গে এই নিয়ে আমি কোনো অপ্রীতিকর কূটতর্কে প্রবৃত্ত হবো না, বিনীতভাবে তাঁদের শুধু এ-সত্যটিই স্মরণ করতে অনুরোধ করবো যে

উইলিয়ম্ বট্‌লার ইয়েট্‌স্ ও অন্যান্য কতিপয় ইয়োরোপীয় সাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ প্রভাব, প্রয়াস ও প্ররোচনায় 'নোবেল প্রাইজ' নামক পাশ্চাত্য অর্থপুষ্ট ও কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক স্বার্থদুষ্ট জড়বস্তুটি গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর নিজের দেশের মানুষদের কাছে রবীন্দ্রনাথ শুধু অবহেলিতই ছিলেন না, ছিলেন অস্বীকৃত, এমন কি কিছুটা ধিক্কৃতও বটে।

নজরুল ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের একটি বিশেষ দিকের যে সাদৃশ্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করলুম, তা নেহাতই তাঁদের সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস ও পটভূমিকাগত ; কেননা স্বরূপত এই দুই প্রতিভাবানের মধ্যে বৈপরীত্য প্রায় মেরুপ্রমাণ। আকস্মিক আবির্ভাব ও বিস্ফোরক প্রভাব নজরুলকে চিহ্নিত করেছে 'ধূমকেতুর নজরুল'-রূপে, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য, শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে এ-ধরনের কোনো উত্তেজক বিশেষণ জোটে নি, তাঁর চকিত আবির্ভাবে আপামর বাঙালি পাঠককুল শুধু সচকিতই হন নি, হয়েছেন প্রীত এবং প্রথম পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে নিজেদের হৃদয়ের একেবারে অন্দর-মহলে অকুণ্ঠ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখেছি যে সমকালীন রাজনীতিসৃষ্ট ও প্রভাবিত 'ধূমকেতুর নজরুল' ধূমকেতুর মতো সহসা আবির্ভূত হয়ে অস্তমিতও হয়েছেন ধূমকেতুর মতোই অকস্মাৎ। স্বভাবতই তাঁর প্রভাবের ব্যাপ্তি হযতো ছিলো, কিন্তু ছিলো না স্থায়িত্ব। সেজন্যেই আমাদের সাহিত্যে নজরুল ইস্‌লাম আজ একটি পাঠ্যক্রমভুক্ত বহু-উচ্চারিত ঐতিহাসিক নামমাত্র, কোনো সৃজনশীল প্রভাব কিংবা সক্রিয় ব্যক্তি নন। কিন্তু, সুখের বিষয়, শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে ঘটনাপ্রবাহ সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। আবির্ভাব তাঁরও আকস্মিক এবং প্রতিষ্ঠাও প্রায় তৎক্ষণাৎ, ঠিক যেন পূর্ব-দিগন্তে সূর্যের উদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই মধ্যগগন পরিক্রমার মতো, কিন্তু প্রভাবে তিনি যেমন ব্যাপক ও গভীর তেমনি স্থায়ী ও পরিণতিপ্রবণ। আর 'প্রত্যেক যুগ যুগন্ধর সাহিত্যিকদের আপন প্রয়োজনে সৃষ্টি করে' -এই ধারণায় আমার সাহিত্যজীবনের সূচনাপর্ব থেকে অবিচল বিশ্বাসী আছি বলে, আজ শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীতে এ-কথাটি আমার মনে ক্রমেই বদ্ধমূল হচ্ছে যে কোনো সাময়িক উত্তেজনা কিংবা কোনো সংকীর্ণ রাজনৈতিক ঘূর্ণিবাত্যা অথবা কর্ম-কাণ্ডের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ স্থূল প্রভাবের পরিণতি হিসেবে শরৎচন্দ্রকে আমরা পাইনি ; যুগোচিত এক গভীর সমাজজিজ্ঞাসা, মানবিকতা এবং আত্মচৈতন্যই বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে তাঁর আবির্ভাবকে অনিবার্য করে তুলেছে, তাঁর শিল্পীসত্তাকে তিলে তিলে নির্মাণ করেছে এবং তাঁকে ক্রমে ক্রমে প্রাজ্ঞ পরিণতি দান করেছে। অতএব, কোনো স্বল্পকালীন অগভীরত্ব নয়,

বরং দীর্ঘকালীন সুগভীরত্ব ও পরিণতিপ্রবণতাই শরৎচন্দ্রের বহুব্যাপক প্রভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

॥ দুই ॥

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেমন ক'রে সম্ভব হলো শরৎচন্দ্রের মতো একজন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল, পূর্বপরিচিতির ভূমিকা-বর্জিত, সহায়-সম্বল-কপর্দকশূন্য প্রাক্-আত্মপ্রকাশপর্ব পর্যন্ত আযৌবন বঙ্গবহির্ভূত, ধ্যান-ধারণায় তদানীন্তন সমাজ-স্বীকৃত বিকৃত মূল্যবোধ ও নিষ্ফল প্রথাপরায়ণতার চরম বিরোধী, জীবন-যাপনে চূড়ান্তরকমের এমন কি বিপজ্জনকরূপে 'বোহেমিয়ান'-এর পক্ষে অবিশ্বাস্যরূপে আশ্চর্য ও দুরূহ এমন একটি কর্ম সম্পাদন করা? কেমন ক'রে সম্ভব হলো তাঁর পক্ষে প্রথম রচনা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই আবালবৃদ্ধবনিতা-নির্বিশেষে আপামর বাঙালি পাঠক-পাঠিকার চিত্ত হরণ ক'রে নেওয়া, তাঁদের মর্মলোকের অর্গলিত দুয়ারে দুয়ারে সুপ্তিনিঝুম প্রহরে প্রহরে ঘুম-ভাঙানিয়া সাড়া-জাগানো, যেন একান্ত আপনজনের মতো সকলের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গাঢ় স্বরে তন্ময়ের মতো বলে ওঠা : চেয়ে দ্যাখো, এই যে আমি এসেছি, আমার জন্যেই তো তোমরা এতোদিন তৃষিত অন্তরে অপেক্ষা করছিলে, তাই না?

এক ধরনের প্রতারক সরলতার আবরণে আবৃত অত্যন্ত কঠিন এ-প্রশ্নটির উত্তরে শরৎসাহিত্যের স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় আলোচকদের স্বভাবতই স্ব-বিরোধী, পক্ষপাতদুষ্ট ও প্রাণস্পর্শশূন্য যুক্তিজাল এবং তথাকথিত তথ্যপুঞ্জের অন্ধ অনুবর্তন ক'রে সেগুলোকে আরো অসঙ্গত ও দুর্বল ক'রে তুলবো না, প্রশ্নটির উত্তরে আমি বরং দুটি বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করবো : প্রেম, হ্যাঁ, প্রেম—মাত্র দুটি অক্ষরের এই অক্ষয় সম্পদ যা সৃষ্টির প্রথম প্রহর থেকেই বিশ্বমানবতাকে ঐক্যবিন্দুতে সংস্থাপিত করেছে, যে-শব্দটি উচ্চারণে সংক্ষিপ্ত হয়েও ব্যঞ্জনায় ব্যাপক হয়তো বা ব্যাপকতম, যা শুধু সুশ্রাব্য কিংবা শ্রুতিসুখকরই নয়, প্রতিক্রিয়ায় বিশল্যকরণীসদৃশ আরোগ্যের নিদানও বটে, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এই সহজ শব্দটিই হচ্ছে শরৎচন্দ্রকে চেনার ও জানার, তাঁকে খোঁজার ও বোঝার, তাঁর লোভের ও ক্ষোভের, তাঁর দোষের ও রোষের খবর নেবার, তাঁর অভাব ও স্বভাব সম্পর্কে সচেতন হবার অন্যতম নয়, প্রধানতম কিংবা আরো অদ্ব্যর্থ ভাষায় একমাত্র নিঃশর্ত শর্ত ; অর্থাৎ, এই ঘনিষ্ঠ শব্দটিই হচ্ছে শরৎসাহিত্যমন্দিরে আরোহণের স্বর্গীয় সোপান, রহস্যময় সেই মন্দিরের অবরুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করার অবগাঢ় গোপন মন্ত্র।

কিন্তু প্রেমকে ভিত্তি ক'রে, প্রেমকে আশ্রয় ক'রে আমাদের সাহিত্যে কতো

সাহিত্যিকই তো কল্পনার কল্পজাল বিস্তার করেছেন, কল্পিত কাহিনীর ইন্দ্রধনুক রচনা করেছেন, তাহলে শরৎচন্দ্রের প্রেমোপজীব্যতাকে কেন্দ্র ক'রে এতো সাতকাহন গাইবার কী-ই বা আছে, এ-প্রশ্ন সংশয়ের আকারে অনেকের মনেই দেখা দিতে পারে ; কিঞ্চিৎ বিরক্তবোধও করতে পারেন কেউ-কেউ তাঁর প্রেম-পরায়ণতাকে নিয়ে এই রুদ্ধশ্বাস উচ্ছ্বাসে, বিশেষত যখন আমরা জানি যে প্রেম মাত্রেরই একটি অসাধারণ সাধারণ প্রবৃত্তি যা বহুক্ষেত্রেই আমাদের বহুমুখী ক্রিয়াকলাপের অন্তরালে শুধু আত্মগোপনই ক'রে থাকে না, আত্মপ্রকাশ ক'রে আমাদেব অনুপ্রাণিতও করে জীবনধর্মী বহুবিধ কর্মোদ্যমে, তখন।

কিন্তু হ্যাঁ, শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে এবং হয়তো একমাত্র শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন আছে এ-ধরনের অবিরল উচ্ছ্বাসের অন্তহীন প্রকাশের, কেন না যাকে আমরা উচ্ছ্বাস অভিধায় অভিহিত করেছি তা যে আসলে কোনোক্রমেই উচ্ছ্বাস-মাত্র নয়, তা যে আমাদের আবেগাসিক্ত অন্তরেরই অভিব্যক্তি, তা যে শরৎচন্দ্রের প্রতি আমাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধারই স্বতোৎসার, এই মূল সত্যটি আমরা, অনুরাগী-অনুরাগিণীরা, যেন কোনোক্রমেই বিস্মৃত না হই। আমরা যেন মুহূর্তের জন্যেও ভুলেও না যাই যে গড্ডালিকাস্রোতে অক্ষমের মতো আত্ম-সমর্পিত, বহু-বিজ্ঞাপনের ঢক্কা-নিনাদিত, আমাদের সাহিত্যের অনেকানেক তথা-কথিত জনপ্রিয় সাহিত্যিকের মতো তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রেমকে কেন্দ্র ক'রে কোনো নিষ্ফল কাহিনীকলাপ বিস্তার করেন নি, বরং প্রেমকে তিনি সর্বতোভাবে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর শিল্পীজীবনের প্রধান দর্শন হিসেবে, তাঁর জীবনদৃষ্টির নেপথ্যনিয়ামক হিসেবে। সেই কারণেই শরৎসাহিত্যের অভি-নিবেশী অনুসন্ধিৎসু হিসেবে আমরা লক্ষ্য করি যে তাঁর সাহিত্যজীবনের উপ-ক্রমণিকা থেকে উপসংহার পর্যন্ত—এই সুদীর্ঘ অধ্যায় জুড়ে বিভিন্ন লগ্নে, পর্ব-পর্বান্তরে, তিনি যা কিছু রচনা করেছেন, তাঁব বিচিত্রপ্রসবী লেখনী থেকে যে-কোনো ধরনের রচনাই উৎসারিত হয়ে থাকুক না কেন, তা গল্পই হোক, উপন্যাসই হোক কিংবা আত্মজৈবনিক কোনো কাহিনীই হোক, সেগুলোর প্রায প্রতিটিই এক অর্থে প্রেম-পটভূমিক, অর্থাৎ, রচনাগুলোর পটভূমিকায় রয়েছে প্রেম, তা প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, মুখ্যতই হোক কিংবা গৌণতই হোক। বস্তুত প্রেমিক শরৎচন্দ্রের মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রেমের যে শান্তশ্রী ধরা পড়েছে, তাঁর শিল্পঋদ্ধ লিপিকুশলতায় প্রেমের যে স্নিগ্ধ স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রীরা, তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা, যেভাবে প্রেমের প্রভাবে পরিণতি পেয়েছে, তাঁদের কথাবার্তায়, চলনে-বলনে, ভাবে-ভঙ্গীতে যেভাবে প্রেম অনুস্যূত হয়ে উঠেছে, তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে প্রেম যেভাবে

আকীর্ণ-বিকীর্ণ-পরিকীর্ণ হয়ে আছে, অর্থাৎ, এককথায়, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে মানব-মানবীর প্রেমের হ্লাদিনী লীলাকে প্রধান উপজীব্য ক'রে যে কল্পলোক, না, ভুল হলো, কল্পলোকমাত্র নয়, চিরভাস্বর যে জ্যোতির্লোক সৃষ্টি করেছেন, তার অম্লান আভা তাঁর শত সহস্র মুগ্ধ পাঠক-পাঠিকার আধুনিকযুগলাঞ্ছিত, বিজ্ঞানশাসিত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন, প্রেমবুভুক্ষু অন্তরের গহন প্রদেশে আঁধার-মানিকের মতো জ্বলতে থাকবে আরো বহুদিন ধরে, এ-ঘোষণা আজ আমাদের কণ্ঠে-কণ্ঠে নির্দ্বিধায় উচ্চারিত হওয়া উচিত।

॥ তিন ॥

এই সীমাহীন প্রেমতন্ময়তার সঙ্গে মণির সাথে কাঞ্চনের মতো যুক্ত হয়েছে তাঁর দরদ—তাঁর অনন্ত, অসীম, অপরিমেয়, অকল্পনীয় দরদ, যা তাঁর সাহিত্যের নিঃশ্বাসবায়ু-সদৃশ, প্রেম যদি হয়ে থাকে শরৎসাহিত্যের দেহ, তবে দরদ হচ্ছে শরৎসাহিত্যের প্রাণ। এই প্রেম ও দরদকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে শরৎসাহিত্যের পূর্ণাবয়ব মনোহারী মূর্তিটি, যা আমাদের বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হয়েছে বারেবারে, বহুতর রূপে। শরৎসাহিত্যের বিস্তীর্ণ পরিসরের প্রায় সর্বত্র এবং বিশেষভাবে সেই সব অন্ধকার উপেক্ষিত বিজন অঞ্চলে যেখানে তিনি আমাদের কলুষিত সমাজের অত্যাচারে-অবিচারে বিষ-জর্জর, নীলকণ্ঠবতী, হতভাগিনী, মূক নারীকুলের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব উদঘাটনের মহাব্রতে ব্রতী হয়ে ডুব দিয়েছেন তাঁদের হৃদয়-সমুদ্রের গহন-গহীনে, এবং দক্ষ ডুবুরীর মতো একের পর এক উদ্ধার ক'রে এনেছেন বহুমূল্য রত্নরাজি—তাঁদের প্রেমপ্রীতির, তাঁদের স্নেহমমতার, তাঁদের আবেগ-অনুরাগের, তাঁদের সেবা-পরায়ণতা-সহনশীলতার অজ্ঞাত ও অস্বীকৃত কাহিনী, তখন তাঁর হৃদয়ের গোপন নির্ঝর থেকে সহস্র ধারায় যে বিগলিত দরদ উৎসারিত হয়েছে, তা-ই শরৎচন্দ্রের পাঠক-পাঠিকাদের মনের অন্তঃপুরে, তাঁদের মগ্নচৈতন্যে, আলোড়নের ঝড় তোলে, তাঁদের ভাবায়, তাঁদের অনুপ্রাণিত করে। এতো দরদ, সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে, হৃদয় উজাড় করে অকৃপণভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিলিয়ে দেবার মহৎ দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে বাস্তবিকই বিরল। আর শুধু আমাদের সাহিত্যেই বা বলি কেন, বিশ্বের বহু দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যেই এই বিশেষ গুণটিতে শরৎচন্দ্রের জুরি ভূরি-ভূরি খুঁজে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হিসেবে রুশ সাহিত্যের 'লিটের‍্যারি ম্যাজিসিয়ান্' আন্তন চেখভ্ এবং ইংরেজী সাহিত্যের 'পাব্লিক এণ্টারটেনার' চার্লস্ ডিকেন্স—অন্তত এ-দুজনের কথা এ-প্রসঙ্গে একবারও যে আমার মনে পড়েনি তা নয়, কিন্তু এই দুই খ্যাত-কীর্তি সাহিত্যিকের সাহিত্যকৃতির সঙ্গে পাঠক হিসেবে আমার যে-পরিচিতি,

তার ওপর ভিত্তি ক'রে আমি বিচার ক'রে দেখেছি, বাংলা সাহিত্যের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রতীচ্যের এই দুই সাহিত্যিকের শুধু যে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্যই ছিলো, তা-ই নয়, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এঁদের যেখানে-যেভাবে যেটুকু মিল তার অনেকখানিই নেহাতই আপতিক সামীপ্য, আত্মিক সাদৃশ্য নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে শরৎচন্দ্রের সারা-জীবনের-সাধনার-ধন তাঁর সাহিত্যকর্মে ফল্গুর মতো, মন্দাকিনীধারার মতো, অন্তঃশীল প্রবাহের মতো প্রবাহিত রয়েছে দরদ ; কিন্তু না, এ-ও বোধ করি যথেষ্ট হলো না, যথার্থ ব্যাখ্যায় দরদই হচ্ছে শরৎ-সাহিত্যের অন্তঃশীলা। শরৎচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যে ও ব্যক্তিগত জীবনে দরদের এই শতধা স্বতোৎসারে মুগ্ধ হয়েই আমরা যে একদা তাঁকে 'দরদী' কিংবা 'জীবনদরদী' বিশেষণে বিশেষিত করেছিলুম, তা-ও যেন, যতোই দিন যাচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে, অতিব্যবহারে বৈচিত্র্যহারা, গতানুগতিকতাদুষ্ট ও অনুভূতি-শূন্য হয়ে আসছে, কিংবা বলতে পারি, এই বিশেষণ দুটির ধার আজ বহু ব্যবহারে বহুলাংশেই ক্ষীয়মাণ। আমার এই আবেগী উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, এই সুযোগে, শরৎচন্দ্রের শুভ জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে আমার মনের একটি গোপন অভিলাষের কথা শরৎ-প্রেমিকদের উদ্দেশে একটি প্রস্তাবের আকারে নিবেদন করি ; আমার প্রস্তাব : আসুন, আমরা এই বরণীয়ের জন্মশতবর্ষপূর্তির স্মরণীয় দিনটি থেকে তাঁকে দরদী শরৎচন্দ্র-র সসীম পরিচিতি থেকে 'শরৎচন্দ্র দরদসাগর'-এর অসীমত্বে প্রতিষ্ঠিত করি। আর এটাকে উদ্ভটই বা বলি কী করে। আমরা যদি জনৈক ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পঠন-পাঠন-স্পৃহায় ও বিদ্যার বিপুল ব্যাপ্তিতে বিমুগ্ধ-বিচলিত হয়ে তাঁকে 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'-রূপে আমরণ স্মরণ করতে পারি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে, তাহলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন মানুষকে, যাঁর কাছে নরনারী-নির্বিশেষে এমন কি অবলা প্রাণী পর্যন্ত (তাঁর সারা জীবনের সঙ্গী বড়ো প্রিয় বিশ্বস্ত কুকুর ভেলু ও 'মহেশ' গল্পে বর্ণিত স্নেহমমতাভরা সজল বড়ো-বড়ো একজোড়া কালো চক্ষু বিশিষ্ট গোরু মহেশ-এর কথাই বিশেষভাবে বলতে চাইছি) মমতাসিক্ত, দরদী আচরণ ছিলো অবিকল ধর্মাচরণের সামিল, 'শরৎচন্দ্র দরদসাগর' নামে বরণ করতে পারবো না কেন প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের অমৃতস্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে?

এই সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে আরো দুটি গুণের উল্লেখ করতে চাই যা আমার বিবেচনায়, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের চারিত্রিক মেরুদণ্ডকে গঠন করেছে সুদৃঢ়রূপে, তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান চরিত্রবান সাহিত্যিকের দুর্লভ সম্মানে

ভূষিত করেছে ; সে দুটি'গুণ হচ্ছে তাঁর আত্মচৈতন্য ও মানবিকতা। আত্ম-চৈতন্য ও মানবিকতা—এ দুটি গুণ শিল্পী-সাহিত্যিকমাত্রেরই সহজাত স্বধর্ম, এ-তথ্য আমরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তাবৎ শিল্পী ও সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবন ও স্রষ্টাজীবনের পর্যালোচনা থেকে সহজেই জানতে পারি। এ দুটি গুণ সার্থক স্রষ্টামাত্রেরই সহজ লক্ষ্য, কেননা এ দুটি গুণ শুধু গুণই নয়, তার চেয়েও অনেকখানি বেশী কিছু ; এ দুটি আসলে এমন দুটি গঠনাত্মক শক্তি যা যে-কোনো শিল্পী বা সাহিত্যিককে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে সাহায্য করে, অলক্ষ্যে সাহায্য করে তাঁকে তাঁর স্রষ্টাসত্তার পায়ের তলার শক্ত মাটি খুঁজে পেতে এবং সেই শক্ত মাটির ওপর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে জগৎ ও জীবনের প্রতি নিবাসক্ত দৃষ্টিপাত কবতে। শবৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও যে এ-দুটি শক্তি তাঁর জীবনদৃষ্টির ভঙ্গিমা ও চারিত্র্যগঠনের অদৃশ্য ও জটিল প্রক্রিয়ায় আদ্যোপান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণভাবে সক্রিয় ছিলো, এ-কথা আজ আর বিশেষ অজানা নেই, কিন্তু আজো অজ্ঞাত রয়েছে তাঁর উদাব মানসিকতাব যথার্থ স্বরূপ, অকৃত থেকে গিয়েছে তাঁর তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গীব মৌলিকতাব মূল্যায়ন। এ-কথা ঠিক যে বিশ্বের অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের কারো-কারো বচনাব মতো শরৎচন্দ্রের বচনাতেও প্রথমাবধি অত্যুগ্র এক দ্রোহ মূর্ত হয়ে উঠেছিলো, কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, সেই দ্রোহকে বাণীরূপ দিতে গিয়ে তাঁকে কোনো কপট অভিনবত্বের তথা আধুনিকতাব ছলনাব আশ্রয় গ্রহণ কবতে হয় নি, সেই কাবণেই তাঁর চকিত আবির্ভাবে আমবা সচকিত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু কখনো হতচকিত হই নি ; কেননা তিনি আমাদের চক্ষুকে ঝল্‌সাতে চেষ্টা করেন নি কোনোদিন, তিনি আমাদেব প্রেমতৃষ্ণায় বিশুষ্ক মনকে স্নিগ্ধতাব স্পর্শ দিতে প্রযাসী থেকেছেন চিবদিন। আমাদের সাহিত্যমঞ্চে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব চঞ্চল চরণে সশব্দ পদক্ষেপে নয, তাঁর আবির্ভাব নিঃশব্দ চবণে লঘু পদপাতে ; আমাদের সাহিত্যাকাশে তাঁর উদয় সূর্যের প্রখরতায় নয়, তাঁর উদয চন্দ্রের স্নিগ্ধতায়। সত্য কথা বলতে কি, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে ক্ষণকালেব জন্যেও কোলাহলকে বরণ কবেন নি, বারণ করেছেন বরং কোলাহলে দীক্ষিত হতে ; আত্মপ্রতারণাকে, প্রচণ্ড লুব্ধ মুহূর্তেও, এতোটুকু স্বীকার করেন নি, বিকার বলেই জেনেছেন, তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসের চবিত্রের মুখে উপদেশ দিয়েছেন আত্ম-প্রতারণাকে জয় করাব শিক্ষায় শিক্ষিত হতে। এ-ব্যাপারগুলো তো তাঁর গভীর আত্মজ্ঞানের বিশ্বস্ত সাক্ষী বটেই, তা ছাড়া রয়েছে তাঁর মানবিকতা—তাঁর স্নেহাপ্লুত হৃদয়ের দুকূল-প্লাবিত-করা আকুল মানবিকতা, যা তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কৃতির অন্তর্লীন স্বরূপের নির্ভুল নির্ণায়ক, তাঁর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের

উন্মোচক, তাঁর জীবনদৃষ্টির প্রতি অভ্রান্ত অঙ্গুলিনির্দেশক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের সাহিত্যের সেই অতি বিরল সাহিত্যিকদের একজন যাঁরা তাঁদের সাহিত্যজীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত নিজেদের অন্তরের অন্তঃস্থলে সযত্নে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন মানবিকতার অনির্বাণ শিখাটি। মানুষকে আপন জীবনবৃত্তের কেন্দ্রে স্থাপিত ক'রেই তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের পরিধি পরিক্রমা করেছেন। শোক-দুঃখ-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-কবলিত এই যে অসম্পূর্ণ মানবজীবন, লোভ-ক্ষোভ-দ্বন্দ্ব-দ্বেষ-ক্লেশ-বিচলিত এই প্রাণময় গ্রহের এই যে অসহায় মনুষ্যসম্প্রদায়, এরই প্রতি সসম্ভ্রম শ্রদ্ধায়, গভীর সহানুভূতিতে, বিভোল ভালোবাসায়, দয়া-মায়া-মমতার যে নিরন্ত নির্ঝর উচ্ছ্রিত হয়েছে, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে প্লাবিত করেছে, তাঁর সৃজিত নায়ক-নায়িকাকে আবেগে উদ্দীপ্ত করেছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর শত সহস্র পাঠক-পাঠিকাকে অশ্রুজলে অভিসিঞ্চিত করেছে—এ সমস্তেরই মূলে রয়েছে তাঁর আত্মচৈতন্য, তাঁর কালজ্ঞানিকল্প নিবিড়-গভীর আত্মচৈতন্য।

মানুষকেই যে শরৎচন্দ্র তাঁর সৃষ্টির প্রধান উপকরণ হিসেবে নিরন্তর অন্বেষণ করেছেন, তাঁর সৃষ্টিপরিধির কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন, এমন কি তাঁর সৃষ্টির ধমনীর রক্তস্রোতে অবিরত অনুভব করেছেন,—শুধু এই বিষয়টিকে আশ্রয় করেই শরৎচন্দ্রের জীবন ও তাঁর জীবনাদর্শের ওপর একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ রচিত হতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধের নাতিদীর্ঘ পরিসরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ সুযোগ ও সম্ভাবনা নেই। তবু, যদি আমরা তাঁর জীবনাদর্শের যাথার্থ্য উদঘাটনে অভিনিবেশী হই, তাহলে লক্ষ্য করবো যে জীবনাদর্শে শরৎচন্দ্র ছিলেন পুরোপুরি 'র‍্যাডিক্যাল' যদিও রচনারীতিতে তিনি ছিলেন একজন অবিচলিত 'ট্র্যাডিশন্যাল'। তাঁর চিন্তার নিজস্বতায়, তাঁর সুদূরব্যাপ্ত ভবিষ্যৎদৃষ্টিতে, তাঁর সামাজিক ব্যাধির উৎস নির্ণয়ের আকুলতায়, সমাজসংস্কারের আন্তরিক ব্যাকুলতায়, গ্রামবাঙলার ছন্নছাড়া দুঃখিনী মূর্তির রূপোন্মোচনের আকাঙ্ক্ষায়, পল্লীজননীর বিগতশ্রী পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে, তাঁর রাজনৈতিক চেতনার নির্ভীকতায়, তাঁর সাহিত্যের বহুবিচিত্র চরিত্রসৃষ্টির বলিষ্ঠতায়, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কুশীলব, সর্বপথের ও সর্বমতের বাঙালি নরনারীর হৃদয়রহস্য উদঘাটনের একাগ্রতায়—তাঁর অগতানুগতিক জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি পর্যায়েই আমরা তাঁর 'র‍্যাডিক্যাল'-সুলভ জীবন-দৃষ্টির সাক্ষাৎ লাভ করি। তাছাড়া তিনি যে উদার মনুষ্যধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, মনে-প্রাণে অবিশ্বাসী ছিলেন অন্ধ সাম্প্রদায়িকতায়, শত সংশয়-সন্দেহ-সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম ক'রে শেষপর্যন্ত প্রগাঢ় আস্থাশীল ছিলেন মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে,

এ-সমস্তই তাঁর জীবনাদর্শের ঐ বিশেষ দিকটির প্রতিই আমাদের দৃষ্টিকে সর্বতো-ভাবে আকর্ষণ করে।

॥ চার ॥

আশ্চর্যের বিষয়, যে-শরৎচন্দ্র চিন্তায়-মননে, ধ্যানধারণায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশুদ্ধ 'র‍্যাডিক্যাল', তিনিই আবার শিল্পীধর্মে যুগপরম্পরায় বিবর্তিত চিরন্তন মূল্যবোধে প্রগাঢ় বিশ্বাসী। শিল্পী হিসেবে শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় এই যে তিনি অন্যায় অসত্য ও অশুভের বিরুদ্ধে সারা জীবনই উদ্যতখড়্গ ছিলেন ; তিনি বিশ্বাস করতে চাইতেন না যে জীবনের যাত্রাপথে পদস্খলিত অসহায় মানুষের পাপপ্রবৃত্তির মানসকণ্ডুয়ন কখনো কোনো সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে ; সেজন্যেই তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন : যা পাপ, যা অশুভ, যা অসত্য, সাহিত্যে তার কোনো স্থান নেই। অথচ এই পরুষবাণী উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই আবার মানুষের প্রতি তিনি মমতায় বিগলিত হয়েছেন, ব্যাকুলকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত করেছেন ঈশ্বরতনয় যীশুখ্রীষ্টের বাণী : পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়। আসলে, আমি চিন্তা করে দেখেছি, শরৎচন্দ্র মানুষমাত্রকেই হয়তো স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে যথাযথ মূল্য দেবার অনুপ্রেরণাতেই, ভীষণ ভালোবাসতেন ; অসম্ভব রকমের ছিলো তাঁর সেই ভালোবাসা, তিনি মানুষকে ভালোবেসেছিলেন মানব-পাগল আত্মভোলা বাউলের মতো, নিষ্ঠুর দরদীর মতো। সেই কারণেই আমরা গভীর তৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ্য করি যে 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' অর্থাৎ ভাষান্তরে 'শিল্প শিল্পের জন্যে' বা এ-ধরনের কোনো ফাঁপা শৈল্পিক মতবাদে তিনি আস্থা স্থাপন করতে পারেননি, বরং তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন যে 'আর্ট ইজ ফর ম্যানস্ সেক্', এমন কি 'ম্যান ইজ দ্য ফাইন্যাল রেফারেন্স অব অল আর্টস্'। আর মানুষের প্রতি তাঁর এই সীমাহীন দরদের প্রকাশে অভিনয়ের কোনো স্থান ছিলো না, ছলনার কোনো সুযোগ ছিলো না, কেননা তা ছিলো নিখাদসোনার মতোই অকলুষ ও অম্লান। সেকারণেই নরনারীর হৃদয়ের মহত্ত্ব বর্ণনায় তিনি কোনো ভেদাভেদ করেন নি সতী ও স্বৈরিণীতে, মনিব ও মুনিষে, ভদ্র ও ইতরে, প্রৌঢ়া ও অনূঢ়ায়, ত্যাগী ও ভোগীতে, সুশিক্ষিত ও কুশিক্ষিতে, সংসারগৃহী ও সংসারসন্ন্যাসীতে। তবে হ্যাঁ, একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে শরৎচন্দ্রের যে-সব মানুষের প্রতি প্রীতি, সেসব মানুষ কোনো অর্থেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমূহ জ্ঞানভাণ্ডারের দম্ভী দাবিদার, হৃদয়-ঐশ্বর্যে দীনাতিদীন, কুচক্রী, ক্রুর, অর্থ-স্বার্থ-বিত্ত-খ্যাতি-লোলুপ অপদার্থ আধুনিক দানব-মানব, অর্থাৎ 'অর্গানিজেশন্যাল ম্যান' নয়, সে-সব মানুষ

স্বাভাবিকভাবেই এক-একজন সৎ ভারতীয় এবং বিশেষভাবে, অর্থাৎ মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে, এক-একজন হৃদয়বান বাঙালি.। তাঁরা নানা অশিক্ষা-কুশিক্ষা-কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ, স্বার্থ-দ্বেষ-হানাহানি-মারামারিতে বিপর্যস্ত, নীচতা ও স্বার্থপরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এ-সবই সত্য, সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ সত্য নয়। এঁদের এই শোচনীয় অধঃপতন সত্ত্বেও মানবতার পূজারী শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে এঁদের অন্তরের দীপশিখা হয়তো নির্বাপিতপ্রায় হয়েছে, কিন্তু তা নির্বাপিত হয়নি আজো, চিরদিন তা অনির্বাণই থাকবে, কেননা এঁরাও অমৃতেরই সন্তান; সেই কারণেই এঁদের ঘৃণায় বিকর্ষণ করার পরিবর্তে তিনি ভালোবাসায় আকর্ষণ করেছিলেন আপন অন্তরে, সেই কারণেই তিনি এঁদের মানুষের মৌল মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হননি এতোটুকু; এঁদের ওপর কিছুতেই বিশ্বাস হারান নি, হারাতে পারেননি, কেননা 'মানুষ ঈশ্বরের সন্তান আর মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ'—এই স্থির সত্যে আমৃত্যু তিনি অবিচলিত ছিলেন।

আত্মদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ, বিলুপ্তঐশ্বর্য, বিগতশ্রী বাঙালি জাতির এই যে ভাঙা-চোরা সমাজ, যে-সমাজের অন্তঃসারশূন্যতার কথা সামান্য বলতে চেষ্টা করলুম অতি সংক্ষেপে, সে-সমাজই দুর্নিবার আকর্ষণে শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তাকে আকৃষ্ট করেছে, তাঁকে আবিষ্ট করেছে। তিনি ডুব দিয়েছেন, যেন স্বপ্নতাড়িতের মতো, বাঙালির হৃদয়-রহস্যে। মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে, মানবজীবনের অপরিসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির পিপাসায় কাতর হয়ে, তাঁকে পরিশ্রান্ত পথিকের মতো পৃথিবীর পথে-পথে দূরে-দূরে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে হয় নি, বরণ করতে হয়নি তাঁকে নিচ্ছেদ্য ভ্রাম্যমান পথিকবৃত্তিকে। তাঁর স্বদেশ ও স্বকালের ইতিহাস-ভূগোলের স্বল্পব্যাপ্ত পরিসরেই তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁর তৃষ্ণার পানীয়ের, তাঁর প্রাণের শান্তির; তাঁর নিজের দেশের অতি পরিচিত মানুষগুলোর প্রাণের আবেগে উচ্ছলিত অতি সাধারণ যে জীবন-ধারা, সুখী হয়েছেন তারই সঙ্গে আপন জীবনপ্রবাহকে মেলাতে পেরে, মেশাতে পেরে। সে কারণেই তিনি বাঙালি সমাজের ও বাঙালি জাতির প্রাত্যহিক জীবনের শত অন্ধকারকে আশ্রয় করেও তাঁর সাহিত্যে অসামান্য যে জ্যোতি-র্মণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন, তার উজ্জ্বল আভা সুদীর্ঘ সময়ের শত তরঙ্গ অতিক্রম করে, সহস্র অভিঘাত সহ্য করলেও আজো যে শত সহস্র বাঙালিকে আলোকিত করে, পুলকিত করে, করতে পারে, এই হচ্ছে তার গোপন রহস্য, এ-তাঁদের সর্ব ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে, তাঁদের সকল আশা-নিরাশার সঙ্গে, তাদের সাধ-আহ্লাদ-অনিচ্ছার সঙ্গে এবং সর্বোপরি তাঁদের আবেগপ্রবণ মানসিকতার সঙ্গে তাঁর এই

যে নিবিড় একাত্মতাবোধ ও পরিপূর্ণ অভেদীকরণ, ইংরেজীতে যাকে বলে 'কমপ্লিট সেলফ্‌ আইডেণ্টিফিকেশান', এটাই হচ্ছে শিল্পী হিসেবে শরৎচন্দ্রের যুগপৎ সরলতা ও দুর্বলতা, তাঁর সাফল্য ও নৈষ্ফল্য, সাহিত্যিক বিচারে একই সঙ্গে তাঁর কৃতিত্ব ও বিচ্যুতি। শবৎচন্দ্র শিল্পী, জীবনের শিল্পী, সন্দেহ নেই ; কিন্তু বিশেষভাবে বাঙালী জীবনেরই শিল্পী, বাঙালিয়ানারই শিল্পী। বাঙালীর জীবনকেই তিনি তন্নতন্ন ক'রে ব্যবচ্ছেদ করেছেন নিপুণ শব-ব্যবচ্ছেদকের মতো। বাঙালীর সমাজ ও জীবনেব অতি নিখুঁত, স্বভাব-সম্মত অনবদ্য যে-আলেখ্য তাঁর সাহিত্যে তিনি অঙ্কন করেছেন, তাব দিকে আমাদের চোখ পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদেব মন উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠে: চমৎকার, অতুলনীয়, অদ্বিতীয। তাঁর সৃষ্ট বিচিত্র স্বভাবী চরিত্রাবলীর মমতা-মহত্ত্ব-মহাশয়তার মহৎ ভাষ্যকাব তিনি। তাঁব ইন্দ্রনাথ-চন্দ্রনাথ-কাশীনাথ, দেবদাস বিপ্রদাস, রমেশ-সুরেশ, তাঁর অশান্ত শ্রীকান্ত চাবিত্রিক মহিমায় যে এতোখানি উজ্জ্বল, তাঁর অচলা-অভয়া-বিজয়া, তাঁর অনুপমা-সুরমা-রমা, স্নেহ-প্রেম-ক্ষমায় যে এতো দূর আত্মবিস্মৃতা, এ-তথ্য কি আমাদের হৃদযে এতো বেশী সত্য হয়ে কোনোদিন অনুভূত হতো, যদি না শবৎচন্দ্র আপন হৃদযেব দরদসুধায় অভি-সিঞ্চিত ক'রে, শিল্পমনের মাধুবীর রঙে অনুরঞ্জিত ক'রে এই সব আপাততুচ্ছ চরিত্রাবলীর চিত্রমালা আমাদের মনের চোখের সামনে তুলে ধবতেন। আমরা দেখি তো কতো কিছুই, কিন্তু তার কতোটুকুই বা মনে বাখি। কোনো দৃশ্য কিংবা ঘটনা কখন আমাদের স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয না, যখন কেউ সেই দৃশ্য বা ঘটনাকে সুস্পষ্ট ক'বে আমাদের মনেব চোখের সামনে টাঙিয়ে দেয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যেব তেমনই একজন সাহিত্য-চিত্রকর যিনি বাঙালিত্বের যথার্থ স্বরূপের বর্ণাঢ্য আলেখ্যটি প্রতিটি বাঙালিব হৃদয়পটে চিরভাস্বব ক'রে অঙ্কিত করেছেন।

গদ্যশিল্পী শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতিটি কেমন ছিলো ? এককথায় এ-প্রশ্নের সংক্ষিপ্ততম উত্তর : অনবদ্য, কেননা তাঁব গদ্যরীতিতে কোনো নিঃসার কৌশলের স্বল্পায়ু আকস্মিকতা ছিলো না ; শরৎচন্দ্রের রচনাশৈলী ফলতঃ অদ্যাবধি অদ্বিতীয়, কেন না এতো সহজ ভাষায় এতোখানি শক্তির দ্যোতনা পাঠক-পাঠিকার মনে সঞ্চারিত করার কঠিন সাধনায় তাঁর ব্যর্থ অনুকারকরাও কেউই তাঁর নিকটতর হতে পারেন নি ; তাঁর শব্দচয়নের আশ্চর্য ক্ষমতা আজো অতুলনীয়, কেননা প্রতিটি শব্দের বাচ্যার্থ ও ভাবার্থের এতো ঘনিষ্ঠ সামীপ্য শরৎ-পরবর্তী বাঙালি সাহিত্যিকদের রচনায় সর্বাংশে না হলেও বহুলাংশেই অনুপস্থিত। সাহিত্যিক হিসেবে শরৎচন্দ্রের এই যে অনতিক্রান্ত, এমন কি

এক-এক সময় বলতে ইচ্ছে হয় অনতিক্রম্য জনপ্রিয়তা, এটা অর্জন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাঁর সাবলীল গদ্যরীতির জন্যেই। তাঁর ব্যবহৃত ভাষার এই একটা মস্ত গুণ যে ঠিক যতোটুকু তিনি জানাতে চান, তাঁর পাঠক-পাঠিকারা ঠিক ততোটুকুই জানতে পারেন, এতোটুকু কম কিংবা বেশী নয়। 'জাগ্‌লারি অব্‌ ওয়ার্ড্‌স্‌' কিংবা শব্দকে নিয়ে অনর্থক কসরত ক'রে পাঠক-পাঠিকাকে বিমূঢ় ও বিরক্ত করার কোনো প্রবণতা ছিলো না বলেই, আমার ধারণা, এটা সম্ভব হয়েছে। আর যাকে আমরা বলি তাঁর 'স্টাইল', তা কী সহজ-স্বচ্ছন্দ, কী নিরাভরণ-মনোহরণ, কী নিরলঙ্কৃত-নিরহঙ্কৃত! তাঁর রচনায় ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত সরলবাক্যের মনোজ্ঞ শোভাযাত্রা আমাদের সাহিত্যের ভাষায় নূতন প্রাণের আনন্দবার্তা ঘোষণা করেছে।

॥ পাঁচ ॥

বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না যখন লক্ষ্য করি এহেন যথার্থনামা যে-শরৎচন্দ্র, যিনি যথার্থই শরৎঋতুর চন্দ্রের মতো তাঁর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টির স্নিগ্ধ আলোয়, তাঁর প্রখর প্রতিভার প্রদীপ্ত প্রভায়, আমাদের সাহিত্যের পবিত্র প্রাঙ্গণ উদ্ভাসিত করেছেন, আমাদের সাহিত্যের অন্ধকার বহু প্রকোষ্ঠের রুদ্ধদ্বার নব নব সৃজনের মায়াস্পর্শে উন্মুক্ত করেছেন, বাংলাভাষাকে বাঙালিজাতির বহু-রূপী অনুভূতির যোগ্য প্রকাশের যথার্থ বাহন হিসেবে নবরূপ দান করেছেন, তাঁকে, তাঁর জন্মের সুদীর্ঘ এক শতাব্দী সময়ের ব্যবধানেও আমরা যোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করতে, যথার্থ শ্রদ্ধার সম্মানে সম্মানিত করতে, যথেষ্ট উদার হতে পারিনি। তাঁকে ঘিরে অনেক দ্বিধা, অনেক দ্বন্দ্ব, যোগ্য-অযোগ্য-নির্বি-শেষে আমাদের মনে বহু অহেতুক মানসকূটের সৃষ্টি করেছে। যদি দেখতুম যে শুধুমাত্র অর্বাচীন কতিপয় ব্যক্তি, যাঁদের মন স্পষ্টত গ্রাম্যতাদুষ্ট, যাঁদের পাঠকসত্তা সাহিত্যরস আস্বাদনের পক্ষে যথেষ্ট পরিশীলিত নয়, এমন কি পাঠক হিসেবে যাঁদের অস্তিত্বই বালির প্রাসাদের মতো ক্ষণভঙ্গুর, যাঁরা অস্থির-মতিত্বের পরাকাষ্ঠা, শুধু তাঁরাই ভ্রান্তির বশে শরৎচন্দ্রের অন্ধ বিরোধিতায় মত্ত হয়েছেন, তাহলেও নয় বুঝতুম, মার্জনা করতে পারতুম তাঁদের এই বালখিল্য-সুলভ বাচালতা। কিন্তু, পরম পরিতাপের সঙ্গে যখন প্রমাণ পাই যে শরৎ-চন্দ্রের স্বদেশবাসীদের মধ্যেই আছেন এমন বহু তথাকথিত সমালোচক, যাঁরা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীশোভিত পণ্ডিত-গবেষক-অধ্যাপক, যাঁরা নিজেদের গণ্য করেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বজ্ঞ ভাষ্যকার হিসেবে, সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের গোত্রনির্ণয়ের একমাত্র অধিকারী হিসেবে, সাহিত্যবিষয়ক

সর্বব্যাপারে দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্তাব্যক্তি হিসেবে, এবং আরো শোচনীয় বিষয়, যাঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার শরৎসাহিত্যের নরনারীদেরই রক্ত-বমন-বিষ্ঠা-পুঁজ-কৃমি ঘেঁটে অর্জন করেছেন তাঁদের উচ্চাতিউচ্চ খেতাব 'ডক্টরেট', তাঁরাও বদ্ধপরিকর হয়েছেন শরৎচন্দ্রকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে, তাঁর যোগ্য মর্যাদা থেকে তাঁকে ভ্রষ্ট করতে, সভ্য জগতের সর্বত্র শরৎচন্দ্রের অগণিত পাঠক-পাঠিকার মনে তাঁর যে মহিমোজ্জ্বল ভাবমূর্তিটি জাগরূক রয়েছে, তাঁর অবমাননা ঘটাতে, তখন সত্যিই অসহায়ের মতো ভাবি: আমাদেব মূঢ়তা, আমাদের হৃদয়বর্জিত, অনুভূতির স্পর্শলেশশূন্য, শরীবসর্বস্ব, যুক্তিশুষ্ক, নিরুত্তাপ মস্তিষ্ক আমাদের অস্তিত্বকে সমূহ সর্বনাশের অন্ধ পাতালে আরো কতোখানি টেনে নামাবে ?

পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী সমালোচককুলের শরৎ-শত্রুতার পাশাপাশি আরো একটি বিষয় সমস্যার আকাবে আমাদের কাছে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যেটিব প্রতি আমি শরৎ-অনুরাগী সারস্বত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তাঁদের চিন্তাভাবনাকে উদ্রিক্ত করতে চাই। বিষয়টি হলো উত্তরকালের বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা আত্মপ্রকাশে প্রায় শবৎ-সমসাময়িক অথবা ঈষৎ-পববর্তী, তাঁদের সকলেব মধ্যে সাধারণভাবে এবং প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েক-জনের মধ্যে বিশেষভাবে, শরৎচন্দ্রের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব, তাঁকে সহজ স্বীকৃতির উদারতা, তাঁর সাহিত্যিকমানসের তন্ময় অনুধাবনের প্রয়াস এবং যাকে আমরা বলতে পারি শরৎ-ঐতিহ্য (যদি এ-ধরনের কোনো ব্যাপার আমাদের সাহিত্যে আদৌ থেকে থাকে), তার সচেতন অনুসরণের আন্তর-আকাঙ্ক্ষা সহজেই লক্ষ্য করা যায় ; এমন কি এ-কথাও বোধ হয় বলা যেতে পারে যে এঁরা কোনো-কোনো বিচারে মূলতঃ শরৎচন্দ্রেরই সহযাত্রী, সহধর্মী ও সহমর্মী। শরৎচন্দ্রের প্রদর্শিত পথেই এঁদের সাহিত্যিক পদক্ষেপ, শরৎচন্দ্রের চিন্তালব্ধ মতেই এঁদের শিল্পীমানসের দীক্ষা, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শেই এঁদের সৃষ্টিলোক উদ্ভাসিত। শুধু তা-ই নয় শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকে এঁরা শুধু অনুসরণই করেন নি, সে-ঐতিহ্যকে নিজ-নিজ চারিত্র্যমণ্ডিত সৃষ্টিসম্পদে সমৃদ্ধিশালীও করেছেন। আজ যদি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করি যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তন্ময় প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণে ও তার রূপসুন্দর মূর্তির আবরণ উন্মোচনে, তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায় সহজিয়া রচনাশৈলীতে ও সমাজের অন্তজ শ্রেণীর মর্মসত্য উদ্‌ঘাটনে কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিপুণ মনোবিশ্লেষণে ও গণসাহিত্যের বলিষ্ঠ দাবির উচ্চকিত উচ্চারণে, বাংলার এই তিন বন্দনীয় বন্দ্যোপাধ্যায়-সাহিত্যিক বাংলার অনিন্দনীয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরই সুযোগ্য উত্তরসাধক, তাহলে

কি খুব মারাত্মক কোনো অপরাধ হবে ? আমার তো ভুলেও তা মনে হয় না।

কিন্তু এ-কথা আমার খুবই মনে হয় যে আমাদের সাহিত্যের আরো পরবর্তী যুগ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে নির্মমভাবে উদাসীন থেকে চরম বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের সাহিত্যের আধুনিক যুগ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে পরোক্ষে উদাসীন মাত্র নয়, প্রত্যক্ষত উন্নাসিক। এ-যুগের বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে ঔৎসুক্যবশত ব্যক্তিগত আলাপের মাধ্যমে জেনেছি যে এঁদের অনেকে শরৎ-চন্দ্রের সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত নন, শরৎচন্দ্রকে এঁরা আগা-গোড়া পড়েন নি, পড়েন না, পড়তে চান না। আমি জানি, আমার এই নির্মম উক্তির প্রতিক্রিয়া হিসেবে এঁদের অনেকের কণ্ঠেই এঁদের শরৎ-বিরোধিতার নিষ্ফল শ্লোগানগুলোই পুনরুচ্চারিত হবে। আমি জানি, সম্ভবত সমস্বরে এঁরা বলে উঠবেন : শরৎচন্দ্র 'ইমোশন্যাল' 'সেন্টিমেন্টাল' 'অ্যান্টিইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল' ইত্যাদি ইত্যাদি ; এঁরা হয়তো বোঝাতে চাইবেন যে শরৎচন্দ্র মাত্রাতিরিক্ত ভাবালু, নিছক ভাবাবেগের তরঙ্গে-তরঙ্গেই তাঁর নায়ক-নায়িকারা হিল্লোলিত ; এঁরা হয়তো জানাতে চাইবেন যে শরৎচন্দ্রের শিল্পী-মেজাজ অবিন্যস্ত এবং তারই ফলে তাঁর সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধ প্রায়শই বিপর্যস্ত। কিন্তু এঁদের আমি কী করে জানাবো যে জগৎ ও জীবনের প্রতি শরৎচন্দ্রের জাত আর্টিস্ট-সুলভ যে নির্লিপ্ত ও নিরাসক্তি, তা-ই তাঁর মেজাজে এনেছে কিছুটা স্বাভাবিক অস্বাভাবিকতা, কিঞ্চিৎ অ-সুসংবদ্ধতা ; কাজেই লেখক হিসেবে কোনোক্রমেই এটা তাঁর বিফলতা নয়, এটা তাঁর বিশুদ্ধতারই নজীর। আর মানুষের চিন্তাব জগতে নিত্য বিবর্তনের যে-লীলা অব্যাহত রয়েছে, সে লীলাকে যদি আমরা স্বীকার করি, তাহলে এটাই তো প্রত্যাশিত যে মানবিক মূল্যবোধগুলো স্থাণুর মতো একই কেন্দ্রে স্থির হয়ে থাকবে না, সেগুলোও আবর্তিত হবে, বিবর্তিত হবে, রূপান্তরিত হবে। শরৎচন্দ্রের হাতে মানবিক কোনো মূল্যবোধই এতোটুকু বিপর্যস্ত হয়নি, হয়েছে পুনর্বিন্যস্ত, এই মাত্র বলা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের ভাবাবেগ, তাঁর ভাবালুতা, তাঁর উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, তাঁর স্বভাবের আত্মবৈপরীত্য —এ-সমস্তই যে বাঙালিসমাজের জীবনশিল্পী সেই সমাজের প্রতিটি মানুষেরই অস্থি-মজ্জা-মাংসে সঞ্চারিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রবাহিত জীবনসত্য, একথা এ-যুগের শরৎ-অনীহদের আমি কী করে বোঝাবো ; কী করে বলে উঠবো তাঁদের উদ্দেশে, যাঁরা ফতোয়া জারী করেছেন যে শরৎচন্দ্র 'অ্যান্টিইনটেলেকচুয়্যাল', আমার প্রাণের কথা যে সাহিত্যজীবনের অন্তিমপর্বে বুদ্ধি-নির্ভর যে-সামান্য রচনা তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, সেগুলো সম্পূর্ণ সম্মোহক না হলেও, অতি আধুনিক, ধমনীতে নীলরক্ত-প্রবাহিত, বাঙালি সাহিত্যিকদের রচনায়

বুদ্ধিবৃত্তির অবমাননার নিদর্শনসদৃশ শুধুমাত্র 'ইন্‌টেলেকচুয়্যাল পোজ' হয়ে থাকেনি, ঘনিষ্ঠ প্রতীতি অর্জন করেছে। তা না হলে তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' কেন আজো আমাদের জীবনের অনুত্তরিত প্রথম প্রশ্ন হয়ে আমাদের মনে অনুরণিত হয়ে ওঠে? তা ছাড়া অত্যাধুনিক শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে বহু-উচ্চারিত অথচ নিতান্ত অনুপলব্ধ 'স্ট্রীম অব্ কন্‌সাস্‌নেস্' নামক যে-জীবনদর্শনকে আশ্রয় করে আবেগের মুণ্ডপাত হচ্ছে, তা যদি সাহিত্যের উপাস্য হতে পারে, তাহলে 'স্ট্রীম অব্ ইমোশান্'-এর হৃদয়-অনুভূত জীবনসত্য কেন সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারবে না, তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। আমি তাঁদের শুধু এ-প্রশ্নই করতে চাই যে বিশ্বসাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর যতো গ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচিত হয়েছে, তার কয়টি মস্তিষ্কবিবরবাসী বুদ্ধিরূপী শয়তানের পরামর্শে আর কয়টি হৃদয়মন্দিরনিবাসী আবেগ-দেবতার আশীর্বাদে রচিত হয়েছে, সে কথা কি তাঁরা একবারও ভেবে দেখেছেন? সম্ভবত তাঁরা একবারও এ-কথা ভেবে দেখেন নি। তাহলে তাঁরা শরৎচন্দ্রকে এভাবে অবহেলার শীতে উপেক্ষিত করার আগে অন্তত একবারও হয়তো দ্বিধান্বিত হতেন, বিকম্পিত হতেন। আসলে, আমার বিবেচনায়, সাম্প্রতিক শরৎ-উপেক্ষার সমস্ত ব্যাপারটাই আমাদের আত্মঘাতী পিতৃবৈরিতারই উদাহরণমাত্র, পূর্বসূরীদের প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করার, যোগ্য মর্যাদা থেকে চ্যুত করার, মূঢ় প্রয়াসের বলম্বিত ঐতিহ্যেরই মূঢ়ের অনুসরণের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত, এ ছাড়া অন্য কিছু নয়— অন্য কিছুই নয়॥

শরৎচন্দ্রের ত্রয়ী

ড. সুশীলকুমার গুপ্ত

॥ এক ॥

বাঙলা-উপন্যাস-সাহিত্যের প্রকৃত জন্ম বঙ্কিমচন্দ্রের-হাতে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম সার্থক পদচাবণ ঘটলেও সামাজিক উপন্যাসেও তাঁর কৃতিত্ব সুবিদিত। মানব-জীবনের যে প্রধান ও গভীরতম অনুভূতি প্রেম, তার অকুণ্ঠ প্রকাশ কোনো কোনো জায়গাতে তাঁব ধর্মসংস্কারক মনেব কাছে উপেক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই প্রেম মানব-জীবনের গভীরতম রহস্য সন্ধানে এক অপূর্ব কবিত্বময় পথে পরিক্রমা করেছে। প্রেমের বৈধ এবং অবৈধ প্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সনাতন আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রেমের বিচরণ ও প্রকাশ তাঁর সূক্ষ্ম ও কবিত্বময় অনুভূতির আলোতে এক নূতন তাৎপর্য ও মূল্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। এরপর শরৎচন্দ্রই প্রেম ও তার বিচিত্র প্রকাশকে যথার্থ সামাজিক পটভূমিকায সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র বা ববীন্দ্রনাথের মতো কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি প্রেমের বিশ্লেষণ ও তাব রহস্যময় প্রকাশকে আশ্চর্যভাবে ব্যক্ত করেছেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ ; দ্বিতীয় পর্ব সেপ্টেম্বর ১৯১৮, তৃতীয় পর্ব এপ্রিল ১৯২৭ ও চতুর্থ পর্ব মার্চ ১৯৩৩), 'চরিত্রহীন' (নভেম্বর ১৯১৭) ও 'গৃহদাহ' (মার্চ ১৯২০) তাঁব প্রেম-ধারণা তথা উপন্যাসের মূল সৃষ্টিশক্তির সবচেয়ে বিশিষ্ট পরিচয় বহন করে। এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যেই শরৎ-প্রতিভার মূল ও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্ময়করভাবে উপস্থিত। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলির মধ্যে পুরাতন ভাব-ধারার কম-বেশী উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বৈধ প্রেমের প্রকাশ স্বাভাবিক-ভাবেই সাধারণতঃ বৈচিত্র্যহীন, কেন না তার মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাত ও ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ার তরঙ্গ মনকে তেমন করে আন্দোলিত করে না। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক অনা-য়াসেই লোকমনের সমর্থন পান বলে তা তাঁর সৃষ্টিশক্তির সামনে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জটিল ক্ষেত্র রচনা করে না। নিষিদ্ধ অসামাজিক প্রেমের যে প্রকাশ

বঙ্কিমচন্দ্রে শুরু এবং রবীন্দ্রনাথে অনুবর্তিত তারই এক সুষ্ঠু ও বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে। অবৈধ প্রেমের নূতন মূল্যায়নই শরৎ-উপন্যাসের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যে সবচেয়ে বেশী চিহ্নিত তাঁর উপন্যাস-ত্রয়ী—'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ'। এই ত্রয়ীর পূর্ব সংযোগ-সূত্র খুঁজতে হলে আমাদের বিশেষভাবে যেতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস ও 'নষ্টনীড়' গল্পটিতে।

॥ দুই ॥

এই ত্রয়ীতে শরৎচন্দ্রের প্রেমচিন্তা প্রধানতঃ নারীচরিত্রের আশ্রয়েই প্রকাশিত হয়েছে। এর একটি বিশেষ কারণ এই যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রতিপালিত শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন যে বাঙালী সমাজে প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর প্রাধান্যই বেশী এবং নারীর প্রভাবেই প্রেম বিচিত্র গতি ও প্রকৃতি লাভ করে। শরৎচন্দ্র এই তিনটি উপন্যাসেই প্রেমের প্রধানতঃ অবৈধ ও অসামাজিক রূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। অবৈধ প্রেমের প্রকাশের ক্ষেত্রে এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে এক আশ্চর্য মিল দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে 'শ্রীকান্ত'ব রাজলক্ষ্মী, অভয়া ও কমললতা, 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী ও কিরণময়ী এবং 'গৃহদাহে'র অচলা বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। এদের পাশাপাশি শরৎচন্দ্র বৈধ-প্রেমের অপূর্ব প্রকাশ দেখাবার জন্য 'শ্রীকান্ত'র অন্নদাদিদি, 'চরিত্রহীনে'ব সুরবালা ও সরোজিনী এবং 'গৃহদাহে'র মৃণালের চরিত্র উপস্থিত করেছেন।

অসামাজিক প্রেমের প্রকাশের প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মধ্যে রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী ও কিরণময়ী বিধবা। তবে কিরণময়ীর সঙ্গে রাজলক্ষ্মী ও সাবিত্রীর এক বিশেষ প্রভেদ আছে। কেননা কিরণময়ী বিবাহিত থাকা-কালীন স্বামীর সংসর্গে থেকেও অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছে। এর প্রধান কারণ সে স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত এবং তার শ্বশ্রূ অঘোরময়ীর হাতে যৎপরোনাস্তি নির্যাতিতা হয়েছে। তার পদস্খলনের কারণ দর্শাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "শ্বশ্রূ অঘোরময়ী তাহাকে কোনদিন আদর-যত্ন করেন নাই, বরং যতদূর সম্ভব নির্যাতন করিয়া আসিয়াছেন। স্বামীও তাহাকে একদিনের জন্য ভালোবাসেন নাই। তিনি দিনের বেলা স্কুলে শিক্ষা দিতেন, রাত্রে নিজে অধ্যয়ন করিতেন, বধূকে শিক্ষাদান করিতেন। বিদ্যার্জনের নেশা তাঁহাকে এমনই গ্রাস করিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে গুরুশিষ্যের কঠোর সম্বন্ধ ভিন্ন স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধের কিছুমাত্র অবকাশ ঘটে নাই। এমনি

করিয়াই এই নিরুপমা প্রখর বুদ্ধিশালিনী রমণী শৈশব অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণ যৌবনের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—এমনি করিয়াই সংসারের সৌন্দর্য মাধুর্য হইতে নির্বাসিতা, শুষ্ক কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এমনি স্নেহপ্রেমে বঞ্চিত হইয়াই যে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্মেও জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছিল।"

এই কিরণময়ী উপেন্দ্র ও সুরবালার দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য দেখে রুগ্ন স্বামী হারানের সেবায় নিজেকে ঢেলে দিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে স্বামী লোকান্তরিত হওয়ায় দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্যপ্রতিষ্ঠা থেকে সে বঞ্চিত হল। এরপর বিধবা কিরণময়ী উপেন্দ্রের মহৎ আচার-নিষ্ঠ ও দৃঢ় চরিত্রের কাছে হার স্বীকার করল। এর আগেই উপেন্দ্রের প্রথম সংস্পর্শে এসেই সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনঙ্গ ডাক্তারকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিল। কিরণময়ী জানত সে কোনদিনই উপেন্দ্রকে পাবে না, কিন্তু তবুও তাকে ভালোবাসা জানানোর মধ্যে তার প্রেম নিজের মুক্তি খুঁজতে চেয়েছে। কিরণময়ী উপেন্দ্রকে অকপটে বলেছে, "যাক, তোমাকে যে ভালোবাসি তা জানিয়ে দিয়ে আমি বাঁচলুম। এখন তোমার যা খুসি করো, আমার কিছুই বলবার নেই। কিন্তু মনে করো না ঠাকুরপো, আমি অন্ধ আশায় ভুলে একথা জানালুম। আমি তোমাকে চিনি, আমি জানি এ নিষ্ফল। একেবারে নিষ্ফল! রক্ষক হয়ে এসে যে তুমি ভক্ষক হতে পারবে না। কোনমতেই না, এ আমি জানি।" এর পর উপেন্দ্র তার পরম স্নেহের পাত্র দিবাকরের ভার কিরণময়ীর হাতে তুলে দিয়েছিল এবং বলেছিল, 'আমি যাকে ভালবাসি, তার অমঙ্গল আপনার দ্বারা কখনো হবে না এই তো আমার ভরসা—'। কিন্তু যখন সে দিবাকরের সঙ্গে কিরণময়ীর সম্পর্কের জটিলতা বুঝতে পারল তখন সে দিবাকরকে তখনই কিরণময়ীর কাছ থেকে নিয়ে যেতে চাইল। অপমানিতা কিরণময়ী তখন দিবাকরকে নিয়ে আরাকান যাত্রা করল। এর প্রধান কারণ উপেন্দ্রের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করা। কিন্তু সে কোনদিনই দিবাকরকে ভালোবাসতে পারেনি। কিরণময়ী স্পষ্টই বলেছে "...কিন্তু তোমার নয়, আর একজনের সর্বনাশ করেছি ভেবেই তোমার ক্ষতি করেছি।" এই একজন যে উপেন্দ্র সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। দিবাকর কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিরণময়ীকে ভালোবেসেছিল। তবুও কিরণময়ী দিবাকরের বাসনার কাছে কখনো আত্মসমর্পণ করেনি। সে যা করেছে তা শুধু প্রেমের নিছক ছলনা।

বিধবা কিরণময়ী উপেন্দ্রকে কতটা ভালোবাসত তা বিশেষভাবে জানত সতীশ। তাই উপেন্দ্রের কঠিন অসুখের সময় সে কিরণময়ীকেও দিবাকরের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এল। উপেন্দ্রের অসুখের সংবাদে কিরণময়ী মূর্চ্ছিতা

হয়ে পড়লে সে দিবাকরকে বলে উঠল, "ঠিক এই ভয়ই আমার ছিল দিবাকর। আমি জানতুম এ খবর উনি সইতে পারবেন না।" শেষ পর্যন্ত কিরণময়ীর মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিল। শরৎচন্দ্র সামাজিক ও বৈধ প্রেমকেই উচ্চস্থান দিয়ে তার জয় ঘোষণা করেছেন কিরণময়ীর করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে। অসামাজিক অসার্থক প্রেম কোনো সুনির্দিষ্ট পথ পায় না বলে শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডির সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে কিরণময়ীর বিষয়ে সাবিত্রীব কাছে উপেন্দ্রের উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সে বলেছে, "...আজ আমার বড় ব্যথার সঙ্গে কি মনে হচ্ছে জানিস্ দিদি,—মনে হচ্ছে সে সারাজীবন শুধু হাতড়েই বেড়িয়েছে, কিন্তু কোনদিন কিছু পায় নি। আমাকেও সে কখনো ভালবাসেনি। এতটুকু ভালবাসলে কি কেউ এত ব্যথা দিতে পারে?" এখানে সে দিবাকব প্রসঙ্গের প্রতি উল্লেখ করেছে। কিন্তু কিরণময়ী উপেন্দ্রকে পাবে না জেনেও যে ভালবেসেছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না এবং তার এই অচরিতার্থ ভালোবাসাই তাকে কক্ষভ্রষ্ট করেছে।

এই অসামাজিক প্রেমের রূপ নির্ণয় না করলে শরৎচন্দ্রের প্রেমধারণা বোঝা যাবে না। কিরণময়ী দিবাকরকে বলেছে, "আমি ভগবান মানিনে, আত্মা মানিনে, জন্মান্তর মানিনে, স্বর্গ নরক ওসব কিছুই মানিনে—ও সমস্তই আমার কাছে ভুয়ো, একেবারে মিথ্যে। মানি শুধু ইহকাল আব এই দেহটাকে। জীবনে কেবল একটা লোকের কাছে হার মেনেছিলুম—সে সুরবালা।" এখানে শরৎচন্দ্র প্রেমের একটি বিশেষ রূপের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। দেহ ও মনের পূর্ণ পাওয়ার মধ্যে প্রেমের বিশিষ্ট পরিতৃপ্তি ও সার্থকতা। শুধু দেহসর্বস্ব প্রেম কখনোই তৃপ্ত হতে পারে না, কেননা এর কামনা অপবিসীম। অপরদিকে দেহবিচ্যুত মানসিক প্রেম অপূর্ণ হলেও অনেক পরিমাণে পরিতৃপ্ত, কেননা সেখানে সীমাহীন বাসনার কোন বাধা নেই। এই জন্যে কিবণময়ী যেখানে আত্মঘাতী, অতৃপ্ত ও চঞ্চল, সাবিত্রী সেখানে প্রেমাস্পদেব সুখ ও সামাজিক মর্যাদার জন্যে আত্মত্যাগ করতে পারে। মানসিক প্রেম দৈহিক প্রেমের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী, আত্মস্থ ও পারপূর্ণ। সেইজন্যে সাবিত্রীর কাছে যা অসৎ, যা মিথ্যা, যা লেশমাত্রও কলঙ্কের বাষ্পে কলুষিত, তা বিষবৎ বর্জনীয়। সে দুঃখ স্বীকার করেও জীবনে বৃহৎ প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে। সাবিত্রী কঠোর শুদ্ধাচারিণী ও ঈশ্বরের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীলা। তাই সে সতীশকে বিয়ে করে সামাজিক বিক্ষোভ ও দুঃখ সৃষ্টি করার চেয়ে উপেন্দ্রের সেবার মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজেছে। সতীশের বিয়ের প্রস্তাবে সে অনায়াসে বলতে পেরেছে, "ছিঃ, এমন কথা কখনো ভ্রমেও মনে করো না।

আমি বিধবা, আমি কুলত্যাগিনী, আমি সমাজে লাঞ্ছিতা, আমাকে বিয়ে করার দুঃখ যে কত বড়, সে তুমি বোঝোনি বটে, কিন্তু যিনি আজন্ম শুদ্ধ, শোকের আগুন যাঁকে পুড়িয়ে হীরের মত নির্মল করেছে, তিনি বুঝেছেন বলেই এই হতভাগিনীকে আশ্রয় দিতে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন।" সাবিত্রী সমাজকে অস্বীকার করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। তার কাছে যে প্রেম সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয় তাকে মানসিক স্তরে প্রেমের স্মৃতিচর্চায় সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। অসামাজিক প্রেমকে জোর করে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তা অসাধ্য সাধনের তুল্য এবং তাতে কোন মঙ্গল বর্তায় না। সে সতীশকে বলেছে, "তুমি বলবে সত্য হোক মিথ্যা হোক আমি সমাজ চাইনে, তোমাকে চাই। কিন্তু আমি ত তা বলতে পারিনে। সমাজ আমাকে চায় না, আমাকে মানে না জানি, কিন্তু আমি ত সমাজ চাই, আমি ত তাকে মানি। আমি ত জানি শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না। কোন স্বামীরই ত সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তাঁর বজায় রাখেন। ওগো, এ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করো না।" প্রেমের এই সামাজিক দিকটির উপর এই গুরুত্ব ও প্রাধান্য আরোপ শরৎচন্দ্রের ভারতীয় ঐতিহ্যে পালিত মানসিকতার উত্তরাধিকারের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্রের প্রেম আপনাতে আপনি ফোটে না। তার একটা বাস্তব দিক আছে। মানসিক গুণ এবং সেই সঙ্গে দেহকে কেন্দ্র করেই প্রেম জন্মলাভ করে। দেহের সৌন্দর্য, স্পর্শ ইত্যাদি এই প্রেমের উন্মেষে সাহায্য করে। রুগ্ন প্রেমাস্পদের সেবা, আহার্য পরিবেশনে ক্ষুন্নিবৃত্তি ইত্যাদি শরৎচন্দ্রের প্রেমবিকাশের প্রায় অপরিহার্য সহায়ক। কিন্তু এই প্রেম অসামাজিক ও দেহের দিক দিয়ে অশুচি হলে তিনি পরিপূর্ণ মিলনে তার পরিসমাপ্তি ঘটান নি। দৈহিক শুচিতার প্রশ্নে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে বাধা রচনা করে প্রেমকে মালিন্যমুক্ত রাখতে চেয়েছেন। নারী তার প্রকৃত প্রেমাস্পদকে অশুচি দেহ দান করতে পারে না এবং ত্যাগের মধ্যেই জীবনের আনন্দ ও সার্থকতা খোঁজে। তাই সাবিত্রী সতীশের ভালোবাসার প্রশ্নে বলেছে, "ভালবাসি কিনা! নইলে কিসের জোরে তোমার ওপর আমার এত জোর? কিসের জন্যে আমার এত সুখ, আমার এত বড় দুঃখ? ওগো, তাই ত তোমাকে এত দুঃখ দিলুম, কিন্তু কিছুতে আমার এই দেহটা দিতে পারলুম না!" সে আরও বলেছে, "এই দেহটা আমার আজও নষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু তোমার পায়ে দেবার যোগ্যতাও এর নেই। এই দেহ দিয়ে যে আমি ইচ্ছে করে অনেকের মন ভুলিয়েছি, এ ত আমি কোনমতেই ভুলতে পারব না। এ দিয়ে আর যারই সেবা চলুক, তোমার পুজো হবে না।

আজ কি করে তোমাকে সে কথা বোঝাব। এত ভাল যদি না বাসতুম, হয়ত এমন করে তোমাকে আজ আমায় ছেড়ে যেতে হত না।" কিন্তু যে মনকে দিয়ে সে কাউকে ভোলাতে চায়নি তাকে নিঃশেষে সতীশকে অর্পণ করেছে। সতীশের কাছে তার উক্তি, "না, এ দিয়ে কোন দিন কাউকে ভোলাতে চাইনি— এ তোমারই। এখানে তুমিই চিরদিন প্রভু!" সে আরও বলেছে, "অন্তর্যামী জানেন, যতদিন বাঁচব, যেখানে যে ভাবেই থাকি, এ তোমার চিরদিন দাসীই থাকবে।"

রাজলক্ষ্মীও জীবনের প্রথমেই শ্রীকান্তকে মন সমর্পণ করেছিল। তাই রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠে শোনা যায়, "এ জন্মে এমন করে তোমাকে হয়তো পেতুম না, কিন্তু মনের মধ্যে তুমি চিরদিন এমন প্রভু হয়েই থাকতে। আর, তাই বা কেন ? আমাকে এড়াতে তুমি পারতে না, যেখানে হোক, যতদিনে হোক নিজে এসে আমাকে নিয়ে যেতে হতোই।"

সে অন্যত্র বলেছে, "কি বলব আমার হাত-পা বাঁধা নইলে এমন জব্দ করতুম যে জন্মে ভুলতে না ; কি সে থাকগে, আমি সে-যুগের মত তোমার দাসী হয়েই যেন থাকি, তোমার সেবাই যেন হয় আমার সবচেয়ে বড় কাজ কিন্তু তোমাকে আমার কথা ভাবতে আমি একটুও দেব না।" পতিতাজীবনের গ্লানি সম্বন্ধে সচেতন রাজলক্ষ্মীও শ্রীকান্তকে সত্যকার ভালোবাসত বলে দৈহিক মিলনে প্রেমের আস্বাদন করতে চায়নি। সে স্ত্রী হবার আকাঙ্ক্ষা না করে চিরকাল তার সেবা করে তার দাসী হয়ে থাকতে চেয়েছে। রাজলক্ষ্মী চেয়েছে শ্রীকান্তের প্রেম দিয়ে অতীত জীবনের গ্লানি প্রক্ষালন করতে। তাই তার প্রেমে স্বার্থ ও স্নেহ মেশানো ছিল। সে পুঁটুর সঙ্গে শ্রীকান্তের বিয়েতে মত দিতে পারেনি। অপর দিকে কিন্তু সাবিত্রী সতীশ ও সরোজিনীর বিয়েতে বাধা সৃষ্টি করে নি। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের প্রেমের আশ্রয়েই পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার একটা উত্তর খুঁজেছে। আচার-আচরণ সে পুরাতন আদর্শের অনুসরণ করেছে। প্রণয়ভাষণেও সে কুণ্ঠিত। শ্রীকান্তের কথায়, "আচার-আচরণে রাজলক্ষ্মী সে যুগের মানুষ। প্রণয় নিবেদনের আতিশয্য তো দূরের কথা 'ভালবাসি' এমন কথাও কখনো সম্মুখে উচ্চারণ করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না।" রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের কাছে তার ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনায় বলেছে "উপরের ঐ দক্ষিণের ঘরটা হবে তোমার পড়ার ঘর।···ওর একপাশে থাকবে আমার শোবার ঘর, অন্যপাশে হবে আমার ঠাকুরঘর। এ জন্মে রইলো আমার ত্রিভুবন—এর বাইরে যেন না কখনো দৃষ্টি যায়।" শ্রীকান্তের প্রেম আস্বাদনের জন্য সে আবার জন্মলাভ করতে আকাঙ্ক্ষা করেছে। এক কথায় রাজলক্ষ্মীর

প্রেম প্রণয়ীর সাহচর্য ও সেবার মধ্যে চরম সার্থকতা পেতে চেয়েছে। কিরণময়ী, সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মী এই তিনটি বিধবা নারীই রূপবতী, তবে কিরণময়ীর রূপের তুলনাই হয় না এবং বোধ হয় সেইজন্য তার দাহ সবচেয়ে বেশী।

'গৃহদাহে'র অচলা ও 'শ্রীকান্তে'র অভয়া বিবাহিত অবস্থাতেই অসামাজিক প্রেমের পথে পা বাড়িয়েছে। স্বামী মহিমের নির্লিপ্ত, অনুচ্ছ্বাসপ্রবণতা ও স্থৈর্য অচলাকে স্বামীর বন্ধু উচ্ছ্বাসপ্রবণ, প্রগল্‌ভ ও আবেগচঞ্চল সুরেশের দিকে ঠেলে দিয়েছে। প্রেম অর্থে তার কাছে দেহসম্ভোগ একটা বড় আকর্ষণ। তাই সে বিধবা মৃণালের বিয়ে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সে ব্রাহ্ম পিতার কন্যা এবং ছোঁয়াছুঁয়ি ঠাকুরদেবতা মানে না। সে কখনই ঠিক বুঝতে পারেনি সে প্রকৃতপক্ষে কাকে ভালবাসে। কেন না তার প্রেমের মধ্যে চিত্তবৃত্তির অস্থিরতা ও দৈহিক ভোগস্পৃহা প্রবল ছিল। তার হৃদয়ের দোলাচলবৃত্তিই তাকে বিপথে নিয়ে গিয়ে চরম ট্রাজেডি ঘটিয়েছে। সুরেশের মৃত্যুর পর অচলার অবৈধ প্রেমকে ক্ষমা করে শরৎচন্দ্র মৃণালের সহায়তায় তাকে আবার সংসারাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এর শুভাশুভ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত দেননি। মহিম তার পতিতা স্ত্রীকে বৈধ প্রেমের ক্ষেত্রে মানসিকতার দিক দিয়ে সত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে কিনা সে প্রশ্ন থেকে যাওয়া স্বাভাবিক।

অসামাজিক অথচ প্রকৃত প্রেমের পূর্ণ মর্যাদা স্থাপনের প্রবল প্রয়াস রয়েছে অভয়া চরিত্রে। স্বামীর লাম্পট্য ও নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির উপায়স্বরূপ সে রোহিণীকে স্বামিত্বে বরণ করে প্রকৃত বিদ্রোহিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে দেহ ও মনের মিলনেই সে শুধু প্রেমের সার্থকতা খোঁজেনি, অনাগত সন্তানের মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাতেও সে দৃঢ়সংকল্প। জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধ সংস্কারকে পদদলিত করে সে দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করেছে, "একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল,—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা ? এতবড় অন্যায়, এতবড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না ? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই ; সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই ? এক জন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী, বিনাদোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই ?"

অভয়ার মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন, অত্যাচারী ও লম্পট স্বামীর কাছে গণিকার মতো পড়ে থাকাতেই কি নারীর জীবন সার্থক

হয়ে ওঠে ? সে ক্ষেত্রে অপর দিকে প্রকৃত ভালবাসাকে উপেক্ষা করে কি সতী নাম কেনা উচিত ? সেই প্রশ্নের জবাব হিসাবে অভয়ার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে, "রোহিণীবাবুকে তো আপনি দেখে গেছেন ? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচরে নেই ? এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিয়ে আব আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু।"

শুধু নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই সে করবে না, সন্তানদেবও সামাজিকভাবে মর্যাদার আসনে বসাবে। সমাজ থেকে পালিযে না গিয়ে সমাজের বুকে প্রকৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় অভয়া আধুনিক মনোভাবের স্বাক্ষর রেখেছে। সে শ্রীকান্তের কাছে পবিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে ঘোষণা করেছে, "আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাবো না। সমস্ত অপযশ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়েই আমি চিরদিন আপনাদের হযেই থাকব। আমার একটি সন্তানকেও যদি কোন দিন মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পাবি, সেদিন আমাব সকল দুঃখ সার্থক হবে, এই আশা নিয়েই আমি বেঁচে থাকব। সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না তার জন্মের হিসাবটাই জগতে বড়, এ আমাকে যাচাই কবে দেখতে হবে।"

প্রকৃত প্রেম প্রতিষ্ঠায় বিদ্রোহিণী অভয়া শরৎসাহিত্যে অতুলনীয়া।

'শ্রীকান্তে'র কমললতা যৌবনের প্রাবম্ভেই দেহপ্রধান প্রেমের বিষময ফল ভোগ করেছিল বলেই প্রেমাস্পদেব সেবা ও সাহচর্যে প্রেমের মানসিক পরিতৃপ্তি খুঁজেছে। প্রেমের ম্যনসিক দিকটি তার মধ্যে বিশেযভাবে উঁচু ছিল বলেই সে প্রিয়তমের কাছ থেকে নিঃশেষে বিদায় নিয়ে ত্যাগেব স্মরণীয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সেই জন্যে ঈশ্ববে নির্ভবশীল হয়ে সে শ্রীকান্তকে বলতে পেরেছে, "আমি জানি, আমি তোমার কত আদবের। আজ বিশ্বাস কবে আমাকে তুমি তাঁব পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমাব জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ কবো না গোঁসাই, এই তোমাব কাছে আমার প্রার্থনা।"

সামাজিক প্রেমেব মহত্ত্ব ব্যাখ্যানের দিক দিয়ে 'চরিত্রহীনে'র সুরবালা ও 'গৃহদাহে'র মৃণাল বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। উভয়েই যুক্তিতর্করহিত স্বামিপ্রেমের আদর্শে বিশ্বাসী। ধর্মগতপ্রাণা সুরবালার কাছে স্বামীই সর্বস্ব। ভারতীয় সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী মৃণাল অচলাকে জানিয়েছে যে, মানুষ বিয়ে দেবার মালিক নয়। তার কাছে বিবাহ জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ এবং সেখানে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিছু যায় আসে না। সে জানে যে অত্যাজ্য সতীধর্ম জীবনে মরণে অদ্বিতীয় ও নিত্য। সে অচলাকে বলেছে, "বিয়ে জিনিষটি

তোমাদের কাছে শুধু একটা সামাজিক বিধান ; তাই তার সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার চলে, তার মতামত যুক্তিতর্কে বদলায় কিন্তু আমাদের কাছে এ ধর্ম। স্বামীকে আমরা ছেলেবেলা থেকে এইরূপেতেই গ্রহণ করে আসি। এ বস্তুটি যে ভাই বিচার-বিতর্কের বাইরে।"

সতীধর্মের সবচেযে বড় আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে অন্নদাদিদির চরিত্রে। বাইরের লোকের দৃষ্টিতে অন্নদা কুলত্যাগিনী এবং তার প্রেম অবৈধ। কিন্তু অন্নদা স্বামীর কাছে যাবার জন্যই পিতৃগৃহ ত্যাগ করেছে এবং তার পিতা তাঁর সন্তানঘাতী জামাতাকে ক্ষমা করবেন না বলে কখনও সে নিজের আত্মপরিচয় দিতে পারেনি। সারা জীবন তাকে কলঙ্কের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়েছে এবং স্বামীর জন্য সে ধর্ম ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেনি। স্বামী-সহবাসে থেকে সে সুকঠোর দারিদ্র্য ও নির্যাতনের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে। সেইজন্য শ্রীকান্ত অভয়াকে বলেছে, " · আমার জীবনে যে কটি নারী চরিত্র দেখতে পেয়েছি, সবাই তাঁবা দুঃখব ভেতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হয়ে আছেন। আমার অন্নদাদিদি যে তাঁর সমস্ত দুঃখের ভাব নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া জীবনে আর কিছুই করতে পারতেন না এ আমি শপথ করেই বলতে পারি। সে ভার অসহ্য হলেও যে কখনও আপনার পথে পা দিতে পারেন, একথা ভাবলেও হয়তো দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।"

॥ তিন ॥

ত্রয়ীর পুরুষ চরিত্রগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে শ্রীকান্তের সামাজিক প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ থাকলেও অসামাজিক প্রেমকেই নিজেব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু একটা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সুর তার প্রেমকে মানসিক দিক থেকে মুক্তি দিয়েছে। রাজলক্ষ্মী তাকে বলেছে, "আমি জানি মেয়েদের দিকে তোমার সত্যিকার আসক্তি এতটুকু নেই, যা আছে তা লোক-দেখানো শিষ্টাচার। সংসারে কোন কিছুতেই তোমার লোভ নেই, যথার্থ প্রয়োজনও নেই। তুমি 'না' বললে তোমাকে ফেরাবো কি দিয়ে ?" এর উত্তরে শ্রীকান্ত বলেছে, "পৃথিবীতে একটি জিনিষে আজও লোভ আছে—সে তুমি। কেবল ঐখানে 'না' বলতে বাধে। ওর বদলে দুনিয়ার সব কিছু যে ছাড়তে পারি, শ্রীকান্তের এই জানাটাই আজও তুমি জানতে পারোনি।" শ্রীকান্ত জানত যে রাজলক্ষ্মীর প্রেম তাকে আচ্ছন্ন করে আছে এবং তার সেবা ও স্নেহের বন্ধন থেকে সে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত সে রাজলক্ষ্মীর প্রেমের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে তার সাহচর্য ও সেবাযত্নের মধ্যেই

সার্থকতার সন্ধান করেছে। চরিত্রহীনের উপেন্দ্র তার পত্নী সুরবালার দাম্পত্য প্রেমে পরিপূর্ণ এবং এর জন্যই যে কিরণময়ীর মতো অসামান্যা রূপবতী রমণীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে। সে অপমানিতা কিরণময়ীকে দর্পভরে বলেছে, "বৌঠান, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আজও আমার সুরবালা বেঁচে আছে। উপেন্দ্রব প্রভাব ছিল বলেই সাবিত্রী শেষ পর্যন্ত সতীশ সরোজিনীব বিয়েতে কোন প্রতিবন্ধক হয়নি এবং সতীশও সামাজিক প্রেমকে স্বীকার করে তার কাছে ধরা দিয়েছে।

'চরিত্রহীনে'র সতীশ সাবিত্রীর প্রভাবেই তার প্রেমকে মানসিক স্তরে মুক্তি দিতে পেরেছে। অবশ্য এব পেছনে উপেন্দ্রের প্রভাব বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু 'গৃহদাহে'ব সুরেশের পেছনে তেমন কোন প্রভাব না থাকায় সহজেই তার পদস্খলন ঘটেছে। তাছাড়া সতীশ যেখানে ধর্মেব বন্ধনে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত, সুরেশ তার নাস্তিকতাব জন্যে অল্পেই উত্তেজনাপ্রবণ ও অসংযত। উভয়েই বিত্তশালী, অপূর্ব দৈহিক শক্তির অধিকারী ও পরোপকাবী। দুজনেই ডাক্তাবি পড়েছে, তবে সতীশ ডাক্তারি পাশ করেনি। উভয়েই বন্ধুবৎসল, আবেগপ্রবণ ও অন্তরে দুর্বল। কিন্তু সুরেশের প্রকৃতি সতীশের তুলনায় আরও অস্থির, উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগাসক্ত বলে সে অবৈধ প্রেমের স্রোতে অবাধে ভেসে গেছে। তাব পবোপকাবপ্রবৃত্তিও অন্ধ ও কাণ্ডজ্ঞানরহিত।

সুরেশ প্রেমের ক্ষেত্রে মনেব স্বতন্ত্র স্থান মানত না বলে তাব কাছে দেহ-কেন্দ্রিক প্রেম শেষপর্যন্ত একটি ঝঞ্ঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং একমাত্র মৃত্যুতেই সে তা থেকে মুক্তি পেয়েছে। সুরেশ বিশ্বাস করত "মানুষের মন বলে স্বতন্ত্র কোন একটা বস্তু নেই। যা আছে সে এই দেহটারই ধর্ম। ভালোবাসাও তাই।" দেহসর্বস্ব প্রেম যে অসার্থক, আত্মঘাতী ও ভঙ্গুর, একথা সুরেশের ট্রাজেডির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অচলাকে সুরেশ বলেছে, "তখন ভাবতুম কি করে তোমাকে পাবো, এখন অহর্নিশ চিন্তা করি, কি উপায়ে তোমাকে মুক্তি দেব। তোমার ভাব যেন আমি আর বইতে পারিনে।" অন্যত্র তার উক্তি, "মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা এমন অসহ্য ভারী এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

অসামাজিক কিন্তু মানসিক প্রেমের এক সুন্দর উদাহরণ কমললতার প্রতি গহরের প্রেম। কমললতা অসুস্থ গহরের সেবা করার জন্যে মঠ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

॥ চার ॥

'ত্রয়ীর' মধ্যে আরও অনেকগুলি চরিত্রের মিল দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। 'চরিত্রহীনে'র বেহারী যেমন সাবিত্রী ও সতীশের যোগসূত্র হিসাবে

কাজ করেছে, তেমনি 'শ্রীকান্তে'র রতন অনেক ক্ষেত্রে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের সংযোগসাধন করেছে। শ্রীকান্তের গোঁড়া ঠাকুর্দা আরো বিস্তৃতভাবে 'গৃহদাহে'র রামবাবুর মধ্যে উপস্থিত। 'চরিত্রহীনে'র মধ্যে আরাকানগামী জাহাজে কামিনী বাড়িউলী ও বাড়িআলাকে পাওয়া যাবে প্রায় একই অবস্থায় রেঙ্গুনগামী জাহাজে টগর বোষ্টমী ও নন্দমিস্ত্রীর মধ্যে। 'শ্রীকান্তে' আরার রামবাবু আর 'গৃহদাহে'ও ডিহরীর রামবাবু।

ঘটনা ও পরিবেশ রচনার দিক দিয়েও এই তিনটি উপন্যাসের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। তিনটি উপন্যাসেই অসুস্থ প্রেমাস্পদের সেবার মধ্যে নর-নারীর প্রেম বিকাশ লাভের সুযোগ পেয়েছে। শ্রীকান্ত তার সন্ন্যাসী অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছে। তার পাশেই সতীশের তান্ত্রিক আচারের সময় সে অসুস্থ হলে বেহাবী সাবিত্রীকে এনে উপস্থিত করেছে। 'চরিত্রহীনে' আরাকানগামী জাহাজে প্রেমের কারণে দেশ থেকে পলাতক কিরণময়ী ও দিবাকর আর 'শ্রীকান্তে' রেঙ্গুনগামী জাহাজে অভয়া ও রোহিণী। ঝড়বৃষ্টিপূর্ণ দুর্যোগের পটভূমিকাকে মানসিক স্খলনের ব্যাপারে শরৎচন্দ্র বিশেষ ভাবে ব্যবহাব করেছেন। আরাকানগামী জাহাজের মতো রেঙ্গুনগামী জাহাজও ঝড়ের কবলে পড়েছে। ঝড়বৃষ্টির রাত্রিতেই অচলাকে সুরেশ মহিমের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে এবং আর-এক ঝড়বৃষ্টির রাত্রিতেই অচলা সুরেশের শয্যায় গিয়ে তার সতীত্বকে হত্যা করেছে। পরিবেশের দিক দিয়েও উপন্যাস তিনটিতে ঐক্য বর্তমান। শ্রীকান্তের গ্রামের পবিবেশ মহিমের গ্রামের অবস্থাকে মনে করিয়ে দেয়। 'শ্রীকান্তে' বসন্ত মহামারীর মধ্যে অসুস্থ শ্রীকান্তের পাশে রাজলক্ষ্মী, 'গৃহদাহে' প্লেগ মহামারীর মধ্যে রোগগ্রস্ত সুরেশের পাশে অচলা। অচলার স্বামীর ঘরের দরিদ্র ও ম্লান পরিবেশের সঙ্গে কিরণময়ীর স্বামীর ঘরের অন্ধকার ও নিরানন্দ পরিবেশ তুলনীয়।

এই ত্রয়ীতে অনেক জায়গায় কথাবার্তা ও বর্ণনায় ভাষা ও অলংকারের সাদৃশ্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রাজলক্ষ্মীর কথাবার্তা কখনো কখনো সাবিত্রীর উক্তির মধ্যে প্রতিধ্বনিত। সতীশ ও শেষের দিকে দিবাকরের কথার রেশ সুরেশের ভাষণে শুনতে ভুল হবার কথা নয়। কিরণময়ী কি ভাবে দিবাকরকে ঘরের বার করেছিল তার বর্ণনায় লেখা হয়েছে, "কাঁচপোকা যেমন করিয়া তেলাপোকাকে টানিয়া আনে, তেমনি করিয়া দুর্নিবার যাদুমন্ত্রে কিরণময়ী অর্ধ-সচেতন, বিমূঢ়চিত্ত হতভাগ্য দিবাকরকে জাহাজঘাটে টানিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল এবং টিকিট কিনিয়া আরাকানযাত্রী জাহাজে চড়িয়া বসিল।" আর শ্রীকান্ত তার উপর রাজলক্ষ্মীর প্রভাবের উল্লেখ করে তাকে

বলেছে, "তখন বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকা ধরে নিয়ে যায় তেমনি নিয়ে যেতে।"

এই তিনটি উপন্যাসে কয়েকটি মূল প্রশ্ন একই ভাবে ঘুরেফিরে এসেছে। দৈহিক রূপগুণ দিয়ে মন ভোলালেও মনের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারে এমন নারী কি সতীত্বের অধিকারিণী ? এই প্রশ্ন জেগেছে রাজলক্ষ্মী ও সাবিত্রীকে কেন্দ্র করে। হিন্দু বিবাহবিধি ও স্বামীর নির্যাতন কি কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর পদস্খলনেব জন্যে দায়ী নয় ? এ প্রশ্ন এসেছে রাজলক্ষ্মী, অভয়া প্রমুখের মধ্য দিয়ে। প্রেমের ক্ষেত্রে দেহ বড় না মন বড় ? এ প্রশ্ন উঠেছে শ্রীকান্ত, মহিম, সুরেশ, সতীশ প্রভৃতিকে নিয়ে।

॥ পাঁচ ॥

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের একই পরিকল্পনার অন্তর্গত এবং প্রেমের গতি ও প্রকৃতির বিশ্লেষণে একে অপরের পরিপূরক। বক্তব্য, ব্যাখ্যা ও রীতির দিক দিয়ে এই তিনটি উপন্যাসই শরৎসাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের অধিকারী। এই তিনটি উপন্যাসকে ত্রয়ী বলে উল্লেখ করে এদের কেন্দ্রগত ঐক্যকেই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। এই ত্রয়ীর প্রভাবই পরবর্তী বাঙলা উপন্যাস-সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে এবং সেইজন্যে এদের গুরুত্ব, উৎকর্ষ ও স্মরণীয়তা অনস্বীকার্য।

শরৎচন্দ্র ও দেবানন্দপুর

দীনবন্ধু ঘোষ

দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী।

বাংলার বরেণ্য কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র একদিন যে গ্রামের বন্দনা গেয়েছেন সেই দেবানন্দপুর হুগলী জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত একটি ছোটগ্রাম। বাংলার বাণিজ্যিক জগতে সপ্তগ্রামের যখন দপদপা, সরস্বতী নদী দিয়ে যখন বড় বড় বাণিজ্যপোতের আসা-যাওয়া, তখন এই সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত দেবানন্দপুরেরও সুদিন। বিদ্যায়-বিত্তে-স্বাস্থ্যে সমৃদ্ধ, জনকোলাহলে ও আনন্দ-উৎসবে নিত্য মুখরিত সেদিনের সে দেবানন্দপুর।

একদা জনৈক কামদেব দত্ত অন্যস্থান থেকে দেবানন্দপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পুত্র কল্যাণপ্রসাদ দত্ত দিল্লীর নবাব সরকারের উচ্চপদে নিযুক্ত ও 'মুন্সী' পদবীতে ভূষিত হন। তাঁর পুত্র রামরাম দত্তমুন্সীও নিজ পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানে দেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন এবং দিল্লীর দরবারে তাঁর সুনাম ও প্রতিপত্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর অর্থানুকূল্যে ও ইচ্ছায় দেবানন্দপুর গ্রামে আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার একটি মূলকেন্দ্র স্থাপিত হয়। সেই দিনগুলিতেই দেবানন্দপুর গ্রাম তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত করে।

ভাগ্যহত এক কিশোর একদিন এই দত্তমুন্সী পরিবারে আশ্রয় লাভ করে এবং সেকালের প্রথা অনুসারে পারসী ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। কাব্য-লক্ষ্মীর অদৃশ্য নির্দেশে একদা গৃহদেবতার নিত্যপূজারীর অনুপস্থিতিতে এই কিশোর দত্তমুন্সী-গৃহে সত্যনারায়ণ পূজায় স্বরচিত পাঁচালি পাঠ করে গুণগ্রাহী গৃহস্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। সেদিনের সেই অঙ্কুর ভাবীকালে 'রায় গুণাকর' রূপে কাব্যভারতীর অঙ্গনে বনস্পতির মর্যাদা লাভ করে।

তার পর কালের অমোঘ প্রভাবে একে একে বিত্ত গেল, বিদ্যাচর্চা গেল, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে স্বাস্থ্য গেল। ধনী সম্পন্ন গৃহস্থগুলি গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। গ্রামের সকল বৈভব, মর্যাদা, সুনাম, প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যেতে

লাগলো। সংস্কারহীন জীর্ণ অট্টালিকা, কচুরিপানায় ভর্তি জলাশয়, শস্যহীন কৃষিক্ষেত্র নিয়ে স্বাস্থ্যহীন হতোদ্যম শীর্ণ মানুষগুলি বন্য জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে দিনাতিপাত করতে লাগলো।

এমন এক সময়ে গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায় ২৪ পরগনার হালিশহর এলাকা থেকে এক সদ্যবিধবা ব্রাহ্মণকন্যা তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে পিতৃগৃহে স্থায়িভাবে বসবাস করতে এলেন। এই শিশুটিব নাম মতিলাল,—মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।

মতিলাল মাতুলালয় দেবানন্দপুর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারেই তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করেন। তিনি অস্থিতচিত্ত, পরিশ্রমবিমুখ ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। অভাবে-অনটনে নিত্য জর্জর কিন্তু বংশমর্যাদা ও কৌলীন্যে গৌরবান্বিত। মতিলালের সঙ্গে হালিশহবের বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ কেদাবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ভুবনমোহিনী দেবীব বিবাহ হয। কেদারনাথের অর্থানুকূল্যেই মতিলাল এফ. এ. পড়েছিলেন।

১২৮৩ সালের ৩১এ ভাদ্র জীর্ণ এক খড়েব ঘরে মতিলালের দ্বিতীয় সন্তান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মলগ্নে ভাবতের সাহিত্যাকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে। সেদিন অভাবী সংসারে সীমিত আনন্দ-উৎসবে হয়তো প্রতিবেশী গ্রামবাসীর অংশ গ্রহণেব তেমন অবকাশ ছিল না, কিন্তু সেই শিশুই একদিন আপন সৃষ্টিমহিমায় সারা দেশের মানুষকে সাহিত্যের অমৃতধারায় অবগাহনের আনন্দ দান করে।

রোগভোগে মাথার চুল-ওঠা শীর্ণ বালক 'ন্যাড়া' পিতামহীর আদরে প্রশ্রয়ে ও মাতার স্নেহশাসনে দিনে দিনে দুরন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগলে পিতা মতিলাল একদিন বিদ্যাসাগবের প্রথমভাগ হাতে শরৎচন্দ্রকে প্রতিবেশী প্যারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়ে এলেন। বাড়ির খড়ের ঘরের দাওয়ায় পণ্ডিতমশাইএর পাঠশালার শান্ত পরিবেশে হঠাৎ যেন প্রাণের জোয়ার এলো। ন্যাড়ার দুরন্তপনার নিত্য নতুন কৌশল আবিষ্কারের অত্যাচারে পণ্ডিতমশাই অতিষ্ঠ ও ছাত্র-ছাত্রীরা পুলকিত হয়ে উঠতে লাগলো। ছাত্র শরৎচন্দ্র পড়াশুনায় মেধাবী তবে বড় অমনোযোগী। পড়াশুনা অপেক্ষা দুরন্তপনায় তার আগ্রহ বেশী। পণ্ডিত মশাই-এর পুত্র কাশীনাথ ও একটি সহপাঠিনী তার এই কাজে সঙ্গী ও উৎসাহদাতা। পণ্ডিত মশাই-এর কল্‌কেয় তামাক খাওয়া, বয়স্ক ছাত্রদের অপ্রস্তুত করা প্রভৃতি কাজগুলি এমন কৌশলে সম্পন্ন হতো যাতে তাদের ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। ফলে দিনে দিনে তার অত্যাচার চরমে উঠে গেলো! নিরুপায় পণ্ডিতমশাই ছাত্রটির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তার পিতামাতার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন। বালক

শরৎচন্দ্র তখন পাঠশালা না গিয়ে মনের আনন্দে নদীর ধারে ফড়িং আর পাখির বাচ্চা ধরে বেড়াচ্ছে।

মতিলাল তখন গ্রামের সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যর ছাত্রবৃত্তি স্কুলে শরৎচন্দ্রকে ভর্তি করে দিলেন। বয়স তখন তাঁর বোধ করি দশ বছর। দেবানন্দপুর গ্রামের সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়লাল দাস, সতীশ ভট্টাচার্য, বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, কালীসাধন দত্তমুন্সী, সদানন্দ দত্তমুন্সী প্রভৃতি তাঁর এই সময়ের কেউ সহপাঠী, কেউ শুধু বন্ধু।

ইতিমধ্যে মতিলালের সংসারে আরও অনেকগুলি পুত্র-কন্যা এসে যুগপৎ সংসারের আনন্দ ও অভাব বৃদ্ধি করেছে। মতিলাল গানবাজনা, সাহিত্যসাধনা অভিনয়ে যতটা তৎপর সংসারের উন্নতিবিধানে ততটা নন। ফলে অচল সংসারে অশান্তির উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাধ্য হয়ে একদিন মতিলাল চাকুরির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন এবং বাইরে চাকুরি করে বেশ কিছু অর্থ উপার্জনে সমর্থ হ'ন। এই সময়ে মতিলালের মাতুলদের সাহায্যে তাঁদেরই ভিটা সংলগ্ন ৬ শতক জমির উপরে বারান্দা রোয়াক সহ দুখানি পাকা দক্ষিণদ্বারী ঘর তৈরি করেন।

শরৎচন্দ্র তখন মোহন মুন্সীর দালানে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের ছাত্র-বৃত্তি স্কুলে বোধোদয় আর পদ্যপাঠ মুখস্থ করেন আর অবসর সময়ে একদল সঙ্গী-সাথী নিয়ে নদীতে নৌকা চড়া, পরের বাগানের ফলমূল সংগ্রহ করে দত্ত মুন্সীদের 'হেদুয়া' পুকুরের পাড়ে গড়ের জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে তা ভোগ করা, তামাক সেবন, ছিপ ফেলা, বাঁশি বাজানো, যাত্রা শোনা প্রভৃতি কাজ করে বেড়ান।

দেবানন্দপুরের অনেকেই এই দুরন্ত বালকের চপলতার অত্যাচারে বিরক্ত হলেও হৃদয়ের উদারতা, মানবপ্রীতি, সৎসাহস প্রভৃতি মানবিক গুণের জন্য কিছু কিছু পরিবারে তাঁর জন্য স্নেহভালবাসার প্রশ্রয় ছিল। সেকালে গ্রামের জমিদার নবগোপাল দত্তমুন্সীর গৃহে শরৎচন্দ্রের অনায়াস যাতায়াত ছিল। নবগোপাল বাবুর পুত্র অতুলচন্দ্র দত্তমুন্সী শরৎচন্দ্রকে খুব স্নেহ করতেন। কলকাতায় এম. এ. ও আইন পাঠকালে তিনি শরৎচন্দ্রকে বিদেশী সাহিত্যের গল্প বলতেন, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে যাত্রা-থিয়েটার দেখাতেন, মুখে মুখে বলা গল্প ও যাত্রা-থিয়েটারের গল্প নতুন করে শুনতে চাইতেন। অতুলচন্দ্রের পরিবারের মহিলারাও শরৎচন্দ্রকে আপন জনের মত গ্রহণ করেছিলেন। মাসের মধ্যে অনেকদিনই তাঁর স্নান আহার রাত্রিবাস এই গৃহেই হতো। অতুলচন্দ্রের বিধবা ভগ্নি নবনলিনী মিত্র শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

সংসারের অভাব-অনটনে ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ভুবনমোহিনীর

স্বাস্থ্য দিনে দিনে ভেঙে পড়তে থাকায় মতিলাল বাধ্য হয়ে দেবানন্দপুরের বাড়িতে তালা লাগিয়ে সপরিবারে শ্বশুরবাড়ি ভাগলপুরে গিয়ে পুনরায় চাকুরিতে যোগ দেন। শরৎচন্দ্র প্রথমে ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্তি হন এবং এক বছর পড়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংরাজী স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। এখানে বছর দুই থাকার পর মতিলাল আবার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে দেবানন্দপুরে ফিরে আসেন। পড়াশুনা ছেড়ে শরৎচন্দ্র সহ তাঁর অন্য ছেলেমেয়েরা এবং স্ত্রী ভুবনমোহিনীও তাঁর অনুগামী হন।

এবার গ্রামে এসে শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে অর্থাৎ এ-কালের ক্লাস সেভেন-এ ভর্তি হলেন। জুলাই মাস, ইংরেজি ১৮৮৯ সাল। দেবানন্দপুর থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে হুগলী শহরে গঙ্গাব ধারে অবস্থিত এই ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়ার সুযোগ শরৎচন্দ্রেব কাছে ঈশ্বরেব আশীর্বাদ বলে মনে হলো। গ্রামের ক্ষুদ্রগণ্ডির বন্দীদশা থেকে মুক্ত বিহঙ্গের সামনে যেন সীমাহীন আকাশে অবাধ বিচরণের সুযোগ এসে গেল। দীর্ঘ পথের ধারের আমকাঁঠালেব গাছ, দরিদ্র মানুষ, পশুপক্ষী, গাড়িঘোড়া ; গঙ্গার বুকে ভাসমান নৌকা—সবই তাঁব গহন মনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। গ্রামের শেষ প্রান্তে মুড়া অশ্বত্থতলায় অন্য গ্রাম থেকে আগত বিদ্যালয়গামী সঙ্গীদের নিয়ে দত্তমুন্সীদেব গলায দড়ের বাগানের পাশ দিয়ে সেকালেব কাঁচারাস্তার ধুলোকাদা ভেঙে নিত্য হুগলীর স্কুলে যাওয়াতে কোন অবহেলা নেই। মুক্তির আনন্দ ও নতুনের লোভে পথ হাঁটার কষ্ট, ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই যেন গায়ে লাগে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়া-শুনাতেও বুঝি মনোযোগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে বছরে বছরে এক-একটি ক্লাসের পড়া অনায়াসে শেষ হতে লাগলো।

কিন্তু তাঁর সেই অশান্ত মন ! তার খেলা কি শেষ হযে গেছে ? না, শুধু তা বুঝি অন্য ধারা নিয়েছে। আর্ত মানুষের সেবা, দুঃস্থদেব সাহায্য, নদীর ধারে সঙ্গিনীদের নিয়ে বৈঁচী ফল খাওয়া, বেহালা বাজানো প্রভৃতি অকাজে তাঁর অনেকটা সময় কাটে। সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাঠের বাক্স ভেঙে উদ্ধার করা অসমাপ্ত রচনা 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আর 'ভবানী পাঠক'-এর প্রতি তীব্র আকর্ষণবোধ। বন্ধুদেব নিযে সকলের চোখের আড়ালে লেখাগুলি পড়া শুরু হয়ে যায়। শ্রোতারা অমনোযোগী হলেও পাঠকের বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই, দিনের পর দিন অসমাপ্ত লেখাগুলি পড়ে মনে মনে তা শেষ করার ইচ্ছা জাগে। এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাই লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি বীজ থেকে অঙ্কুর-উদ্গমে উত্তাপ ও জল সিঞ্চন করে। এমন করেই কৈশোরের রঙীন দিনগুলি বুঝি শেষ হয়ে এল।

শরৎচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরের যাঁরা সহচর, তাঁদের কেউ কেউ এই সময়ের কিছু কিছু স্মৃতিচারণ করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরীদের কাছে। তাঁরা বলেছেন, 'শ্রীকান্তের' 'রাজলক্ষ্মী' সে তো প্রতিবেশী দরিদ্র ব্রাহ্মণের আশ্রিতা বিধবা ভগ্নীর অনূঢ়া কন্যা। বৃদ্ধ কলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে যার নামেই বিয়ে হয়েছিল, জীবন-যৌবন বিফলে যায় যায়, এমন দিনে মায়ের সঙ্গে বিদেশে তীর্থ করতে গিয়ে সে আর ঘরে ফিরলো না। ঐ যে বৈঠকখানাঘর, ঐ ঘরেই অসুস্থ শ্রীকান্ত একদিন 'প্রসন্ন ঠাকুরদা'র সঙ্গে সেই রাজলক্ষ্মীকেই স্ত্রীরূপে পরিচয় করিয়ে দেয়। 'শ্রীকান্তের' রহস্যময়ী নারী 'অন্নদাদিদি'—তার বাপের বাড়ি নাকি ছিল ঐ নদীর ওপারের গ্রাম মালিমপুরে। ধনী পিতার আশ্রয় ছেড়ে স্নেহের দুলালী অন্নদা তার ধর্মত্যাগী সাপুড়ে স্বামীর সঙ্গে পথে নামতে দ্বিধা করেনি, এ তো শরৎচন্দ্রের বাল্যকালে দেখা ঘটনা। ঐ যে রামায়ণ-মহাভারত পড়া, কীর্তনের মুগ্ধ শ্রোতা মহৎমন মুসলমান গহর-- সে তো পাশের গ্রাম কৃষ্ণপুরের সম্পন্ন গৃহস্থের একমাত্র সন্তান। সে শুধু গল্পের চরিত্র নয়, সে যে শরৎচন্দ্রের বাল্যের সাথী সহচর। কৃষ্ণপুরের রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আখড়া বাড়ি—সে তো আমাদের সামনেই রয়েছে, 'শ্রীকান্তে'র মুরারিপুরের আখড়া বাড়ী, উপন্যাসের বর্ণনায় লেখকের নিজের গ্রামের উত্তর দিকে সরস্বতীর তীরে বকুলগাছের তলায় যার অবস্থিতি তা আজও বর্তমান। শ্রীকান্তের আর-এক অসাধারণ চরিত্র, দস্যি ছেলে ইন্দ্রনাথ—তাতেও শিক্ষক সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের ভাই, শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্রের কৈশোর-যৌবনের ছায়া। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের ছাত্রদের ফুটবল খেলায়—মারামারি, সরস্বতী নদীতে নৌকা বেয়ে ত্রিবেণী যাওয়া, আখড়াবাড়িতে কীর্তন শোনা, বেহালা বাজানো, সাপ খেলানো, দুর্জয় সাহসের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া,—এ সবই ঐ সতীশচন্দ্রের কাছে ও কিছু নয়, শুধুই ছেলেখেলা।

জীবনের পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্র আরও অনেক মানুষ দেখেছেন ঠিকই, কিন্তু বাল্যের শৈশবের দিনগুলিতে দেখা গ্রাম মানুষ ঘটনা--সবই দ্রষ্টার মনের মন্দিরে দেবতার স্থান নিয়েছে। তারাই আবার স্রষ্টার জবানিতে উপন্যাসের পাতায় এক-একটি চরিত্রের পরিচয়ে পাঠকের মনের কাছাকাছি এসে তাদের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনার সঙ্গী হয়েছে। যে মাটিতে শিশু পৃথিবীর প্রথম আলো দেখে, যেখানে শৈশব-কৈশোরের রঙীন দিনগুলি অতিবাহিত হয়, যে মাটির রসে আর আকাশের রঙে শিশুর চোখে প্রথম কল্পনার অঞ্জন লাগে—সেই মাটিকে সে জীবনে কোনদিন ভুলতে পারে না—তাই শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুর ত্যাগের ২৫ থেকে ৪৫ বছর পরে প্রকাশিত লেখাগুলির মধ্যে

এই গ্রামের আশেপাশে অবস্থিত গ্রাম-নদী-শহর-গঞ্জের যত্রতত্র উল্লেখ দেখতে পাই—'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের নায়ক নীলাম্বরের পিতৃভূমি ঐ পাশের গ্রাম সপ্তগ্রামে। অসুস্থ স্বামীর রোগমুক্তিতে দেবতার চরণে বিরাজ যে পূজা পাঠায়, সেও লাগোয়া গ্রাম বারেকপুরের পঞ্চানন্দতলায়। অভাবের কঠিন দিনগুলিতে স্বামীর অগোচরে বিরাজ তার সাধ্যমত উপার্জনের যে পথ খুঁজে পায়, তা মগরার পিতলের কারখানায়—মাটির ছাচ তৈরি করে দিয়ে। গ্রামের গোপাল চক্রবর্তীর বৃদ্ধ পিতার গঙ্গাযাত্রা করানো হয়—ঐ ত্রিবেণীতে। বিরাজের সেই দুর্যোগের আর দুর্ভাগ্যের রাতে হাতে পায়ে কাপড় জড়িয়ে যার কোলে আশ্রয় পেতে চায়—সেও এই "শ্রাবণের শেষদিনে খরবেগে দু' কূল ভাসিয়ে" চলা স্রষ্টার আবাল্যের সাথী এই সরস্বতী নদীতে। বিরাজের চিকিৎসা, সেও এই হুগলীর হাসপাতালে। বিরাজ শত দুঃখ-লাঞ্ছনার পর আবার তার আদরের পুঁটি আর আবাধ্য দেবতা স্বামী নীলাম্বরকে ফিরে পায়—দেবস্থান তারকেশ্বরের পথপ্রান্তে।

বৈকুণ্ঠের উইলে দেখি—"বৎসর পাঁচ ছয় পূর্বে বাবুগঞ্জের বৈকুণ্ঠ মজুমদারের মুদির দোকান যখন অনেক প্রকার ঝড়ঝাপটা সহ্য করিয়াও টিঁকিয়া গেল, তখন অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।" এই বাবুগঞ্জ, হুগলী শহরের গঙ্গাতীরে অবস্থিত। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার সংবাদে ক্ষুব্ধ বৈকুণ্ঠের ছোট ছেলে বিনোদ যখন বাড়ি ফেরে না—তখন বাড়ির কোচোয়ান বারবার গাড়ি নিয়ে গিয়ে যে স্টেশন থেকে বিফল হয়ে ফিরে আসে তার নাম চুঁচুড়া স্টেশন।

'বিন্দুর ছেলে'র যাদবের পিসতুতো বোন এলোকেশীর শ্বশুরবাড়ি ছিল উত্তরপাড়ায়।

'পণ্ডিত মশাই'এ "কুঞ্জ বোষ্টমের ছোট বোন কুসুমনাথের পাঁচ বছরের সুশ্রী মেয়েটির সঙ্গে বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস অধিকারী তার পুত্র বৃন্দাবনের সঙ্গে বিয়ে দেয়"। কুসুমের শ্বাশুড়ী তার ছেলে বৃন্দাবনের নতুন করে কণ্ঠি বদলের জন্য নলডাঙার বুড়ো বাবাজীর মত আনতে যায়। এই বাড়ল ও নলডাঙা গ্রাম দুটি দেবানন্দপুরের পশ্চিমে ও দক্ষিণে অবস্থিত। গ্রামে কলেরায় মৃত্যু হওয়ায় এবং রোগের ব্যাপকতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃন্দাবন গ্রামবাসীদের রক্ষা করার জন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পুকুরে রোগীর কাপড় ধুতে নিষেধ করায় তারিণী মুখুজ্যে চেঁচাইয়া উঠিল—বলিল কোথায় ধোবে। থাকব বাড়লে ধুতে যাবে বদ্দিবাটীতে।

এই বদ্দিবাটী সকলেরই পরিচিত একটি নাম।

'মেজদিদি'র মায়ের কেষ্ট "তার মায়ের মৃত্যুর পর অবস্থা-ভালো বৈমাত্র বড় বোন কাদম্বিনীর কাছে আশ্রয়ের জন্য" যে গ্রামে গিয়ে হাজির হয়—সেই 'রাজহাট' গ্রামটির অবস্থিতি দেবানন্দপুরের এক মাইল পশ্চিমে। মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর একাজ্বরী, বুকে সর্দি বসেছে, নিরুপায় কেষ্ট অস্থির হয়ে তার বিশ্বাস ও ক্ষমতা মতে—মেজদিদিকে অনুরোধ জানায়—"আমাদের গাঁয়ের বিশালাক্ষী ঠাকুর বড় জাগ্রত মেজদি. পুজো দিলে অসুখ সেরে যায়,—দাও না মেজদি"—। এই জাগ্রত দেবী বিশালাক্ষী দেবানন্দপুরে আজও নিত্য পূজিতা।

'পল্লীসমাজের' নায়ক রমেশ তার বাল্যের ভালবাসার নায়িকা বিধবা রমাকে নতুন করে আবিষ্কার করে তারকেশ্বরের মহাতীর্থে।

'নিষ্কৃতি'-তে দেখি ভবানীপুরের উকিল আত্মভোলা গিরীশ তাঁর খুড়তুতো ভাই রমেশের স্ত্রী শৈলজাকে গ্রামের সম্পত্তি লিখে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চান যেখানে দাঁড়িয়ে সেটি হুগলীর আদালতকক্ষ।

'অরক্ষণীয়া'য় "এগারো বৎসর পরে দুর্গামণি হরিপালে বাপের ভিটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।" এই হরিপাল হুগলী জেলার একটি সুপরিচিত জনপদ।

'দেবদাস'-এর নায়িকা পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল বর্ধমান জেলার হাতি-পোতা গ্রামের জমিদার ভুবনমোহন চৌধুরীর সঙ্গে। বর্ধমান জেলায় হাতিপোতা গ্রাম আছে কিনা জানি না, তবে—ব্যাণ্ডেল বাজারে মদের দোকানের কাছের জায়গাটির নাম হাতিপোতা। নায়ক দেবদাস বোম্বাই হাসপাতাল থেকে মুক্ত হয়ে অসুস্থ শরীরে ধর্মদাসের সঙ্গে ট্রেনে চড়ে দেশে ফেরার পথে হঠাৎ পার্বতীর কাছে যাওয়ার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ হওয়ায় যে স্থানে ধর্মদাসের অগোচরে নেমে পড়েন, সেই স্থানটি পূর্ব রেলের একটি সুপরিচিত স্টেশন পাণ্ডুয়া।

'দত্তা' উপন্যাসে যে হুগলীর ব্রাঞ্চ স্কুল, ন্যাড়া বটতলা, খাঁয়েদের গলায় দড়ের বাগান, সরস্বতী নদীর বাঁশের পুল, কৃষ্ণপুর গ্রামের বার বার উল্লেখ দেখতে পাই, সেগুলি দেবানন্দপুর গ্রামের আশেপাশে আজও বিদ্যমান।

'শুভদা' উপন্যাসে হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল যে গ্রামে তার নাম হলুদপুর। সরস্বতী নদীর ধারে ছোট্ট একটি গ্রাম যার বর্ণনায় লেখক বলেছেন "এখানে দেখিবারও কিছু নাই, শুনিবারও কিছু নাই।"

'শুভদা'র জমিদার সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বাড়ি ছিল নারায়ণপুরে। এই নারায়ণপুর ব্যাণ্ডেলের কাছে জি. টি. রোডের ধারের একটি ছোট গ্রাম।

এই উপন্যাসেই বর্ণিত জলে ডুবে যাওয়া স্ত্রীলোক, সুরেন্দ্রনাথের বজরায়

আশ্রয় পাবার পর তার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় এই মালতীর বাড়ি ছিল মহেশপুর গ্রামে যার অবস্থিতি চুঁচুড়া-খানপুর পিচরাস্তার ধারে।

'বাল্যকালের গল্পে' এ অঞ্চলে সুপরিচিত কুন্তীনদী ও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের বার বারই উল্লেখ আছে।

'রামের সুমতি' গল্পে রামের অত্যাচারে অতিষ্ঠ শ্যামলাল যখন তাকে আলাদা করে দেয়, তখন ২।৩ দিন প্রায় উপবাসের পর রাম ভৃত্য ভোলাকে তার বৌদিদি নারায়ণীর কাছে দুটি টাকা ধার চেয়ে পাঠিয়েছে—অশিক্ষিত নির্বোধ ভোলা নারায়ণীকে বলছে—"মাঠান, বাবার থানের ওদিকে কোথায় তেনার মামার বাড়ি আছে যে--সেখানে দাদাবাবু চলে যাবে দুটি টাকা দাও।" এই 'বাবার থান' বলতে বাবা তারকনাথের তীর্থভূমি তারকেশ্বরকেই বোঝায়। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণের মধুর এই দিনগুলিতে শরৎচন্দ্রের মনের গভীরে সৃষ্টির সেই অঙ্কুরটি পল্লবিত হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে 'কাকবাসা' 'ব্রহ্মদৈত্য' লেখা হয়ে যায়—'কাশীনাথ' গল্পের ছায়া মুক্তির পথ খুঁজতে থাকে।

এদিকে আবার সংসারে অভাব ও অশান্তির কালোমেঘ ঘনিয়ে আসে। ছোট মেয়ে সুশীলা ছাড়া অন্য সবাই তখন সংসারে এসে গেছে, বড় মেয়ে অনিলা বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া দূরের কথা, শুধু তাদের খাওয়া-পরার সংস্থান করাও তখন মতিলালের সাধ্যের অতীত। শরৎচন্দ্রের পড়াশুনা প্রায় বন্ধ, ব্রাঞ্চ স্কুলের খাতায় অনেক টাকা মাইনে বাকী। ছেলেমেয়েদের খাওয়া-পরার কষ্ট, স্ত্রীর নীরব অসহায় চাহনি, প্রতিবেশীর ঋণ পরিশোধের গঞ্জনায় অবশেষে অনন্যোপায় মতিলাল মনস্থির করে ফেললেন। আর গ্রামে পড়ে থাকা নয়। সংসারকে বাঁচাতে গেলে অর্থ চাই, আর সে অর্থ গ্রামে বসে থেকে আসবে না; বাইরে থেকে আনতে হবে। তাই ১৮৯২ সালের শেষে অথবা ১৮৯৩ সালের প্রথম দিকে মতিলাল দেবানন্দপুর ত্যাগ করে স্ত্রীপুত্রকন্যাদের নিয়ে স্থায়িভাবে ভাগলপুর চলে গেলেন। সেদিন নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবনে 'ন্যাড়া' নামের একটি দুরন্ত বালকের অনুপস্থিতি কাউকে ব্যথা দিয়েছে, কেউ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে, কারো বা নানা কাজের ভিড়ে সেকথা স্মরণ হয় নি। কিন্তু এখানেই শরৎচন্দ্রের জীবনে দেবানন্দপুরের কথা শেষ নয়। অনেক—অনেক বছর পরে আবার দেবানন্দপুর তার হারানো মানিককে ফিরে পেয়েছে।

বাংলা ১৩০৩ সালের ২৩ কার্তিক, দেবানন্দপুর গ্রামের রাজকুমারী দেবীর কাছে ঋণের কারণে মামলার ফলস্বরূপ মতিলালকে তাঁর নিজ বাসভবনটি

মাত্র ২২৫ টাকায় নিজ মাতুল অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিক্রয় করতে বাধ্য হতে হয়।

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের পড়াশুনা ও সঙ্গোপনে লেখার কাজ যেমন নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে, তেমনি মাতা ভুবনমোহিনীর মৃত্যুতে তাঁর সন্ন্যাসী মন সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছে।

দীর্ঘ ২৫ বছরে নানা দেশ পর্যটন সেরে, নানা ঘাতপ্রতিঘাত কাটিয়ে, অভিজ্ঞতার বিপুল সম্ভার আর সাহিত্যের হাটে ছোট পশরা নিয়ে জীবনের প্রৌঢ় বয়সে শরৎচন্দ্র হাওড়া বাজে শিবপুরের ভাড়া বাড়িতে এসে বাসা বাঁধলেন।

বাজে শিবপুরে আসার আগে তাঁর বড়দিদি, বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, পল্লীসমাজ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি বইগুলি প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যে নতুন হাওয়া বইতে শুরু হয়েছে—বাজে শিবপুরে আসার পর এক এক বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, শ্রীকান্ত (১ম), দেবদাস, নিষ্কৃতি, কাশীনাথ, চরিত্রহীন প্রভৃতি বইগুলি তাঁকে জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। রবীন্দ্রপ্রতিভার দীপ্ত মধ্যাহ্নে শরৎচন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোকধারা বাঙালী পাঠককে এক মধুর আবেগে আবেশে আপ্লুত করেছে।

এই সময় দেবানন্দপুর গ্রামের বাংলা সাহিত্যের এক মনোযোগী পাঠক, অতুল দত্তমুন্সীর ভাই প্রফুল্লকুমার দত্তমুন্সী জনৈক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখাগুলির মধ্যে এই এলাকার গ্রামগুলির হুবহু বিবরণ পাঠ করে স্থির-নিশ্চিত হন যে এই লেখক শরৎচন্দ্র, দেবানন্দপুর থেকে বাল্যে চলে যাওয়া তাঁদের একান্ত স্নেহভাজন 'ন্যাড়া' ছাড়া আর কেউ নয়। তাঁরই উৎসাহে ও আগ্রহে একদা শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী নামে দেবানন্দপুরের এক উদ্যোগী তরুণ সামান্য নামসাদৃশ্যের সূত্রটুকু সম্বল করে বাজে শিবপুরের বাসায় শরৎ-চন্দ্রের ঘরের দুয়ারে নিজের জন্মস্থানের পরিচয় নিয়ে হাজির হলেন।

প্রথম দিনে বুঝি অভিমানে বেদনায় তিনি শৈলেন্দ্রনাথকে নিরাশ করে ফেরত দিলেও জন্মস্থানের প্রতি তাঁর হৃদয়ের দুর্বলতা ঐ তরুণের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি, তাই দু-চার দিন পরে নাছোড়বান্দা সেই তরুণ এবার বুঝি শরৎচন্দ্রের মনের দুয়ারে গিয়ে হানা দিলেন। এবার আর ফিরিয়ে দেওয়া নয়, একেবারে ঘরে টেনে তোলা, বুকে জড়িয়ে ধরা। একদা যে মাটি-মাকে তিনি অভাবে, লাঞ্ছনায়, গভীর বেদনায় ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই মাটি-মায়ের তরুণ সন্তানদল আবার তাঁকে স্মরণ করেছে। এমন দিন বোধ করি মানুষের জীবনে বেশীবার আসে না।

এমনি করেই দীর্ঘ দিন পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেবানন্দপুরের একটা ক্ষীণ সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হলো।

ক্রমে বাংলা সাহিত্যে তাঁর সৃষ্টির পশরা ভারী হয়েছে এবং অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবই তাঁর করায়ত্ত হয়েছে। মানুষেব স্বাভাবিক মমতাবশে জন্মস্থানেব পৈতৃক সম্পদটুকু উদ্ধারের বাসনা জেগেছে মনে, কিন্তু সেদিনের পল্লীবাংলাব বক্ষণশীল ও কুটিল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁব সে বাসনা-পূবণ সম্ভব হয় নি। শুধু সে সময়ে দেবানন্দপুবে নয়, পল্লীবাংলার প্রায় সর্বত্র সমাজের বিত্তশালী ও রক্ষণশীল একটি অংশ এই কুটিল, সংস্কাবাচ্ছন্ন অনুদার ধারাটি সযত্নে লালন ও রক্ষা করে আসছিল, ফলে শবৎচন্দ্রকে পরবর্তী কালেও অন্যত্র এই কুটিলতার আবর্তে পড়ে দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। সেদিন শহর কলকাতাতেও এই একই মনোভাবের জন্য জনৈকা গৃহস্থবধূ তাঁব সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় নিমন্ত্রিত অতিথি শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাহাব কবে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেদিন পৈতৃক ভিটা উদ্ধারে সফল হতে না পারায মনে দুঃখ পেলেও জন্মস্থানের প্রতি মমতা বিন্দুমাত্র কমেনি। ১৯২০ সালে স্থাপিত গ্রামের ক্ষুদ্র পাঠাগারটিকে আলমারি, বই-পত্র-পত্রিকা দিয়ে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯২৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁর এক জন্মদিনে এই পাঠাগাবটিই তাঁব নামেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'শরৎচন্দ্র পল্লী পাঠাগার' হয়েছে। বাজে শিবপুবে বাস কবার সময়ে পল্লীগ্রামে একটি বাড়ি করার তাঁব তীব্র ইচ্ছা হয়েছিল। তাঁর সেই সময়েব জনৈক ভক্ত সঙ্গীর স্মৃতিচারণে জানা যায় তিনি দেবানন্দপুরে একটি দোতলা বাড়িব নকশাও তৈরি কবেছিলেন। দেবানন্দপুর গ্রামেব স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী এই সময়ে শরৎচন্দ্রের পৈতৃক ভবনের কাছে 'মযরা ভিটা' নামের জায়গাটি কিনে দেবাব চেষ্টাও করেছিলেন, —কিন্তু বড়দিদি অনিলা দেবীর স্নেহের টানে ও দ্বিতীয়া স্ত্রী হিবণ্ময়ী দেবীর ইচ্ছায় তিনি হাওড়াব সামতা গ্রামে রূপনারায়ণের তীবে মাটিব দোতলা বাড়ি তৈবি করান ও সেখানে বসবাস শুরু করেন।

১৯২২ সালে দেবানন্দপুর গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পল্লী-সংস্কারের আদর্শ সামনে রেখে 'দেবানন্দপুর পল্লীসেবক সমিতি' গঠন করেন। শরৎচন্দ্রের গুণগ্রাহী শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত সমিতির সভাপতি ও শরৎচন্দ্র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৬ সালের ৩রা অক্টোবর দেবানন্দপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে সহ-সভাপতিরূপে শরৎচন্দ্র সমিতির কার্য-বিবরণ ও কর্মধারা উল্লেখ করে ভাষণ দেন। হুগলী জেলা বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান তারকনাথ মুখোপাধ্যায় অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। এই সভার

বিবরণ ৮ই অক্টোবর ১৯২৬ তারিখের দৈনিক 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দূরে থেকেও গ্রামের সকল উন্নতির সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন এবং সেদিনের গ্রামেব সংস্কারমুক্ত তরুণ কর্মীদের তিনি আন্তরিক ভালবাসা দিয়েছিলেন।

• ১৯২৮ সালে (বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ সালের ৩১ ভাদ্র) ৫৩তম জন্মদিনে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে দেশবাসী শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই মহতী সভায় দেবানন্দপুব পল্লীসেবক সমিতির পক্ষ থেকে একটি মানপত্র দিযে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জ্ঞাপন করা হয়।

১৩৩৫ সালের ১লা আশ্বিন 'বাংলার কথা' দৈনিক পত্রিকায় মানপত্রটি প্রকাশিত হয়—

শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রদত্ত মানপত্র—

অশেষ শ্রদ্ধাভাজন,

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশযের করকমলে—

আয়ুষ্মান শরৎচন্দ্র !

তোমার ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্মদিবস উপলক্ষে তোমার জন্মভূমি দেবানন্দপুরেব অধিবাসিবৃন্দ আমরা সমগ্র বঙ্গবাসির সহিত মিলিত হইয়া, গর্ব ও গৌরবের সহিত, প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে তোমার অতুলনীয় দান, সমগ্র জাতির হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে ধারণ করিয়াছে। তুমি বাঙ্গলার—তুমি বাঙ্গালীর—তোমাব নব সৃষ্টির মহিমা কীর্তনে সারা বাংলা মুখরিত। কিন্তু তুমি বিশেষ করিয়া আমাদের—কেননা আমাদের সহিত তোমার এক নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। একই পল্লীর পবিত্র ধূলিতলে আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াছি এক মাতৃক্রোড়ে সন্তানের মত। তবু জানি—যে সম্পদ বিশ্বের, তাহা বিশেষ ধরিয়া রাখিতে পারে না।

মহাকালের মহৎ প্রয়োজন তোমাকে দেবানন্দপুরে নিভৃত পল্লীবক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া বিপুল পৃথ্বীর বুকে বিচিত্র আনন্দবেদনার তীব্র সংঘাতের মধ্য দিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। যে জীবন সত্যের অনুসন্ধানে দেশ হইতে দেশান্তরে, মত হইতে মতান্তরে, স্বাধীনভাবে পরিভ্রমণ করিয়াছে—অবশেষে একদিন শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ কিরণধারায় বঙ্গসাহিত্য-গগন প্লাবিত করিয়া অকস্মাৎ উদিত হইয়াছে—আজ মধ্যগগনে তাহার কি অপরূপ শোভা।

হে প্রিয়, জগতের হাটে তোমাকে হারাইয়া আবার বঙ্গবাণীর পূজাতীর্থের ঘাটে আমরা তোমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি। বাঙ্গালীর হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের সংসাবে অপমানিত নারীত্ব ও অধঃপতিত পৌরুষেব দুঃখ ও লজ্জাকে, হে মানব-মহত্ত্বের পুরোহিত, তুমি যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইয়া, সমুজ্জল ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া, বর্তমানের গ্লানিভার তুচ্ছ করিয়া প্রতিভার পূজা পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছ, তাহার কল্যাণসম্পদ কালের ভাণ্ডাবে অক্ষয় হইয়া বহিল। তুমি শুধু বর্তমান বাঙলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক নহ,—তোমার মনুষ্যত্ব রুদ্রতেজে দৃপ্ত, অথচ স্নেহে মমতায করুণ কোমল, সহানুভূতিতে নিত্য বিগলিত।

পরবর্তীদিগকে তোমাব কথা স্মরণ কবাইয়া দিয়া তাহাদের চিত্তে গৌবব-বুদ্ধি উদ্‌বুদ্ধ করিবে, এই আশায় তোমার জন্মভূমির দীন অধিবাসিবৃন্দ 'শরৎচন্দ্র পল্লী পাঠাগার' স্থাপন কবিয়াছে। সেই অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র হইলেও সূচনা হইতেই তোমাব প্রসন্ন দৃষ্টিলাভে সমর্থ হইযাছে, এজন্য আমবা কৃতজ্ঞ।

হে বাণীর ববপুত্র, তোমার ত্রি-পঞ্চাশৎ বর্ষীয জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ সমগ্র দেশবাসী আশান্বিত। চারিদিকের ক্ষুদ্রতা ও দীনতা, নিকৃষ্ট বিলাস ও অর্থহীন আড়ম্বরেব স্থূল যবনিকা ভেদ করিযা তুমি যে আলোক আনিয়াছ—তাহা শাশ্বত হইয়া তোমাব জাতিকে পুনরায বিশ্বে বরণীয় করিবে—তোমার জন্মভূমির অধিবাসিবৃন্দের ইহাই প্রেমসহকৃত অভিনন্দন!

তোমাবই একান্ত অনুরক্ত

দেবানন্দপুর, জেলা হুগলী
৩১শে ভাদ্র, সন ১৩৩৫ সাল

দেবানন্দপুব পল্লীসেবক সমিতিব
সভ্যবৃন্দ

মৃত্যুব পূর্বে বেশ কযেকবার তিনি দেবানন্দপুরে বেড়াতে এসেছেন—কখনও নামী কারোর সঙ্গে মোটরে, কখনও বা নিতান্ত একা ট্রেন থেকে নেমে, পাযে হেঁটে। গ্রামের প্রবীণদের সঙ্গে বসে স্মৃতিচারণ করেছেন, নবীনদের সঙ্গে প্রাণ খুলে হেসেছেন—আবার দিনশেষে আপন আবাসে ফিবে গেছেন।

এমনি করেই জন্মস্থানের ঋণ পরিশোধ করে আর জন্মস্থানের অধিবাসী-দের ঋণী রেখে তিনি ১৯৩৮ সালে (বাংলা ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ) পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

তাঁর মৃত্যুতে সারা দেশের সঙ্গে দেবানন্দপুরের অধিবাসিবৃন্দ শোকাভিভূত হন এবং শোকসভার আয়োজন করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এই শোকসভার সংবাদ ১৩৪৪ সালের ৫ই মাঘ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় —

"শরৎচন্দ্রের জন্মভূমিতে শোকসভা – গত রবিবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমন সংবাদ প্রচারিত হইলে, তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত স্থান।য় শরৎচন্দ্র পল্লী-পাঠাগার বন্ধ রাখা হয় ও স্থানীয় পল্লীসেবক সমিতির উদ্যোগে সন্ধ্যায় গ্রামবাসীগণের এক মিলিত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

"বাঙ্গলার অপরাজেয় কথাশিল্পী সাহিত্যিক ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি ও বাঙ্গলার লীলাক্ষেত্র হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামের অধিবাসী-গণ তাঁহার পরলোকগমনের সংবাদ শ্রবণে তাঁহাদের আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং ভগবানের নিকট তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের ও দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয় এবং দেবানন্দপুর পল্লী সেবক সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদের বিশিষ্ট ও প্রথম দরদী পৃষ্ঠপোষককে হারাইয়া যে ব্যথা ও অভাব অনুভব করিতেছেন তাহা অবর্ণনীয়। গ্রামবাসী সমবেত পুরুষ ও মহিলাগণ এই সভায় শরৎচন্দ্রের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

মৃত্যুর পরের বছরে ২রা মাঘ তারিখে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের প্রথম স্মৃতিসভায় জন্মস্থানে তাঁর স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত ও দেবানন্দপুর পল্লী সেবক সমিতির উদ্যোগে 'শরৎ-চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। দেবানন্দপুর শরৎস্মৃতিমন্দির নির্মাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন রাখেন— সুভাষচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ সে কালের বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানবৃন্দ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বাণী পাঠান— "তোমরা শরতের গ্রামের বাড়িতে তাঁর স্মৃতি-রক্ষার যে ব্যবস্থা করছ, এ জন্য তোমরা বাংলাদেশের কৃতজ্ঞতাভাজন।"

পরের বছর শরৎচন্দ্রের স্নেহধন্যা কবি শ্রীমতী রাধারানী দেবী পৌরোহিত্য করেন।

১৯৪৬ সালের ২৭ জানুয়ারি স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সীর চেষ্টায় শরৎ স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুপস্থিতিতে 'দীপালী'-সম্পাদক কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট শরৎচন্দ্রের নামে গ্রামে একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় চালু হয়। ১৯৪৯ সালের ২১শে জানুয়ারি বাংলার তৎকালীন প্রদেশপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাট্‌জু শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান পরিদর্শন করেন।

প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে দীর্ঘ দিন অসম্পূর্ণ থাকার পর ১৯৫৯ সালের ২৬ জুলাই শরৎস্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীকেশকার এবং অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীঅতুল্য ঘোষের সহায়তায় ও তৎকালীন হুগলী জেলাশাসক শ্রীকুমুদকান্ত রায় ও পরে শ্রীসৌবীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের চেষ্টায় এই নির্মাণকার্য ও শরৎচন্দ্রের বৈঠকখানা-গৃহটির সংস্কারকার্য সুসম্পন্ন হয়। এই বৈঠকগৃহটি পল্লীসেবক সমিতি মালিকদের কাছ থেকে উদ্ধার করে। এই দিনেই শরৎচন্দ্র পল্লী পাঠাগারটি 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার'রূপে উৎসর্গীকৃত হয়ে শরৎ-স্মৃতি মন্দিরে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯৬০ সালে রাজ্য সরকার পাঠাগারটিকে গ্রামীণ গ্রন্থাগার-রূপে স্বীকৃতি দিয়ে তার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে ৩১ ভাদ্র জন্মদিন পালনের রীতি চালু হয়ে ২রা মাঘের স্মৃতি-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে।

তারপর প্রতি বছর জন্মদিনের অনুষ্ঠানগুলিতে দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রনায়কগণ যোগদান করে কথাশিল্পীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন এবং অনুষ্ঠানে কথাশিল্পীর যোগ্য স্মৃতি-রক্ষার বহুবিধ প্রস্তাব উত্থাপিত, সমর্থিত ও সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছে। দেবানন্দপুরে বার্ষিক শরৎ-মেলা প্রবর্তন, শরৎ-আবাস নির্মাণ, পিতৃভবন জাতীয়করণ ও সংগ্রহশালায় রূপান্তর, মূর্তি প্রতিষ্ঠা, সরস্বতী নদীর উপরে শরৎ সেতু নির্মাণ, ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশনের সঙ্গে শরৎচন্দ্র অথবা দেবানন্দপুরের নাম যুক্তকরণ, দেবানন্দপুরকে পর্যটন-ভ্রমণসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা, তাঁর নামে শিক্ষায়তন স্থাপন প্রভৃতি নানা কাজের পরিকল্পনা গৃহীত এবং তার অতি সামান্য অংশই ইতিমধ্যে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

১৯৬৮ সালের ২০ ডিসেম্বরে হুগলীর তৎকালীন জেলাশাসক চিত্তরঞ্জন গুহ মজুমদার, মহকুমাশাসক শুভ্রাংশু ঘোষ ও উন্নয়ন আধিকারিক করুণাময় ভট্টাচার্যের আন্তরিক চেষ্টায় এক সফল সাহায্যানুষ্ঠানের দ্বারা সংগৃহীত অর্থে শরৎ স্মৃতিমন্দিরের দীর্ঘ বেষ্টনী-প্রাচীর নির্মাণ ও বৈদ্যুতীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। শরৎ-অনুরাগী শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ দে ছবি ও লেখা দিয়ে স্মৃতিমন্দির ও গ্লোব নার্শারি কর্তৃপক্ষ গোলাপ গাছ দিয়ে তার অঙ্গন সজ্জিত করেছেন।

১৯৭২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্রের ৯৭তম জন্মদিন ও দেবানন্দপুর

পল্লী সেবক সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দেবানন্দপুর গ্রামে ১৯৬৪ সালে স্থাপিত উচ্চ-বিদ্যালয়টিকে 'শরৎচন্দ্র শিক্ষা-নিকেতন' রূপে শরৎচন্দ্রের নামে উৎসর্গ ও তাঁর পৈতৃক ভবনটি অবিলম্বে জাতীয়করণের সংকল্প ঘোষণা করেন। অতি সম্প্রতি তাঁর সেই সংকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের তিরোধানে বাঙালী পাঠকের অন্তরের কথাই সেদিন কবিগুরু তাঁর কবিতার ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন—

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।

তবু বাঙলার অপরাজেয় কথাশিল্পী, ভারতের জনপ্রিয়তম সাহিত্যিক, স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রণী সৈনিক, নিপীড়িত মানবাত্মার দরদী বন্ধু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি দেশবাসীর ঋণ অপরিসীম।

তাই, শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষের পুণ্য লগ্নটি সেই ঋণ স্বীকারের শুভক্ষণে পরিণত হোক—এই আমার অন্তরের প্রার্থনা।

শরৎ-সাহিত্যে নাট্যচেতনা

ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

উপন্যাসের কাহিনী সংগঠনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র অনায়াসগতি—তাঁর মানসপ্রবণতার পূর্ণতম অভিব্যক্তিও এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। মানুষের জীবন্ত হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে, মানবিকতাকেই উচ্চতম সত্য বলে স্বীকৃতি জানিয়ে, নিরপেক্ষ সমাজজিজ্ঞাসায় উচ্চকণ্ঠ হয়ে শরৎচন্দ্র সাহিত্য রচনা করেছেন। শরৎসাহিত্য বাস্তবের সহজ স্বীকৃতিতে যেমন উদার—মানুষের প্রবৃত্তি ও হৃদযদ্বন্দ্বের তীক্ষ্ণতির্যক তাৎপর্যেও তা মূল্যবহ। শরৎ-সাহিত্যে সমাজজিজ্ঞাসার বস্তুরূপ এবং হৃদয়প্রাধান্যের ভাবরূপের রসসমন্বয় ঘটেছে। তাঁর স্পর্শকাতর চিত্তের ভাবালুতা বস্তুতন্ত্রতাকে রোমান্টিক আদর্শবাদে রূপান্তরিত করেছে। এই উচ্চকিত নাটকীযতার স্পর্শ তাঁর সাহিত্যে কাহিনী পরিকল্পনা, চরিত্রনির্মিতি, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বা প্রকাশভঙ্গী সর্ব ক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়েছে। আবার এই অন্তর্লীন নাটকীয়তার স্পর্শে বিশেষ মানুষ বা বিশেষ বস্তু তার বাস্তব সত্তাকেও হারিয়ে ফেলেনি। ঘটনাসংস্থাপনের ঋজুতায়, গ্রন্থনায় এবং ঐক্যবদ্ধতায় শরৎচন্দ্র হৃদয়লীলার আকর্ষণ-বিকর্ষণজাত যে মন্থিত রূপের সাহিত্যিক ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করেছেন—নাটকীয়তা তার মধ্যে একটি বিশেষ দিক। যুক্তি এবং পারম্পর্যে গ্রথিত অথচ অতিবিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যামুক্ত কতকগুলি ছোট ছোট দৃশ্যের সমাবেশ-সমবায়ে শরৎচন্দ্র তাঁর নায়ক-নায়িকা বা চরিত্রকে কাহিনীর চরম মুহূর্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। পরিবেশের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করলেও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সেই দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত কোন উচ্চতর শৈল্পিক সমন্বয়ে পরিণতি লাভ করেছে কিনা এ নিয়ে সমালোচক মহলে অবশ্য মতান্তর রয়েছে। সাহিত্যে নাট্যরসের চিত্রণের জন্যে চরিত্রের দ্বন্দ্বচিত্রণ ছাড়াও শরৎচন্দ্র হৃদ্‌গত উৎকণ্ঠা, ঘটনাগতির চরম মুহূর্ত এবং পটভূমি পর্যালোচনার দিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। উপন্যাসের কাহিনীসংগঠনে বা আঙ্গিকগত উৎকর্ষের সমুন্নতির ক্ষেত্রে নানা মাধ্যমের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কখনও একটি কেন্দ্রীয় সমস্যার বৃত্তে কাহিনী আবর্তিত হয়, কখনও ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যেই কাহিনী সমর্পিত হয়, কোথাও চরিত্রের নৈর্ব্যক্তিক চেতনাপ্রবাহ ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে, কোথাও বা উপন্যাসের রূপ আত্মজীবনী বা ভ্রমণকাহিনীতে আত্মস্থ হয়ে পড়ে, আবার কখনও বা ঘটনার বা প্রসঙ্গের সামান্য উপস্থিতির

মধ্য দিয়েও মনন ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ঔপন্যাসিকের অভিপ্রেত হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র আবির্ভূত হবার পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আঙ্গিকগত সমুৎকর্ষ স্বীকৃত মানদণ্ডে পৌঁছেছিল। বঙ্কিম-উপন্যাসে কাব্যরসান্বিত নাট্যভঙ্গী, বর্ণোজ্জ্বল বর্ণনা এবং গীতিপ্রবাহ ঘটনাকে গতিমান এবং তরঙ্গিত করেছে। গল্পকথনে নাটকীয়তার বিশেষ সমন্বয় সাধনের ঔপন্যাসিক রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামাজিক উপন্যাসের আঙ্গিকে ঘটনার বহুলতায় নাটকীয়তার পরিবর্তে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণপদ্ধতির অন্তর্গামী রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। আবার রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত কবিপ্রাণের স্পর্শ তাতে গভীরভাবে বেজেছে। সমস্যাপ্রধান গল্পদেহ-গঠনের সম্পূর্ণতায় শরৎচন্দ্র হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের রীতিকে গ্রহণ করেছেন—আবার রাবীন্দ্রিক বিশ্লেষণ-রীতিও তাঁর পথনির্দেশক। তথাপি এ কথাও ঠিক—এ সাদৃশ্য সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র নিজস্ব শিল্পসৃষ্টি ও সৃষ্টির অনুগামী। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আপাত সারল্যের অন্তরালেও দুরূহ জটিলতার উপস্থিতি সামগ্রিকতার চিত্রাঙ্কনে নাটকীয়তার অপরিহার্য বিস্তার এনেছে। পরিবেশ ও প্রতিবেশের সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক এবং সংঘাতকে কেন্দ্রে রেখে কাহিনীবৃত্তকে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রসংহত ও একাগ্র নাট্যগ্রন্থনার সৌন্দর্য অনুধাবন করা যাবে। নাটকীয়তা-রস-সম্পৃক্ত অনেকগুলি উপন্যাসেরই তিনি নির্মাতা। এ প্রসঙ্গে পল্লীসমাজ, দেবদাস, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত (৪টি পর্বে), গৃহদাহ, দেনা-পাওনা, দত্তা, পথের দাবী, বিপ্রদাস, শেষ প্রশ্ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া উপন্যাসের ব্যাপ্তিরহিত কিছু বড় গল্প—বড়দিদি, পণ্ডিতমশাই, পরি-ণীতা, চন্দ্রনাথ, অরক্ষণীয়া, নিষ্কৃতি, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, বামুনের মেয়ে, স্বামী, কাশীনাথ প্রভৃতি। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে নাটকীয় কথাশিল্প-গুণে অপরাজেয়। সামাজিক সংস্কারে বা সামাজিক-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত জীবনের বিক্ষুব্ধ অভিজ্ঞতাকে শরৎচন্দ্র উপন্যাসের আঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করে-ছেন। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষে তাঁর আবেগ রঙীন হয়ে উঠেছে। এই বিক্ষোভের নাটকীয় দ্বন্দ্ব উষ্ণ তর্কে উত্তেজিত হয়েও শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের মধ্যে পুরাতনী সামাজিক কাঠামোর প্রতি অনিঃশেষ মমত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অভিমানের অশ্রুনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর তির্যকতার সঙ্গে কাহিনীর সুডৌল নির্ভরতাকে সহাবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শরৎচন্দ্র। এই বিশেষ ধরনের নাটকীয় বেগ সৃষ্টি করে শরৎচন্দ্র বিদ্রোহের পাশাপাশি প্রাচীন মূল্যবোধকে জয়ী করেছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর কতকগুলি উপন্যাসকল্প আখ্যায়িকায় বাঙালী পরিবারের স্নেহ-ঈর্ষা ও স্বার্থপরায়ণতাকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাত বা

বিরোধের চিত্র এঁকেছেন। এই হৃদয়বৃত্তির নাটকীয় সংঘাত অঙ্কনে স্নেহ-সম্পর্কের মধ্যেও তির্যকতা লক্ষণীয়। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল ইত্যাদি রচনাগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিন্দুর ছেলের সম্পর্ক, অল্পবয়স্ক দেওর রামের সঙ্গে নারায়ণীর সম্পর্ক কিংবা রমা ও রমেশের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে পল্লীসমাজের জ্যাঠাইমাব কথা বিশ্লেষণ করলে এই জাতীয় তীক্ষ্ণ ও নাটকীয় স্নেহ-সম্পর্কের অতিশয়িত দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই নাটকীয়তাকে অবশ্য তিনি আবেগ ও ভাবালুতার দ্বারা কিছুটা আচ্ছন্ন করেছেন। ফলে চরিত্রের আভ্যন্তর দ্বন্দ্ব অনেকটা সরলীকৃত হয়ে পড়েছে। শরৎ-উপন্যাসে প্লট বা বৃত্ত পরিকল্পনা ও নাটকীয়তার সঙ্গে এই পরিকল্পনার অন্যোন্য সূত্রে সৃষ্ট হয়েছে চরিত্র। নায়ক-নায়িকা বা কিছু ভিন্নতর চবিত্র স্রষ্টার হাতে এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত হয়েছে। নানা বিচ্ছিন্নতাকে তিনি এ ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। কাহিনী গ্রন্থনায় অনেক উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার মানসিক জটিলতার সংকেতচিত্রণে উপন্যাসের পারিপার্শ্বিক পটভূমিতে নাটকীয়তার সন্ধানে তৎপর হয়েছেন। দুর্নিবার প্রণয়াকূতি, মানবমনের প্রতিবুদ্ধ প্রেমের অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, সামাজিক বিধিবিধানের শাসনে পীড়িত নরনারীব আত্মিক অপচযেব বেদনা নাটকীয় রসতাৎপর্যে বিন্যস্ত হযেছে তাঁর চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, গৃহদাহ প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে। 'দেবদাস' উপন্যাসে আবেগাত্মক উপলব্ধি বিশেষ প্রাবল্য পেলেও পার্বতী-দেবদাসের সম্পর্কের মধ্যে জটিলতার সূচনা, অগ্রগতি ও পরিণতির নাটকীয় বোধের মধ্যে সামঞ্জস্য বয়েছে। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সাবিত্রী, সতীশ, দিবাকর, উপেন্দ্র, ইত্যাদি চরিত্র ব্যক্তিত্বে মণ্ডিত হলেও নায়ক-নায়িকা হিসেবে ব্যক্তিত্বে ভূষিত চরিত্র দুটি—সতীশ ও সাবিত্রী। সাবিত্রী ও কিরণময়ীর অচরিতার্থ জীবনের বেদনাকে শরৎচন্দ্র গভীরভাবেই উপলব্ধি করেছেন। কিরণময়ীর তীব্র জীবনতৃষ্ণাব বঞ্চিত বেদনার হাহাকার চিত্রণে কিংবা প্রেমার্তি ও ভোগবাসনায় তাঁর হৃদয়রূপের দ্বৈত ব্যক্তিত্বের মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তা রয়েছে। কিন্তু কাহিনীবৃত্তের শিথিলতাজনিত ত্রুটি এই নাটকীয়তার রসস্ফূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই নায়িকা কিরণময়ী ও সাবিত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন। দুই নায়িকার কাহিনীর কেন্দ্রমূলে অবস্থান করছে উপেন্দ্র। অন্তর্মুখী মানসদ্বন্দ্বকে নাটকীয় শিল্পসমুৎকর্ষে মণ্ডিত করা হয়েছে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে। এখানে নায়ক মহিম ও প্রতিনায়ক সুরেশের দ্বৈত আকর্ষণে অচলার মানসিক দ্বন্দ্বের তীক্ষ্ণতাকে উচ্চকিত নাটকীয় রসে দ্বৈত তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। অচলার মনোজীবনের এই নাটকীয় পরিস্থিতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই শরৎচন্দ্র শেষ

পর্যন্ত এক দাম্পত্যনীতির তত্ত্বকথাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মোহ কিংবা সাময়িক মানসিক বিভ্রান্তি দাম্পত্যনীতির বিরোধিতা করলেও শুদ্ধ-সুসমঞ্জস স্বামী-প্রেমের নিষ্ঠাকে নারী অতিক্রম করতে পারে না। এ উপন্যাসে নাটকীয় তীব্রতার সংরক্ষণে শিল্পী সার্থক। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে কাহিনীর সূচনাতেই নাটকীয় ঘটনার সংস্থাপনা লক্ষ্য করতে পারি। সমস্যার উপস্থাপন অংশটির মধ্যে এই জাতীয় উচ্চস্বর নাটকীয়তার চেতনা-সঞ্চার সমগ্র কাহিনীকে কতখানি বিশ্বাসযোগ্য ও ঐক্যবিধৃত করেছে এ নিয়ে সমালোচক মহলে মতান্তর আছে। এ উপন্যাসে কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য তরঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে উচ্চগ্রামী হয়ে ওঠেনি। ষোড়শীকে বলপূর্বক ধরে এনে আটক করে রাখা, জীবানন্দকে ষোড়শীর মরফিয়া প্রদান, তারাদাসের পুলিসসহ আগমন, ষোড়শীর স্বেচ্ছায় আসার কথা স্বীকার—এই জাতীয় নাটকীয় ঘটনাপ্রাচুর্যের তীব্রতা উভয়ের মনের আবরণ উন্মোচনে সহায়তা করেছে। আবার ষোড়শীর চণ্ডীগড় ত্যাগ করার মুহূর্তে দৃঢ় চরিত্রের অন্তর্মুখী উপলব্ধির নাটকীয়তা অসামান্য। বাহিরের ঘটনাক্ষুব্ধ বা আড়ম্বরের তীব্রতার মধ্য দিয়ে এই মুহূর্তটি রচিত হয়নি। এ উপন্যাসের সমাপ্তিতে ষোড়শী-জীবানন্দের মিলনের মধ্যে কিছু অনিবার্য আকস্মিকতার আশ্রয় লেখক নিয়েছেন। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের গ্রন্থননৈপুণ্যের মধ্যেও কয়েকটি নাটকীয় কৌশলের সহায়তা গ্রহণ করেছেন শরৎচন্দ্র। এই জাতীয় কৌশল গল্পকথনভঙ্গীর বিশিষ্টতাকেই প্রমাণিত করেছে। জীবানন্দকে নিয়ে উপন্যাসের যবনিকা-উত্তোলন হলেও লেখক অল্পকাল মধ্যেই উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি থেকে তাকে বিকেন্দ্রিত করে নিয়েছেন। সূচনার নাটকীয় তীব্রতার সংরক্ষণ-কারণেই শরৎচন্দ্র এখানে নির্মল-হৈম উপকাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর জীবানন্দ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করল। নতুন পরিস্থিতিতে ভৈরবী পদপ্রসঙ্গে উত্থাপিত সংঘাতে জীবানন্দের মানসভূমিকা বা ষোড়শীর জীবন-মনে তার প্রভাব ইত্যাদি প্রসঙ্গে পাঠকমনে নাটকীয় উৎকণ্ঠার সঞ্চার ঘটেছে। এই জাতীয় নাট্যরসতাৎপর্য সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের কুশলী বিন্যাস-রীতি নিঃসন্দেহে শিল্প-রসোত্তীর্ণ। আবার উপন্যাসের বিশেষ কোন মুহূর্তে লেখক ষোড়শীকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে অন্তরালে সরিয়ে নিয়েছেন। সংঘাত-তরঙ্গিত ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে এই জাতীয় নতুন পরিস্থিতি কাহিনীর সিচুয়েশনগত তাৎপর্যকে আরও মূল্যবহ করেছে। পরবর্তী উপন্যাস 'শেষ প্রশ্নে' লেখকের বিচিত্র ভাবনা-চিন্তা ও বিতর্কের প্রযত্ন অধিকতর লক্ষণীয়। ঘটনার প্রবহমানতা এবং নাটকীয় বিন্যাসকুশলতা সেখানে ক্ষীণ। তবে লক্ষ্য করা গেল, শরৎচন্দ্রের পরবর্তী প্রায় সকল উপন্যাসের মধ্যেই

কাহিনীবৃত্ত রচনায় কিংবা কাহিনী-উপস্থাপনারীতিতে নাটকীয় আকর্ষণের দিকে একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল। সকল উপন্যাসে এই প্রবণতা হয়তো সমপরিমাণে কেন্দ্রমুখীন হয়নি, কিংবা শিল্পরীতিগত শৈথিল্যের কারণে সর্বময় সিদ্ধি লাভ করতে পারেনি।

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের জীবননির্ভর উজ্জ্বল স্মৃতিমালায় গ্রথিত আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাস। নাট্যকারের আত্মনির্লিপ্তির প্রশ্ন এ উপন্যাসে আছে কি? শ্রীকান্তে-বর্ণিত বহু ঘটনার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনের অন্তর্ময় ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত বেশ কিছু চরিত্র শরৎ-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, পারিপার্শ্বিক বহু পরিবেশের বর্ণনার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের কৈশোর ও যৌবনপর্বের পরিবেশ উদাহৃত। শ্রীকান্তের ছন্নছাড়া ও ভবঘুরে জীবন, তার কৌতূহলী নিরাসক্ত দৃষ্টি, নারীর প্রতি সহানুভূতি, সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু তিক্ত প্রতিবাদ, তার সদাজাগ্রত স্পর্শকাতর মনের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি শরৎচন্দ্র উপস্থিত। এ বিষয়ে ড. অজিতকুমার ঘোষ অতি মূল্যবান উক্তি করেছেন—"শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের বাস্তব তথ্যকে সাহিত্যসত্যে পরিণত করতে চেয়েছেন। তাই তিনি এক অখণ্ড রসপরিকল্পনা সম্মুখে রেখে প্রয়োজনমত তাঁর জীবনেব তথ্য ব্যবহার করেছেন, আবার বর্জনও করেছেন এবং শিল্পের পরিপূর্ণতার জন্যই মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে বহু উপাদান ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে সত্য ও মিথ্যা, বাস্তব ও কল্পনা, অভিজ্ঞতা ও অনুমান, আলো ও অন্ধকারের মতো মিশে শ্রীকান্ত উপন্যাসের মধ্যে বিরাজ করছে।" (বেতার-জগৎ ৪৬ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা : ১—১৫ আগস্ট, ১৯৭৫) কাজেই দেখা গেল, 'শিল্পের পরিপূর্ণতার জন্য মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি' এবং 'রসকল্পনাকে সম্মুখে রেখে জীবনের তথ্য ব্যবহারের' গ্রহণ-বর্জন এ উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের সর্বময় আত্মানুসন্ধানের attachment-ই নয়—নাটকীয় নির্লিপ্তি এবং ঘটনাসংগ্রহের মনোযোগও আকর্ষণ করেছে। অবশ্য শ্রীকান্ত উপন্যাসের অন্তর্ধর্মের মধ্যে অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ্য কাহিনীগত ঐক্যও হয়তো অনুপস্থিত। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে এই শিথিলবৃত্ত উপন্যাসের মধ্যে নাটকীয়তার ঘনসংহতি থাকাই সম্ভব নয়। কিন্তু বিশেষ অভিনিবেশে একথা ধরা পড়বেই যে, শ্রীকান্ত উপন্যাস বাহ্যিক ঐক্যে বিধৃত নয়—কিন্তু অন্তর্লোকের বিশিষ্ট ঐক্যসূত্র এ উপন্যাসের ঘটনাবলীকে ঘনসংহতি দিয়েছে। শ্রীকান্তের আপাত-ঐক্য-বিরহিত বৃত্ত নাট্য-সম্ভাবনা থেকে একেবারে মুক্ত নয়। অসংবদ্ধ ও ঐক্যমুক্ত চিত্রাবলী 'সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান ভাবনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে' আজকের উপন্যাসে ও নাটকে উপস্থাপিত হচ্ছে। বস্তুনিষ্ঠ, বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ নাট্যরীতিতে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস

সর্বাংশে নিশ্চয়ই পরিচালিত হয় নি—নিজস্ব ভাবনা ও অনুভূতির চিত্ররীতিও এখানে একটি অন্তরঙ্গ দিক। এই উপন্যাসের নানা পরিস্থিতির মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তনশীলতা ও রসের বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থিতির মধ্যে নাটকীয়তা নিঃসন্দেহে উপস্থিত। শ্রীকান্তের দ্বিতীয় পর্বে নন্দ মিস্ত্রী ও টগরের কাহিনী, মনোহর চক্রবর্তী ও ঠাকুর্দার কাহিনী, রোহিণীবাবু-অভয়ার গল্প ইত্যাদি প্রসঙ্গ ঘটনাগত গুরুত্বে শ্রীকান্তের জীবনের সঙ্গে কতোখানি অন্বিত তার পরিচয় বিধৃত নেই। উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব ঘটনাবিবৃতির দৃষ্টিকোণে অনেকটা ধারাবাহিক হলেও খুব বেশী নাটকীয় গতিশীলতা সেখানে আসে নি। চতুর্থ পর্বে কমললতা চরিত্রকেন্দ্রিক রোমান্টিকতা রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের সম্পর্কের মধ্যে নতুন আলোকপাত করবার চেষ্টা করলেও ধর্মীয় আবেগের অতিশয়িত প্রাধান্যে শেষ পর্বের নাটকীয় তাৎপর্য ভারাতুর হয়ে উঠেছে।

॥ দুই ॥

শরৎসাহিত্যের এই আভ্যন্তরীণ নাট্যরস শৈল্পিক তাৎপর্যে ভাস্বর। ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে নাট্যগুণ একটি অতিবাঞ্ছিত উপাদান। অবশ্য স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম হিসেবে উভয় শিল্পের রীতিগত পার্থক্যও অবশ্যই স্বীকার্য। উইলিয়াম আর্চারের প্রাজ্ঞ মন্তব্য এ-ক্ষেত্রে একটুখানি স্মরণ করে নেওয়া যেতে পারে—"The Drama may be called the art of crisis ; as fiction is the art of gradual developments. It is the slowness of its process which differentiates the typical novel from the typical play"। উপন্যাসে বা গল্পে কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা সম্ভবপর অর্থাৎ উপন্যাস একজাতীয় ক্রমবিকশিত কলারূপ—উপন্যাস বর্ণনাধর্মী বলে এই ক্রমবিকশিত রূপ সেখানে বর্ণিত হয়। নাটকের ত্বরিত গতি সেখানে দৃশ্যধর্মী। অঙ্কবিভাগ ও দৃশ্যবিভাগের মধ্য দিয়ে সংকট চেতনা ক্রমান্বয়ে ত্বরিতলয়ে দর্শকমনকে আকৃষ্ট করে। অতএব নাটকের রসাবেদনের সার্থকতা গুণগ্রাহী দর্শকের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। আবার তা মঞ্চ, শিল্পী ও আনুষঙ্গিক প্রয়োগবিধির সার্থকতার সঙ্গেও সংযুক্ত। শরৎ-উপন্যাসের নাট্যগুণের উল্লেখের পরে এবারে আমরা শরৎচন্দ্রের স্বরচিত নাটক ও নাট্যায়িত উপন্যাসগুলি প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করবো। শরৎচন্দ্রের স্বরচিত নাটকগুলিও অবশ্য তাঁর সর্বাধিক নাট্যলক্ষণাক্রান্ত তিনখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ। 'দেনাপাওনা', 'পল্লীসমাজ' ও 'দত্তা'—'ষোড়শী', 'রমা' ও 'বিজয়া' শিরোনামে চিহ্নিত হয়ে নাটকরূপে প্রকাশিত এবং রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

অপরের দ্বারা নাট্যরূপায়িত হয়েও তাঁর আরও কিছু উপন্যাস অভিনীত হয়। তবে উপন্যাসায়িত নাটক কিংবা নাট্যায়িত উপন্যাস উভয়ের শিল্পরীতি স্বতন্ত্র বলে ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। শরৎ-উপন্যাসের নাট্যরূপ শিল্প-বৈচিত্র্যের স্বতন্ত্র স্মারক হিসেবে কিংবা ব্যবসায়িক মঞ্চসাফল্যের নিদর্শন হিসেবে গৌরব অর্জন করলেও সেই নাটকগুলির অবলম্বিত উপন্যাসমূল্য অনেক বেশী চিরন্তনী। এই নাট্যায়িত উপন্যাসের বা উপন্যাসের অন্তর্নিহিত নাট্যচেতনার যথার্থ পরিচয় নিতে হলে শরৎমানসে নাট্যচেতনার বিবর্তন, বঙ্গমঞ্চ সংস্পর্শে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ, নাট্যচেতনা সম্পর্কিত তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার উল্লেখ, সম-সাময়িক রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের জনাদর প্রভৃতি প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা পূর্বেই ক'রে নিতে হয়। শরৎচন্দ্র শৈশবে গানবাজনা, অভিনয় প্রভৃতি ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 'বাতায়ন' (শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা, ২৬শে ফাল্গুন ১৩৪৪) পত্রিকায় 'শরৎচন্দ্রের বাল্য-কাহিনী' শীর্ষক স্মৃতিচারণায় শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন: "ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতেই শরৎচন্দ্র অধিকাংশ সময় কাটাইতেন, যেহেতু রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁহার বন্ধু।

সতীশচন্দ্র 'আদমপুর ক্লাব' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই আদমপুর ক্লাবের একটি ড্রামাটিক সেক্‌সান ছিল এবং সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে বাংলা নাটক অভিনয় করা ছিল এই ক্লাবের বৈশিষ্ট্য। 'মৃণালিনী', 'বিল্বমঙ্গল' ও 'জনা' নাটকের অভিনয়ে শরৎচন্দ্র যথাক্রমে মৃণালিনী, চিন্তামণি ও জনার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া 'আদমপুর ক্লাবের' সুখ্যাতি বর্ধিত করেন।" ১৯১৩ সালের ৮ই এপ্রিল রেঙ্গুনে থেকে লেখা প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের কাছে এক পত্রে শরৎচন্দ্রের নাট্যরচনা বিষয়ে প্রবণতার পরিচয় পাই—"আমিও একটা নাটক লিখবো বলে ঠিক করেছি। যদি ভালো হয় (হবেই।) কোন theatre এ প্লে করিয়ে দিতে পারো?" ৭ই মাঘ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে শরৎচন্দ্র লিখছেন—"আমি 'দত্তা' বইটার একখানা নাটক অপরের কাছে পেয়েছি; নিজেই কিছু কিছু অদল বদল ক'রে 'বিজয়া' নাম দিয়ে Star Theatreকে দেবো মতলব করেছি।" অপরকে দিয়ে উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের মানসিক অনুমোদন কিছুটা সংশয়াপন্ন ছিল। এর সাক্ষ্যে আমরা দু'টি পত্রাংশের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি—"আমার উপন্যাসগুলোর দোষ এই যে নাটক তৈরী করতে গেলে বহু স্থানেই একেবারে নতুন করে লিখতে হয়। বাইরের লোকের মুস্কিল এই যে তাঁরা তো নতুন কিছু দিতে পারে না, শুধু বইয়েতেই যে কথাগুলো

আছে তাই নাড়াচড়া কোরেই যা হোক্ কিছু একটা খাড়া করতে বাধ্য হন। সেইজন্য প্রায়ই দেখি ভালো হয় না।" কিংবা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি পত্রাংশ (৭ই আষাঢ়, ১৩৪০) ; "আপনি অপরকে দিয়ে পার্ট লেখাতে চাইছেন, কিন্তু সে কি আমার চেয়েও শীঘ্র পেবে উঠবে ? ওর দেখেচি অনেক অসুবিধা আছে মাঝখানে—গ্রন্থকার নিজে না হলে সে-সব স্থান পূর্ণ করে তোলা কঠিন বলেই মনে করি এবং অভিনয়েব দিক দিয়েও সে যে বিশেষ ভালো হবে তাও ভরসা করি নে। আমার নিজের লেখা হলে সে বাধা থাকে না।" আর নাট্যচেতনা বিষয়ে শরৎমানসের শ্রেষ্ঠ দর্পণ হল পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রটি ('নাচঘর' পত্রিকায় ২৫শে আশ্বিন ১৩৪১ এ প্রকাশিত) :

"আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। · এই অক্ষমতাকে অস্বীকার করে যদিই বা নাটক লিখি, তা হ'লেও আমার মজুরী পোষাবে না।···গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ, শিখিয়ে দিন ব'লে কারও বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটেনি। কিন্তু নাটক ? রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ জায়গায় অ্যাকশন্ (action) কম, দর্শকে নেবে না, কিম্বা এ বই অচল, ত তাকে সচল করার কোন উপায় নেই। তাঁদের রায়ই এ সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা-দেনে-ওয়ালা দর্শকের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ-বিপদের মধ্যে খামকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে। নাটক হয়তো আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভাল না হ'লে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পোঁছয় না—সেই ডায়ালোগ্ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমনভাবে বলতে হয়, কতো সোজা ক'রে বললে তা মনেব ওপর গভীর হয়ে বসে, সে কৌশল জানিনে তা নয়। এ ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি ব'লেই বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশন সৃষ্টি করতে হয় চরিত্রসৃষ্টির জন্যেই। চরিত্র-সৃষ্টি দু'রকমেব হতে পারে—এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্রপাত্রী যা, তাই ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রেব বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে তার জীবনের পরিবর্তন দেখানো।···আর একটা কথা - উপন্যাসের মতো নাটকের elasticity নেই, নাটককে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশী এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা,—তাও হয়তো চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি ক'রে কি হবে ? নাটক যে লিখবো, তা অভিনয় করবে কে ? শিক্ষিত

বোঝদা'র অভিনেতা-অভিনেত্রী কই? নাটকের হিরোইন্ সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী ত নজরে পড়ে না। এমনি ধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিক্‌টায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না।" কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই খেদোক্তি তাঁব পরবর্তী সাহিত্যজীবনে বাস্তব সত্য হয়ে কখনই দেখা দেয়নি। বাংলা নাটকে শরৎ-শিশির ভাদুড়ী সংস্পর্শ মঞ্চে অসাধারণ সাফল্যকে করায়ত্ত করেছিল। শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই শিশিরকুমাবের প্রয়োজনায় ষোড়শী, রমা, বিরাজবৌ, বিজয়া, অচলা অর্থাৎ গৃহদাহ অভিনীত হয়। এই যুগ বাংলা নাট্যশালার নবযুগের দ্বিতীয় পর্ব। আর্ট থিয়েটার ও নাট্যাচার্য শিশিবকুমারেব নাট্যমন্দিবেব ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'বাংলা নাটক ও নাট্যশালা' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—'শিশিবকুমাবই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের সংযোগকে সার্থক কবে তুলেছিলেন। তাঁব সেই আদর্শ এই দ্বিতীয় পর্বে বিশেষ ভাবে অনুসৃত হয়েছে একাধিক নাট্যমঞ্চে। মঞ্চে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সম্ভাব্যতা শিশিরকুমাবই প্রথম উপলব্ধি কবেছিলেন এবং সামাজিক ও পাবিবারিক নাটকের অভিনযে শবৎচন্দ্রেব একাধিক উপন্যাসেব নাট্যরূপকে অবলম্বন কবে যে নূতন উদ্দীপনা দুই যুগ ধবে চলেছিল, সে ইতিহাস মনে রাখবার মতন।" শিশিব-উত্তব বাংলা নাট্যশালায শবৎচন্দ্রের পথের দাবী, চরিত্রহীন, কাশীনাথ, পবিণীতা, নিষ্কৃতি, শ্রীকান্ত ইত্যাদি উপন্যাসেব নাট্যরূপ অভিনীত হযেছিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট শিশিরকুমার মঞ্চস্থ করলেন 'ষোড়শী'। ১৯২৮ সালেব ৫ই আগস্ট আর্ট থিয়েটাব কর্তৃক 'রমা' নাটক অভিনীত হযেছিল—পবে "শিশিবকুমাবেব প্রয়োজনায় নাট্যমন্দিরে এই নাটকটি অধিকতর সার্থকভাব সঙ্গে অভিনীত হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর মিনার্ভা মঞ্চে সর্বপ্রথম 'চন্দ্রনাথ' অভিনীত হয়। আবার ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা মঞ্চে বীবেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নাট্যায়িত 'চন্দ্রনাথ' নতুনভাবে অভিনীত হয়ে প্রচুর জনসংবর্ধনা লাভ করেছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর স্টার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের পুরাতন নাট্যমন্দিরের পরিবর্তিত নাম 'নব নাট্যমন্দির' কর্তৃক অভিনীত হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের ১৩ই মে শচীন সেনগুপ্ত নাট্যরূপায়িত 'পথের দাবী' অভিনয় করিয়েছিলেন প্রবোধ গুহ —সাময়িকভাবে সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়ে নাট্যনিকেতনে এটি অভিনীত হয়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তর কালে রঙমহলে দ্বিতীয়বার 'পথের দাবী' অভিনীত হয়েছিল। অতি-সাম্প্রতিক কালেও 'পথের দাবী'র অভিনয় প্রসঙ্গে 'দেশ' (৩০শে আগস্ট, ১৯৭৫) পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে—"শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অধ্যায়ের স্মৃতি

বিশেষভাবে জড়িত। শরৎ-জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে তাই ওয়েস্ট বেঙ্গল মাস্টার প্রিণ্টারস অ্যাসোসিয়েশন প্রযোজিত 'পথের দাবী' নাটকের অভিনয় ('স্টার' রঙ্গমঞ্চে) একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্পীদের সম্মিলিত অভিনয় নাটক-টিকে উপভোগ্য করে তোলে।" (পৃ. ৪০০) 'রঙমহলে' ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে চরিত্র-হীনর প্রথম অভিনীত হয়েছিল 'চরিত্রহীন'-এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যোগেশ চৌধুরী। নাট্যরূপের শিল্পকলার দিক দিয়ে নট ও নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর উপর শরৎচন্দ্র বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করেছেন কালীশ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎকাহিনী মঞ্চে ও পর্দায়' নামক প্রবন্ধে ('অমৃত': শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যা): "রঙমহল কর্তৃপক্ষ ভিন্ন নাট্যকারকে দিয়ে চরিত্রহীনের নাট্যরূপ দেবার জন্য অগ্রসর হলে শরৎচন্দ্র মঞ্চস্বত্ব বিক্রয়ে অস্বীকৃত হন এবং যোগেশচন্দ্রকে দিয়ে নাট্যরূপ দেবার শর্তে কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত হলেই চরিত্রহীনের মঞ্চস্বত্ব বিক্রয় করেন।" (পৃ. ১০৯) 'নাট্যভারতী'তে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জুলাই শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নাট্যায়িত 'দেবদাস' অভিনীত হবার পরেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে শরৎকাহিনীর জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হয়েছিল। বিধায়ক ভট্টাচার্য নাট্যরূপায়িত 'বিপ্রদাস' ১৯৪৩ সালে শ্রীরঙ্গমে অভিনীত হয়েছিল। যদিচ শিশিরকুমারের ব্যবস্থাপনায় এই নাটকটি অভিনীত হয়েছিল—তথাপি পরিচালনার কৃতিত্ব ছিল বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর। ১৯৪৪ সালের ২২শে জুন দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যরূপায়িত 'বামের সুমতি' রঙমহলে অভিনীত হয়েছিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর অধুনালুপ্ত কালিকা থিয়েটারে উদ্বোধনী নাটক হিসেবে অভিনীত হয়েছিল বিধায়ক ভট্টাচার্য নাট্যরূপায়িত 'বৈকুণ্ঠের উইল': বিধায়ক ভট্টাচার্য নাট্যরূপায়িত 'মেজদিদি'ও কালিকায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। ছবি বিশ্বাসের প্রযোজনায় ধর্মতলার কবিনুিয়ান থিয়েটারে অমর বসু নাট্যরূপায়িত 'স্বামী' অভিনীত হয়েছিল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর দেবনারায়ণ গুপ্তের নাট্যরূপায়ণে 'স্টার' থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা'। দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যরূপায়িত 'শ্রীকান্ত' (১ম ও ২য়) ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি 'স্টারে' মঞ্চস্থ হয়েছিল। শ্রীকান্তের ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড নিয়ে দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যায়িত 'রাজলক্ষ্মী' অভিনীত হয়েছিল।

শরৎ-নাট্যাভিনয়ে বিভিন্ন শৌখীন সংস্থা, বিভিন্ন অফিস-ক্লাব ইত্যাদির প্রয়াসও শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়।

॥ তিন ॥

নাট্যরচনায় গঠনশৈলী প্রসঙ্গে নাট্যকারকে বিশেষভাবে অবহিত থাকতেই হবে। গঠনশৈলীর গুণগত দিকটি পরোক্ষভাবে মঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত বলে

মঞ্চচেতনা বিষয়ে সম্যক জ্ঞানও নাট্যকারের থাকা চাই। মঞ্চরসিকদের কাছে নাটকের ট্র্যাজিক রসাবেদন আরও আকর্ষণীয় বলে শরৎচন্দ্র 'দেনাপাওনা'র মিলনান্তক পরিণতিকে 'ষোড়শী'তে বিষাদান্তক মঞ্চ-পরিণতি ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল তাঁর 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী'তে মন্তব্য করেছেন : "শরৎচন্দ্র শিশিরকুমারকে নিরাশ না করে উক্ত নাটকখানিকে আমূল পরিবর্তন করে দেন। তবে মূল উপন্যাসের পরিণতি ও নাটকের পরিণতির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান দেখা যায়···তা শিশিরকুমারের একান্ত অনুরোধেই শরৎচন্দ্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও করতে রাজী হন।" (পৃঃ ১৮৭) 'ষোড়শী' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"আমার বিশ্বাস, তোমার নাটক লিখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাহিরের আকৃতি, এই দুইটিই যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্রচিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেন না, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত···ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসী করতে চেয়েচ এবং তার দামও পেযেচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুন্ন করেচ।" রবীন্দ্রনাথ 'ষোড়শী'র মঞ্চসাফল্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের এ বিষয়ক প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়েও তাঁর নাট্যচেতনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—"এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্রসৃষ্টির জন্য যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি, এতে তা পারিনি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সংকীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারংবার অনুভব করেছি—এ ঠিক হচ্ছে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয় তখন ঠিক কিভাবে যে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধকরি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরীর চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে, একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ হয়, কিন্তু আর দিকে ত্রুটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই।" আর নাট্যরসতাৎপর্যের ক্ষেত্রে 'উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সেও যে শাস্তি দেয়।' অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠেই এ-কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন। 'ষোড়শী'র নাট্যরূপে অভিনবত্ব হয়তো খুব বেশী সংযোজিত হয়নি। মদ্যপায়ী জীবানন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা নাট্যরূপে একটু অতিমাত্রায় প্রকট হয়েছে। ষোড়শীর পরিবর্তন উপন্যাসে যতটা ক্রমসম্বন্ধ—নাটকে তার পরিণতি খানিকটা নাটকীয় হলেও আকস্মিক। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্গে শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভার মিলন 'ষোড়শী'কে রঙ্গমঞ্চে আরও বরণীয় করেছে।

'ষোড়শী' চার অঙ্কের নাটক। দৃশ্যবিভাজনপরিকল্পনা যথাক্রমে প্রথম অঙ্কে চারটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে একটি করে দৃশ্য। কাজেই অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাজনে তিনি তৎকালীন প্রচলিত রীতির অনুসারী নন।

কাহিনীর বর্ণবিরলতা এবং নাটকীয় গুণের ঘাটতি 'দত্তা'র নাট্যরূপ 'বিজয়া'য় অনুপস্থিত। প্রচলিত পঞ্চাঙ্ক রীতি এখানে অনুসৃত হলেও দৃশ্য-পরিচয়ে সম-পরিসর ও বিস্তৃতি রক্ষিত হয়নি। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে বৃহত্তর সমাজসমস্যার উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে যে ব্যাপ্ত জীবনরস সঞ্চারিত, 'রমা' নাটকে মঞ্চ-রসিকেরা সেই স্বাদ থেকে বঞ্চিত। উপন্যাসের মূল পরিচ্ছেদগুলি নাটকীয় প্রয়োজনে এখানে পুনর্বিন্যস্ত হয়নি। 'রমা' নাটকে চার অঙ্কে উপন্যাসের উনিশটি পরিচ্ছেদ সংলাপমূলক ও দৃশ্যাত্মক রীতিতে সন্নিবিষ্ট হলেও নাট্যরস ঘনীভূত হতে পারে নি। মূলতঃ চরিত্রগুলির আপাতবৈপরীত্য এবং রমেশ-রমার সম্বন্ধের আকর্ষণ-বিকর্ষণজাত লীলারস দর্শকের কৌতূহল ও আগ্রহকে উচ্চকিত করে রেখেছে। রমেশের আদর্শবাদী রূপ নাটকে গৌণ হয়ে নাটকীয়তার পোষকতা করেছে। নাটকের পরিণতিতে রমার অবরুদ্ধ বেদনার মিনতি দর্শকের হৃদয়কে আবেগে রুদ্ধ করেছে।

'বিজয়া' নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে শরৎচন্দ্র 'নববিধান'-এর নাট্য-রূপ দিতে প্রয়াসী হলেও শিশিরকুমারের অসুস্থতায় সে পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি। শিশিরকুমারের অনুরোধে শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নাট্যরূপ রচনা শুরু করেছিলেন —কিন্তু দু' অঙ্ক রচনার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে নবনাট্য মন্দিরে শিশিরকুমারই 'গৃহদাহের' নাট্যরূপ 'অচলা' মঞ্চস্থ করেন —কিন্তু তা রঙ্গমঞ্চে খুব সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

॥ চার ॥

শরৎসাহিত্যের অন্তর্নিহিত নাট্যচেতনা উপন্যাসকে নাট্যায়িত করে রঙ্গ-মঞ্চে যেমন দর্শকচিত্তকে অভিভূত করে রেখেছে—তেমনি এই নাট্যচেতনার আশ্রয়েই শরৎসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়িত শিল্পরূপও বিকাশলাভ করেছে। অবশ্য চিত্রনাট্যকারের নির্দেশে এবং ভাষাতেই এই চলচ্চিত্রগুলির শৈল্পিক মানদণ্ড রচিত হয়েছিল। দক্ষ চিত্রনাট্যকার ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোনের শক্তি-সামর্থ্যকে ব্যবহার করে দেশ-কালে ব্যাপ্ত ঘটনাকে সুকৌশলে সন্নিবেশিত করতে পারেন। কিন্তু মঞ্চনাট্যকার বিশেষ দৃশ্য-সজ্জার পটভূমিতে নাটকের পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নির্দিষ্টতাকে মাত্র ফুটিয়ে তোলেন। চিত্র-নাট্যকার নাট্যকারের মতো নেপথ্যবাসী নন। চিত্র-নাট্যকারকে সমালোচকেরা

'চিত্রভাষা-ভাষী ঔপন্যাসিক' রূপে চিহ্নিত করেছেন। ঔপন্যাসিকের রীতিতে কিন্তু চিত্রের ভাষায় চিত্রনাট্যকারকে কাহিনী রসোত্তীর্ণ করতে হয়। আমাদের নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রে যান্ত্রিক কুশলতার প্রশ্ন যেমন অনিবার্যভাবেই সীমাবদ্ধ ছিল—তেমনি অভিনয়রীতির মধ্যেও মঞ্চধর্মী আনুগত্যের দিকটিও ছিল লক্ষণীয়। তাঁর সাহিত্যের নাট্যিক রসবৈশিষ্ট্যই মূলতঃ তাঁকে সফলতম চলচ্চিত্রের কাহিনীকার করে তুলেছে। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী শিশির-কুমার ভাদুড়ীব পরিচালনায় ১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' উপহার দিলেন। নির্বাক যুগে শরৎচন্দ্রের যে সমস্ত কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছিল —তা হল : চন্দ্রনাথ, দেবদাস, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন। 'চরিত্রহীন' পবি-চালনা করেছিলেন ডি. জি (ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়); কিছুদিন পূর্বে কলকাতা টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে পূর্ণেন্দু পত্রীব সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকাবে ডি. জি এ বিষযে স্মৃতিচারণা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীনে'র সুটিংয়ের সময় দেউলটি থেকে স্টুডিওয় এসে শিল্পীনির্বাচনে সহায়তা কবে সক্রিয় সহযোগিতা করতেন। নির্বাক যুগেব চলচ্চিত্রে শরৎসাহিত্যেব শেষ রূপায়ণ—শিল্পী চারু রায়েব পরিচালনায় 'স্বামী'। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীব পবিচালনায় সবাক্ চলচ্চিত্রেব প্রথম অধ্যাযে স্মরণীয় সাহিত্যের প্রথম বাংলা চিত্ররূপ শরৎচন্দ্রেব 'দেনাপাওনা' (১৯৩১ সালেব ২৪শে ডিসেম্বর চিত্রমুক্তি)। ১৯৩২ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্স উপহার দিলেন শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'। শরৎসাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালিত 'দেবদাস' —তিনি প্রচলিত গতানুগতিক পদ্ধতি এবং প্রকরণ থেকে সরে গিযে অথচ চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্রের শর্ত মেনে নতুন আঙ্গিকে 'দেবদাস'-এর চিত্ররূপ দিলেন। ব্যক্তিগতভাবে শরৎচন্দ্রের এই চিত্ররূপ অত্যন্ত ভালো লেগেছিল—পরিচালকের কৃতিত্বকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিযেছিলেন তিনি। মূল গল্পের দ্বন্দ্ব ও সংকটের স্থানগুলিকে ছবির মধ্যে সংযম ও সতর্কতায় উত্তীর্ণ করে দেবার কৃতিত্বকে শরৎচন্দ্র ভূয়সী প্রশংসা জানিয়েছিলেন। 'বিজয়ার' চিত্রগ্রহণকালে শরৎচন্দ্র নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে এসে সমস্ত কাজ-কর্ম বিশেষভাবে পরিদর্শন করেছিলেন। 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার 'শরৎশতবার্ষিকী সংখ্যা'য় একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে। "এই স্টুডিও পরিদর্শন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ধরে রাখা হয়। পরে 'আশীর্বাণী' নাম দিয়ে 'বিজয়া' চিত্রের সঙ্গে দেখানো হয়।" সবাক্ চলচ্চিত্রের পরবর্তী ও সাম্প্রতিক পর্যায়ে চলচ্চিত্রায়ণে শরৎকাহিনী প্রায় নিঃশেষিত। তার পরিচয় নতুন করে উল্লেখ করার হয়তো আর প্রয়োজন নেই। শরৎ-কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে চিত্রনাট্যকার,

পরিচালক ও সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কয়েকজন সাহিত্যিকের সহ-যোগিতার কথাও এক্ষেত্রে ইতিহাসের পর্যালোচনার কারণেই সংযোজিতব্য—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দীনেশরঞ্জন দাস, সজনীকান্ত দাস, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

শরৎ-সাহিত্যে নাট্যচেতনার বিস্তার ও তার পর্যালোচনা তাই শুধুমাত্র সাহিত্যের রসতাৎপর্যের ব্যাখ্যা বা সমীক্ষাই নয়--সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নাট্যজগৎ, মঞ্চজগৎ, চিত্রজগৎ ইত্যাদির বিবর্তনের সঙ্গে জড়িত সাংস্কৃতিক জগতেরও পর্যালোচনা—বাঙালীব রসসংস্কৃতির আত্মাবিষ্কাবে ভাস্বর।

শরৎপরিক্রমা

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলার কথা অনেক সময় স্মৃতির পট থেকে একেবারে মুছে গেলেও কিছু কিছু শিলালিপি আছে যা কিছুতেই মোছে না, যদিও অস্পষ্ট হয়। শরৎচন্দ্রকে বাল্য কৈশোরের এক সন্ধিক্ষণে হাওড়া শহরের বৈকুণ্ঠ চাটুজ্জের লেনে কংগ্রেস অফিসের সামনে একবার দেখেছিলাম, আর একবার হাওড়া টাউন হলে এক বিরাট সভায়—ঢাকা থেকে ডি. লিট্ পাওয়ার পর তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য যে সভা হয়েছিল। বাজে শিবপুরে কানাগলির মধ্যে ইঁট-বার-করা একতলা বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরিও করেছি কিছু কিছু, উদ্দেশ্য—বহুপ্রার্থিতদর্শন দরদী কথাশিল্পীকে একবার চোখে দেখা। কিন্তু সুযোগ মাত্র দুবারই মিলেছিল। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগের সেসব ঘটনা স্মৃতির পট থেকে মুছেই গেছে। হঠাৎ শরৎস্মৃতি উৎসব সম্পর্কে দু-চারকথা ভাবনা-চিন্তা করতে করতে সেই বাল্যজীবনের নিষ্প্রভপ্রায় ঘটনাগুলি আবার উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল।

শরৎচন্দ্রকে আমরা কেন ভালবাসি, একথার জবাব দেওয়া দুরূহ, কারণ ভালোবাসার কোন 'কেন' নেই। ভালো লাগে বলেই ভালোবাসি। দক্ষিণ ভারতের এক বন্ধু বলেছিলেন যে, তেলুগুভাষায় অনূদিত শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ অন্ধ্রপ্রদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এক পথচলতি কাশ্মীরি বন্ধু বলেছিলেন যে পর্বত-উপত্যকার বাসিন্দা হয়েও তিনি শ্যামল বাংলাদেশের কাহিনীগুলির মধ্যে তাঁর জীবনে ভীড়-করে-আসা অসংখ্য নবনারীর মিছিল দেখতে পান। তখন আমার মনে হয়েছিল ভারতবর্ষে একালের যদি কেউ আন্তঃপ্রাদেশিক লেখক থাকেন তবে তিনি শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ মাথার মানিক, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক নাটুকে মহলেও খুব জনপ্রিয়, কিন্তু ভাষা আচার ব্যবহার রীতিনীতি ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও অন্য প্রদেশের হৃদয়বান পাঠক অনূদিত শরৎগ্রন্থে কী রস পায় তা আমি সেই সময়ে উপলব্ধি করেছিলাম।

আমার তো মনে হয় আন্তঃপ্রাদেশিকতা যে সাহিত্যে আছে, অর্থাৎ যে সাহিত্যে ভাষা ভুগোলের গণ্ডী কাটতে পেরেছে তাকেই আমরা যথার্থ ভারতের সাহিত্য বলতে পারি। যাঁরা বলেন শরৎচন্দ্র হয় কোলকাতার মেসবাড়ি থেকে, নয়, কালাপানির পার রেঙ্গুন থেকে সমস্ত জীবনকে দেখেছেন তাঁরা বোধহয় শরৎচন্দ্রের প্রতি কিছু অবিচার ক'রে থাকেন। শরৎচন্দ্রের গল্পকাহিনীর আধার

হয়েছিল বাঙলাদেশ, কোলকাতা ও কোলকাতার বাইরের পল্লীগ্রাম। শরৎচন্দ্র যে সমস্যাগুলি সাহিত্যে তুলেছিলেন সেগুলি হল একান্তভাবে বাঙালীর নিজস্ব ঘরোয়া সমস্যা—বিধবাবিবাহ, কৌলীন্য, স্বামী বর্তমানে অন্য পতি গ্রহণ, এবং তথাকথিত পণ্যারমণীর মধ্যে সীতা-সাবিত্রীকে আবিষ্কার। এই সমস্যা অন্যান্য প্রদেশে ঠিক এইরকম উৎকট নয়। যেমন ধরা যাক অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান সমাজ। উল্লিখিত পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলির দ্বারা তাঁদের সমাজ ও পরিবার প্রায় কোথাও আক্রান্ত হয় নি। সুতরাং এর তীব্রতাজনিত বেদনা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তাঁদের মধ্যে নাও থাকতে পারে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে তাঁদের সমাজেও শরৎচন্দ্রের এই গ্রন্থগুলির অসাধারণ জনপ্রিয়তা আমরা লক্ষ্য করেছি। রমাঁ রোলাঁ ইংরাজী জানতেন না, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের ১ম পর্বের ইংরেজী অনুবাদ তাঁর ভগিনী ফরাসীভাষায় মুখে মুখে অনুবাদ করে অগ্রজকে শুনিয়েছিলেন। শুনে রমাঁ রোলাঁ মুগ্ধ হয়েছিলেন; সুইডেনের এক বাংলা গবেষক উইলিয়ম স্মিথ কিছুকাল কলকাতায় থেকে মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ওপর গবেষণা করছিলেন। তিনি দিলীপ রায় কৃত 'নিষ্কৃতি'র ইংরাজী অনুবাদ "The Deliverence" পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে উঠলেন। এইসব দৃষ্টান্ত দেওয়ার অর্থ—শরৎচন্দ্রের যে সমস্ত গল্পকাহিনীকে আমরা নিতান্ত 'tale' বলে মনে করি, অবারণ চোখের জলেই যার মোক্ষ প্রাপ্তি, সেগুলিও ভিন্নরুচির, ভিন্নভাষাভাষী পাঠকদের অন্তরে দোলা দেয়। এর কারণ বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের আধারে শরৎচন্দ্র নির্বিশেষ মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এইভাবেই বিশেষের সীমা লঙ্ঘন ক'রে নির্বিশেষের কক্ষে ধাবমান হয়। কত শতাব্দী আগে বৃদ্ধ হোমার ও ভার্জিল যেসব কথা লিখে গেছেন, আজকের আমাদের সঙ্গে তার কতটুকুই বা যোগাযোগ। তাহলে আমরা এখনো অ্যাণ্ড্রোম্যাকির বেদনায় মানসিক যন্ত্রণা উপলব্ধি করি কেন? কেনই বা রাজকুমার ইনিয়াস-এর ব্যর্থ ভাগ্যের জন্য মনে মনে ক্ষুব্ধ হই? এর একই কারণ। মহৎ শিল্প সমসাময়িকতাকে ছাড়িয়ে যায়। কাল যখন ইতিহাসের দ্বারা সীমাবদ্ধ, তখন কোন কিছুই অনন্ত নয়, না সাহিত্য, না জীবন। তবু কোন কোন সারস্বত সৃষ্টি অমরত্বের আংশিক অধিকার নিয়ে আসে। শরৎচন্দ্রের পাঁচাপাঁচি গল্পের মধ্যে সেই সীমাতিশায়ী অনন্ত বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করি। এইজন্য তিনি বারবার ভূগোল-ইতিহাসের সীমানা লঙ্ঘন ক'রে যাবেনই যাবেন।

একালের সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক শরৎচন্দ্রের গল্পকাহিনীর মধ্যে real-এর 'রোমান্স' লক্ষ্য করবেন। একসময়ে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

শরৎচন্দ্র কতোবড়ো realistic লেখক, সেবিষয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ফেঁদেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক, অতিশয় আবেগপ্রবণ লেখক বস্তুর যথাযথ বর্ণনায় কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করেন না। বস্তুতঃ realism কথাটাই মানুষের সৃষ্টিতত্ত্বে চলে কিনা জানি না। লেখক তাঁর মনের মুকুরে প্রতিফলিত জীবনকেই কথা-সাহিত্যে রূপ দেন এবং রূপ দিতে গেলেই মনের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে আসার জন্য সে বাস্তব ঘটনা কাহিনী আর নিছক বস্তুতন্মাত্রময় বাস্তব থাকে না, সে একটি কল্পনাশ্রয়ী ব্যক্তিগত আকৃতিলাভ করে। শরৎচন্দ্র চল্‌তি জীবনের ছবি আঁকলেও সেই জীবনগুলি তাঁর চোখের জলে আর্দ্র, বুকের বেদনায় নিষিক্ত। তারা যা, তাঁর কাছে এবং হৃদয়বান পাঠকের কাছে, তার চেয়েও অনেক বড়। সুতরাং একথা যদি বলি, ঘটনাকে ঘটা করে না সাজিয়ে তিনি মনের মুকুরেই সেগুলিকে বিন্যাস করেছেন, এবং 'বড়দিদি' থেকে আরম্ভ ক'রে 'শেষের পরিচয়' পর্যন্ত সর্বত্রই শরৎচন্দ্রই বর্তমান, তাহলে কি ভুল করা হবে ? অর্থাৎ একথা বলতে চাই যে শরৎচন্দ্র দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে যে নর-নারীগুলিকে আমাদের সামনে এনেছেন তারা অনেকেই বৃহৎ মহৎ-বিশাল নয়। কেউ মাতাল, গেঁজেল, চরিত্রভ্রষ্টা—অতি সাধারণ। কেউ সামান্য নারী—যার কোনরূপ মহিমাই নেই। অকস্মাৎ যবনিকা উঠে গেলে দেখা যায় সামান্য বিবর্ণ মানুষটি ভস্মভূষিত মহেশ্বরের মত বেদনায় নীলকণ্ঠ হয়ে দেখা দেয়। পণ্যাঙ্গনা বহ্নিপূত সীতার মত জ্যোতির্ময় লাবণ্যের অধিকারী হয়। আজকের দিনে রাম-রাবণ, যুধিষ্ঠির-দুর্যোধন, এমনকি কৃষ্ণা-দ্রৌপদীও দূরস্থান, গোবিন্দলাল নগেন্দ্রনাথ অমরনাথ—এঁরাও যেন কাছের মানুষ বলে অন্তরঙ্গতা দাবি করতে পারেন না। আকারে-প্রকারে এঁরা বিশাল, তাঁদের দুঃখবেদনাও তেমনিই বিশাল। তাই বোধহয় আমাদের মত ভূমিচারী মানুষ তাঁদের দেখে বিস্মিত হয়, কিন্তু অন্তরঙ্গ আশ্লেষে কাছে টানতে পারে না। এমনকি গোরা নিখিলেশ সন্দীপ কুমুদিনী অমিত অতীন্দ্র এলা—এদেরও আর একালের পথেঘাটে দেখা যায় না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলি কোলকাতায় ও গ্রামে এখনো দুর্লভদর্শন হয়ে পড়েনি। আমার এক বন্ধু বলেন, তাঁদের গ্রামে পল্লী-সমাজের সকলেই আছে, অবশ্য রমা-রমেশ ও বিশ্বেশ্বরী বাদ দিয়ে। সে যাই হোক শরৎচন্দ্র সামান্য মানুষের কারবারী। তাঁর নায়ক কল্পনার রথে আরোহী হয়ে সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে বিপুল ধ্বনিসহকারে আবির্ভূত হয় না। তারা সামান্য সাধারণ, সওদাগরী আপিসের কনিষ্ঠ কেরানী হরিপদর মত। তাদের অন্তরে ধলেশ্বরী নদীতীরের কোন বালিকার ছায়া পড়ে না, তবু এই সামান্য মানুষগুলি হঠাৎ ভস্মশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তখন দেখা যায় তারা জ্যোতির্ময়।

শরৎচন্দ্র সামান্যের বুকে এই অসামান্য হৃৎস্পন্দন শুনেছেন। এবং চোখের জলের মধ্য দিয়ে তারা আমাদের কাছে এসে বাণী প্রার্থনা করেছে।

একালের মার্জিতরুচির পাঠক শরৎচন্দ্রের করুণরসের গল্পগুলিকে বলবেন, সেগুলি আদিম আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই চরিত্র এবং রেখায় লেখায় মননের চিহ্নমাত্রও নেই। শুধুমাত্র আবেগ সম্বল করে কথাসরিৎসাগরে একালে তরঙ্গ তোলা যায় কি? উত্তরটা হল- বুদ্ধির দাহ হচ্ছে মনন! এই মনন মানুষকে স্বতন্ত্র, ব্যক্তিগত এবং পরিপার্শ্ব থেকে উদ্ধৃত ক'রে তোলে। কথা-সাহিত্যে মননে মানুষ একক, আবেগে সে বহু। আবেগের শ্রীক্ষেত্রে জাত-পাঁতের কোন ভেদ নেই। মুখে আমরা যাই বলি না কেন কথাসাহিত্যে এখনো আমরা আবেগের ভক্ত, সে আবেগ যতই আদিম ধরনের হোক না কেন। শরৎসাহিত্যকে কেউ কেউ এই বলে নিন্দা করেন যে এ সাহিত্য মননে দুর্বল, কিন্তু হৃদয়ের সবলতা এর ত্রুটি ঢাকতে পারে না। আমরা বলি মানুষ তো মননে-পূর্ণ কোন যন্ত্র নয়, সে সর্বোপরি হৃদয়বান। শরৎচন্দ্র আমাদের আবিষ্ট করেন হৃদয়ের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা ততটা নয়। যেখানে তিনি বুদ্ধিকে, তত্ত্বকে, উগ্র রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেখানে তিনি তাঁর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন -- যেমন 'শেষ প্রশ্ন', 'পথের দাবী', 'বিপ্রদাস'।

শরৎ-শতবার্ষিক উৎসব এখন অনেককেই শরৎচন্দ্রের প্রতি কৌতূহলী করে তুলছে, বিশেষতঃ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কথা কিছুই বলেননি, বিদ্যাসাগর নিজের জীবনসম্পর্কে দু-চার কথা লিখেই দাঁড়ি টেনেছেন। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবন'-এ সত্য, অর্ধসত্য, মিথ্যা এবং অস্তিত্বহীন কাল্পনিক ব্যাপারকে মিশিয়ে যেসমস্ত বাললোভন রূপকথা লিখেছেন তা অতিশয় সুখপাঠ্য হলেও তাঁর জীবনের সবকথা তাতে ধরা পড়েনি। রবীন্দ্র-নাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' আত্মস্মৃতিমূলক হলেও স্মৃতিকথা নয়। এ দুটি হল কবির বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের এক-একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সুবলয়িত impression। তাকে আত্মজীবনী বলে গ্রহণ করা যায় না। শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী নেই, আছে চিঠিপত্র। সেসমস্ত চিঠির আবার অধিকাংশই কাজের কথায় পূর্ণ। সাহিত্যে যিনি বাক্‌পটু, নিজের সম্বন্ধে তিনি প্রায় নীরব। তাই তাঁর জীবনকে ঘিরে এত রহস্য রোমাঞ্চ। তাঁর নেপথ্যের দিকে আমরা তর্জনীসংকেত করতে পারি কিন্তু যবনিকা কোনদিন উঠবে কিনা কে বলতে পারে।

শরৎচন্দ্রে কথাসাহিত্যের এক ক্রান্তিকাল পূর্ণ হল। বিশ শতকের প্রথম থেকেই তিনি লেখা শুরু করেন অথচ উনিশ শতক যাই-যাই করেও তাঁর মধ্যে

অল্পস্বল্প রয়ে গেছে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'—এটিতে যে পারিবারিক চিত্র আছে, সেটি নাকি নদীয়া জেলার বাঘআঁচড়া গ্রামের সত্য ঘটনা। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হলে আমরা বাল্যকালে গবেষণা করতাম এ নিশ্চিন্দিপুর আষাঢ়ুর ঘাট বারাকপুর, যা এখন বনগ্রামের কাছাকাছি, এই সমস্ত সত্যঘটনাই কি বিভূতিভূষণের উপাদান! রমেশ দত্তের 'সমাজ' ও 'সংসারে' রাঢ়ের পল্লীঅঞ্চলের পটভূমিকায় অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহের কাহিনী আঁকা হয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্র গল্প লিখতে পুরোপুরি সার্থক না হলেও এমন একটি স্বেচ্ছাচারিণী নারীকে এঁকেছেন যার ধরনধারন অনেকটা কিরণময়ীর মত। কৌলীন্য ও বৈধব্য হিন্দু উচ্চবর্ণের দুটি প্রধান ব্যাধি—উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ধরা পড়েছে। তারই শেষ তলানি বিশ শতকের গোড়ার দিকে এসে ঠেকল। এবং শরৎচন্দ্র সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করলেন। তিনি যেসব প্রশ্ন তুলেছেন তার মূল কিছুটা উনিশ শতকেই নিহিত। তবে গত শতকের পল্লীসমাজে ততটা ঘুণ ধরেনি, একান্নবর্তী পরিবার তখনো ভেঙে পড়েনি এবং পণ্যাঙ্গনার মধ্যে সতী-সাবিত্রীকে আবিষ্কার করবার মানসিকতা উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালীর ছিল না। শরৎচন্দ্র যখন আসরে অবতীর্ণ হলেন তখন বাঙালীর সমাজনামক সেই institution প্রায় ভেঙে পড়েছে, নাগরিক জীবনের সমাজ সংকীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে তিনটি প্রাণীর মধ্যে আবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে—স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান। এই পটভূমিকায় আবির্ভূত নরনারীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ও অদৃশ্য সমাজের কাল্পনিক সংঘর্ষ শরৎসাহিত্যের একটা মূল উপাদান। রমা ও রমেশের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে বেণী-শাসিত পল্লীসমাজ। কিন্তু শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মধ্যে সেরকম তো কোন ব্যবধান ছিল না। শ্রীকান্ত বাউণ্ডুলে পুরুষ, অনেকটা সাংখ্যের পুরুষের মত, বাহ্যতঃ কোন আসক্তির বন্ধন নেই। অপরদিকে রাজলক্ষ্মীর কোন সমাজ নেই, কারণ কাঞ্চনের বিনিময়ে সামাজিকের মনোরঞ্জন করাই তাঁর একমাত্র জীবনচর্যা। সুতরাং দুজনেই সমাজহীন যাযাবর। কিন্তু মিলন হয় না কেন, কেন রাজলক্ষ্মীকে মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া বাস পরে কাশীতে ছুটতে হয় দীক্ষা নেবার জন্য! এর কারণ বোধহয় এই—সমাজ নামক প্রচণ্ড শক্তি আমাদের উপরে অদৃশ্যভাবে মুঠি পেষণ করছে। তাকে দেখতে না পেলেও, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনবহিত থাকলেও, সে অদৃশ্যলোক থেকে অনিবার্য নিয়তির মত ধীরে ধীরে জাল গুটিয়ে আনে। শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকারা এই বন্ধন ছিঁড়তে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। এ যেন গ্রীক নেমেসিসের মত একটা আদিম প্রচণ্ড হিতাহিতজ্ঞানশূন্য শক্তি। এই নিয়তিকে মানুষ নিজেই

সৃষ্টি করেছে, নিজেই ভেঙেছে। শরৎচন্দ্র এই দ্বন্দ্বসংঘাতে রক্তাক্তকলেবর মানুষের হৃদয়টাকে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ও নবীনতর লেখকদের অল্প লেখাই পাঠককে পুনঃ পুনঃ পাঠে উত্তেজিত করে। শরৎচন্দ্রের রোমান্টিক অশ্রুকণাময় পরিচিত কাহিনীগুলি অবসরের সঙ্গী হয়, একবার নয়, বহুবার। একাধিক পঠন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের একটা মূল লক্ষণ। বাল্য-কৈশোরের সন্ধিস্থল থেকে শুরু করে যৌবন-প্রৌঢ়ত্বের সীমা পর্যন্ত তাঁর গল্পকাহিনীর সুদূর বিস্তার। বহুকাল পরে তাঁর বই আবার পড়তে গেলে আমরা সহসা স্মৃতিস্নাত হয়ে উঠি। কখনো বাল্যে, কখনো কৈশোরে, কখনো মধুময় যৌবনে, কখনো বা প্রশান্ত প্রৌঢ়ত্বের বৈরাগী অপরাহ্নে তাঁকে নতুন করে ফিরে পাই। বাঙালীর অন্তরলোক থেকে তিনি উত্থিত হয়েছেন, সারা ভারতের অন্তরলোকে তিনি প্রবিষ্ট হয়েছেন, বাঙালী হিসেবে এ আমাদের পরম গৌরব।

শরৎসাহিত্যের শিশুরা

অচল ভট্টাচার্য

শরৎচন্দ্রের বহু গল্প ও উপন্যাসে সমাজ ও সংসারেব বিভিন্ন পরিবেশে শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্ব বেশ বিশদ ভাবেই বিশ্লেষিত হয়েছে। কোন কোন গল্পের মুখ্য উপজীব্য শিশুচরিত্রচিত্রণ— যেমন রামেব সুমতি। কোন কোন গল্পের শিশুরা সংসারে বিশেষ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করেছে— যেমন বিন্দুর ছেলে-র অমূল্য, মেজদিদি-র কেষ্টা প্রভৃতি। ছেলেরা শুধু ভাঙে না, গড়েও। 'মামলার ফলে' পৃথগন্ন দুই ভাইয়ের সংসারে অভগ্ন সেতুর ভূমিকা গ্রহণ করেছে ছোট ভাইয়ের মাতৃহারা পুত্র গয়ারাম, অবশ্য জ্যাঠাইমা গঙ্গামণির স্নেহে ও প্রশ্রয়ে। অনুরাধা গল্পে জমিদার বিজয়ের মাতৃহারা পুত্র কুমারও একই ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কয়েকটি গল্পের ছোটরা আবার নেহাৎ-ই পার্শ্বচরিত্র ; যেমন, বিন্দুর ছেলে-তে নরেন, অভাগীর স্বর্গে কাঙালীচরণ, মহেশ গল্পে আমিনা, অনুরাধা-য় সন্তোষ। এদের তুলনায় বিলাসী গল্পেব মৃত্যুঞ্জয় চরিত্রটি অনেক বিশিষ্টতার দাবী রাখে।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র শিশুচরিত্রচিত্রণে আদৌ মনোযোগ দেন নি। সমগ্র বঙ্কিমসাহিত্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য কিশোরী-চরিত্র রাধারাণী। রাধা-রাণীর বযস যখন এগাব বৎসব তখন মাহেশেব বথের মেলায আমাদের সাথে তার প্রথম দেখা। কিন্তু কিশোরী রাধারাণীব চবিত্রের বিশেষ কোন পবিচয় পাঠকদের দেবার আগেই—উপন্যাসটির দুপাতার মধ্যেই লেখক তাকে ষোড়শী-যুবতীতে পরিণত করে গেছেন। ইন্দিরা উপন্যাসেব নায়িকা গঙ্গাব ঘাটে দুটি মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। "মেয়ে দুইটিব বয়স সাত আট বৎসর। দেখিতে বেশ, তবে পরমাসুন্দরীও নয়। কিন্তু সাজিয়াছিল ভাল।···তাহারা ঘাটের রাণায় নামিবার সময়ে জোয়ারের জলের একটা গান গায়িতে গায়িতে নামিল। ···তাহাদের নাম শুনিলাম, অমলা আর নির্মলা।" "বালিকা সিঞ্চিত রসে ইন্দিরা'র জীবন কিছু শীতল" হওয়ার পরই লেখক এদের কথা ভুলে গেছেন। ইন্দিরা উপন্যাসেই সুবো বা সুভাষিণীর ছোট ছেলে ও মেয়ের প্রসঙ্গে যৎ-সামান্য কিছু মন্তব্য ব্যতীত সমগ্র বঙ্কিমসাহিত্যে শিশু বা কিশোর চরিত্র চিত্রণের অপর কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না।

রবীন্দ্ররচনায় কিন্তু শিশু ও বালক-বালিকাদের মনস্তত্ত্বের প্রতি কৌতূহল

ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাসমণির ছেলে, দুটি, বলাই, চিত্রকর ও অন্যান্য বহু গল্পের কথা বাদ দিলেও জীবনস্মৃতিতে আমরা শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্বের এক সুন্দর চিত্র পাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আদিতে কবি—কবিসার্বভৌম, তারপর তিনি গল্পকার। তাই তাঁর শিশুজগৎ জীবন-রহস্যে পূর্ণ। ছোটদের পৃথিবীর মাটি-জল-গাছ-আকাশ-- সবই কিরকম যেন কৌতূহলজনক, রহস্যময়—যার প্রভাব শিশুচিত্তকেও এক ভাবঘন উদাসীনতায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। শরৎসাহিত্যের শিশুরা এ ধরনের প্রভাব হতে মুক্ত। প্রকৃতির সাথে মানবমনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ ও অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ রবীন্দ্র-সাহিত্যের অধিকাংশ শিশুর সর্বাঙ্গে। অপর পক্ষে, শরৎসাহিত্যের শিশুরা সর্বত্রই তীক্ষ্ণ ও রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন।

কী পরিবেশে ঘরের বন্ধনদশায় হাঁপিয়ে ওঠা শিশুপ্রাণ আড়ালে আবডালে দেখা প্রকৃতির সাথে মিলন রচনায় আকুল হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতির পাতায় সে বর্ণনার চিত্রময় বাণীরূপ ধরা পড়েছে। এই সঙ্গে শরৎ-জীবনীর বেশি নয় সামান্য দু-একটি ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখলেই শিশুচরিত্র চিত্রণে রবীন্দ্র-শরৎ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের উৎসটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেবানন্দপুরের পাঠশালার পড়ুয়াদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ছিলেন সর্বাপেক্ষা দুরন্ত কিন্তু মেধাবী। বালক শরৎচন্দ্র গ্রামের একান্তে অবস্থিত গলায় দ'ড়ের বাগান নির্ভয়ে পার হয়ে প্রতিদিন স্কুল যান। তিনি নির্ভীক, কিন্তু নির্মম নন। গভীর রাত্রে একাকী একটিমাত্র লণ্ঠন ও লাঠির ভরসায় রুগ্ন প্রতিবেশীর চিকিৎসার্থে তিন মাইল দূরের শহর হতে ডাক্তার বা ওষুধ নিয়ে আসেন। বড় হয়েও কি শিশু শরৎচন্দ্রের স্বভাবের খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেছিল? ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে শরৎচন্দ্র বাসা বাঁধেন হাওড়া শহরের বাজেশিবপুর এলাকার একটি গলিতে। সে সময়ের একদিনের ঘটনা। গলির একটি স্কুলে-পড়া ছেলে—বলাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় —একদিন বিকালে স্কুল থেকে ফিরে সমবয়স্কদের নিয়ে যখন গুলি খেলায় রত, তখন প্রৌঢ় শরৎচন্দ্র তাদের সাথে গুলি খেলায় যোগ দেন এবং অব্যর্থ টিপ দেখিয়ে তাদেরকে চমৎকৃত করেন। শরৎসাহিত্যের সব শিশুচরিত্রগুলিই গড়ে উঠেছে এইসব ঘটনার ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে —তাই সেগুলি এত বাস্তব, আমাদের কাছে এত বাস্তবঘেঁষা বলে মনে হয়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কিছুসময় কোন কোন শিশুচরিত্র কিছুটা গুরুত্ব অর্জন করলেও সমগ্র আখ্যায়িকায় তাদের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথমপর্বে অল্পবয়স্ক তিনটি সুবোধ বালক শ্রীকান্ত, ছোড়দা ও যতীনদা এবং দুঃসাহসী ইন্দ্রনাথের, 'চন্দ্রনাথে' বিশ্বনাথের

এবং শুভদা-য় মাধবের কথা। দেবদাসকে ছোট অবস্থায় একরূপে দেখি, বড় অবস্থায় আর-এক রূপে।

ঘটনাসমূহের সহজ বর্ণনাভঙ্গী এবং সৃষ্ট চরিত্রসমূহের প্রতি গভীর সমবেদনা শরৎসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। শিশুচরিত্রচিত্রণেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমভাবে বিদ্যমান। অপর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, ডানপিটে ও দুঃসাহসী চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেই শরৎ-লেখনী অধিকতর আকর্ষণীয়। বৌদি নারায়ণী ব্যতীত অপর সকলের অবাধ্য রামের ক্রিয়াকলাপ কিংবা দারিদ্র্যপীড়িতা অন্নদাদিদির সাহায্যার্থে দুঃসাহসী ইন্দ্রনাথের নিশীথ অভিযান এবং বাড়ির কঠোর শাসনকে উপেক্ষা করে শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ঘটনাগুলি পাঠকচিত্তকে এদের প্রতি বিরূপ করে না, সহানুভূতিশীল করে তোলে। অপরপক্ষে, ছাত্রজীবনের একমাত্র তপস্যা বিদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে মেজদা'র সুনিয়ন্ত্রণে (?) শ্রীকান্ত, ছোড়দা ও যতীনদা'র পাঠানুশীলন-প্রচেষ্টাটি লঘুকৌতুকের সুর সৃষ্টি করেছে মাত্র। তবে একথা নিশ্চিত এ রসিকতায় নিষ্ঠুরভাব স্পর্শ লাগে নি। শুধুমাত্র বক্রোক্তির দ্বারা বোঝানো হয়েছে- প্রচেষ্টাটি ছেলেখেলার পর্যায় অতিক্রম করে নি।

শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসে শিশু ও কিশোরচরিত্রগুলির সাথে সাথে এরূপ স্বভাবের একটি করে নারীচরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যারা তাদের প্রতি স্নেহশীলা—তা সে নারায়ণীর মত বৌদিই হোক, গঙ্গামণির মত নিঃসন্তান জ্যাঠাইমা হ'ক, বিন্দুর মত নিঃসন্তান কাকীমা হক, হেমাঙ্গিনীর মত সন্তানবতী রক্তসম্বন্ধহীনা হ'ক বা অনুরাধার মত অনূঢ়া যুবতী-ই হ'ক যার সাথে পারিবারিক বা সামাজিক কোন যোগসূত্রই নেই। শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথমপর্বে শ্রীকান্তের পিসিমার অল্প দু-একটি কথাতেই তার স্নেহসিক্ত অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যায়—শ্রীকান্তের প্রতি ত বটেই, ইন্দ্রনাথের প্রতিও। স্নেহের কাঙালী কাঙালীচরণের সকল অভাব পূর্ণ করেছিল তার মা অভাগী। মহেশ গল্পের আমিনা মাতৃহারা। সংসারে একমাত্র স্নেহ পায় সে বাবা গফুর মিঞার কাছ হতে। আমিনার ছোটো বুকেও জমা ছিল বৃদ্ধ অক্ষম পিতার প্রতি ভালোবাসার নির্ঝরিণী। আপাত দৃষ্টিতে অবাধ্য বা মূর্খ ছেলেগুলিও কিন্তু যারা তাদের প্রতি স্নেহশীলা তাদের প্রতি অন্তঃকরণের অন্তস্থল হতে আকর্ষণ অনুভব করে। বৌদি নারায়ণীর প্রতি রামের বা মেজদি হেমাঙ্গিনীর প্রতি কেষ্টার ব্যবহারে এই মন্তব্যেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

শরৎসাহিত্যের শিশুরা নিত্য নূতন সমস্যাপীড়িত বর্তমান সমাজের বাসিন্দা নয়। তার একমাত্র কারণ আমাদের সমাজ আজ যে ধরনের যুগসংকটের

সম্মুখীন শরৎচন্দ্রের সমকালীন সমাজে সেই সংকটের অস্তিত্ব ধরা পড়ে নি। তথাপি সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণশক্তি ও গভীর চিন্তাশীলতার সাহায্যে অঙ্কিত শরৎ-সাহিত্যের শিশুচরিত্রগুলির আবেদন আজও কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। শরৎ-সাহিত্যের দু-এক জায়গায় কোন কোন শিশুচরিত্রচিত্রণে সুলভ হৃদয়াবেগের ব্যবহার দেখা গেলেও সামগ্রিক বিচারে চরিত্রগুলি মানবীয় রসে পূর্ণ, সেজন্যই [illegible]

শরৎকথা

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

শতবর্ষ পূর্ণ হলো শরৎচন্দ্রের। একশো বছর পূর্বে, ৩১শে ভাদ্র ১২৮৩ বঙ্গাব্দে, ইংরাজী ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয় (জন্মস্থান মাতুলালয়, ভাগলপুর, বিহার)।

রবীন্দ্রোত্তর ও তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এক বিস্ময়কর আবির্ভাব। তাঁর পূর্বে বাংলা সাহিত্য যে ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল, সে ধারা বেগবতীহলেও এমন স্বচ্ছতোয়া ছিল না, পাঠকমনের পিপাসানিবৃত্তি করেনি। বুদ্ধি ও মনন-প্রসূত সাহিত্যের যুগে নিছক জীবনদর্শন ও অনুভূতি প্রসূত কথাসাহিত্যের স্রষ্টা শরৎচন্দ্র এক নবযুগ সৃষ্টি করলেন। উদঘাটিত করলেন সাধারণ মানুষের চরিত্র ও নিভৃত মনের গোপন কথা, যা চিরন্তন সত্য। জীবনের আচ্ছাদিত স্বরূপ অনাবৃত হলো সংকোচের গণ্ডি কাটিয়ে। মানব-চরিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো তাঁর গল্প ও উপন্যাসে। দেখতে দেখতে অতি অল্পকালের মধ্যে শরৎচন্দ্র হয়ে উঠলেন বাংলার জনপ্রিয় লেখক : গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর রচনা রেখাপাত করলো জনমনের নিভৃত অন্তরালে। নর-নারীর মনের কথা, সমাজে অনাদৃতা রমণীর সুখদুঃখ ও হৃদয়বত্তার কথা পূর্বে কোন লেখক এমন নিঃসঙ্কোচ সরসভাব সঙ্গে বলতে পারে নি। তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়ে পাঠকমন রসসিক্ত হয়ে উঠলো সাধারণ মানুষের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী।

সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে শরৎচন্দ্র নিবিড়ভাবে মেলামেশা করেছিলেন। তাই সাধারণ মানুষের চরিত্র তাঁর চোখে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল। তিনি মানুষকে দেখেছিলেন মানুষের মন নিয়ে, তাদেরই একজন হয়ে। দূরে দাঁড়িয়ে আভিজাত্যের মণিকোঠার অলিন্দ থেকে অথবা গবাক্ষপথে মানব-সমাজকে তিনি দেখেন নি। তাই তাঁর সৃষ্টি ও কল্পনায় মানুষের বাস্তব জীবন প্রতিফলিত হয়েছে, রূপায়িত হয়েছে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ আনন্দ ও বেদনা। তারা কেউ অতিমানব হয়ে ওঠেনি ; শো-কেসে সাজানো কল্পনার পুতুলও হয় নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে শরৎচন্দ্র সাহিত্যসাধনায় অবতীর্ণ হন নি। সহজাত প্রজ্ঞা, মানবতাবোধ ও অনন্যসাধারণ প্রাতিভজ্ঞান এবং স্বচ্ছ

দৃষ্টি নিয়ে তিনি মানবচরিত্রচিত্রণে অগ্রসর হয়েছিলেন। মানুষকে তিনি যে রূপে দেখেছিলেন সেই-রূপই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনীতে। জীবন-সমীক্ষা কোথাও চিন্তার পীড়নে আড়ষ্ট হযে পড়ে নি। চরিত্রসমীক্ষা সার্থক হয়ে উঠেছে। তাঁর যুগে তিনি হয়েছেন অপরাজেয় কথাশিল্পী।

শরৎচন্দ্র যখন সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হলেন, তখন বাংলা সাহিত্যের আকাশ রবি-রশ্মিতে প্রদীপ্ত। তারই অন্তরালে শুক্লা অষ্টমীর চন্দ্রের মত শরৎচন্দ্র তাঁর স্নিগ্ধ কিরণ বিস্তার করে ধীরে ধীরে উদিত হলেন। কাব্যে নয়, ছোটগল্প ও উপন্যাসের ছায়াপথ রচনা করে।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, এই দুই মহামনীষীর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য আমার জীবনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলাম প্রথম ছাত্রজীবনে শান্তি-নিকেতনে গুরুদেবরূপে। সেখানে গুরুশিষ্যের ব্যবধানই ছিল। তার অধিক ঘনিষ্ঠতার সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল না। তিনি ছিলেন সাধারণের নাগালের বাইরে। যখন তিনি আশ্রমে থাকতেন তখন মাঝে মাঝে ছাত্রদের সান্নিধ্যে আসতেন। সময় ছিল তাঁর নিক্তির ওজনে মাপ করা। সময়ের অপচয় কোন সময় করতেন না তিনি।

শরৎচন্দ্র ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ। নিতান্ত ঘরোয়া। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে এত্তেলা করতে হতো না। অতি সহজেই হাজির হওয়া যেতো তাঁর কাছে। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর স্নেহস্পর্শ পাওয়া যেতো। শুরু করতেন কুশল প্রশ্ন। তারপর গল্প। হাতে সময় থাকলে অনেক খোশগল্পও করতেন।

কথায় কথায় প্রায়ই বলতেন—জানিস্, আমাদের দেশের বাপমায়েরা ছেলেগুলোকে ছোটবেলা থেকেই ভীতু তৈরী করে। আমজাম পাড়বার জন্যে গাছে বা পাঁচিলে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে হৈঁই হৈঁই করে ওঠে: ওরে নাম, নাম। এখুনি পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবি। উঁচু গাছের মগডালে উঠলে তো কথাই নেই। বলে, আরে সর্বনাশ! ডাল ভেঙে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। হাড়গোড় ভেঙে চূর হবে।—আমি শুনে হাসি। ভাবি, ছেলেগুলো কি তবে গোবরগণেশ হবে! ছেলেবেলায় কী ডানপিটেই না ছিলাম। ভয় কাকে বলে তা জানতাম না।

সত্যি তাই। অসমসাহসী ছিলেন শরৎচন্দ্র।

যাক, যা বলছিলাম, তাই বলি।

শরৎচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি প্রায়ই বলতেন, রবীন্দ্রসাহিত্য পড়েই আমি গল্প-উপন্যাস লিখতে শিখেছি। যে ভাষায়

আমি লিখি, তা রবীন্দ্রনাথের কাছেই ধার করা। চন্দ্রের তো নিজের কোন আলো নেই ; তার আলো সূর্যের কাছে ধার করা।···রবীন্দ্রনাথের গোরা আমি বাইশ বার পড়েছি। শুধু পড়েছি তাই নয়। যতবার পড়েছি ততবার খাতায় নোট করেছি তাঁর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী। লিখে নিয়েছি নতুন কি শিখলাম।

একথা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ববীন্দ্রজয়ন্তীর বিবাট জনসভায়ও শরৎচন্দ্র বার বাব বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথেব কথা বলতে তিনি সব সময়ই গৌরববোধ কবতেন।

ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার অফিসে আমি প্রায়ই যেতাম। শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে সেখানে আসতেন তাঁর রয়ালটিব টাকা নিতে। তিনি এলে, মালিক হরিদাসবাবু খুব সমাদরের সঙ্গে বসাতেন এবং চা-সিগাবেট আনিযে দিতেন। হাসিমুখে রসালাপ করতেন। এমনিতে হরিদাসবাবু ছিলেন খুব গম্ভীব প্রকৃতির মানুষ। সাধারণতঃ লেখকদের সঙ্গে তিনি বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। সংক্ষেপে কাজের কথাটুকু শেষ করেই বিদায় দিতেন।

একদিন শরৎচন্দ্র যখন এলেন, আমি সেখানেই ছিলাম।

এসেই চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, কিহে হবিদাসবাবু। 'অভিঘবন্তী না পায় ঘব' যে গল্পটা ভারতবর্ষে বেরিয়েছে, পড়েছ ?

হাঁ। মাঝে মাঝে নতুন লেখকদেব গল্প উল্টে দেখি।

টাকা দিয়েছ কি ?

দিই নি। দেবো।

দেবে মানে তো দশ টাকা , না হয পাঁচ টাকা ?

ভাল গল্প হলে দশটাকাও দিই।

না না, অন্ততঃ তিরিশ টাকা দিও। গল্পটা শৈলজানন্দ খুব ভাল লিখেছে। এমন গল্প আমিও লিখতে পারতাম কিনা, সন্দেহ।

হরিদাসবাবু হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। --তিরিশ টাকায় তো নতুন লেখকদের উপন্যাসের কপিরাইট পাওয়া যায়।

তা যাক। আমি বলছি, এই গল্পটাব জন্যে তুমি শৈলজানন্দকে তিরিশ টাকা দিও। ভাল লেখাব জন্যে লেখকদেব উৎসাহিত করতে হয়।

সে তো নিশ্চয়ই।--হরিদাসবাবু আর কিছু না বলে, অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।

দেখলাম, তরুণ লেখকদের প্রতি শরৎচন্দ্র যথেষ্ট স্নেহশীল।

তখন বসন্ত রায় রোডে কবিশেখর কালিদাস রায়ের বাড়িতে রসচক্রের

অধিবেশন হতো। লেখকরা প্রায় সকলেই সেখানে আসতেন। আমিও যেতাম। কালিদাসদার ভাই রাধেশদা ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা।

রসচক্রের বার্ষিক অধিবেশন আয়োজিত হলো বরাহনগরে ও. সি. গাঙ্গুলির উদ্যানবাটীতে। সারাদিন সেখানে সাহিত্য আলোচনা, গান, খাওয়াদাওয়া ও আনন্দ-উৎসব হবে। লেখকেরা সকলেই সেখানে সমবেত হলেন। কালিদাসদা গাড়ি করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন জলধর সেন ও শরৎচন্দ্রকে। আমরা সকলেই খুব উল্লসিত হয়ে উঠলাম।

হলঘরে কেউ হারমোনিয়ম, কেউ কেউ তাস বা ক্যারমবোর্ড নিয়ে বসে ছিলেন। চা ও জলযোগের পর, শরৎচন্দ্র অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমায় কাছে ডেকে বললেন—হীরেন, একটা কম্বল নে। চল আমরা গাছতলায় গিয়ে বসি।

আসরের এক পাশ থেকে একখানা কালো কম্বল তুলে নিয়ে গেলাম তাঁর পিছু পিছু। একটা বড় আমগাছের ছায়ায় ঘাসের উপর কম্বলটা পেতে দিলাম।

আঃ! -শরৎচন্দ্র আরাম করে বসে, পকেট থেকে একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেটের টিন বের করে বললেন, 'গোব্রাহ্মণে বিবলে শুচি'। কি বলিস?

তারপর হেসে বললেন—আমার টিন থেকে যেন কোনদিন সিগারেট নিয়ে খাস্ না।

না। আমি কি আপনার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে খেতে পারি।- মাথা নীচু করলাম।

তিনি বললেন—তাতে দোষ নেই কিছু। কিন্তু এগুলো সব ওষুধ দেওয়া। খেলেই মুস্কিল।

আমি অনুরক্ত শিষ্যের মত বসলাম তাঁর সামনে, কিছুটা ব্যবধান রেখে।

নিজের আশেপাশে কম্বলের তলাকার মাটিটা হাত দিয়ে অনুভব করে বললেন—দেখেছিস তো ভাল করে? ঘাসের ভিতর সাপের গর্তটর্ত নেই তো!

না।

তা হলেই হলো। আমি নিজের জন্য ভয় করি না। ভয় তোমার জন্যে। আফিংখোরেরা সাপে খেয়ে মরে না। ওটাও তো সাপের বিষের মতই একটা জিনিস। নাম অহিফেন।· ·দেবানন্দপুরের মাঠে একদিন বেড়ার ধারে মস্ত বড় একটা গোখরো সাপ মরে পড়েছিল। লোকে বললে, সাপটা নাকি ভিন্ গাঁয়ের কোন আফিংখোরকে কামড়েছিল। সাপটা নিজেই মরে গেছে। লোকটা মরেনি, পালিয়েছে।

কোন প্রতিবাদ না করে আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম—কিন্তু সাপ তো মানুষকে কামড়ে তার রক্ত খায় না, তবে মরবে কেন ? নিজেই বিষ ঢালে। বিষ ঢেলে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু দুর্বল হলেও দাঁড়ায় না, পালিয়ে যায়। খানিক পরে বিষে ঢলে পড়ে মানুষটা। তবে আফিং খাওয়া অভ্যেস থাকলে মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে কাবু হয় না। যতখানি আফিমের বিষ সইবার ক্ষমতা তার আছে, তার মাত্রা না ছাড়ালে সে সাপের বিষে মরে না। কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে পড়ে। তারপর সামলে নেয। বিষের মাত্রা বেশী হলে সে মরে। নইলে মরে না, কাহিল হয়। তবে ভয়ে মরতে পারে। অনেকে মরেও তাই।

ঠিক বলেছিস। সাপ তো মানুষকে কামড়ে তাব রক্ত খায় না। তা হলে আফিংখোরকে কামড়ালে সাপ মরবে কেন!—কথাটা তো কোনদিন ভাবি নি। —শিশুর মত হেসে উঠলেন শরৎচন্দ্র।

কথার মাঝখানে এসে পড়লেন কবি বিভাস রায়চৌধুরী, রাধিকারঞ্জন গাঙ্গুলী ও সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎবাবু মাথা নেড়ে তাদের বসতে বললেন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বোধহয় এই দিকেই আসছিলেন। হঠাৎ কী ভেবে পুকুরঘাটে গিয়ে শান-বাঁধানো পঁইঠার উপর জামাকাপড় খুলে বেখে, গলার চাদরটা কোমরে জড়িয়ে জলে নেমে পড়লেন। বড় বড় চুলগুলো দুহাতে উল্টে নিয়ে, ডুবের পর ডুব দিতে শুরু করলেন।

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—দেখ, দেখ, নেপেনের কাণ্ডটা দেখ। মাথা বোধ-হয় বুঁদ হয়ে আছে।

তারপর আপন উচ্ছ্বাসে বলে চললেন—যাকগে, মবার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। বলি শোন। গল্প নয়, আমার চোখে দেখা সত্যি ঘটনা।

আমি তখন দেবানন্দপুরের বাড়িতেই ছিলাম। বর্ষাকাল। সন্ধ্যা হতেই ঝড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি শুরু হলো। রীতিমত দুর্যোগ! কার সাধ্য বাইরে বেরোয়। যেমন দমকা ঝড় তেমনি বৃষ্টির ঝাপটা!

ঘরে বসে লিখছিলাম। রাত তখন প্রায় দুটো। হঠাৎ কানে এলো একটা করুণ কান্নার শব্দ। কে যেন হাহাকার করে কাঁদে!

ঝড়ো বাতাসে কান্নার শব্দটা কখনো স্পষ্ট, কখনো বা অস্পষ্ট হয়ে ভেসে আসে। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলাম। মনে হলো বেশ কিছুটা দূরে কেউ কাঁদে। নারীকণ্ঠ।

সরোজিনী পিসি নয়তো!

ও পাড়ার সরোজিনী পিসির ছেলেটার একুশ দিন ধরে টাইফয়েড জ্বর।

তিন-তিনটে ছেলে মরার পর এই ছেলেটাকে কোলে নিয়ে সরোজিনী পিসি বিধবা হয়েছিল। গরিব বিধবার সংসার। নানান্ দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে পিসি ছেলেটাকে মানুষ করেছে।

আর বসে থাকতে পারলাম না, একটা ছাতা নিয়ে, হ্যারিকেন হাতে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় জনমনুষ্য নেই। দু-একটা শেয়াল শুধু রাস্তার এপার থেকে ওপারে গিয়ে ঝোপের ভিতর আশ্রয় নিচ্ছে।

ঠিক যা ভেবেছি তাই। সরোজিনী পিসিরই কান্না। বুকভাঙা কান্নার রোল। —ছেলেটা কি তবে মরলো!

ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলাম। সরোজিনী পিসি দরজাটা খুলে সামনে দাঁড়ালো। আলুথালু বেশ। কান্নায় ভেঙে পড়ছে। আছড়ে পড়লো পায়ের কাছে। --শরৎ, সব শেষ হলো বাবা। আর কী নিয়ে বেঁচে থাকবো। না না, আমি গলায় ফাঁস দিয়ে মরবো, ঝাঁপ দেবো জলে।

সেই অন্ধকারে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় সরোজিনী পিসি। পুত্রহারা মা শোকে পাগল হয়ে উঠেছে। হয় গলায় দড়ি দিয়ে, না হয় জলে ডুবে মরবে সে। তাকে সান্ত্বনা কি দেওয়া যায়!

জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে পিসিকে ঘরের ভিতর বসালাম। হাহাকার করে লুটিয়ে পড়ে ঘরের মেঝেয়। বুকভাঙা আর্তনাদ।

কেঁদে আর কী করবে পিসি? যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। যাই, দুচার জন বন্ধুবান্ধব ডেকে আনি। রাত আর বেশী নেই। ভোর হয়ে এলো। রাত পোহালে বাসি মড়া হবে।

দমকা বাতাসে ঘরের প্রদীপটা অনেক আগেই নিবে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম, ঘরে দেশলাই আছে পিসি?

না।

মনে হলো হ্যারিকেনের চিমনিটা তুলে প্রদীপটা জ্বালিয়ে দিই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, চিমনিটা হাঁসকল টিপে উঁচু করে তুললে বাতাসে হ্যারিকেনটাও নিবে যাবে। তখন কী করবো!

বললাম—তুমি মড়ার বুকে হাত দিয়ে থেকো, পিসি। নইলে পাষাণ চেপে যাবে। আমি এখুনি আসছি লোকজন ডেকে নিয়ে। পাড়ার লোক যাকে ডাকবো সেই আসবে।

হ্যারিকেনটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

সরোজিনী পিসি আমার হাতটা চেপে ধরে বললে—না শরৎ, তুই যাস না। আর কতটুকুই বা রাত আছে! খানিক পরে যাবি।

বিস্মিত দৃষ্টিতে পিসির মুখপানে চাইলাম। চোখে মুখে ভয়! স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম—পিসি, তুমি কি একলা থাকতে ভয় পাচ্ছো?

মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অসহায় দৃষ্টিতে আমার মুখপানে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে পিসি বললে— হঁা।

শুনে চমকে উঠলাম। মানুষেব দুটো সত্তা যেন মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার চোখের সামনে। বাইরেব যে মানুষটা পুত্রশোকে উন্মাদ হয়ে এখুনি ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল আত্মহত্যা করতে, তার ভিতরের মানুষটা পুত্রেব মৃতদেহ নিয়ে বসে থাকতে ভয় পাচ্ছে। ভূতের ভয়! —আকস্মিক আলোড়নে আমাব বুকের ভিতরটা যেন ওলটপালট হয়ে গেল।

হ্যারিকেনটা নামিয়ে বেখে বললাম- ঠিক আছে। আমি অন্ধকাবেই যাচ্ছি। বর্ষাকাল, বাস্তায় সাপখোপের ভয় কিনা তাই আলোটা নিয়ে যাচ্ছিলাম।

না শরৎ, তুই যাস না। —পিসি বিব্রত বোধ কবে।

আলোটা রেখে আমি বেবিয়ে গেলাম লোকজন ডাকতে। বাত পোহালেই বাসি মড়া হবে।

জীবনের এই ঘটনাটা আজো ভুলতে পাবি নি। কী বিচিত্র মানুষেব জীবন। ভিতরেব সত্তাটাকে গলাটিপে মারা যায় না। সমাজ-টমাজ যা কিছু, সব ওই বাইবের সত্তাকে নিয়ে।

ভিতরেব সত্তা যেমনকাব তেমনি থাকে। সে বাঁচতে চায়।

শরৎ-জীবন ও পল্লীগ্রাম

শ্রীসনৎকুমার মিত্র

শরৎচন্দ্রের জন্ম ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর। জন্মস্থান হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রাম। বর্তমানে এ গ্রাম হুগলী জেলার চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত। অতীতে এই গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ বন্দরনগর সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ছিল। আজকে যে অবস্থাই হোক না কেন একশ বছর আগে এই দেবানন্দপুর যে একটি গ্রাম ছিল যে বিষয়ে কোন তর্কে প্রবিষ্ট হবার দরকার নেই। ভারতচন্দ্রের জবানীতে কেউ হয়তো বলবেন যে গ্রাম হলেও দেবানন্দপুরের সমৃদ্ধি ও গৌরব তুচ্ছ করবার মত নয়; তথাপি সমাজ-অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেবানন্দপুরকে গ্রামই বলতে হবে।

শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুর যে গ্রাম প্রতিপন্ন করার জন্যে আমার এমত প্রচেষ্টা কেন? এর একটি সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে। যেহেতু বলা হয়ে থাকে যে মানুষ পরিবেশ কর্তৃক সৃষ্ট, সেহেতু যে কোন ব্যক্তিত্ব বা অপূর্বনির্মাণক্ষম চরিত্রের বিস্ময়কর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য বা আচরণের বিচার করতে বসলে অবশ্যই প্রতিবেশের পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়। মানুষ জন্মসূত্রে ঋক্‌থ হিসেবে যা গ্রহণ করে, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যাকে পরিশীলিত করে তোলে—প্রতিবেশ তাকে পরিপুষ্ট, বর্ধিত এবং নির্দিষ্টপথাভিমুখী হতে সাহায্য করে। বীজ যত ভাল জাতেরই হোক, জমি যতই উর্বর হোক, পরিচর্যা যত তন্নিষ্ঠই হোক - যথার্থ পরিমাণ আলো বাতাস ও জল না পেলে সুফসল লাভ সম্ভব নয়—ঠিক তেমনি নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধিও তার প্রতিবেশের স্নেহানুকূল, প্রীতি-উষ্ণ ক্রোড়ে যথার্থ ভাবে পালিত হলেই তবে সার্থক হয়।

শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান ইতিহাসখ্যাত সপ্তগ্রামের অন্তর্গত দেবানন্দপুর, যেকথা আগেই বলেছি। যে সাতটি গ্রাম নিয়ে সপ্তগ্রাম গঠিত, তারা হচ্ছে: বাসুদেবপুর, বংশবাটী, খামারপাড়া, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, শিবপুর ও ত্রিশবিঘা। গল্প-কথা প্রচলিত আছে যে উক্ত সাতটি গ্রামে সাতটি ঋষি তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে এর নাম হয় সপ্তগ্রাম।

কিন্তু এই কিংবদন্তীর বাইরে যে ইতিহাস আছে তা যেমন গৌরবময় তেমনিই প্রাচীন। আমরা জানি যে ভাগীরথী-যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে সপ্তগ্রামের অবস্থিতি। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে নদী-সমৃদ্ধ তাম্রলিপ্ত

বন্দরের গৌরব ও মর্যাদা অপসৃত হওয়াকে অবলম্বন করে সপ্তগ্রাম বন্দরের সৌভাগ্য রবির উদয় হতে থাকে। পাল ও সেন রাজাদের আমল থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত সপ্তগ্রামের উন্নতি ও ঔজ্জ্বল্য এই অঞ্চলকে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিকভাবেই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও শ্রীময়ী করে তুলেছিল[২]। প্রায় চারশ বছর আগেও বড় বড় বাণিজ্যতরী দেশ-বিদেশের পণ্য নিয়ে সপ্তগ্রামে প্রবেশ করেছে। প্রাচীন পর্যটকেরা একে বলতো 'সাতগাঁ রিভার'। এরপর ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হতে থাকে। সরস্বতীর জলসম্ভার ভাগীরথীর খাতে ঢল নেয়। সরস্বতী 'ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল। এই নদী মজিয়া যাওয়ায়, ইহার শাখা-প্রশাখাগুলিও মজিয়া যায়। এতৎপার্শ্ববর্তী যে সমস্ত অঞ্চল জনবহুল ও সমৃদ্ধশালী ছিল, তাহা ধীরে ধীরে জনশূন্য এবং ম্যালেরিয়ায় অধ্যুষিত দরিদ্র পল্লীতে পরিণত হয়'[৩]। নদীমুখাপেক্ষী এককালের সমৃদ্ধ বন্দর-নগর-গঞ্জ নদীর অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেকালে যে অবস্থা প্রাপ্ত হতো সপ্তগ্রামেরও সেই অবস্থা ঘনিয়ে এলো— সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের অঞ্চলগুলিও শ্রীহীন-পরিত্যক্ত-ম্যালেরিয়ার ডিপো হয়ে দাঁড়ালো— কাণ্ড শুকিয়ে গেলে ডালাপালা শুকিয়ে যাওয়ার মত সপ্তগ্রামের অপমৃত্যুর কারণে অন্যদের সঙ্গে দেবানন্দপুরও রক্তশূন্য হয়ে আসতে লাগলো। এই দুর্দিনের মরা কোটালে শিক্ষিত ভদ্র-সম্প্রদায়েরা নতুন জীবন ও জীবিকার সন্ধানে নব্য-নগরী কোলকাতার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকলেন। দারিদ্র্য-রোগ-কুসংস্কার-বদ্ধ গ্রাম্যজীবনের খণ্ডিত জীবন-বোধ নিয়ে যাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই তাদের এবং প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মৃতি অবলম্বন করে অন্যদের সঙ্গে দেবানন্দপুরও বেঁচে রইলো। এই পরিবেশে আজ থেকে একশ বছর আগে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল।

দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্রের পিতৃভূমি ছিল না। এটি ছিল তাঁর বাবার মামার বাড়ি। তাঁদের আদিনিবাস ছিল ভাগীরথীর পূর্বপাড়ে কাঁচড়াপাড়ার অন্তর্গত মামুদপুর গ্রামে। এই পিতৃভূমির পরিচয় দিতে গিয়ে একটা কথা মনে আসছে—যা না বললে শরৎ-জীবন ও চরিত্রের ভিত্তিভূমি এবং তাতে প্রতিবেশের একটা অন্তরশায়ী প্রভাবের ওপর অপ্রত্যক্ষ আলোকপাত করা যাবে না। কাঁচড়াপাড়া বর্তমান ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত। এবং দেবানন্দপুর ও মামুদপুরের মধ্যে সেদিনের হিসেবে দূরত্ব খুবই কম : মাঝে শুধু ভাগীরথী। আগেই বলে এসেছি দেবানন্দপুর সুপ্রাচীন ও সমৃদ্ধ নগর-বন্দর এবং ত্রিবেণী-সঙ্গম তীর্থের অন্তর্গত সপ্তগ্রামের মধ্যে অবস্থিত। অপরপক্ষে মামুদপুর ভাটপাড়ার অন্তর্গত বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যে প্রতিপালিত।

কেবল এখানেই শেষ নয়—পাশের হালিশহরের শাক্ত বা তান্ত্রিক এবং খড়দহের বৈষ্ণব ভাবধারার বিমিশ্র সাংস্কৃতিক চেতনা শরৎ পিতা মতিলালের রক্তে ও ঐতিহ্যে সঞ্চারিত হতে সাহায্য করেছিল। এ এক বিচিত্র মিলন। নিজের পিতৃভূমি ও মাতুলালয়ের মধ্যে থেকে জন্মসূত্রে মতিলাল যে বিমিশ্র সংস্কারকে সংহরণ করে নিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এসে যুক্ত হলো হালিশহরের [ভাগলপুর প্রবাসী] শাক্ত পরিমণ্ডলের ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত কন্যা ভুবনমোহিনী দেবী। বাবা এবং মা উভয়ের যে জীবনধারা এবং যে প্রাকৃতিক ও পরিবেশের রসপুষ্ট বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তা স্বভাবতই অভিনব এক সিন্‌থিসিস্ রূপে শরৎচন্দ্রকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে[৪]। সামগ্রিক এই পটভূমিকায় শরৎচন্দ্রকে বিচার করতে হবে—যেখানে পল্লীগ্রামের স্থান মুখ্য।

এমন কথা বলার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে শরৎচন্দ্রের সমগ্র গল্প-উপন্যাসের মধ্যে প্রায় দুহাজার পৃষ্ঠা ব্যয়িত হয়েছে পল্লীগ্রামের জন্যে। সেখানকার মানুষ, সেখানকার সমাজ, সেখানকার প্রকৃতিই তাঁর কথা-সাহিত্যের মুখ্য উপাদান। এই কারণেই শরৎ-জীবনের জন্ম-বৃদ্ধি ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে পল্লীগ্রাম কতখানি অংশ জুড়ে ছিল, এবং এই সংযুক্তির গুণগত বিশিষ্টতা কি তা না বিচার করলে শরৎসাহিত্যের আলোচনা একপেশে হতে বাধ্য।

জন্ম থেকে আট বছর বয়স অর্থাৎ ১৮৭৬-১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র কতদিন দেবানন্দপুরে এবং কতদিন ভাগলপুরে প্রবাসী মাতুলবাড়ীতে ছিলেন; কোথায় তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়েছিল এবিষয়ে শরৎ-জীবনীকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই মত-বিতর্কের কূটজালে প্রবিষ্ট না হয়েও এটুকু সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে বলা যেতে পারে যে যদিও তিনি ভাগলপুরে তাঁর অতি-প্রাথমিক বাল্য-শিক্ষা শুরু করেও থাকেন [?] তথাপি এই ভাগলপুর বাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কারণ জন্মের পর কয়েক বছর [অন্তত ৩।৪ বছর] স্বাভাবিক কারণেই তাঁকে দেবানন্দপুরে থাকতে হয়েছে। পরে দেখা যাচ্ছে যে তিনি সমগ্র পরিবারের সঙ্গে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে [আট বছর বয়সে] ডিহরীতে পিতা মতিলালের কর্মস্থানে চলে গিয়েছিলেন তা এই দেবানন্দপুর থেকেই। এই কারণেই অনেকে সন্দেহ করেন যে শরৎচন্দ্র দশ বছর [১৮৮৬] বয়সের আগে ভাগলপুর যান নি এবং তাঁর অতি প্রাথমিক বাল্যকাল ও শিক্ষা দেবানন্দপুরে। নানা কারণে এই সন্দেহটিই সং'। এখানে এ বিষয়টি একটু পর্যালোচনা করা যাক:

শরৎচন্দ্রের অগ্রজা অনিলা দেবী। এঁর জন্মের পর ভুবনমোহিনীর একটি পুত্রসন্তান হয়ে মারা যায়। পুত্র-সন্তানকামনার স্বাভাবিক ইচ্ছা, বংশরক্ষার

আকাঙ্ক্ষা এবং সংস্কারের বশে অন্তঃসত্ত্বা ভুবনমোহিনীকে ভাগলপুর থেকে দেবানন্দপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এইখানেই [১৮৭৬ এর সেপ্টেম্বরে] মতিলাল দম্পতীর যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে তিনিই শরৎচন্দ্র। এর আট বছব পরে [১৮৮৪] নতুন চাকুরি নিয়ে মতিলাল সপরিবারে শোন নদীর তীরস্থ ডিহরীতে যান। সেখানে দু-বছর [১৮৮৬] চাকুরী করার পর খেয়ালী ও উদ্‌ভ্রান্ত মতিলাল কাজে ইস্তফা দিযে ভাগলপুরে শ্বশুরালয়ে উঠলেন। এব এক-আধ বছরের মধ্যে মতিলাল-দম্পতীর চতুর্থ সন্তান প্রভাসচন্দ্রের জন্ম হয় [ইনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন · স্বামী বেদানন্দ]। তখন শরৎচন্দ্রের বয়স প্রায বছর বার। এ প্রসঙ্গে আমরা জানি যে শরৎচন্দ্র [১৮৭৬] এবং প্রভাস-চন্দ্রের [আনুমানিক ১৮৮৮] মধ্যে শরৎচন্দ্রের আব-একটি ভাই হয়ে মাবা যায়।[৫] শরৎচন্দ্রেব জন্ম এবং মতিলালের ডিহরী গমন [অর্থাৎ ১৮৭৬-১৮৮৪]-এর মধ্যেই এই জাতকের জন্ম ও মৃত্যু ঘটনাটি সংঘটিত হয়। অতএব যে সংস্কারবশে ভুবনমোহিনী শরৎচন্দ্রকে গর্ভে নিয়েই দেবানন্দপুবে এসেছিলেন ; শরৎচন্দ্রের পরবর্তী সন্তানের জন্মের সময়েও সেই আকাঙ্ক্ষা ও সংস্কারের বশবর্তী হয়েই তাঁবা দেবানন্দপুরেই ছিলেন। দুইটি সন্তানের জন্ম, তাদের অতি শৈশবাবস্থা ইত্যাদি অসুবিধাগুলি পার হয়ে দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুর যাওযা, আবার দেবানন্দপুরে ফিবে আসা ইত্যাদির বাস্তব অসম্ভাব্যতাই প্রমাণ করে। অধিকন্তু শরৎচন্দ্রেব যে মাতুল [মাযের খুড়তুতো ভাই] সুবেন্দ্রনাথেব সাক্ষী শরৎচন্দ্রের ভাগলপুবে বিদ্যাবম্ভেব প্রসঙ্গে আনা হয়েছে তা আমার উপরোক্ত কাল ও ঘটনা বিচারের যুক্তিতে একেবারেই ধোপে টেঁকে না। অতএব দেবানন্দপুবের বাসিন্দা দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী ও নরেন্দ্রদেব দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের অতি বাল্যজীবন এবং শিক্ষা-সূচনার উল্লেখ করেছেন তা-ই যুক্তি-সিদ্ধ এবং প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায়। তাঁরা বলছেন : “বালক শরৎচন্দ্র ছিলেন চঞ্চল ও উদ্দাম প্রকৃতির, তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয তাঁহাদেরই বাটীর নিকটবর্তী প্যারী [বন্দ্যোপাধ্যায়ের] পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালাতে ; একটি প্রশস্ত চণ্ডী-মণ্ডপে এই পাঠশালাটি বসিত এবং এখানে অনেকগুলি ‘পড়ুয়া’ ছাত্রছাত্রী ছিল ; শরৎচন্দ্র ইহাদের মধ্যে ছিলেন সর্বাপেক্ষা দুরন্ত কিন্তু মেধাবী। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র ‘কাশীনাথ’ তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমবয়স্ক বন্ধু ছিলেন বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় শরৎচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও অনেক সময়ই তাঁহার দুরন্তপনা নির্বিচারে সহ্য করিতেন। পাঠশালায় দুরন্তপনার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রামে নূতন স্থাপিত সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য মাস্টার মহাশয়ের বাঙলা স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন ও এই স্কুলে প্রায় তিনি এক বৎসর কাল

পড়েন।"[৬] কবি নরেন দেবও এই ধরণের কথা বলেছেন তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে।

এর পরেও যদি কেউ বলে যে ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৪-র মধ্যে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই 'শরৎচন্দ্রের লেখাপড়া আরম্ভ হয়'— তাহলে কালানৌচিত্যের প্রশ্নটি বাদ দিয়ে কেবল তর্কের খাতিরে ধরে নিতে হয় যে এ যাওয়া প্রথম পুত্রসন্তানকে দেখানোর জন্যে কন্যার [ভুবনমোহিনীর] বাপের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া এবং স্বল্পস্থায়ী ভ্রমণ। এবং সেই অবস্থানকালে 'বিদ্যাসাগর মশাই' এর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও হাতের দেখে-লেখার একখানি খাতা' পাওয়া গেলেও তাকে যথার্থ অর্থে বিদ্যারম্ভ বলা যায় না। তাঁর সত্যিকারের বিদ্যাশিক্ষা সুরু হয়েছিল দেবানন্দপুরের প্যারী পণ্ডিতের স্কুলে এবং পরে সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের নতুন স্কুলে। এখানে ক্লাশ-ওয়ান-টু পর্যন্ত পড়ে ডিহরীতে যান। সেখানে দু-বছরে ঘরেই ক্লাশ ফোর-এ ভর্তি হওয়ার মত প্রস্তুতি নিয়ে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরে গিয়ে ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীতে ভর্তি হন ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন, এবং প্রবাসী বাঙালীদেব প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এইখানে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ শ্রেণীতে এবং ১৮৮৯-তে সপ্তম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এই বছরেই সাংসারিক কারণে শরৎ-পিতা মতিলাল সপরিবারে ভাগলপুরের শ্বশুরালয় ত্যাগ করে দেবানন্দপুরে স্বগ্রামে চলে আসেন। এবং শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের ক্ল্যাশ সেভেনে ভর্তি হন। তখন শরৎচন্দ্রের বয়স তের বছর। এখানেই ১৮৯৩-এর প্রথমাংশ পর্যন্ত পড়েছিলেন। যেটি ছিল ক্লাস টেন [তৎকালের প্রথম শ্রেণী]। ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৪ এই পাঁচ বছরে চারটি ক্লাশ ডিঙিয়েছেন দেখে স্বভাবতঃই মন্তব্য করা হয়েছে : 'লেখাপড়া যে তাঁহার অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছিল এবং প্রতি বছর উচ্চতর ক্লাসে যে তিনি উঠিতে পারিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না'।[৭]

এর মধ্যে ১৮৯২-তে দাদামশাই কেদারনাথ স্বগ্রাম হালিশহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেবানন্দপুরে মতিলাল এবং তাঁর পরিবার ক্রমশই দুরবস্থার মধ্যে প্রবেশ করতে থাকেন। এবং অবশেষে প্রাণ ও মান বাঁচাবার আশায় ভুবনমোহিনী সপরিবারে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি আবার বাপের বাড়ি চলে যান। এখানে পৌঁছে 'শরৎচন্দ্র ১৮৯৪ সনেই পুনরায় টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে যোগদান করেন এবং পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাঁহার বয়স তখন ১৮, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে পরীক্ষাদানকালে ১৫ বৎসর ৩ মাস ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে'।[৮]

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত শরৎচন্দ্র একটানা ভাগলপুরে ছিলেন। এর মধ্যে শরৎচন্দ্রের জীবনে তিনটি ঘটনা ঘটে। এক, মায়ের মৃত্যু [১৮৯৫, নভেম্বর]। শরৎচন্দ্রের বয়েস তখন উনিশ বছর দু-মাস। দুই, ১৮৯৭-৯৯ এর কোন এক সময়ে গোড্ডার রাজ-বনেলী এস্টেটের কাজ নিয়ে কিছুদিন সাঁওতাল পরগণায় অবস্থান। তিন, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে সম্ভবত পিতার প্রতি অভিমান বশত সন্ন্যাসীর বেশে নিরুদ্দেশ যাত্রা। কয়েক মাস উদ্দেশ্যহীন যাযাবর জীবন যাপন করার পর মজঃফরপুরে আত্মপ্রকাশ। এবং সেইখানেই ১৯০২ সনের মাঝামাঝি পিতা মতিলালের মৃত্যুসংবাদপ্রাপ্তি ও ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন।

সাত বছর আগে মা মারা গেছেন, এখন বাবাও মারা গেলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে সংসারের দায়িত্ব এসে কাঁধে পড়লো। সংসার বলতে নাবালক দুটি ভাই ও এক বোন। এঁদের আত্মীয়স্বজনের কাছে গছিয়ে দিয়ে ভাগ্যানু-সন্ধানে কোলকাতায় এলেন সম্পর্কিত মামা লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভবানীপুর ৮৫ নং কাঁসারিপাড়া রোডের বাড়িতে।

এখানে শরৎচন্দ্র ৫-৬ মাসের মত ছিলেন। সামান্য রোজগার-পাতিও লালমোহন মামার চেষ্টায় হচ্ছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের তাতে সুবিধে হলো না। তিনি কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ জানুয়ারি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে ভাগ্য ফিরতে পারে এই আশায়[৯] পাড়ি দিলেন। এই নিরুদ্দেশযাত্রার সংবাদ একমাত্র যিনি জানতেন তিনি হচ্ছেন তাঁর মায়ের খুড়তুতো ভাই উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—পরে বঙ্গদেশে সুখ্যাত সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত।

শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে প্রায় ১৩ বছর ৪ মাসের মত [জানুয়ারি ১৯০৩ থেকে ১৬ এপ্রিল ১৯১৬] ছিলেন। মধ্যে দু-বার—একবার ১৯১২-তে তিন মাসের জন্য এবং ১৯১৪-তে কয়েক দিনের জন্য কোলকাতায় এসেছিলেন।

১৯১৬-র মে মাসে বাংলা দেশে পৌঁছে হাওড়া শহরের বাজে শিবপুর অঞ্চলে বসবাস করেন প্রায় ন-দশ বছর [১৯২৫ খ্রীঃ]। কোলকাতার উপকণ্ঠে শিবপুরে বসবাস কালে 'উত্তরোত্তর তাঁহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, ক্রমে অপরাজেয় কথাশিল্পী রূপে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সভা-সমিতিতে যোগদান, রচনার জন্য উপরোধ-অনুরোধ, দর্শনার্থীদের ভিড় ইত্যাদিতে অতিষ্ঠ হইয়া শহরের কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে'[১০] দিদি অনিলা দেবীর শ্বশুরবাড়ির গ্রামের অনতিদূরে সামতায় [থানা : বাগনান। জেলা : হাওড়া] জমি

কেনেন। ১৯২৫-এ তাঁর বাড়ি তৈরী হয়ে যায় এবং পর বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এইখানে সপরিবারে স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকেন।[১১]

রূপনারায়ণের তীরের এই পল্লীগ্রামে শরৎচন্দ্র প্রায় ন-বছর বাস করে-ছিলেন। শেষ জীবনে—মৃত্যুর বছর চারেক আগে ১৯৩৪ এর জুলাই-এ তিনি বালিগঞ্জের অশ্বিনী দত্ত রোডে একটি বাড়ি তৈরী করে চলে আসেন। মৃত্যু-কাল পর্যন্ত [১৯৩৮, ১৬ই জানুয়ারি] এইখানেই তিনি বাস করেছিলেন। অবশ্য মাঝে মধ্যে তিনি 'যখন সময় পাইতেন তখনই চলিয়া যাইতেন রূপনারায়ণের তীরবর্তী তাঁহার নিরালা বাংলো বাড়িতে। দরিদ্র, নিরক্ষর, গ্রামবাসীরা আসিয়া তাঁহার চারপাশে ভিড় জমাইত। তাহাদের মধ্যেই নিজেকে তিনি স্বাভাবিক এবং সন্তুষ্ট মনে করিতেন'।[২]

ওপরে যে সংক্ষিপ্ত শরৎ-জীবন-পরিচয় দেওয়া হলো তা-থেকে দেখা যাচ্ছে যে শরৎচন্দ্র তাঁর ৬১ বছর ৪ মাসের আয়ুষ্কালের মধ্যে ঠিক পল্লীগ্রাম বলতে যা বোঝায় [দেবানন্দপুর ও সামতাবেড়ে কেবলমাত্র এর অন্তর্গত হতে পারে] সেখানে বাস করেছেন মোট প্রায় বাইশ বছর। এর মধ্যে প্রথম জীবনের দেবানন্দপুরে বসবাসের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সাহিত্যের বাতাবরণ, চরিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গী রচনায় সাহায্য করেছিল। এবিষয়ে নিজেই অনেকবার নানা প্রসঙ্গে নানা কথা বলেছেন। আমরা প্রথমে তার থেকে প্রয়োজনীয় অংশের দ্বারা দেখাবার চেষ্টা করবো যে, সেই পল্লীগ্রাম-জীবন তাঁর সাহিত্যে কি impact সৃষ্টি করেছিল।

শরৎচন্দ্র নিজেই বলছেন : 'ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধ'রে, ডোঙ্গা ঠেলে নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বার হই'।

এ পাড়াগাঁ অবশ্যই দেবানন্দপুর। যাঁরা শরৎ-সাহিত্য পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন তাঁর এই বাল্য-কৈশোরের বিচরণভূমি দেবানন্দপুর, সরস্বতীর অব-বাহিকা, হরিপাল, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি প্রধানত হুগলী জেলার গ্রাম-গঞ্জগুলি তাঁর রচনায় কতদূর প্রভাব ফেলেছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বের প্রথম পরি-চ্ছেদের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখছেন :

'রেল-স্টেশনের উদ্দেশ্যে আমরা যখন যাত্রা করিলাম তখন সূর্যদেব বহুক্ষণ অস্ত গেছেন। আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথের দুই ধারে যদৃচ্ছা-বর্ধিত বঁইচি, শিয়াকুল এবং বেতবন সঙ্কীর্ণ পথটিকে সঙ্কীর্ণতর করিয়াছে এবং মাথার উপর আম-কাঁঠালের ঘনসারি শাখা মিলাইয়া স্থানে স্থানে সন্ধ্যার আঁধার যেন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে।...আমি তখন

দু'চক্ষু মেলিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারের ভিতর দিয়া কত কি যেন দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, এই পথের উপর দিয়াই পিতামহ একদিন আমাব পিতামহীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেদিন এই পথই বরযাত্রীদের কোলাহল ও পায়ে পায়ে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার একদিন যখন তাঁহারা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন এই পথ ধরিয়াই প্রতিবেশীবা তাঁহাদের মৃতদেহ নদীতে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই পথের উপর দিয়াই মা আমার একদিন বধূবেশে গৃহ-প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং আবার একদিন যখন তাঁহার এই জীবনের সমাপ্তি ঘটিল, তখন ধূলাবালিব এই অপ্রশস্ত পথের উপর দিয়াই আমরা তাঁহাকে মা-গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া ফিরিয়াছিলাম। তখনও এই পথ এমন নির্জন এমন দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধকরি ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে এত পঙ্ক এত বিষ জমা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম ছিল—বোধ হয দেশের নিরানন্দ এমন শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠে নাই।

দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, গাড়ীর চাকা হইতে কতকটা ধূলা লইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে আমার পিতৃপিতামহের সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, হাসি-কান্নায় ভরা, ধূলা বালির পথ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি।'

উদ্ধৃতি কিছু দীর্ঘ হলো। তথাপি এর মধ্যে দিয়ে একথা প্রমাণিত হলো যে শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনকালের মধ্যে যে পল্লীবাস কবেছিলেন তার স্মৃতি বা সুখ বা অভিজ্ঞতা সমগ্র জীবনে কখনও ভুলতে পাবেন নি। তাই তাঁর রচিত শহরের পটভূমিকার কাহিনী ও তার পাত্র-পাত্রী, তাদের আচরণ, প্রতিবেশ কখনই নাগরিক চরিত্র [urbanised character] লাভ করে নি। এ বিষয়ে একটি সার্থক উদাহরণ হচ্ছে তাঁর 'নিষ্কৃতি' [১৯১৭], গল্পটি। কাহিনীর ঘটনাস্থান হচ্ছে কলকাতাব 'ভবানীপুর' [দ্র 'ভবানীপুরের চাটুয্যেরা একান্নবর্তী পরিবার'] সূচনার এই ভবানীপুর শব্দটিকে তুলে দিন বা রাখুন, দেখবেন সমগ্র গল্পটির গ্রাম্য-প্রতিবেশের কোন দিকের কোন রকম হেরফের হবে না। এমন কি আরও কিছু এগিয়ে গিযে একথাও বলা যায় যে শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা এত বেশী পল্লীগ্রামকেন্দ্রিক যে তিনি নাগরিক চরিত্র, তার ঘটনা-প্রতিবেশ তার জীবনবোধ ও সামগ্রিক বাতাবরণ যেখানেই রচনা করতে গেছেন সেইখানেই যথেষ্ট রূপে ব্যর্থ হয়েছেন—আমার এই মন্তব্যের সপক্ষে তাঁর 'নববিধান' [১৯২৪] প্রভৃতি আরও অনেকগুলি কাহিনীর উল্লেখ করতে পারি।[১৩]

শরৎচন্দ্র তাঁর আট থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত পিতা-মাতার সঙ্গে গয়া জেলার অন্তর্গত শোন নদীর তীরবর্তী ডেহরী বা ডিহরীতে ছিলেন [১৮৮৪-৮৬]। এর প্রায় দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পরে [১৪.৮.১৯] ডিহরীর নাম শুনেই তিনি লিখছেন :

'ডিহরীতে যাচ্ছে? যখন তোমাদের জন্মও হয়নি তখন আমি ওই ডিহরীর ক্যানালের পাড়ে পাড়ে পাকা খিরণী কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়াতাম আর ফাঁস করে গিরগিটি ধরতাম। উঃ সে কতকালের কথা। তখন রেল হয় নি, ছোট স্টিমারে চড়ে আরা থেকে যেতে হতো। তোমাদের বাঙলোটাও আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তোমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে ডানহাতি সূর্য ওঠে না? তখনকার কালে ওদেশে একটা ঘাট ছিল সতীচওড়া না এমনি একটা কি নাম। বোধকরি তোমাদের ওখান থেকে মাইল দুই হবে। কিছুকাল ঐখানে বসেছি, কি জানি সে ঘাটের অস্তিত্ব আজও আছে কিনা।'[১৪]

আট-দশ বছর বালকের অভিজ্ঞতা তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর পরে একচল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরের প্রৌঢ় যখন এত নিখুঁত ভাবে বর্ণনা দিতে পারেন—তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সেই দিনকার পল্লীবাসের মধুর স্মৃতি কত গভীর ভাবেই না তাঁর মনের মণিকুট্টিমে অমূল্য রতনের মতই সঞ্চিত রয়ে গেছে।

ভাগলপুরকে শরৎচন্দ্র বারে বারেই শহর বলেছেন, 'এলাম শহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্তি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে'।[১৫] শরৎচন্দ্রের ভাষায় ভাগলপুর শহর হলেও আজকের দিনের অভিজ্ঞতায় যাকে town বলা চলে সেদিনের ভাগলপুর বোধ হয় তেমন ছিল না। সেই জন্যেই শরতের পক্ষে সেখানে গ্রাম্যজীবনের উপকরণগুলিকে খুঁজে বার করতে অসুবিধে হতো না। গঙ্গার শুখনো খাতের স্বল্প জলে ঝাঁপাই-ঝোড়া, স্বয়ংসৃষ্ট 'তপোবনে বসে বড় বড় কথা ভাবা,' 'রাজুর সঙ্গে ডিঙ্গি বেয়ে গঙ্গার বুকে উধাও হওয়া' প্রভৃতির মধ্যে পল্লীগ্রামের জীবন-রসকে আস্বাদ করতে দেখা যেতো। এই বিষয়ে তাঁর বাল্যসঙ্গী ও আত্মীয়ের সাক্ষ্য মানা যেতে পারে :

'আদমপুর ও বাঙ্গালী টোলার মাঝখানে ছিল জলা, পুকুর ও বাবলা বন। এই বাবলা বনের দুর্গম জলস্থল ডোবা ঢিবিময় ভূখণ্ডে সেদিনের বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো দুঃসাহসিক ছেলের দল অভিভাবকদের কঠোর শাসনের গণ্ডী পেরিয়ে এসে মনের আনন্দে জীবনের পাঠগ্রহণ করত। এইখানে রাজু মহিষের দুধ চুরি করে খেয়ে শরীর বানিয়ে তুলতো। এইখানে ধূমপান বিদ্যে কুমড়োর ডাঁটার হাতে খড়ি থেকে আরম্ভ করে গঞ্জিকা চরসের পরিণতি এবং চরম সিদ্ধিলাভ করতো।'

পত্নীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে শরৎ-পিতা ভাগলপুরেরই অন্য এক মহল্লায় এলে শরৎচন্দ্র যে থিয়েটার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারও মহলার স্থানসমূহ ছিল অত্যন্ত বিচিত্র। এ প্রসঙ্গে তাঁর ভাগলপুরের বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্ট বলছেন : 'এই থিয়েটারের রিয়ার্সাল অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত স্থানে হইত —নদীর ধার হইতে মুসলমানের কবরস্থান, দেবস্থান, কোনো স্থানই বাদ যাইত না'।[১৬]

এতএব এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে শরৎচন্দ্রের মেজাজ ও মর্জির মধ্যে শহর-জীবনের কৃত্রিমতা বা বৈচিত্র্যহীন নিয়মনিষ্ঠা ও নিগড়বদ্ধতার প্রতি অনীহা ছিল প্রবল। এই কারণেই তিনি সবসময়েই পল্লীগ্রামের ধীর অলস এবং অকৃত্রিম ও আদিম রোমান্সের মধ্যেই স্বাভাবিক স্ফূর্তি লাভ করতেন। তার মধ্যেই নিজের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যটি সমতা খুঁজে পেতো।

সুদুর বর্মা মুল্লুকে তিনি প্রায় বার-তের বছর কাটিয়েছেন। প্রথমে আত্মীয়-বাড়ি কিছুদিন, তারপরে মেসে কয়েকদিন, তারপরেই অনেকের পক্ষে আঁৎকে ওঠার মত জায়গায় বাসা বাঁধলেন। এ বিষয়ে প্রবাসে শরৎ-সুহৃদ এবং শরৎ-চন্দ্রের নিজের বক্তব্যকে নজির হিসেবে গ্রহণ করবো। প্রথমেই শরৎ-সুহৃদ বলছেন :

'গিয়া দেখি. তিনি মেসের বাস পরিত্যাগ করিয়া যে বাড়িতে একাকী অবস্থানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, যে বাড়িটি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও একলার পক্ষে যথেষ্ট। ক্ষুদ্র গৃহটির সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত সুবিস্তীর্ণ ময়দান। ময়দানের প্রান্ত-সীমায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি পজুন্ ডাঙের খাড়িটি রেঙ্গুন হইতে বাহির হইয়া উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে জনপদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মাঠটার দৃশ্য. কি সুন্দব তখন। যেদিকে তাকাও যেন সোনা গলানো।'[১৭]

শরৎচন্দ্রও ২২.৩.১৯১২-সনে প্রথমনাথ ভট্টাচার্যকে রেঙ্গুন থেকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে বোধহয় এই বাসাটার কথাই লিখেছেন : 'শহরের বাইরে একখানা ছোটো বাড়িতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি'।

এর পরে এলেন, হুগলী নদীর পশ্চিম তীরস্থ শহর বাজে শিবপুরে—কোলকাতায় নয়। এখানে যে ন'বছর তিনি বাস করেছিলেন সেই সময়টাকে যদি কেউ তাঁর শহরবাসের সময় বলে ধরেন, তবে তার উত্তরে বলতে হয় যে এই শহরবাসে প্রথম তিন বছরের মধ্যেই তিনি হাঁপিয়ে পড়েন [১৯১৯-এ পানিত্রাসে জমি ক্রয়]।

বর্মা মুল্লুক থেকে ফেরার পরেই প্রথম তিন বছর প্রশংসা, খ্যাতি, অভি-নন্দন, সংবর্ধনা, অর্থপ্রাপ্তি ইত্যাদির মদ্যপানে বোধ হয় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে-ছিলেন। অনেক কিছু মিলিয়ে বোধ হয় তাঁর ঘোর লেগে গিয়েছিলো। কিন্তু পল্লীগ্রামের নিস্তরঙ্গ শান্তি, তার শ্যামপ্রকৃতির ছায়াচ্ছন্ন মোহ অচিরে তাঁর রক্তের পল্লীপ্রাণতাকে উদ্বেল করে দিলো—তিনি 'ফিরে চল মাটির টানে'র সুরে শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে নতুন করে বাসা বাঁধলেন। 'রূপ-নারায়ণের তীরস্থ নিভৃত পল্লীনিকেতনেই তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। সেখানকার শান্ত পরিবেশে সরলপ্রাণ দীন দরিদ্র পল্লীবাসীদের সাহচর্যে তাঁহার মন শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিত।[১৮]

প্রকৃত শহর বলতে যদি আমরা কোলকাতাকে বুঝি তা হলে শরৎচন্দ্র চার থেকে সাড়ে চার বছরের বেশি কোলকাতায় বাস করেন নি।[১৯] সমগ্র ভারত-বর্ষের cultural headquarter কোলকাতায় শরৎচন্দ্রের ৬১ বছরের জীবনের এই স্বল্পতম বাস স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। আমরা এই আলোচনার সূচনা করেছি যা দিয়ে, অর্থাৎ তাঁর জীবনাচরণ ও তৎ-সঞ্জাত জীবনানুসন্ধান একেবারেই পল্লীজীবনের আলো-বাতাস ও রসপুষ্ট। তাঁর নিজের জীবনও যেমন পল্লীগ্রামের ভালোমন্দ প্রতিবেশের মধ্যে পরিপুষ্ট, তাঁর সাহিত্যও ঠিক তেমনি পল্লী-জীবন ও সমাজকেন্দ্রিক। এর বাইরে যখনই তিনি পা ফেলতে গেছেন তখনই স্বল্প সম্বল ও অনভিজ্ঞতার দায়ে ঠেকতে হয়েছে।[২০] এই প্রসঙ্গগুলি আমি পরবর্তীকালে পৃথক পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করতে ইচ্ছাবদ্ধ হয়েছি। এখানে কেবল আর দুটি বিষয়ের উল্লেখ করে বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করবো।

প্রথমে দেখাবো যে শরৎচন্দ্র তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছ থেকে এক সময়ে উপদেশ পেয়েছিলেন যে : '...তিনি স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন আমাদের ছেলেবেলার ইস্কুলের শিক্ষক। ·ডেকে বললেন,···আমার আদেশ রইল- যা সত্যই জান না, তা কখনো লিখো না। যাকে যথার্থ উপলব্ধি কর নি, সত্যানুভূতিতে যাকে আপন করে পাও নি, তাকে ঘটা করে ভাষার আড়ম্বরে ঢেকে পাঠক ঠকিয়ে বড় হতে চেয়ো না! কেন না এ ফাঁকি কেউ-না কেউ একদিন ধরবেই, তখন লজ্জার অবধি থাকবে না। আপন সীমানা লঙ্ঘন করাই আপন মর্যাদা লঙ্ঘন করা।'[২১] শরৎচন্দ্র এই শিক্ষা নিজের সাহিত্যকর্মে যতদূর সম্ভব পালন করেও মাঝে মাঝে যে নাগর জীবন ও তার বাতাবরণ এবং শাহরিক শিক্ষিত চরিত্র অঙ্কনের কৃত্রিমতা ও ত্রুটিকে অতিক্রম করতে পারেনি তার দুটি মাত্র উদাহরণ দিয়েছি—শরৎ-সাহিত্য-পাঠকেরা নিরপেক্ষ মনোযোগ দিলে নিজেরাই খুব সহজেই আরও অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করতে পারবেন।

এই বক্তব্যের উপসংহারে শরৎচন্দ্রের নিজেরই একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে দেখাবো যে তিনি যথার্থ পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস কোথায় ফেলতে পারতেন :

'শহর হইতে দূরে গ্রামের মধ্যে আমার বাস। অতীতের নানাপ্রকার আমোদ ও আনন্দের প্রাত্যহিক আয়োজন গ্রামে আর নাই, পল্লী এখন নির্জীব নিরানন্দ।···শ্রাবণের ঘন মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসে, কর্দমাক্ত জনহীন গ্রাম্য পথ নিতান্ত দুর্গম, নিবিড় অন্ধকার ভারের মত বুকের 'পরে চাপিয়া বসে,···আবার কোনোদিন ক্ষান্ত বর্ষণ আকাশে লঘু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো দেখা দেয়, বর্ষার সুবিস্তীর্ণ নদীজলে মলিন

জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়ে, আমি তখন প্রাঙ্গণের একান্তে নদী, তটে আরাম-কেদারায় চোখ বুজিয়া বসি,… ।'[২২]

পল্লীগ্রামের অনেকানেক অসুবিধা, দীনতা, হীনতা ও নীচতার মধ্যেও শরৎ-জীবনের খাতাখানি যে সেইখানকার অভিজ্ঞতার অক্ষরে ভরে গিয়েছে সে বিষয়ে আব সন্দেহ কি ? তাই আমায় বক্তব্য যে শরৎ-সাহিত্যকে পর্যা-লোচনা করতে গেলে তাঁর জীবনে পল্লীবাসের অবস্থান এবং তার প্রভাবকে অবশ্যই নিখুঁত ভাবে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। পল্লীগ্রামের দীন ও ক্ষুদ্র এবং খণ্ডিত কূপ-গভীরতায় শরৎ-সাহিত্যের প্রাণভোমরাটি সুবর্ণ কোটায় রক্ষিত আছে,—যা তাঁর ব্যক্তি-জীবনেরও প্রাণবস্তু।

পাদটীকা ঃ

১। 'দেবেব আনন্দধাম, দেবানন্দপুব গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী।
ভাবতে নবেন্দ্র রায, দেশ যার যশ গায
হয়ে মোব কৃপাদায় পড়াইল পারসী।

২। দ্র মৎপ্রণীত 'পশ্চিমবঙ্গেব লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা [১৯৭৫]ঃ পৃঃ ২৪৪।

৩। শ্রীসুধীরকুমার মিত্র 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ'. ১ম খণ্ড [১৩৬৮]. পৃ ৭৯।

৪। শরৎচন্দ্র নিজেই একাধিকবাব বলেছেন 'পিতাব নিকট হতে অস্থিব স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি।' এছাড়াও আরও দু-এক জায়গায তিনি পিতার কথা বললেও মাতার প্রসঙ্গ একেবারেই অনুল্লেখিত দেখা যায়। অথচ তাঁর এই মা না থাকলে 'হয়তো মতিলাল দীর্ঘ দিন টিঁকে থাকতে পারতেন না, যদি না ভুবনমোহিনীর মত সঙ্গিনী ও সহধর্মিণী পেতেন।' এই প্রেমময়ী মা কি অন্যভাবে শরৎ-চেতনাকে অভিভূত করে তাঁর সাহিত্যে অমর আসন পেতেছিলেন!

৫। দ্র. ড শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার' [১৯৬৭]. পৃ ৭।.

৬। 'দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র' 'ভারতবর্ষ'. ১৩৪৪, চৈত্র পৃ ৬৩৬।

৭। দ্র. ৫নং পাদটীকা পৃ ২১।

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'শরৎ পরিচয়' [১৩৫৭] পৃ ৩।

৯। তুলনীয় শ্রীকান্ত ঃ ২য় পর্ব ১নং পরিচ্ছেদ "তাঁর কোন এক আত্মীয় বর্মা

মুলুকে চাকরি করিয়া 'লাল' হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অতিশয় ধনবান হইয়াছে। সেখানকার পথে-ঘাটে টাকা ছড়ানো আছে—শুধু কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষামাত্র।···পরে দেখিলাম, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস শুধু তাঁহার একার নহে, এমন অনেক লোকই এই মায়া-মরীচিকায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সেখানে ছুটিয়া গিয়াছে···"।

১০। দ্র. ৮নং পাদটীকা পৃ ৩৪-৫।

১১°। দ্র. ৫নং পাদটীকা পৃ ৩৪৪।

১২। দ্র. ৫নং পাদটীকা পৃ ৪১৫।

১৩। আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে সদ্য-প্রকাশিত 'শরৎ-রচনাবলী'র [১৯৭৫] প্রথম খণ্ডের ৫৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হচ্ছে : 'শরৎচন্দ্রের এই বইটি তাঁর অন্যান্য বই-এর তুলনায় বিক্রি হয়েছে কম। এর প্রথম প্রকাশকাল [কার্তিক ১৩৩১] থেকে ১৩৬০ সালের আশ্বিন মাস পর্যন্ত অর্থাৎ ২৯ বছরে মাত্র ৮টি সংস্করণ শেষ হয়েছে।' অধিকন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর একান্ত সহুরে নায়ক-নায়িকাকেও গ্রামে না নিয়ে এলে গল্প জমাতে পারতেন না।

১৪। কানপুরপ্রবাসী মহিলা সাহিত্যিক লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি : ১৪।৮।১৯ দ্র শরৎ সাহিত্য-সংগ্রহ ১৩ খণ্ড পৃ ৪৩০।

১৫। দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৫২ পৃ ১৩।

১৬। এই অংশের তথ্যগুলির জন্য ৫নং পাদটীকার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য পৃ ১৭, ১৯, ৩৪, ৪৪ ইত্যাদি।

১৭। যোগেন্দ্রনাথ সরকার ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র [২ সং] পৃ ৮।

১৮। দ্রষ্টব্য ৮ নং পাদটীকা . পৃ ৩৫।

১৯। আমি এই হিসাবটি এইভাবে করেছি ১৯০২তে ভবানীপুরে প্রায় ৫।৬ মাস + ব্রহ্মদেশ থেকে ১৯১২-তে কোলকাতা এসে তিন মাস + ১৯১৪-তে ডিসেম্বর—প্রায় ১ মাস + অশ্বিনী দত্ত রোডে প্রায় সাড়ে তিন বছর—চার/সাড়ে চার বছর।

২০। দ্র ১৩ নং পাদটীকা।

২১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী' [৫ সং] পৃ ২১২।

২২। দ্র ৮নং পাদটীকা পৃ ৩৫-৬।

সভাসমিতির আলোকে শরৎচন্দ্র

সুনীল দাস

দেশনন্দিত শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র-সমকালীন বাংলাসাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক হিসাবে যশের উচ্চ শিখরে আসীন হয়েছিলেন। দেশবাসীর কাছ থেকে তিনি অযাচিতভাবে যোগ্য সম্মান ও সমাদর লাভ করেছিলেন। এই এলোমেলো খামখেয়ালি মানুষটি জাতিধর্মনির্বিশেষে সবার সাথে মিশেছেন। অথচ প্রাচুর্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি। অপ্রত্যাশিত যশঃসৌরভ ও অপরিসীম গৌরব তাঁর চারিত্রিক সংযমকে এতটুকুও বিচলিত করতে পারে নি। সব কিছুর মাঝে তিনি ছিলেন একাকী, নির্লিপ্ত ও উদাসীন। যশোভীরু শরৎচন্দ্র প্রকাশ্য সভাসমিতি ও জনতার ভিড় এড়িয়ে চলতেন। দেশের লোক তাঁকে সভাপতি হিসাবে পাবার জন্য চেষ্টা করে হতাশ হয়েছে, অনেক প্রতিষ্ঠানে কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ত সভায় উপস্থিত হন নি, কোথাও সভার শেষ মুহূর্তে গিয়ে হাজির হয়েছেন। কখনো তিনি সভাপতির আসনে বসে গড়গড়া টেনেছেন, অনেক সভায় তিনি এমন নিম্নস্বরে ভাষণ দিয়েছেন যে শ্রোতৃমণ্ডলীর কানে সব কথা পৌঁছয় নি। আবার কোন কোন সভায় তিনি সভাস্থ জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রূপ করেছেন (সত্যেন্দ্রনাথের শোকসভা)। এমনও দেখা গেছে, তাঁর লিখিত সভাপতির ভাষণ অন্য লোকে পড়ে দিয়েছেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বাংলা ভাষায় একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হয়েও মাতৃভাষায় সুবক্তা ছিলেন না। অথচ এই সভাভীরু লোকটি সারা জীবনে অসংখ্য সভাসমিতিতে উপস্থিত থেকেছেন। কোন সভায় তাঁর ভাষণ শুনে জনসাধারণ মুগ্ধ হয়েছে, আবার কোথাও হতাশ হয়েছে। সত্যনিষ্ঠ শরৎচন্দ্র বানানো কথা বলতে পারতেন না, আসল কথা বলতে গিয়ে তিনি ভীষণ অসুবিধায় পড়তেন। এর ফলে সভার উদ্যোক্তারা ভীষণ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তেন। তাঁর জীবন ছিল অগোছাল, সব কিছুর মধ্যে ছিল শৈথিল্য। তিনি সভার চেয়ে ভালোবাসতেন বৈঠক।

প্রথম জীবনে শরৎচন্দ্র নিজেকে জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন, নাটকে ও গানে। ভাগলপুরে থাকাকালীন তিনি আদমপুর ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন। এখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' নাটকে 'মৃণালিনী'র ভূমিকায় এবং জনা ও 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে অভিনয় করে জনসাধারণকে মুগ্ধ করেছিলেন। ভাগলপুরে থাকাকালীন তিনি সঙ্গীতে আকৃষ্ট হন। পরবর্তী কালে রেঙ্গুনে বাঙালী

সমাজে তিনি একজন গায়ক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী, বিভূতিভূষণ ভট্ট, যোগেশচন্দ্র মজুমদার—এঁদের মিলিত চেষ্টায় শরৎচন্দ্রকে পুরোভাগে রেখে ভাগলপুরে একটি 'সাহিত্যসভা'র সৃষ্টি হয়েছিল। কবিতা ও গল্প লেখাই ছিল এই সাহিত্যসভার কাজ। এই সাহিত্যসভার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র। এই সময় ভাগলপুরে একটি সাহিত্য-সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে সৃজন ও নির্মাণ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণটি এই তরুণ সাহিত্যসেবীদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সাহিত্যসভায় পঠিত যে সমস্ত লেখা শরৎচন্দ্রের মনোনয়ন লাভ করত, সেগুলি সভার হাতে-লেখা পত্রিকা 'ছায়া'য় প্রকাশ করা হত।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যান। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি নিয়মিত সাহিত্যসাধনা শুরু করেন। ১৯০৩ থেকে ১৯১৩,-এর মধ্যে তিনি কিছু কিছু সাহিত্য রচনা করেছিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কবি নবীনচন্দ্র সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের' সভ্যবৃন্দ সাহিত্যবিভাগ থেকে একটি সংবর্ধনাসভার আয়োজন করেন। প্রথমাবস্থায় শরৎচন্দ্র গররাজি হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত গেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর সুললিত কণ্ঠে উদ্বোধন-সঙ্গীতটি গেয়েই সভা ছেড়ে পালিয়ে যান। নবীনচন্দ্র কিন্তু শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি খুশি হয়ে তাঁকে 'রেঙ্গুনরত্ন' আখ্যায় ভূষিত করেন। কবিবর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য উৎসুক হয়েছিলেন কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ আত্মগোপনকারী শরৎচন্দ্র নবীনচন্দ্রের সাথে দেখা করেন নি। এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ব্রহ্ম প্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায়,—"একবার রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙ্গালীরা মিলিয়া স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনের এই সহরে অভ্যর্থনা করেন। এই অভ্যর্থনাসভায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কবি নবীনচন্দ্রের সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় হয় তখন তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ওহে সে ছোকরাটি কোথায় থাকে হে? রবির গান সে বড় চমৎকার গায়।' কিন্তু ছোকরাটিকে বহুবার অনুরোধ করিয়াও নবীনচন্দ্রের সদনে লইয়া যাইতে সক্ষম হই নাই।"

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপান থেকে আমেরিকা যাবার পথে রবীন্দ্রনাথ ৭ই মে রেঙ্গুনে আসেন। রবীন্দ্রসংবর্ধনার জন্য রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কবি নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র নির্মলচন্দ্র সেন, গিরীন্দ্রনাথ সরকার

এবং অন্যান্য বন্ধুরা দ্বারস্থ হলেন শরৎ-সকাশে। কারণ অভিনন্দনপত্র তাঁকেই রচনা করে দিতে হবে। পরদিন ৮ই মে (২৫শে বৈশাখ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ) স্থানীয় জুবিলী হলে রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙালীদের পক্ষ থেকে নির্মলচন্দ্র সেন অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন। এই অভিনন্দনপত্রটি পাঠে রবীন্দ্রভক্ত শরৎচন্দ্রের মানসলোকের সম্যক পরিচয়টি পাওয়া যায়। মানপত্রটিতে তিনি লেখেন 'এই সুদূর পারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞান-রাজ্যের সম্রাট আপনাকে অভিবাদন করিতেছি'।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, শরৎচন্দ্র ঐ মানপত্রটি রচনা করে-ছিলেন এবং তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে রেঙ্গুন ত্যাগ করেন। পক্ষান্তরে কিন্তু গোপালচন্দ্র রায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, শরৎচন্দ্র ১২ই এপ্রিল রেঙ্গুন ত্যাগ করেন। রেঙ্গুনে রবীন্দ্রসংবর্ধনায় শরৎচন্দ্রের উপস্থিতি নিয়ে মতদ্বৈতের সৃষ্টি হয়েছে। গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

রেঙ্গুনে 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে' সাহিত্য বিভাগে মধ্যে মধ্যে সভ্যগণের প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদি পাঠ করা হত। এই রচনাগুলির গুণাগুণ নিযে তাঁদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হত। শরৎচন্দ্রকে ঐ ক্লাবের সভ্যগণ বার বার অনুরোধ করেছেন কিছু লিখে এনে পড়বার জন্য, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁদের কথা এড়িয়ে যেতেন। 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের' সদস্যগণের চাপে পড়ে শরৎচন্দ্র একটি সভায় 'নারীর ইতিহাস' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করবেন বলে কথা দেন। নির্দিষ্ট দিনে সভা ভিড়ে পরিপূর্ণ। সময় পার হয়ে গেছে তথাপি শরৎচন্দ্রের দেখা নেই। এমতাবস্থায় দুজন সভ্য শরৎচন্দ্রের বাড়ি গিয়ে দেখেন প্রবন্ধটি রেখে তিনি কোথাও চলে গেছেন। তাঁরা শরৎচন্দ্রকে সেদিন সভায় পান নি কিন্তু তাঁর রচনাটি পেয়ে তাঁরা খুশী হয়েছিলেন। প্রবন্ধটির রচনাভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর বিন্যাসে শরৎচন্দ্রের গভীর জ্ঞান ও অদ্ভুত রচনাশক্তির পরিচয় পেয়ে সেদিনকার সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়াভিভূত হয়ে শরৎচন্দ্রকে প্রশংসা না করে পারেনি।

শরৎচন্দ্র সম্ভবতঃ প্রকাশ্য সভাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের' সাহিত্য বিভাগের অনুষ্ঠিত একটি সভায়। এ সম্বন্ধে নরেন্দ্র দেব রচিত 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে নিম্নোক্ত বিবরণটি প্রণিধানযোগ্য—

'স্বভাবতঃ সভাভীরু শরৎচন্দ্র সর্বপ্রথম সভাপতি হয়েছিলেন রেঙ্গুনের বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের সাহিত্য বিভাগের অনুষ্ঠিত একটি সভায়। স্বদেশী

আন্দোলন যুগের প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত সুরেন সেন মহাশয় ছিলেন সেদিনকার প্রধান বক্তা। সভায় অনেকগুলি প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতিও পাঠের ব্যবস্থা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র পাছে যথাসময় না আসেন এই আশঙ্কায় সভার উদ্যোক্তারা এবার আগে থেকেই তাঁকে ধরে এনে হাজির করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন বাংলা দেশের একজন শক্তিশালী লেখক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলে সেখানে খ্যাত হয়ে পড়েছেন। বৃহৎ এক প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করা জীবনে তাঁর এই প্রথম। শরৎচন্দ্র গোড়ায় অত্যন্ত 'নার্ভাস' হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সব শেষে সভাপতির আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সেদিন যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন তা সকলের প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছিল। তবে একথা ঠিক যে সুবক্তা বলে তিনি কোন দিনই যশোলাভ করতে পারেন নি।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে ৭ই মে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করেন (গোপালচন্দ্র রায়ের মতে ১২ই এপ্রিল)। দেশে ফিরে তিনি বাজে শিবপুরে থাকতেন। নারায়ণ পত্রিকায় 'স্বামী' গল্পটি (শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২৪)। প্রকাশিত হওয়ার পব থেকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। দেশবন্ধুর আহ্বানেই অসহযোগ আন্দোলনের সময় শরৎচন্দ্র কংগ্রেস ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকাব রৌলাট আইন পাশ কবে। এর প্রতিবাদে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারাভারতব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন হয়। হরতালের দিন কলকাতার শোভাযাত্রায় ছয়-সাত জন নিহত এবং দশ-বারো জন আহত হয়। শরৎচন্দ্র ঐ মিছিলে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারাদেশ জুড়ে শুরু হয অসহযোগ আন্দোলন। শরৎচন্দ্র ঐ বৎসর কংগ্রেসে যোগদান করলেন। দেশবন্ধুর আহ্বানে তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতির পদও গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের নীতি অনুসারে তিনি দীর্ঘকাল খদ্দর পরেছিলেন এবং নিয়মিত চরকায় সুতা কেটেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে যথেষ্ট সম্ভ্রম করতেন ও মেনে চলতেন। সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ বাংলার কংগ্রেস মহারথীরা শরৎচন্দ্রকে আপনার মনে করতেন। শরৎচন্দ্রের কথা তাঁরা মেনে চলতেন। কংগ্রেস দলেও শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন নেতা—কি রাজনীতির ক্ষেত্রে কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি কখনো কোন দলের কাজে নিজ ব্যক্তিত্ব বলি দেন নি। এমনও দেখা' গেছে, তিনি সমস্ত দলের বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেছেন। মহাত্মা-গান্ধীর নির্দেশেরও তিনি

প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে মার্চ রংপুর যুব-সাম্মিলনে তিনি চরকা-নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন।

কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সময় তিনি হাওড়া জেলার প শুক্লেশ নিবারণী সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র কংগ্রেসকে প্রাণপ্রিয় মনে করতেন। হাওড়া জেলার তৎকালীন এক শ্রেণীব লোকের স্বার্থপরতা ও ফাঁকি দেখে তিনি ভীষণ বিচলিত হন। শরৎচন্দ্র তাঁর নীতিবোধ ও নিষ্ঠাকে অনুসরণের জন্য ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। পরে অবশ্য দেশবন্ধুর অনুরোধে তিনি পুনরায় উক্ত পদ গ্রহণ করেন। ঐ সময় থেকে প্রায় দশ বৎসর তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতির পদ-ত্যাগকালে তিনি একটি সভা আহ্বান করেছিলেন। কেন তিনি পদত্যাগ করলেন তার কারণ তিনি দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন। ঐ সভায় তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত বলেন—'ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভার এই ক্ষুদ্র শাখার যে কর্মভার আমার প্রতি ন্যস্ত হয়েছিল তা থেকে বিদায় নেবাব কালে আপনাদের কাছে মুক্ত কণ্ঠে তার হেতু প্রকাশ করাই এই সভার উদ্দেশ্য। একটা কথা উঠেছিল, চুপি চুপি সরে গেলেই ত হত, এই লজ্জাকর ঘটনা এমন ঘটা করে জানাবার কি প্রয়োজন ছিল ? আমার মনে হয় প্রযোজন ছিল, মনে হয় নিঃশব্দে চুপি চুপি সরে গেলে চক্ষুলজ্জাটা বাঁচত, কিন্তু তাতে সত্যকার লজ্জা চতুর্গুণ হযে উঠত।'

হাওড়া জেলার পক্ষ থেকে আজ যদি আমি মুক্ত কণ্ঠে বলি অন্ততঃ এ জেলাব লোক স্বরাজ চায় না, তার তীব্র প্রতিবাদ হবে। কাগজে কাগজে আমাকে অনেক কটূক্তি, অনেক গালাগালি শুনতে হবে। কিন্তু তবুও একথা সত্য। কেউ কিছু করব না, কোন ক্ষতি, কোন অসুবিধা, কোন সাহায্য কিছুই দেব না, আমার বাঁধাধরা সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাত্রার এক তিল বাহিরে যেতে পারব না।'

১৯২২ সালে জুন মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কারামুক্তি লাভ করেন। তাঁর কারামুক্তির পর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি সংবর্ধনাসভার আয়োজন করা হয়। এই সভাব অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন শরৎচন্দ্র। ঐ সভায় দেশবাসীর পক্ষ থেকে দেশবন্ধুকে একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। অভিনন্দনপত্রটি শরৎচন্দ্রেরই রচনা। মানপত্রটি দেশবাসীর পক্ষ থেকে দেওয়া হলেও মানপত্রটিতে শরৎচন্দ্রের দেশবন্ধু-প্রীতির সশ্রদ্ধ প্রকাশ ঘটেছে। মানপত্রে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন……'রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে

ভোলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের শ্রেষ্ঠ-বলি গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্ব-লোকচক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার জন্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইল।'

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যরূপে গয়া কংগ্রেসে তিনি যোগদান করেছিলেন। গয়া কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু বলেছিলেন অসহযোগকারীদের আইনসভায় প্রবেশ করা প্রয়োজন। বেশীর ভাগ প্রতিনিধিই দেশবন্ধুর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দেশবন্ধু নিজের মত প্রচার করতে উদ্যোগী হলেন। বেশীর ভাগ কংগ্রেসকর্মী, সংবাদপত্র দেশবন্ধুর বিপক্ষে। দেশবন্ধুর এই সংকটমুহূর্তে শরৎচন্দ্র তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। দেশবন্ধুর ভগ্নমনে শরৎচন্দ্র যোগালেন সঞ্জীবনীশক্তি।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সাহিত্যিকরা যে শোকসভা করেছিলেন তার সভাপতি হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র ঐ সভায় মৌখিক অভিভাষণ দিয়েছিলেন। ঐ সভায় কাজী নজরুল ইসলাম উদ্বোধনসঙ্গীত গেয়েছিলেন আর সমাপ্তিসঙ্গীত গেয়েছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। নির্ধারিত বক্তাদের বক্তৃতায় সভাটি শোকোচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সভাপতির ভাষণ দানকালে শরৎচন্দ্র কোন প্রকার সভার গাম্ভীর্য তো রাখলেনই, না বরঞ্চ তিনি শোকাহত জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ মন্তব্য করলেন। সত্যেন্দ্রনাথের শোকসভার অন্যতম উদ্যোক্তা অবিনাশ-চন্দ্র ঘোষাল-এর 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা' গ্রন্থটি থেকে নিম্নোক্ত বিবরণটি প্রণিধানযোগ্য—

"এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কোন সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করা শরৎচন্দ্রের এই প্রথম। এই কারণেই সেদিন সভা উপলক্ষে যে লোকসমাগম হয়েছিল, তাতে সভার কাজ যে পরিচালনা করা যাবে, এমন আশা একরকম ছিল না। যাই হোক, অতি-কষ্টে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে শরৎ-চন্দ্রকে ফটক থেকে উপরে সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একে তো শরৎ-চন্দ্র লাজুক মানুষ, তার উপর এই বিপুল জনতার ব্যূহ ভেদ করে দ্বিতলে এসে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সুখের বিষয়, সভার কার্য আরম্ভ হতে স্তব্ধতা বিরাজ করেছিল এবং সুশৃঙ্খলভাবে সভার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু যিনি সভাপতি, যাঁর জন্য এই বিপুল জনতার সমাবেশ হয়েছিল তিনি যে ভাষণ দিলেন তা বড় কৌতুকপ্রদ। তাঁকে প্রায় দুদিক থেকে ধরে যখন সভাপতির ভাষণ দিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল, তিনি বললেন, "আপনারা এখানে

সত্যেন্দ্রের জন্যে চোখের জল ফেললে কি হবে। তার বই পড়বেন, তবেই তার স্মৃতি বজায় থাকবে।"

এই বলেই তিনি বসে পড়লেন। আমার বেশ মনে আছে, কবি শশাঙ্ক-মোহন সেন তাঁকে কৌতুক করে বলেছিলেন —"শরৎবাবু, আপনার ভাষণই সবচেয়ে ভাল হয়েছে। এটা তৈরি করতে আপনার ক'দিন লেগেছে?"

শরৎচন্দ্র হেসে জবাব দেন, "আমাকে জোর করে সভাপতি করার এই ফল —আমার কোন দোষ নেই।"

এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র কোন্নগর পাঠচক্রে সভাপতির ভাষণে (১৩৪২) 'বাংলা বইয়ের দুঃখ' (শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী) প্রবন্ধে বলেছেন—"কত বড় বড় কবি উৎসাহের অভাবে নাম করতে পারেন নি। পরলোকগত সত্যেন দত্তর শোক-বাসরে গিয়ে দেখেছিলুম, অনেকে সত্যিই কাঁদছেন। তখন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলুম,—কড়া কথা বলা আমার অভ্যাস আছে, এরকম ক্ষেত্রে কড়া কথা মাঝে মাঝে বলেও থাকি। সেদিন বলেছিলুম, এখন আপনারা কেঁদে ভাসাচ্ছেন কিন্তু জানেন কি যে বারো বছরে তাঁর পাঁচশ'খানা বই বিক্রি হয় নি। অনেকে বোধ করি তাঁর সব পুস্তকের নাম পর্যন্ত জানেন না। অথচ আজ এসেছেন অশ্রুপাত করতে।"

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা আয়তনে এক মহতী সভায় শরৎচন্দ্র সে সময়কার শিক্ষাবিধি সম্পর্কে 'শিক্ষার বিরোধ' নামে একটি ভাষণ পাঠ করেছিলেন। এই প্রবন্ধটি পরে 'স্বদেশ ও সাহিত্য' পুস্তকে মুদ্রিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে শরৎচন্দ্র ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে বক্তৃতার সমালোচনা করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-সম্বন্ধটা অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্র-নাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবলি ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে লেশমাত্র আঘাত করে বসি। কিন্তু এ তো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়—যা তাঁরও বহু পূজ্য,—সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত।"

শিবপুর ইন্স্টিটিউটে শরৎচন্দ্র ১৩২৮ সালে পৌষ মাসে 'স্বরাজসাধনায় নারী' প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে নারীমুক্তি এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন যে স্বাধীনতা পেতে হলে নারীদের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। তিনি সমাজের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, "মেয়েমানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ হতে

দেই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ, যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে দেখেছে তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শোধ করতেই হবে।"

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে আগস্ট তারিখে প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙলা সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য ঐ কলেজের ছাত্ররা শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করতে তাঁর বাজে শিবপুরের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সভাপতি হতে হবে শুনে শরৎচন্দ্র প্রথমাবস্থায় কিছুতেই রাজী হন নাই। ছাত্রদের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিক্স থিয়েটারের সভায় শরৎচন্দ্রের আগমনবার্তায় প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। শরৎচন্দ্র-প্রদত্ত ভাষণটি পরে Presidency College Magazine-এ Vol. X. No. 1, Sept. 1923) মুদ্রিত হয়। এই সংখ্যার Editorial Notes-এ প্রকাশ 'On August 30 (1923) last we had the Anniversary of the Bengali Literary Society ··The Society invited the renowned novelist Srijut Sarat Chandra Chattopadhyay to deliver an address'.

সাহিত্য রচনায় বাস্তবতার সঙ্গে সামাজিক মঙ্গলবোধের সম্পর্ককে তিনি এক করে দেখেছেন —এইটাই শরৎচন্দ্রের সংস্কারী মনোভাবের পরিচয়। বাস্তবে তিনি যা কিছু দেখেছেন, যা কিছু ঠিক মনে করেছেন, তাই তিনি সাহিত্যে রূপদান করেছেন—প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সাহিত্যসভায় তিনি এই কথাই বলেছিলেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী দেশবন্ধু তাঁর সমর্থকদের নিয়ে 'স্বরাজ্য দল' নামে আলাদা একটা দল গঠন করেছিলেন। এই সময় দেশবন্ধুর প্রধান সহযোগী ছিলেন সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র। এই দলের নীতি এবং অসহযোগকারীদের আইনসভায় প্রবেশের কারণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। গয়া কংগ্রেসে যাঁরা তাঁকে সমর্থন করেননি 'স্বরাজ্য দলের' সমর্থনকারীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে তাঁরাও চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন। তাঁরা পুনরায় অসহযোগকারীদের আইনসভায় প্রবেশের কথা চিন্তা করলেন। কংগ্রেসের এই সংকটময় মুহূর্তে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়। দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতি হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। যথারীতি অসহযোগকারীরা আইনসভায় প্রবেশাধিকার পেলেন। দিল্লী কংগ্রেসে দেশবন্ধুর নেতৃত্ব

ও ব্যক্তিত্ব দেখে শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। দিল্লী কংগ্রেসের কথা তিনি 'দিন কয়েকের ভ্রমণকাহিনী' প্রবন্ধে বলেছেন, "যতই দেখিয়াছি ততই অকপটে মনে হইয়াছে, এই ভারতবর্ষের এত দেশ, এত জাতির মানুষ দিয়া পরিপূর্ণ বিরাট বিপুল এই জনসঙ্ঘের মধ্যেও এত বড় মানুষ বোধকরি আর একটিও নাই। এমন নির্ভীক, এমন শান্ত সমাহিত, দেশের কল্যাণে এমন করিয়া উৎসর্গ করা জীবন আর কই ?" [বিজলী, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৩০]

দিল্লী কংগ্রেসে আইনসভায় প্রবেশের নীতির অনুমতি পাবার কিছুদিন পর আইনসভার নির্বাচনের দিন স্থির হয়েছিল। দেশবন্ধু তাঁর সমর্থকদের নিয়ে বিপুল উৎসাহে নির্বাচনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে নির্বাচনপ্রার্থী হবার জন্য অনুরোধ কবলেন। শবৎচন্দ্রের কোনদিন কোন পদের মোহ ছিল না। তাই তিনি সবিনয়ে দেশবন্ধুব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন।

গয়া কংগেসে দেশবন্ধু হেরে গেলে তিনি তখন কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি 'স্ববাজ্য দল' গঠন করেন। এইসময় দেশবন্ধুর অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী, সমর্থক ও সহকর্মী শবৎচন্দ্র সবসময় দেশবন্ধুর সাথী ছিলেন। বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্মেলনে দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রও ঐ সম্মেলনে যোগদান কবেছিলেন (১৯২৪ খ্রী মে মাসে)। পথে স্টীমারে শরৎচন্দ্রেব সহিত দেশবন্ধুর রাজনীতি সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা হয়। বরিশালে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন অসহযোগকারীদের আইনসভায় প্রবেশ নীতিব ঘোর বিরোধী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। ঐ সভায় তিনি দেশবন্ধুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। দেশবন্ধু তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে সভাত্যাগ করেন। যাই হোক, ঐ সময় শবৎচন্দ্রকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বরিশাল শাখা কর্তৃক সংবর্ধনাব আয়োজন কবা হয়। ঐ সভায় দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র অভিনন্দনের উত্তরে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। পরে ঐ বক্তৃতাটি 'ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য' নামে 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। এই সংবর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন "আপনারা আমার বই পড়ে সবাই প্রশংসা কচ্ছেন, অথচ কিছুদিন থেকে লেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি। সাহিত্যসেবাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা বলে মনে করতে পারচি নে।" বক্তৃতাটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় শরৎচন্দ্র তখন নিজেকে অবিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যসাধনায় নিয়োজিত রাখতে পারেন নি। রাজনীতি তখন শরৎচন্দ্রকে মাতিয়ে তুলেছিল।

১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ় শিবপুর ইনস্টিটিউটের ডাকে তিনি সভাপতির ভাষণে 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধে 'দ্বিতীয় বক্তব্য'তে শরৎচন্দ্র আধুনিক সাহিত্য এবং বঙ্কিমসাহিত্যের নীতিগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন। এক জায়গায় তিনি যা বলেছেন প্রকৃত প্রস্তাবে সেখানেই যেন স্পষ্ট শরৎচন্দ্র ব্যক্ত হয়ে পড়েন, ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ সেও বলে, মন্দের ওকালতি করিতে কোন সাহিত্যিকই কোন দিন সাহিত্যের আসবে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইযা দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক দুর্নীতির মূলে হয়ত এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, সে মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।'

১৩৩১ সালের ১০ই আশ্বিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে শরৎচন্দ্র ছিলেন সভাপতি। এই সভায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণী চরিত্রের সমালোচনা করে বলেছেন, "আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর রোহিণী চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে লাস চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকি কিছু আর রইল না। ভালই হলো। হিন্দু সমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন, নরনারীর হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম? আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেছে।" এই সভায় তিনি আরও বলেন সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে সুনীতি ও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে। কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই---এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডোগোল করতে দিলে যে গোলযোগ বাঁধে কাল তাকে ক্ষমা করে না। নীতিপুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে। কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হবে না।' এই অভিভাষণটি পরে 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'সাহিত্য ও নীতি' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের যশ দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতির বিড়ম্বনাও শুরু হয়। রক্ষণশীল সমাজ চিৎকার করে উঠলো সমাজ ধর্ম মান—সব গেল। প্রাচীনপন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু করলেন কাগজে। আর

অন্য দিক থেকে শুরু হল শরৎচন্দ্রের অভ্যর্থনা। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ডাক আসতে শুরু হল সভাপতিত্ব করবার জন্য। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ও ১১ই এপ্রিল মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। সভাপতির ভাষণে তিনি আধুনিক সাহিত্যের জোরালো সমর্থন জানান। তিনি বলেন যে, আধুনিক সাহিত্যিকগণ সমাজকে দেবতা বলে স্বীকার করতে পারে না কারণ নারীর মূল্য আধুনিক সাহিত্যিকগণের চোখে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। প্রাচীনপন্থীদের মতে, 'আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অপরাধই এই যে, তার নর-নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি অর্থাৎ নানাদিক দিয়ে এই জিনিসটাই যেন মূলতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু হয়ে উঠেছে।'

তাঁর মতে অথচ আধুনিক সাহিত্য সেটাকেই অস্বীকার করে মূলতঃ সাহিত্যের প্রকৃত স্বাস্থ্যর প্রতিই নজর দিয়েছে। মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সভায় সভাপতির অভিভাষণটি 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' এই নামে 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে এই সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। এই সম্মেলন উপলক্ষে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের সহিত শরৎচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি রমেশবাবুর বাড়িতে যান। কিন্তু তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকতেন।

শরৎচন্দ্র শিবপুরে ফিরে এসে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৪ঠা বৈশাখ এক চিঠিতে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন· ·'কি যত্নটাই তোমরা আমাকে করেছ। জীবনে এই দিনগুলোই শুধু মনে থাকে। · আর একবার ঢাকায় যেতে হবে।'

আর একবার ঢাকায় যাবার কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শরৎচন্দ্রকে অনারারি ডি. লিট দেওয়া হয় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে।

মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা শরৎচন্দ্রের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়' এই মনুষ্যপ্রীতি মানবতাবোধের পিছনে আছে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি। মনুষ্যপ্রীতির প্রেরণায় শরৎসাহিত্যে অনেক উজ্জ্বল নারীচরিত্র স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন 'পল্লীসমাজ'-এর কথা—'পল্লীসমাজ' বলে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার নায়িকা বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না।

প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিকও তো আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে জন্ম গ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ-নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত' তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এত বড় শাস্তি ভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, একথা আমি নিশ্চয়ই জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবার কলম সেইখানেই সেদিন বন্ধ হয়ে যেত।'

এই প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহের কথা উল্লেখ করেন। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় বিচারানুসারে সরকারের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন কিন্তু হিন্দু সমাজ আইন মেনেছিল, মানে নি তাদের অন্তরে এমন কি তৎকালীন সাহিত্যে তার সমর্থনও মেলে নি। শরৎসাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। সমগ্র শরৎসাহিত্য পাঠে দেখা যায়, বিধবার প্রেম বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র পটু কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে তাঁর কলম সংযত, প্রচলিত সমাজের রীতিকেই তিনি অনুসরণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বিধবাদের প্রেম কোথাও নিষিদ্ধ হয় নি, তার বিশ্লেষণও হয়েছে যথেষ্ট, তার বিকাশও ঘটেছে। শরৎসাহিত্যে রাজলক্ষ্মী, রমা, সাবিত্রী, কিরণময়ী তাদের প্রণয়াস্পদকে প্রকাশে ও গোপনে ভালবেসেছে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের অন্তর বিধবা-বিবাহের অনুমতি দিতে পারে নি।

১৩৩৩ সালে আষাঢ় মাসে সুরমা উপত্যকা ছাত্র সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন, সেখানকার শিলচর ছাত্র সংঘ তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে মানপত্র দিয়েছিলেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জুন দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ ঘটে। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের মন একেবারে ভেঙে পড়ে। শরৎচন্দ্রের মনের অবস্থার কথা শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' পুস্তকে এক মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। "...কাঁদতে কাঁদতে যেদিন তিনি বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন তো তাঁর সঙ্গে আমরা কাঁদিনি, হাত ধরে বলিনি তো তাঁকে, ওগো, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি, আমরা

তোমাকে চাই, আমরা শুধু তোমারি। তাই তো তিনি শোধ নিয়েছেন। তাঁকে আমরা কাঁদিয়েছি —তিনি আমাদের কাঁদালেন। সুদে আসলে শোধ নিয়েছেন। বেশ করেছেন। We didn't deserve him, প্রবোধ, we didn't deserve him…কান্নার ভারে আবার ইজিচেয়ারে লুটিয়ে পড়লেন।"

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর দেশজুড়ে নানাস্থানে শোক-সভা হয়েছিল। ঐ সময় বালীতে দেশবন্ধু স্মৃতিসভার আয়োজন হয়েছিল। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র। সভাপতির ভাষণে তিনি দেশবন্ধুর দেশ-সেবা ও ত্যাগ সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন। (শরৎচন্দ্র, ২য় খণ্ড, গোপালচন্দ্র রায়)

১৯২৭ সালটি শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ঐ বৎসর মান্দালয় জেল থেকে সুভাষচন্দ্র, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বিপ্লবীরা মুক্তি পান। ১৯২৪ সালে রেগুলেশন ও বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স আইনে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ধৃত হন। জেল থেকে মুক্তি পেয়েও বন্দীদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠলো। সব সময় তাঁদের পুলিশের বিষদৃষ্টির মধ্যে কাল যাপন করতে হত। বাড়ি এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বার রুদ্ধ তাঁদের জন্য। এমন কি কংগ্রেসের লোকেরাও তাঁদের সুনজরে দেখত না।

শরৎচন্দ্র উৎসাহী হয়ে উঠলেন এই সকল বিপ্লবীদের যোগ্য সম্মান দানের জন্য। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হল। শরৎচন্দ্র ঐ কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন। সভাভীরু শরৎচন্দ্র সভাসমিতিতে কিছু বলতে সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হতেন কিন্তু এই সংবর্ধনাকালে শরৎচন্দ্র যেন নূতন মানুষ। তিনি নূতন উদ্যোগে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ শুরু করলেন। এই সংবর্ধনাসভায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন "·· দেশের জন্য এরা জীবন উৎসর্গ করেছে, যৌবন উৎসর্গ করেছে, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। গবর্নমেণ্ট এদের ভয় করে, কারণ জানে এদের তপস্যার মধ্যেই রচিত হচ্ছে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র। গভর্নমেণ্ট সহস্র চেষ্টা করেও পারলে না ধ্বংস করতে এদের মনের অপরাজেয় বল আর অন্তরের অনির্বাণ স্বাধীনতার স্বপ্ন। চিরনূতন চিরজীবী চিরতরুণ এরা। দেশের তরুণদের আমি বলি, তোমাদের মত এত বড় জীবন্ত আদর্শ আর কেউ নেই।"

শরৎচন্দ্রের অগ্নিময় বাণী দেশবাসীদের চেতনা ফিরিয়ে দিল। রাজবন্দীদের সম্পর্কে বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন এনেছিল। শরৎচন্দ্রের এই বিপ্লবী সংবর্ধনাসভার বক্তৃতা দেশের রাজনীতির মোড় ফিরিয়ে দিল। এ

সম্বন্ধে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' গ্রন্থের নিম্নলিখিত বিবরণটি উল্লেখ করা যেতে পারে। 'একটি সাধারণ জনসভা মাত্র, কিন্তু গুরুত্ব তার কম নয়,—অসাধারণ। প্রতিক্রিয়া তার সুদূরপ্রসারী। অনেক কিছুর বিরুদ্ধে এটা ছিল একটা ভীষণ চ্যালেঞ্জ। গভর্নমেণ্টের ভীতিপ্রদর্শন-নীতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ, দেশের লোকের ভীতিবিহ্বলতার প্রতি চ্যালেঞ্জ, নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদীদের ভায়োলেন্স শুচিবায়ের প্রতি চ্যালেঞ্জ, ধনিকপ্রধান স্বরাজীদের অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার প্রতি চ্যালেঞ্জ। ব্যারিস্টার এটর্নী না হলে, মোটরে চড়ে সভায় বক্তৃতা করতে না এলে, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স না থাকলে লীডার হয় না, এই মনোভাবের প্রতি চ্যালেঞ্জ।'

কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে শরৎচন্দ্র বিশ্বাসী ছিলেন তবুও তিনি বিপ্লবী-দের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যও করতেন। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত উত্তর-পাড়া 'কর্মী সংঘে'র একটি সভায় শরৎচন্দ্র গিয়েছিলেন। ঐ সময় শরৎচন্দ্রের অন্যতম সাথী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ঐ সভায় নজরুল একটি দেশাত্মবোধক গান গেয়েছিলেন।

এই সভাতে তিনি কথাপ্রসঙ্গে মুন্সীগঞ্জের সাহিত্য সম্মিলনের কথা উল্লেখ করেন। "সেখানে (মুন্সীগঞ্জে) এক ফাঁকে কয়েকজন আমার কাছে এসে বললে—'আপনার লেখা পড়লে আমরা বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু রবিবাবুর লেখা তেমন বুঝতে পারি না।'

"তারা হয়তো ভেবেছিল এইভাবে রবীন্দ্রনাথের নিন্দা ক'রে আমার প্রশংসা করলে, আমি খুশী হব। কিন্তু আমি তাদের বললাম—সে তো হবেই, কারণ আমি লিখি আপনাদের জন্য, আর তিনি লেখেন আমাদের জন্য। সেই জন্যই আপনারা তাঁর লেখা বুঝতে পারেন না।"

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহন লাইব্রেরিতে রাজা রামমোহন রায়ের অষ্টনবতিতম স্মৃতিসভার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র। ঐ সভায় জন-সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনা করে ২৬শে সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় উক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়। উক্ত সংবাদপত্রে সভাপতি ও বক্তাদের নাম প্রকাশিত হয়। রামমোহন স্মৃতিবার্ষিকী সভায় সভাপতির ভাষণে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটি গল্পের সঙ্গে তুলনা করে কিভাবে রামমোহন রাজ-নীতি, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার থেকে ধর্মজগতে বেরিয়ে এলেন তা তিনি গল্পাকারে জনসভায় ব্যক্ত করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের জীবনীকার গোপালচন্দ্র

রায় রামমোহন স্মৃতিবার্ষিকী-সভার তারিখ ও স্থান কি প্রকার কষ্ট করে উদ্ধার করেছেন তার বিবরণ তিনি 'শরৎচন্দ্র' ২য় খণ্ডে দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র বক্তা নন, তিনি বক্তৃতা দিতে পারেন না—একথা তিনি প্রায় প্রত্যেক সভায় বক্তৃতা দেবার পূর্বমুহূর্তে সভাস্থ জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে বেলুড়মঠ প্রাঙ্গণে একটি সাধারণ সভা হয়। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র সুভাষ বসুর পাশেই বসেছিলেন। সমবেত ভক্তমণ্ডলী শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে সভাপতি শরৎচন্দ্রকে বক্তৃতা দিতে বলেন। ঐ সভায় গিরীন্দ্রনাথ সরকার বিবেকানন্দ সম্পর্কে একটি ছোট বক্তৃতা দিয়েছিলেন। গিরীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শেষ হলে শরৎচন্দ্র বক্তৃতা শুরু করলেন—"শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত সন্ন্যাসিবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ! সকলেই জানেন, আমি বক্তা নই। বক্তৃতা আমি কোনদিনই দিতে পারি না, আমাকে বক্তৃতা করতে অনুরোধ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এটি একটি ধর্মসভা, কিন্তু আমি ধার্মিক নই, কোনদিন ধর্মচর্চা করিনি। সে কথা আমার লেখার মধ্যে চাইলেই আপনাদের চোখে পড়বে। মঠের সন্ন্যাসীদের কাজকর্মের উপর আমার বিশেষ আস্থা নাই,·· ···আমার বিশ্বাস উপস্থিত মঠের কাজগুলি ঠিক পরমহংসদেবের ভাবানুযায়ী বা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শানুযায়ী কিন্তু হচ্ছে না।"

(গিরীন্দ্রনাথ সরকার—ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র)

শরৎচন্দ্রের এই বক্তৃতার প্রতিবাদ করে স্বামী বিজয়ানন্দ বলেছিলেন, '··· শরৎবাবুর মত প্রতিভাবান লেখক এই মঠ ও মিশনের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ না জেনে এরূপ বলায়, আমরা বড়ই দুঃখিত।'

এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন, সুভাষচন্দ্র নাকি তাঁকে জোর করে সভায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রকে তিনি উল্টো কথা বলবেন একথাও পূর্বেই বলেছিলেন। শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে সুভাষচন্দ্র তাঁকে সাবধান করে দেবার জন্য জামা ধরে টানেন। এই অস্বাভাবিক পরিবেশকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা শেষ হলেই দাঁড়িয়ে বললেন —'মিশনের কাজে আরও প্রেরণা ও উৎসাহ আনার জন্যই—শরৎবাবু আপনাদের এই কথাগুলে বললেন। অন্য কিছু ভেবে বলেন নি।'

শরৎচন্দ্র তক্ষুনি আবার দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্রের কথার প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন—'না, না, সুভাষ—আমি যা বলেছি তা ঠিকই বলেছি। ওর মধ্যে আর অন্য কোন অর্থ নেই। আমি পরিষ্কারই বলেছি।'

এরপর অবশ্য সুভাষ আর কিছু বলল না। (শরৎচন্দ্র— ২য় খণ্ড গোপালচন্দ্র রায়)

'সত্যাশ্রয়ী' শরৎচন্দ্র ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র নিহিত দেখেছিলেন। তাই তিনি যৌবনের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন তাদের জীবনে সত্যনিষ্ঠাই হবে ধর্ম। ১৯২১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মালিকান্দা অভয় আশ্রমে পশ্চিম বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীর অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে এই কথা বলেছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই অভিভাষণটি 'সত্যাশ্রয়ী' নামে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে [illegible] তারিখে একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে [illegible] 'শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী'তে স্থান পায়।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে গুড ফ্রাইডের ছুটিতে (২৯শে মার্চ) রংপুর যুব সম্মেলনে শরৎচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়ে হাওড়া জেলার বাজুতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন হয়। সেখানেও শরৎচন্দ্রকে [illegible] শাখার সভাপতি নির্বাচন করা হয়। শরৎচন্দ্র [illegible] থাকতে পারবেন বলে মত দিয়েছিলেন। [illegible] মার্চ [illegible] বাজুতে এসে [illegible] পারেন নি [illegible] যাওয়ার জন্য তাঁকে রংপুরের লোকেরা [illegible]। রংপুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র [illegible] যুব সম্মেলনের অধিবেশনে শরৎচন্দ্র প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ পরে 'তরুণের বিদ্রোহ' নামে প্রকাশিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর চরকা নীতিকে তিনি সমর্থন করেন নি। এই ভাষণে তিনি ভারতবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন, [illegible] খদ্দর পরে দুহাতে চরকা ঘোরালে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে [illegible] আপোসকামী মনোভাবের বিরোধিতা করে [illegible] বিপ্লবী মতবাদকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। [illegible] তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলার যুবসমাজের [illegible] আন্দোলনের [illegible] আত্মত্যাগের কথা তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন। তাই তিনি দেশের যুবশক্তিকে বাইরের নেতৃত্বের উপর নির্ভর না করে নিজের উপর বিশ্বাস রাখার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যুবসংঘ কেবলমাত্র প্রাণের প্রেরণা ও আগ্রহ দিয়ে তৈরী। এই ভাষণের এক জায়গায় বলেছেন, 'ভারতের আকাশে আজকাল একটা বাক্য ভেসে বেড়ায়— সে বিপ্লব। বৈদেশিক রাজশক্তি তাই তোমাদের ভয় করতে শুরু করেছে। কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলো না যে, কখনও কোন দেশেই শুধু শুধু বিপ্লবের জন্যেই বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন,

অকারণ বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধ'রে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে।'

শরৎচন্দ্র এই বক্তৃতা সম্পর্কে 'বেণু' পত্রিকার (৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৬) 'যুব সংঘ' প্রবন্ধে বলেছেন –"উত্তরবঙ্গের রংপুর শহর থেকে তোমাদের এইখানি লিখছি। তোমরা জান বোধ হয়, বাংলাদেশে যুব সমিতি নাম দিয়ে একটি সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছে।···আমি বুড়োমানুষ, তবুও ছেলেমেয়েরা আমাকে এই সম্মিলনের নেতৃত্ব করবার জন্য আমন্ত্রণ করে এনেছে। তারা আমার বয়সের খেয়াল করেনি।

"যুব-সমিতির সম্মিলনে এই কথাটাই আমি সকলের চেয়ে বেশী করে বলতে চেয়েছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম তোমাদের পরাধীন দেশটাকে বিদেশীর শাসন থেকে মুক্তি দেবার অভিপ্রায়েই তোমাদের সংঘ গঠন। ইস্কুল কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থাতেও দেশের কাজে যোগ দেবার দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিষয় চিন্তা করবার অধিকার আছে এবং এই অধিকারের কথাটাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করবার অধিকার আছে।"

রংপুরে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভায় শরৎচন্দ্রের সভাপতির ভাষণটির বিরোধিতা করে অনেকে সমালোচনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তার উত্তরে শ্রীপরশুরাম ছদ্মনামে 'নতুন প্রোগ্রাম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি ১৩৩৬ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'বেণু'তে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৮ সালে বৈশাখ মাসে শরৎচন্দ্র কুমিল্লায় যুব সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কুমিল্লার পথে সুভাষচন্দ্রের বিরোধী দল শরৎচন্দ্রের প্রতি একজায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে ১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ একটি চিঠিতে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন—"মণ্টু, দেশোদ্ধার করবার জন্য সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল। পথে একদল শেম, শেম বললে, গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতিজ্ঞাপন করলে, আবার একদল বারো ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়, ও মায়া। যাই হোক্ রূপনারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেছি।······জয় হোক কয়লার গুঁড়োর, জয় হোক্ বারো ঘোড়ার গাড়ির।"

১৩৩৫ সালে (১৯২৮ খ্রী) ৯ই বৈশাখ পুরুলিয়া 'হরিপদ সাহিত্য মন্দির' পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশনের প্রথম দিনের সভাপতি হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র।

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় খবরটি ১৫ই বৈশাখ প্রকাশিত হয়েছিল। ইউ. এন. মুখার্জী সভাপতিপদে শরৎচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করেন। তিনি অস্পৃশ্যাদের সাহিত্যচর্চার অধিকারের জন্য শরৎচন্দ্রকে অগ্রণী হতে অনুরোধ করেন।

বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও দেশসেবক নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ইউ. এন. মুখার্জীর কথা সমর্থন করেন এবং 'পথের দাবী'-প্রণেতা রূপে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর ভাষণে অস্পৃশ্যাদের সাহিত্যচর্চাব অধিকার সম্পর্কে বলেন 'যখন সময় আসিবে তখন তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন। তাহার জন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে হইবে না।'

১৩৪০ সালে মাঘ মাসে দিলীপকুমার রায়ের 'অনামী' বইটি নিয়ে একটি আলোচনাসভা হয়েছিল। সভার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র।

১৩৩৮ সালে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৩৩৮ সালের পৌষমাসে বড়দিনের ছুটির সময় কলকাতায় কয়েকদিন ধরে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব পালিত হয়। এই সময় কলিকাতায় টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় দেশবাসীর পক্ষ থেকে কবিকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে কবিকে যে মানপত্র দেওয়া হয় তা রচনা করবার ভার পড়েছিল শরৎচন্দ্রের উপর। মানপত্রটির সঙ্গে একটি চিঠিতে (৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৮) লেখেন, সঙ্গে এই লেখাটা পাঠালাম। দেখতেই পাবে কারুকার্যের ছটায় অভিভূত করবার চেষ্টামাত্র করিনি ; কারণ সেটা অসম্ভব।'

১৩৩৮ সালে ৯ই পৌষ অপরাহ্নে কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার জন্য যে সাহিত্য সম্মেলন হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র। সভাপতির অভিভাষণ রূপে তিনি 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'কবি তুমি অনেক দিয়েছ, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েছি। সুন্দর, সবল, সর্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েছ তুমি, দিয়েছ বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েছ অনুরূপ সাহিত্য, দিয়েছ জগতের কাছে বাঙ্গলার ভাষা ও ভাবসম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েছ যা সকলের বড়—আমাদের মনকে তুমি দিয়েছ বড় করে।'

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা যে কত গভীর এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে শরৎচন্দ্র কতখানি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তা তিনি এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। "কবির সঙ্গে কোনদিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটে নি, তাঁর কাছে বসে সাহিত্যের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাই নি, আমি ছিলাম একে-বারেই বিচ্ছিন্ন। এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ

বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথাসাহিত্য এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ঐ ক'খানা বই-ই বার বার করে পড়েছি—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিশিয়ে কোথাও কোনও ক্রটি ঘটেছে কিনা এসব বড় কথা কখনও চিন্তা করিনি—ওসব দিন আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথাসাহিত্যে আমার ছিল এই পুঁজি।

"একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্যসেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখাবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সবথেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম—ভয়ের কথা মনেই হলো না। আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

"রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে আমি পারিনে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ওঁর অন্তরের সন্ধান আমাকে দিয়েছে। পণ্ডিতের তত্ত্ববিচারে তাতে ভুল যদি থাকে তো থাক্, কিন্তু আমার কাছে সেই সত্য হয়ে আছে।"

১১ই পৌষ অপরাহ্নে টাউন হলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব কমিটি কবিকে সংবর্ধনা জানান। ঐ সভায় কবিকে শরৎচন্দ্র-রচিত মানপত্রটি দেওয়া হয়। মানপত্রটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু অসুস্থ থাকায় কবি কামিনী রায় পাঠ করেন। মানপত্রে তিনি লেখেন, 'আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য, তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে, তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতার্থ হইয়াছি।'

রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় শরৎচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। একটি পত্রে (২৮শে পৌষ ১৩৩৮) অমল হোমকে লিখেছেন......"সত্যি অমল, আমি যে কতখানি খুশী হয়ে এসেছি। সে তোমরা (না তুমি?) টাউন হলে সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে, আমার গলায় মালা দিলে বলে নয়, আমার লেখা মানপত্র কবির হাতে দিলে বলেও নয়—যেভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হল, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায়, শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক করে তুললে—তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ।

"...আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি গুরু বলে,—আমার চাইতে কেউ বেশী মক্‌সো করেনি তার লেখা।

তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশী বার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস, তাঁর 'চোখের বালি', তাঁর 'গোরা', তাঁর 'গল্পগুচ্ছ'। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্য।"

আশুতোষ কলেজে বাঙলা সাহিত্য-সম্মেলনে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেছিলেন (১৩৪২ সাল, ২১শে ফাল্গুন)। শরৎচন্দ্রকে সভাপতির পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করবার জন্য ঐ কলেজের পরিচালক সমিতির বিশিষ্ট সদস্য রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বলা হয়। রমাপ্রসাদবাবু ঐ কলেজের অধ্যাপক কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরীকে শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠান, কারণ, শরৎচন্দ্রের সহিত কুমুদবাবুর 'পথের দাবী' প্রকাশের ব্যাপারে ঘনিষ্ঠতা ছিল যথেষ্ট। প্রথমাবস্থায় শরৎচন্দ্র রাজী না হলেও শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিলেন। সভার দিন শরৎচন্দ্র ঐ সভায় ঠিক সময়মত উপস্থিত হন নি। দেরি দেখে কুমুদবাবু একটি গাড়ি নিয়ে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, শরৎচন্দ্র দিব্যি বৈঠকখানায় বসে নিশ্চিন্তমনে গড়গড়ায় তামাক টানছেন। তাঁকে যে একটা সভায় যেতে হবে এবং সভার সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে তাঁর খেয়ালই নেই।

কুমুদবাবু মনে করিয়ে দিলে তবেই তাঁর খেয়াল হল—তাঁকে সভায় যেতে হবে। কুমুদবাবু শরৎচন্দ্রকে প্রস্তুত হতে বলে যতীন্দ্রমোহন বাগচিকে আনতে গেলেন। অবশ্য যতীনবাবু ও শরৎচন্দ্র একসাথে সভায় যাননি। (১৯৩২ সালে শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মতিথিতে দেশবাসী কলিকাতার টাউন হলে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করবার ব্যবস্থা করলে, সেইসময় কবি যতীন্দ্রমোহন তাঁর দলের কয়েকজন কবি সহ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন—মহাত্মা গান্ধী অনশন করবেন কথা হচ্ছে, অতএব শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনসভা বন্ধ করে দেওয়া হোক্—এইজন্য শরৎবাবু যতীনবাবুর সাথে একসাথে সভায় যাননি।) এই সভার সভাপতিত্ব করবার সময় ধূমপান করেছিলেন। এই সভায় অতি আধুনিক সাহিত্যের পরিণাম ব্যাখ্যা করেন—প্রত্যেকেই তার যোগ্যতা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করবে, এর মধ্যে যেগুলি থাকবার থাকবে, বাকিগুলো লোপ পেয়ে যাবে।

১৩৪০ সালের ১৩ই মাঘ ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মেলনের মূল সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র বলেন সাহিত্য-সম্মেলনের রূপ ও রীতি একই। সাহিত্য-সম্মিলনে 'হয় সবই, হয় না কেবল পরিচয়। হয় না শুধু ভাবের আদান-প্রদান, বাকী থেকে যায় পরস্পরের মন-জানাজানি। তার অবকাশ কই? বড় বড় সুনিশ্চিত সারবান প্রবন্ধের ভারে ভারাক্রান্ত সম্মিলনী মেলা-মেশার

সময় করবে কি, নিঃশ্বাস নেবার ফুরসৎ ক'রে উঠতে পারে না। সেখানে না থাকে পান-তামাক, না থাকে চা। নড়া-চড়ার জো নেই, পাছে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, হাস্য-পরিহাসের সাহস নেই, পাছে বে-আদপি প্রকাশ পায়, আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ মেলে না পাছে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। যেন আদালতের আসামীর মতো সেখানে সবাই গম্ভীর, সবাই বিপন্ন! আড়চোখে সবাই চেয়ে দেখে প্রবন্ধের খাতায় আরও ক'পাতা লেখা পড়তে তখনও বাকী।'

এই সভায় তিনি কোন 'সারালো ও ধারালো' লেখা লিখে আনেন নি। শরৎচন্দ্র ছিলেন মজলিসী মানুষ, তিনি সভা-সমিতির এই বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে যেতে চাইতেন না। তাই হয়তো তিনি সভাসমিতি এড়িয়ে চলতেন। এই সম্মেলনের উপকারিতার কথা তিনি বলেছেন, "এই উপলক্ষ না ঘটলে হয়ত কোনদিন আমাদের আপনাদের দেশে আসা হত না, আপনাদের সৌজন্য, সহৃদয়তা, সৌভ্রাত্র ও আতিথেয়তার স্বাদ গ্রহণ করা ভাগ্যে জুটত না। ·· সাহিত্যের পুণ্য-মিলনক্ষেত্র ছাড়া এতগুলি হিন্দু মুসলমান ভাই বোনরা আমরা একাসনে ব'সে এমনভাবে মিলতে পারতাম আর কোন্ সভাতলে?"

ফরিদপুর বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করতে গেলে সেখানকার রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্ররা এক সভায় শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানায়। অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র তাঁর স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণ করেন। সকল ছাত্র-ছাত্রীই স্কুলজীবন শুরু করার সময়ে জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে। শরৎচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য থেকেও তিনি ঠিক ততখানি বঞ্চিত হয়েছিলেন—জীবনের অপরাহ্নবেলায় এসে তাঁর ঠিক একথাই মনে হয়েছিল। তাই তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'এ জীবনে একটা সত্য উপলব্ধি করেছি, সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ফাঁকি দিয়ে মানুষের চোখ সামলাতে গেলে সে ফাঁকি একসময় নিজেকে এসেই বেঁধে। তোমাদের তাই বলব—অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমাদের সামনে। তোমাদের দিয়ে দেশ একদিন বড় হবে। তোমরা তাই খাঁটি হও। চোখে দেখে যা পরখ করবে না, জীবনে তাকে সত্য বলে প্রচার করবে না, তাতে ঠকতে হয়।'

১৩৪১ সালের কার্তিক মাসে শরৎচন্দ্র যশোহর জেলার কালিয়া গ্রামে 'বাণীমন্দির' নামক একটি গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শরৎচন্দ্রের কালিয়া যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোপালচন্দ্র রায় একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে (২য় খণ্ড)। সভাভীরু শরৎচন্দ্র সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতেন কোন সভায় যাওয়ার আহ্বান শুনলেই। কালিয়া 'বাণীমন্দির' গ্রন্থাগারেও তিনি যেতেন না। শুধুমাত্র কিরণশঙ্কর রায়-এর

একটি চিঠি প্রস্তাবকারী অর্থাৎ বিনয়কুমার দাশগুপ্ত নিয়ে এসেছিলেন। তাই দেখে তিনি মত দিয়েছিলেন। যাই হোক অনিচ্ছা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র কালিয়ায় গিয়েছেন শেষপর্যন্ত। তিন দিন তিনি ছিলেন কালিয়ায়। প্রথম দিন গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। দ্বিতীয় দিন তাঁর আগমনে স্থানীয় নাট্যমন্দিরে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকটি অভিনীত হয়। শরৎচন্দ্র সে অভিনয় দেখেছিলেন। তৃতীয় দিন কালিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে শরচচন্দ্র যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা খুবই সাধারণ। এই ক্ষুদ্র বক্তৃতায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করে বলেছিলেন 'আমি বক্তা নই, এমন কি ঠিক সাহিত্যিকও নই। কেননা আমি বঙ্কিমচন্দ্রের মত চাঁদ বা নদী নিয়ে পাতার পর পাতা লিখতে পারি না।...আমি মানুষের মনের খবর রাখি এবং তাই নিয়েই কারবার করি। মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মান-অভিমান, ভালোবাসা ও মানসিক দ্বন্দ্বকেই আমি আমার সাহিত্যে ফোটাবার চেষ্টা করে থাকি। সেই দিক থেকে আমি একজন বিজ্ঞানী অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানী'।

১৩৪১ সালে পৌষমাসে কলকাতার টাউন হলে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন হয়। এই সম্মিলনের সাহিত্যশাখার অধিবেশনে শরৎচন্দ্র উপস্থিত থেকে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 'সাহিত্যিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য' নামে বক্তৃতাটি পরে পুস্তকাকারে 'শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী' পুস্তকে মুদ্রিত হয়। এই বক্তৃতাতে তিনি বলেছেন 'সাহিত্যের ভিত প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যের উপর। সত্যিটা যেন বনেদের মত মাটির নিচে থাকে এবং তাহলে তার উপর যে সৌধটা গড়ে তুলবো কল্পনা দিয়ে—সেটা সহজে ডুবে যাবে না।'

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের শেষদিন (১৫ই পৌষ ১৩৪১ বঙ্গাব্দ) সম্মিলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কবি অতুলপ্রসাদ সেনের অকালমৃত্যুতে শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র। টাউন হলে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় শরৎচন্দ্র অতুলপ্রসাদের মৃত্যুতে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন 'অতুলপ্রসাদ ছিলেন ভারী ভক্ত এবং ভগবৎপ্রেমে তাঁর মন পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর দয়া, দান, দাক্ষিণ্য জানাবার লোক এ সভায় নেই,-তাঁরা অত্যন্ত গরীব-অখ্যাত, অজ্ঞাত অজানালোক, তাঁরা যদি আসতে পারতেন তাহলে বলতেন কত বিপদের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে অতুলপ্রসাদ দিয়েছেন এবং তাদের বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন।

তাঁর গান বাঙলা দেশ ছাড়িয়ে যেখানে যেখানে বাঙালী আছেন, সেখানে পৌঁছেছে। তাঁর জীবনটিও ছিল ঐ ধরনের।...গানের ভিতর দিয়ে, কাব্যের

ভিতর দিয়ে, তিনি বাঙলা ভাষার অনেক উন্নতি করেছেন। তাঁর গানের মত ছিল তাঁর জীবন। এমনি করে এই ধারা ধরে-বাঙ্গলা সাহিত্যকে যাঁরা বড় করেছেন, অতুলপ্রসাদ তাঁদের মধ্যে একজন।···তিনি চলে গেলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে, ব্যথার সঙ্গে এই কথাই মনে করছি—তিনি আমাদের মধ্যে নেই।' [আনন্দবাজার পত্রিকা ১৬ই পৌষ ১৩৪১]

১৩৪২ সালের ২৫শে ও ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শান্তিপুর সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের মূল সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শরৎচন্দ্র এবং সাহিত্য শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 'বিচিত্রা'-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল স্কুল হলে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে মূল সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ২৬শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ ভবনে সম্মিলনের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয। এই সভায় সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক পরলোকগত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশযের চিত্রপ্রতিষ্ঠা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায দামোদব মুখোপাধ্যায়েব সম্বন্ধে কবিতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করা হয। এই দিন অপরাহ্নে স্কুলহলে সম্মেলনের সাহিত্যশাখার অধিবেশন হয়। সভাপতির অভিভাষণে শরৎচন্দ্র ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যের ধাবা কোন পথে প্রবহমান তার আলোচনা করেন এবং নব্য সাহিত্যসেবকদেব উদ্দেশ্যে তিনি বলেন 'আমি সাহিত্যসাধনার ব্রত নিযেছি দুঃখের ভেতর দিয়ে। সোজা কথায় আনন্দ ও দুঃখকে ব্যক্ত করেছি। আশা করি নতুন লেখকেবা এই ব্যথার স্থানগুলোকে ভাল করে তুলে ধরবেন, সংস্কারের সমাধানেব জন্য চিন্তাধারা দেবেন।'

১৩৪২ সালে আশ্বিন মাসে হুগলী জেলাব কোন্নগর পাঠচক্রের এক সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন শবৎচন্দ্র। এই সভায বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশেব গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ কুমাব মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়। এই সভায কুমাব মুনীন্দ্র দেব রায় ইউরোপীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা করেন। শবৎচন্দ্র ঐ বক্তৃতাব পুনরাবৃত্তি করে বলেন—"কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর কিছু না হোক অন্ততঃ একটি উপকার আমরা পেয়েছি। ইউরোপের নানা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তিনি যা বললেন, হয়ত তার অনেক কথাই আমাদের মনে থাকবে না। কিন্তু আজ তাঁর বক্তৃতা শুনে আমাদের মনে জেগেছে একটা আকুলতা। ইউরোপের গ্রন্থাগারের অবস্থা যে রকম উন্নত, সে রকম অবস্থা আমাদের দেশে কবে হবে—তা কল্পনাও করা যায় না।··কোথায় ইউরোপ আর কোথায় আমাদের দুর্ভাগা দেশ।

যুগ-যুগান্তরের পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে। একমাত্র ভগবানের বিশেষ করুণা ছাড়া পরিত্রাণের আর ত কোন আশা দেখি না।"

শরৎচন্দ্র যদিও প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না তথাপি অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানিয়ে পারেন নি। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে কলকাতার টাউন হলে একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। সভাব উদ্বোধনী বক্তৃতায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'ভারত-রাজ্য শাসনের নূতন যন্ত্র বিলাতের মন্ত্রিগণ বহুদিনে বহুযত্নে প্রস্তুত করেছেন। জাহাজে বোঝাই দেওয়া হয়েছে,—এলো ব'লে। তার ছোট বড় কত চাকা, কত দণ্ড, কত কলকব্জা, কোনটা কোন দিকে ঘোরে, কোন দিকে ফেরে, কোন মুখে এগোয়—আমরা কেউ ঠিক জানি নে। এবং মূল্য তার শেষ পর্যন্ত যে কি দিতে হ[য়] সে ধারণাও কারও নেই।···রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাসই কি হয়ে দাঁড়ালো সকলের বড়? আর মানুষ হ[ল] ছোট? যে ব্যবস্থা জগতের কোথাও নেই, কোথাও কল্যাণ হয় নি, এই দুর্ভাগা দেশে তার কি হ'ল special and peculiar circumstances? আর সে কেউ বোঝে না—নাবালকের trusteeরা ছাড়া?···নূতন শাসনব্যবস্থাব আগা-গোড়াই মন্দ। সেই অপরিসীম মন্দের মধ্যেও বাংলায় হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হন সবচেয়ে বেশী। আইনের পেরেক ঠুকে তাঁদের ছোট করা হল চিরদিনের মত।···কিন্তু এই অন্যায়ের জনক যাঁরা, তাঁদের বলতে চা[ই],—অন্যায়, অবিচার একজনের প্রতি হলেও যে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্যন্ত না মুসলমানের, না হিন্দুর, না জন্মভূমির—কারও মঙ্গল হয় না।'

কয়েক দিন পরে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়াবার বিরুদ্ধে এলবার্ট হলে আর-একটি প্রতিবাদসভা হয়েছিল। এই সভায় সভাপতির অভিভাষণে শরৎচন্দ্র বলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমিতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিষবৃক্ষ রোপণে হিন্দু এবং মুসলমানের অপরিসীম ক্ষতি হবে এবং ভারতবর্ষের অগ্রগতির বাধা স্বরূপ এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন শরৎচন্দ্র। তিনি ভারতবর্ষকে হিন্দু-মুসলমানের দেশ বলে মনে করতেন কিন্তু স্বাধীনতাসংগ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত কম অংশগ্রহণ করায় শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথিত হন।

শরৎচন্দ্র ও রাজনীতি

ড. শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র মূলতঃ সামাজিক কথাসাহিত্যিক, তাঁর লেখায় সমাজের কঠিন ও জটিল নানা সমস্যা উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। সমাজের সঙ্গে সমাজভুক্ত মানুষের সংঘর্ষ চিত্রায়ণে বাংলা সাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয়, একথা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ রেখেও বলা যায়।

সামাজিক চেতনার তুলনায় শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা কিছুটা দুর্বল সন্দেহ নেই, তবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মাদনাময় কর্মক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের স্বেচ্ছাকৃত সুস্পষ্ট পদসঞ্চার ঘটেছিল ব'লে এই রাজনৈতিক চেতনা সযত্ন বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। শরৎচন্দ্র বড় সাহিত্যিক, তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী অসংখ্য মানুষের মনের গভীরে দাগ কেটেছে। সে হিসেবে জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিতে মহান কথাসাহিত্যিকের প্রকৃত অবদান কী একথা জানার আগ্রহ তাঁর অনুরাগীদের পক্ষে স্বাভাবিক,—বিশেষ করে শরৎচন্দ্র যখন সমকালীন জাতীয় আন্দোলনে বা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ছেড়ে কলকাতায় এসে স্থায়িভাবে বাস করতে শুরু করেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল, ব্রিটিশ শাসন-কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের সময় ভারতের সাহায্য স্বীকার করে নিয়ে যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধজয়ী ইংরেজ সরকার কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি স্বচ্ছন্দে ভাঙলেন, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে তাঁরা ভারতকে দিলেন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং দ্বৈতশাসনের ছেলেখেলা। দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রত্যাগত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব তখন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজ সরকারের এই প্রতিশ্রুতিভঙ্গে গান্ধীজী দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বিক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, "আমরা রুটি চেয়েছিলাম, আমাদের পাথর দেওয়া হয়েছে ("We wanted bread, we have got stone instead")। এই ঘোষণার সঙ্গে তিনি আসমুদ্র-হিমাচল অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন ও পরিচালনা করে ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিৎ কাঁপিয়ে দিলেন। শরৎচন্দ্র দরিদ্র মানুষ, সাহিত্যসৃষ্টিই তাঁর উপজীবিকা, তবু এই মহান আবেগপ্রবণ সাহিত্যিক পরম জাতীয় প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় নিজেকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে জড়িয়ে ফেললেন, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও যথাসাধ্য দেশসেবার দায়িত্ব নিয়ে

নিষ্ঠাবান সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তখন তিনি হাওড়া-শিবপুরে থাকতেন। শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তো হলেনই, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিরও তিনি সদস্য হলেন। কংগ্রেসে এই নেতৃত্বের ভূমিকা তৎকালীন রাজনৈতিক আকাশে উদীয়মান সূর্য সুভাষচন্দ্রকে শরৎচন্দ্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব যেমন নিষ্ঠাভরে মেনে নিয়েছিলেন, সুভাষচন্দ্রও তেমনি শরৎচন্দ্রের প্রতি বরাবর অকুণ্ঠ প্রীতিপরায়ণ ছিলেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার 'শরৎ-স্মৃতি' সংখ্যায় সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন—"তিনি (শরৎচন্দ্র) ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তিস্তম্ভ। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতেই তিনি বাংলার কংগ্রেসে যোগদান করেন। শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁহার দান ছিল এবং সেই সূত্রেই শরৎচন্দ্রের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল।"

শরৎচন্দ্র স্বদেশকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। প্রবাসে থেকেও স্বদেশের জন্য তাঁর আকুলতার অন্ত ছিল না। 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশ চরিত্রে তাঁর এই মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। রমেশ বাংলাদেশের অখ্যাত পল্লীগ্রাম কুঁয়ো-পুরের ছেলে, লেখাপড়া শিখে রুড়কী থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। প্রবাসে বড় চাকরি বা দায়িত্বশীল কাজকর্ম করে জীবন যাপন করা রমেশের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেশে ফিরে এসে গ্রামকে রমেশ একান্তভাবে ভালবেসে ফেলল। গ্রামের বহুবিধ কল্যাণের জন্য রমেশ প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। গ্রামের শিক্ষা-বিস্তার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনমানসের বিকাশ সাধন,—নানা কাজে রমেশ নিজেকে এমন করে জড়িয়ে ফেলল যে, গ্রাম ছেড়ে অধীত বিদ্যা নিয়োগের উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। গ্রামের অনুন্নত মানসিকতা তাকে বিস্তর বাধা দিল, রমার প্রসঙ্গে মনোবেদনাও সে কম পেল না, কিন্তু কর্মভারে বা দুঃখভারে অবসন্ন না হয়ে রমেশ পাশের গ্রাম পীরপুর সমেত স্বগ্রাম কুঁয়াপুর অঞ্চলের উন্নতি সাধনে লেগে রইল। সে যে গ্রামেই থাকবে, অর্থোপার্জনের বা বড় চাকরির মোহে মাতৃভূমি জন্মভূমিকে ত্যাগ করে যাবে না, এই অলিখিত প্রতিশ্রুতি রমেশ রমাকে দিয়েছে, যখন সে রমার প্রাণপ্রিয় ছোটভাই যতীনকে নিজের আদর্শে গড়ে তোলবার করুণ আবেদনে মৌন-সম্মতি জানিয়েছে।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের ম্যাজিস্ট্রেট কে সাহেবের কর্তব্যপরায়ণতার সামান্য ইঙ্গিত শরৎচন্দ্র দিয়েছেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি মালিকান্দা

অভয় আশ্রমে বিক্রমপুর যুব ও ছাত্র সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছেন—"আমি বলি, ইংরাজ আজ তুমি বড়, শৌর্যে বীর্যে স্বদেশপ্রেমে তোমার জোড়া নেই; কিন্তু আমারও বড় হবার মালমশলা মজুত। আমার দেশের মৌন চিত্ত পথের খোঁজে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাকে ঠেকাবার শক্তি কারও নাই, তোমারও না। তুমি যত বড়ই হও, সে তোমারই মত বড় হয়ে তার, জন্মের অধিকার আদায় করে নেবেই নেবে।"—এগুলি শরৎচন্দ্রের ইংরেজ জাতির মর্যাদা-স্বীকৃতির স্মারক সন্দেহ নেই। জাতি হিসেবে ইংরেজের গুণগুলি অস্বীকার করা যায় না, শরৎচন্দ্রের মত যশস্বী লেখকের কাছ থেকে সে অস্বীকৃতি কেউই আশা করে না। শিক্ষা-সংস্কৃতি-অনুরাগী ইংরেজ এবং আমলা-তন্ত্রের সাহায্যে ভারত শাসক শোষক ইংরেজ—রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রাজকে এই দুই সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করে দেখেছেন। শরৎচন্দ্র সংস্কৃতিবান এবং হৃদয়বান মানুষ বলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ইংরেজ সম্পর্কে ধারণার অমিল হবার কথা নয়। কিন্তু ভারতে ইংরেজকে এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখার যৌক্তিকতা অস্বীকার না করেও ইংরেজের ভাল দিকগুলি নিয়ে শরৎচন্দ্র বলতে গেলে কিছুই আলোচনা করেন নি, বরং পারলে তিনি তাঁর সাহিত্যে ইংরেজদের মন্দ দিকগুলিই তুলে ধরেছেন। মনে হয়, ভাল দিকগুলি দেখলে ইংরেজদের প্রতি দেশবাসীর মন প্রসন্ন হবে এবং তাতে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আহত হবে, শরৎচন্দ্রের এই আশঙ্কা ছিল। শরৎসাহিত্যে ভারতশাসক ইংরেজ সরকার প্রায় সব জায়গাতেই এসেছে শাসক ও শোষক রূপে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সৈনিক শরৎচন্দ্র নিন্দা করে, ঘৃণা প্রকাশ করে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উত্তেজিত করতে চেয়েছেন। তিনি আশা করেছেন এই ভাবে স্বাধীনতা সৈনিকদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সংহতি আসবে এবং দেশবাসী সঙ্ঘবদ্ধ ও দৃঢ়সংকল্প হলে ভারত থেকে বিদেশী ইংরেজ রাজশক্তিকে বিতাড়ন অপেক্ষাকৃত সহজ ও দ্রুত হবে। শরৎচন্দ্র প্রধানত সমাজ-সমস্যা নিয়ে লিখেছেন এই রাজনৈতিক চেতনা প্রকাশের সুযোগ তাঁর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তবু সামাজিক গল্প-উপন্যাসে সামান্যতম সুবিধা মিললে শরৎচন্দ্র বিদেশী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষ জোরালো ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। 'পথের দাবী' মূলত রাজনৈতিক উপন্যাস, এই ব্রিটিশ-শাসনবিরোধী মনোভাবের তীব্র কঠিন প্রকাশ 'পথের দাবী'কে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে। নিচের কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে তাঁর এই কঠোর মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় মিলবে—

(১) 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র রমেশকে এমনভাবে এঁকেছেন যাতে রমেশ পাঠকচিত্ত জয় করেছে। কিন্তু রমেশ জ্ঞাতি বেণী প্রভৃতির

ষড়যন্ত্রে জেলে গেল। রমেশের কাছ থেকে নানাভাবে উপকৃত ভৈরব আচার্য প্রতিপক্ষ বেণীর দলে যোগ দিয়ে 'রমেশ তাকে ছুরি মারতে গেছে'—এই মিথ্যা অভিযোগ আনলো। আদালতের বিচারে রমেশের কারাদণ্ড হল। শরৎচন্দ্র পরিস্থিতিকে আপন মনোভঙ্গি প্রকাশের অনুকূল করে সাজিয়ে শেষ-পর্যন্ত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করলেন—"মোকদ্দমায় বাদীর পক্ষে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় নাই—নূতন ম্যাজিস্ট্রেট কি করিয়া পূর্বাহ্নেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এ প্রকার অপরাধ আসামীর পক্ষে খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। এমন কি ডাকাতি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট কি না সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সংশয় আছে। থানার কেতাব হইতেও তিনি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে ঠিক এই ধরনের অপরাধ সে পূর্বেও করিয়াছে এবং আরও অনেকপ্রকার সন্দেহজনক ব্যাপার তাহার নামের সহিত জড়িত আছে।"

(২) 'শেষপ্রশ্ন'-এ শিবনাথ বন্ধুর বিধবাকে ঠকিয়ে বন্ধুর পাথরের ব্যবসা আত্মসাৎ করেছে। শরৎচন্দ্রের হাতে ব্যাপারটির বর্ণনা কিন্তু শিবনাথের ব্যক্তিগত হীনতায় শেষ হয় নি। তিনি অবিনাশের মুখে এই অন্যায়ের প্রতিবাদে প্রবলতর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আশুবাবু সরল মানুষ, তিনি নিরীহ বিস্ময়ে যখন বললেন,—"আদালতই বা তাকে ডিগ্রি দিলে কি করে", অবিনাশ সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিক্ষোভের প্রতিধ্বনি, করলেন,—"ইংরেজদের আদালতের কথা আপনি ছেড়ে দিন আশুবাবু, আপনি নিজেই তো জমিদার,—এখানে সবলের বিরুদ্ধে দুর্বল কবে জয়ী হয়েছে আমায় বলতে পারেন?"

(৩) 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে আছে, বন্ধু সতীশ ভরদ্বাজের মৃত্যুর পর তার দাহকার্যাদি শেষ করে শ্রীকান্ত যখন গঙ্গামাটিতে ফিরে আসছিল, তখন তার সাধারণ গ্রাম্য সঙ্গীদের একজনের মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র কথাচ্ছলে কঠিন মন্তব্য করিয়ে বললেন,—"কোম্পানী বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সেই চোর না হয়ে পারবে না।"

(৪) 'পথের দাবী'তে ফয়ার মাঠে শ্রমিকদের সভায় সভানেত্রী সুমিত্রার মুখ দিয়ে ভারতের (তখন ব্রহ্মদেশ শাসনতান্ত্রিকভাবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত ছিল) ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অগ্নুদগার করিয়েছেন লেখক—"যে দেশে গভর্নমেণ্ট মানেই ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং সমগ্র দেশের রক্ত শোষণের জন্যই যে দেশে এই বিরাট যন্ত্র খাড়া করা······।"

(৫) 'পথের দাবী'তে সব্যসাচী ভারতের সর্বগ্রাসী বিদেশী রাজশক্তির স্বরূপ নির্দেশ করে যে কথা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রের কথা :—"এক

রকমের সাপ আছে ভারতী তারা সাপ খেয়ে জীবন ধারণ করে। দেখেছ তাদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার পরিমাণ ?”

শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক প্রবক্তা ছিলেন না, রাজনৈতিক চিন্তাবিদরূপেও তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না। তবে বিদেশী শাসন থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার হিসাবে তিনি একজন সক্রিয়, দেশপ্রেমিক ও রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। শরৎচন্দ্র ধনীর শোষণ ও অনুপার্জিত মুনাফাভোগের প্রতিবাদকারী এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বে দরিদ্রের আর্থিক ও মানসিক সমন্বয়ের দাবিদার হিসাবে সমাজতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ছিলেন। মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের তিনি ভক্ত ছিলেন। সকলেই জানেন, উগ্র না হলেও রাসেল ছিলেন সোসালিস্ট। শরৎচন্দ্র, মোটের উপর, সমাজতান্ত্রিক-চেতনাসম্পন্ন কংগ্রেস নেতা ছিলেন। ‘পথের দাবী’তে সব্যসাচী অত্যন্ত উজ্জ্বল ও গতিশীল, সশস্ত্র বিপ্লবের নায়ক হিসাবে তিনি পাঠকমন জয় করেছেন। অনেকেই ভাবেন হয়তো বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য শরৎচন্দ্র কংগ্রেসী হয়েও বিপ্লবীদের দিকে একসময় স্পষ্টত ঝুঁকেছিলেন, তারই ফল ‘পথের দাবী’। এই ধারণা ব্যাপক, কিন্তু মলত সত্য নয়। শরৎচন্দ্র উদারচেতা দেশভক্ত ছিলেন, বিপ্লবীদের দেশপ্রেমকে তিনি কি রকম আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন তার পরিচয় ‘পথের দাবী’র নায়ক সব্যসাচীর চিত্রণে আছে। এই সব্যসাচীর চরিত্র চিত্রণে, বিশেষত ভারতের বাইরে অবস্থান করে বিপ্লবের পটভূমি সংগঠনে সব্যসাচীর উপর মহান রুশ নেতা লেনিন অথবা স্বনামখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কিছুটা প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়। কিন্তু তাই ব'লে ‘পথের দাবী’তে শরৎচন্দ্র শুধু বিপ্লবের রক্তপতাকা ওড়াননি, মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অহিংস অসহযোগের সুবিপুল শক্তি এবং সম্ভাবনার স্মারক হিসাবে তিনি সব্যসাচীর বিপরীতে ভারতী চরিত্রটিকে এঁকেছেন। ভারতী অপেক্ষাকৃত শান্ত চরিত্র, কিন্তু তার মনের দৃঢ়তাও কম নয়। ‘পথের দাবী’তে সব্যসাচী ও ভারতীর সহাবস্থান শরৎচন্দ্রের উদার রাজনৈতিক মানসিকতার ফলেই সম্ভব হয়েছে। সব্যসাচীকে ভারতী অগ্রজের মত ভালবাসে, কর্মোন্মাদনা, সংগঠন-শক্তি ও দেশপ্রেমের জন্য ভারতী সব্যসাচীর একান্ত অনুরাগিণী। কিন্তু ভারতীর ধারণা সব্যসাচীর লক্ষ্য মহৎ হলেও তাঁর পথ ঠিক নয়, এ পথে সব্যসাচীর এক বড় প্রতিভা ও কর্মশক্তির সম্ভাব্য অপচয়ে ভারতী মর্মান্তিক বেদনা বোধ করে। ‘পথের দাবী’তে সব্যসাচীর সামনে ভারতী সব সময় মাথা উঁচু করে সব্যসাচীর ভুলভ্রান্তি দেখবার চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে গান্ধীজীর প্রধানত গ্রাম ও কৃষক নির্ভর স্বাধীনতা সংগ্রামের মহৎ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে। সব্যসাচীর উগ্র

মতবাদে যথেষ্ট উত্তেজনা সত্ত্বেও গ্রন্থের অবধানী পাঠক রূপে সব্যসাচীর কোন অনুরাগীই বলতে পারবেন না যে, ভারতী সব্যসাচীর মতের বিপরীতে নিজের মত রাখতে গিয়ে কোথাও পরাজিত হয়েছে অথবা সব্যসাচী নিজমুখে কোথাও ভারতীকে পরাজিত করবার কথা উচ্চারণ করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের আর-একজন ভাল কর্মীরূপে শরৎচন্দ্র যত্ন করে 'জাগরণ' উপন্যাসের নায়ক অমরনাথকে আঁকছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে কিছুদিন প্রকাশিত হয়ে উপন্যাসখানি অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল, অমরনাথ এইজন্য পূর্ণতা লাভ করেনি। এই 'জাগরণ'-এই তিনি আলেখ্যর পিতা ব্যারিস্টার মি.রে'র পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে গান্ধীজীর আন্দোলনের উল্লেখ করে লিখেছিলেন :—"তিনি (মি. রে) একমাত্র মেয়েটিকে লইয়া পশ্চিমের একটা শহরের নির্বিঘ্নে বাস করিতেছিলেন। এমনি সময় একদিন তাঁহার নিশ্চিত শান্তি ও সুগভীর বৈরাগ্য দুই-ই যুগপৎ আলোড়িত করিয়া মহাত্মা নন্-কো-অপারেশনের প্রচণ্ড তরঙ্গ এক মুহূর্তে অভ্রভেদী হইয়া দেখা দিল। হঠাৎ মনে হইল, এই ভয়লেশহীন শুদ্ধ শান্ত সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ তপস্যা হইতে যে 'অদ্রোহ' অসহযোগ নিমেষে বাহির হইয়া আসিল, ইহার অক্ষয় গতিবেগ রোধ করিবার কেহ নাই। যেথায় যত দুঃখ দৈন্য, যত উৎপাত অত্যাচার, যত লোভ ও মোহের আবর্জনা যুগ যুগ ব্যাপিয়া সঞ্চিত আছে, ইহার কিছুই কোথাও আর অবশিষ্ট থাকিবে না, সমস্তই এই বিপুল তরঙ্গে নিশ্চিহ্ন হইয়া ভাসিয়া যাইবে।"

শরৎচন্দ্রের সময়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা বাংলাদেশে তেমন প্রসারিত হয় নি, তবু আপন বৈশিষ্ট্যে শরৎচন্দ্র তাঁর লেখায় সমাজতান্ত্রিক চেতনার যে ছাপ রেখেছেন তা মাঝে মাঝে উল্লেযোগ্য হয়েছে। 'দেনাপাওনা', 'পল্লীসমাজ', 'জাগরণ' প্রভৃতি উপন্যাসে শরৎচেতনার এই দিকটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। 'দেনাপাওনা'য় ষোড়শীর নেতৃত্বে সাগর সর্দার প্রমুখ কৃষিজীবী প্রজারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় জেগে উঠে অনেকখানি ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিয়েছে। 'পল্লীসমাজ'-এ রমেশকে কেন্দ্র করে সনাতনাদি প্রজাদের বেণী-রমা-জমিদারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধতা একই প্রাণস্পন্দনের পরিচায়ক। 'পথের দাবী'তে শরৎচন্দ্র শিল্প-শ্রমিকদের মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করবার যে চেষ্টা করেছেন, তাও পল্লীসমাজ বা দেনাপাওনায় কৃষিশ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রকাশিত তাঁর সমাজতান্ত্রিক মানবতামূলক মনোভাবের আর এক দিক। 'পল্লীসমাজে'-এ বিবদমান দুইপক্ষ আদালতে না গিয়ে রমেশের কাছে তাদের বক্তব্য রেখেছে এবং রমেশের রায় মাথা পেতে নিতে চেয়েছে, এ দৃষ্টান্ত 'পল্লীসমাজ'-এর রচনাকাল ১৯১৫-১৬

খ্রীষ্টাব্দের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে বাস্তবিক বিস্ময়কর।

'বিপ্রদাস' উপন্যাসে শেষপর্যন্ত হৃদয়াবেগের বন্যাপ্লাবন এনেছে, কিন্তু এর প্রথম দিকে অনুপার্জিত মুনাফাভোগী শক্তিমান জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের জাগরণের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত আছে। এখানে জমিদার বড় ভাই বিপ্রদাস মিছিল-কারীদের যখন ব্যঙ্গ করে বসলেন ওদের দাঁত আসল নয় বাঁধানো, ও দাঁতে খিঁচানো চলে, কামড়ানো চলে না, ; নতুন যুগের আলোয় উদ্ভাসিত তাঁরই ছোটভাই জনদরদী দ্বিজদাস শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজকে দৃঢ় অথচ শান্ত গলায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন,—"দাদা, বাঁধানো দাঁত দিয়ে যেটুকু হয় তার বেশি যে হয না এ আমি জানি, শুধু আপনারাই জানেন না যে সত্যকার দাঁতওয়ালা লোকও আছে, কামড়াবার দিন এলে তাদেব অভাব হবে না।

শরৎচন্দ্রেব রাজনৈতিক চেতনার নিষ্কলুষতা সন্দেহাতীত। তিনি নিজে রাজনৈতিক কর্মী, ব্যক্তিগত কাজকর্মের, বিশেষ করে সাহিত্যসেবার হিসাবে দেশসেবার জন্য তিনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নৈষ্ঠিক সর্বাত্মক দেশপ্রেম মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে, শরৎচন্দ্র একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এই জন্যই দেশসেবার ক্ষেত্রে কোনরকম অবহেলা বা ফাঁকি-বাজী তিনি সহ্য করতে পারতেন না। শরৎচন্দ্র কামনা করতেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরা তো বটেই। সমস্ত দেশবাসী তখন চরিত্রবান হয়। তিনি কর্তব্যপথে দেশকর্মীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ চাইতেন, এই কঠিন পথে হাল্কা চালে চললে অনেক আশা, অনেক সম্ভাবনা ব্যর্থ হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করতেন। তাঁর এই মনোভাবই 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের নিম্নোক্ত ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে স্পষ্ট ফুটেছে :—"বলরামপুর গ্রামের রথতলায় চাষাভূষাদের একটা বৈঠক হইয়া গেল। নিকটবর্তী রেলওয়ে লাইনের কুলি গ্যাং রবিবারের ছুটির ফাঁকে যোগদান করিয়া সভার মর্যাদা বৃদ্ধি করিল এবং কলিকাতা হইতে জন-কয়েক নামকরা বক্তা আসিয়া আধুনিক কালের অসাম্য ও অমৈত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা দান করিলেন। অসংখ্য প্রস্তাব গৃহীত হইল ও পরে শোভাযাত্রায় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি সহযোগে গ্রাম পরিক্রমণ পূর্বক সেদিনের মত সম্মিলনীর কার্য সমাধা হইল।"

কোন কোন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মতের অমিল দেখা গেছে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের জাতীয় চেতনার চলমানতা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'কালের যাত্রা' নামক নাটিকাটি উৎসর্গ করেছেন। মানুষে মানুষে অসাম্য দূর হবে, মনুষ্যত্বের অধিকার বঞ্চিতরা মহাকালের রথের সামনে এসে অচল রথকে সচল করবে,—এই হল 'কালের যাত্রা'র মর্মবাণী।

শরৎসাহিত্যে নরনারী

(শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রগুলির বর্ণানুক্রমিক পরিচয়)

শ্রীমতী স্বপ্না কুণ্ডু

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে বহুবিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। শরৎচন্দ্র কাহিনীবর্ণনায় যেমন দক্ষ ছিলেন, তেমনি চরিত্রসৃষ্টিতেও ছিলেন সূক্ষ্ম শিল্পী। উপন্যাসে কেউ কাহিনীর উপর জোর বেশি দেন, আবার কেউ জোর দেন চরিত্রসৃষ্টির উপর। কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনায় এই উভয়বিধ দক্ষতাই পরিস্ফুট হয়েছে।

প্রতিটি চরিত্র তাদের বৈচিত্র্য ও প্রকাশের অভিনবত্ব নিয়ে পাঠকের মনে স্থায়ী আসন অধিকার করে। তবুও তার মধ্য থেকে শরৎসাহিত্যের চরিত্র-সৃষ্টির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে যে সমস্ত নরনারীর চিত্র এঁকেছেন তাঁরা আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ। জমিদারশ্রেণীর কিছু চরিত্র আছে বটে, কিন্তু তাদেরও স্বতন্ত্র জগতের বাসিন্দার মত বলে মনে হয় না। গ্রামীণ মানুষদের সার্থক চিত্রই তিনি আঁকার চেষ্টা করেছেন। শহরের বাসিন্দা যাঁরা তাঁদের সঙ্গেও গ্রামের যোগ রেখেছেন। অর্থাৎ শরৎসাহিত্যের চরিত্রগুলি শহুরে মানসিকতার বিশ্লেষণ নয়, সমাজজীবনের প্রাণকেন্দ্র থেকে উত্থিত বলা চলে।

শরৎচন্দ্র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুরুষচরিত্র আঁকতে স৹ম হয়েছেন। তাদের আদর্শবাদ, ব্যক্তিত্ব আমাদের মুগ্ধ করে। আবার কিছু পুরুষচরিত্র নিতান্তই আত্মভোলা, ভবঘুরে প্রকৃতির। কিন্তু নায়ক-চরিত্রের মধ্যে তিনি এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করেছেন, যার ফলে তারা আমাদের মন কেড়ে নিতে সমর্থ হয়।

শরৎসাহিত্যের নারীচরিত্রগুলিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই নারী-চরিত্রের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী ও বিশিষ্ট। সমাজের তথাকথিত অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত নারীদের শরৎচন্দ্র সহানুভূতির সঙ্গে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। কোন নারীর পদস্খলনে ইতিহাসকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখেননি, তার পেছনে সমাজ-সংসারের ক্রিয়া উপলব্ধি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রে বাঙালী নারীর বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোমাত্রায় বিদ্যমান, যেমন—দয়া-মায়া, স্নেহ, সেবাপরায়ণতা, আহার করানোর আগ্রহ প্রভৃতি। শরৎসাহিত্যের

অধিকাংশ নায়িকাই অসামান্যা সুন্দরী। শরৎচন্দ্র নারীসমাজের সংস্কারের বেড়া ভাঙার চেষ্টা করলেও কতটা অগ্রসর হতে পেরেছেন তা চিন্তার বিষয়।

শরৎসাহিত্যে বেশ কয়েকটি ভৃত্যচরিত্র আছে যারা উপন্যাসে স্বতন্ত্র চরিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে। মনিবের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে তারা বেতনের দেনা-পাওনার বাহ্যিক সম্পর্কের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে।

শরৎসাহিত্যের শিশুচরিত্রগুলি উপন্যাসে সর্বদা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে 'রামের সুমতি'র মত কোন কোন গল্পে শিশুচরিত্রের সমস্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান আলোচনায় শরৎচন্দ্রেব প্রতিটি উপন্যাসের চাবত্রগুলিকে বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কোন্ উপন্যাসের এবং কোন্ পরিচ্ছেদে তাদের প্রথম উপস্থিতি তা বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে। অসমাপ্ত উপন্যাস ও গল্পের চরিত্রগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলিব পরিচিতি সংক্ষিপ্ত করতে হওয়ায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি হয়তো ধরা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

অক্ষয় (শেষ প্রশ্ন/২)। আগ্রা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। নীতি-বাগীশ। অপ্রিয় রূঢ় সত্য ভাষণে তার জুড়ি নেই। শেষ পর্যন্ত সেই অক্ষয়ই কমলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। চিররুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে অক্ষয়ের আপাত-কঠিন হৃদয়ের অন্তরালে যে বঞ্চনার বেদনা রয়েছে তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

অজিত (শেষ প্রশ্ন/৫)। অজিত আশুবাবুর ভাবী জামাই। শিক্ষিত যুবক। তার চরিত্রে যেমন খেয়ালীপনার কথা বলা হয়েছে, তেমনি সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। মনোরমার সঙ্গে বিবাহ ভেঙে যাওয়ায় সে ৪ বছর বিদেশ ঘুরে পুনরায় ফিরে আসে। কিন্তু কেন যেন মনোরমার সঙ্গে তার মনের জোড় মেলেনি। কমলকে দেখে অজিত বিস্মিত হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে। মনোরমা শিবনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পেয়ে সে আশুবাবুর গৃহ ত্যাগ করেছে। কমলকে সে বিবাহ করতে চেয়েছিল, কিন্তু কমল রাজী হয়নি। শেষ পর্যন্ত পুনরায় অজিত সন্ন্যাসগ্রহণের ব্রত নিয়েছে।

অঘোরনাথ (শুভদা/১ম)। বিন্দুবাসিনীর স্বামী। ধনীর সন্তান। তিনি নারায়ণপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ বাবুর উকিল ছিলেন। তিনি কলকাতায় থাকতেন। এঁব মাবফতই সুরেন্দ্রনাথ ও ললনা শুভদার কাছে টাকা পাঠান। কিন্তু শুভদা সে টাকা গ্রহণ করেন নি। সদানন্দ এসে অঘোরনাথের কাছে সে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে যান।

অঘোরময়ী (চরিত্রহীন/১৬)। হারাণের মা, কিরণময়ীর শাশুড়ী।

অঘোরময়ী ঝগড়া করতে পটু, বৌয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাদ লেগেই থাকে। তবে অঘোরময়ী বৃদ্ধা হলেও কার্যসিদ্ধিতে দক্ষ। উপেন্দ্রর উপর ভর করে কিভাবে তীর্থদর্শনের সুযোগ করতে হয় তা তিনি জানেন।

অচলা (গৃহদাহ/৩)। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নায়িকা। সপ্তদর্শী অচলা ব্রাহ্মকন্যা, শিক্ষিতা, আধুনিকা। মহিমকে সে ভালবাসে, সুরেশকে সে পছন্দ করে। কিন্তু অচলা কোনদিনই সুরেশকে প্রশ্রয় দিতে চায়নি, তবে সুরেশের উচ্ছ্বাসকে সে বাধাও দিতে পারেনি। অচলার দৃঢ়তাতেই তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মহিমের বিয়ে হয়। গ্রামে বাস করতে যাওয়ার মধ্যে অচলার সহিষ্ণুতা বা মানিয়ে নেবার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু মহিমের মনের নাগাল না পাওয়ায় সে ক্ষুব্ধ হয়। অচলা জেদী ধরনের মেয়ে। বিবাহের পর—তার জেদের ধরন বাড়তেই থাকে। স্বামী-স্ত্রীর এই ভুলবোঝাবুঝির মধ্যে সুরেশ ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করে। মহিমের অসুস্থতা ও মৃণালের সেবা অচলার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দেয়। সে পুনরায় স্বামীকে আত্মনিবেদনের সংকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু সুরেশের তাকে নিয়ে পলায়ন অচলার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। অচলা সুরেশকে এড়াতে না পারলেও, বিশেষ প্রশ্রয়ও দিতে চায় নি। এই পর্যায়ে অচলার মানসিকতা এক বিচিত্র রূপ গ্রহণ করে। সুরেশের মৃত্যু যে অচলার জন্যই ঘটেছে, এটাও সে বোঝে। মহিম ও সুরেশ—এই দুই পুরুষ অচলার জীবনে দুই বিপরীত ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ এনেছে। একজন তাকে আদর্শনিষ্ঠ নির্ভরশীল স্বামীর সন্ধান দিয়েছে, অন্যজন উচ্ছ্বাসপ্রবণ বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। অচলার দুয়ের প্রতিই আকর্ষণ। সেটাই অচলার ট্র্যাজেডি।

অজয় (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব/৭)। সুনন্দা ও তার স্বামীর ছাত্র। তাদের বাড়িতে থেকেই দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করে ও পড়াশোনা করে।

অতুল (নিষ্কৃতি/২)। নয়নতারা-হরিশের পুত্র। অত্যধিক আদরে সে যেমন দুর্বিনীত, তেমনি অসভ্য। ফ্যাশন সম্পর্কে সচেতন।

অতুল (অরক্ষণীয়া/১)। অরক্ষণীয়া গল্পের নায়ক। শিক্ষিত। জ্ঞানদাকে সে পছন্দ করত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিবাহ করতে পারল না। তার মধ্যে কিছু দুর্বলচিত্ততার পরিচয় আছে। অথচ জ্ঞানদার বাবার মৃত্যুশয্যায় প্রতিবেশীদের সঙ্গে আচরণে সে দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। জ্ঞানদার মা-র মৃত্যুতে অতুলের মতিপরিবর্তন হয় এবং জ্ঞানদাকে গ্রহণ করার ইঙ্গিত আছে।

অনঙ্গ ডাক্তার (চরিত্রহীন/১৪)। কিরণময়ীর স্বামী হারানকে চিকিৎসার জন্য এই ডাক্তারবাবুর আগমন। কিন্তু তার লোভ ক্রমশঃ কিরণময়ীর

রূপে আকৃষ্ট হল। তাই অর্থসাহায্য ক'রে সে কিরণময়ীকে কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি।

অন্নদা (বিপ্রদাস/৯)। বিপ্রদাসদের কলকাতার বাড়ির দাসী। কিন্তু দাসী হলেও তার মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ এই পরিবা'রর একজনের মতই। অন্নদার বাড়ি বলরামপুরে। তার ছেলেপুলে মুখুজ্জেদের দয়াতেই মানুষ হয়ে সংসারী। কিন্তু অন্নদার নিস্তার মেলেনি। সে কলকাতার বাড়িতে দ্বিজদাস ও অন্যান্য আশ্রিতদের দেখাশোনা করে। দ্বিজদাসকে অন্নদা নিজ হাতে মানুষ করেছে, তাই তার প্রতি স্নেহ প্রবল। দ্বিজদাসও অন্নদার যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে। বন্দনা প্রথমে ভুল করলেও, অন্নদার প্রকৃত পরিচয় সে পেয়েছে। দাসী হয়েও একটি সংসারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে ভালবাসার যোগসূত্রে কিভাবে নিজেকে জড়ানো যায়, অন্নদা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অন্নদা দিদি (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/৪)। লেখক তাঁর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।" পরনে মুসলমানীর মত জামাকাপড়—গেরুয়া রঙে ছোপানো, হাতে ছগাছি গালার চুড়ি, সিঁথায় হিন্দুস্থানীর মত সিঁদুরের আয়তিচিহ্ন। হিন্দুর মেয়ে হয়েও সে স্বামীর ধর্ম গ্রহণ করেছিল। দারিদ্র্যের মধ্যেও তার পতিপ্রেম লক্ষণীয়। অন্নদাদিদির শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা অকৃত্রিম। দারিদ্র্যের আগুনে পুড়ে অন্নদাদিদির মহত্ত্ব খাঁটি সোনা হয়ে উঠেছে।

অন্নপূর্ণা (বিন্দুর ছেলে/১)। যাদবের স্ত্রী। বাড়ির গিন্নী। সংসারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। তাই ছেলে অমূল্যকে ছোটজা বিন্দুর কাছে দিয়ে নিশ্চিন্ত। কিন্তু বিন্দুকে সে ভয় করে, তার ফিটের ব্যামো দেখে বিব্রত হয়। বিন্দুর প্রতি মুখে বিরাগ প্রকাশ করলেও অন্তরের টান যে কম নেই—তা গোপন থাকেনি।

অনাথনাথ (অরক্ষণীয়া/২)। প্রিয়নাথের ছোটভাই, জ্ঞানদার কাকা। তাঁর আশ্রয়েই শেষ পর্যন্ত জ্ঞানদাদের থাকতে হয়। জ্ঞানদার পিতার মৃত্যুর পর তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করলেও বিনিময়ে খরচ উশুল করে নেন। তিনি অফিসে চাকরি করতেন।

অনুপমা (অনুপমার প্রেম/১)। একাদশ বর্ষ বয়সে নভেল পড়ে অনুপমার প্রেম সম্পর্কে যে ধারণা জন্মায় তা বাস্তবসম্পর্কবর্জিত। পিতা-মাতা অনুপমার এ জাতীয় ব্যবহারে চিন্তিত। পাড়ারই শিক্ষিত যুবক সুরেশের সঙ্গে অনুপমার বিবাহের সম্বন্ধ করা হয়। সুরেশের এ বিবাহে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাই বিবাহের রাত্রে সুরেশের দেখা মিলল না। তখন বাধ্য হয়ে অনুপমার

বিয়ে দিতে হল পঞ্চাশ বছরের বিপত্নীক বৃদ্ধ রামদুলালের সঙ্গে। কিছুদিন পরে রামদুলাল মারা গেলে অনুপমা ভায়েদের সংসারে পড়ে রইল। ইতিমধ্যে বাবা-মাও মারা গেছেন। অনুপমার দুঃখের আর শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত ভাই যখন তার চারিত্রিক অপবাদ দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে প্রবৃত্ত হল, তখনই সে আত্মহত্যা করার জন্য পুকুরে ডুব দিল।

সেখান থেকে তাকে তুলে এনে যে সহানুভূতি দেখাল সে হল ললিতমোহন যাকে একদিন অনুপমা পাঁচিল ডিঙিয়ে তার কাছে আসার অপরাধে সাক্ষ্য দিয়ে জেলে পাঠিয়েছিল।

অনুপমার চরিত্রের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র পুঁথিগত ভালবাসার রঙীন কল্পনা ও তার পাশাপাশি বাস্তবের ভালবাসার রূঢ় পার্থক্যের রূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

অনুপমার বড়বৌদি (অনুপমার প্রেম/১)। বিবাহের পূর্বেই অনুপমার প্রেম সম্বন্ধে ধারণার রূপ দেখে বড় বৌ হাস্য-পরিহাস করেছে। বিধবা অবস্থায় অনুপমা তাদের গলগ্রহ হলে বড়বৌদি তাকে সুনজরে দেখেনি।

অনুপমার মা (অনুপমার প্রেম/১)। অনুপমার মা কন্যার বিরহদশা দেখে স্বামীকে তার বিবাহের ব্যবস্থা করার জন্য তাগাদা দিয়েছিল।

অপর্ণা (মন্দির/৪)। 'মন্দির' গল্পের নায়িকা। জমিদার-কন্যা। বাল্যকাল থেকেই তার দেব-দ্বিজে ভক্তি। বিবাহের পর স্বামিগৃহেও তার ভক্তি-প্রবণতা যেন তাকে সংসার থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তারপর একদিন স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা অপর্ণা পিতৃগৃহে ফিরে আসে। সেখানে মন্দিরের পুরোহিত শক্তিনাথের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। শক্তিনাথ তাকে এসেন্স উপহার দিলে সে রাগান্বিত হয়। কিন্তু শক্তিনাথের মৃত্যু অপর্ণাকে তার ভালোবাসার স্বরূপ উপলব্ধি করায়।

অপূর্ব হালদার (পথের দাবী/১)। 'পথের দাবী' উপন্যাসের ঘটনা অপূর্বকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হলেও তাকে এই উপন্যাসের নায়ক বলা যায় কিনা সন্দেহ আছে। কারণ পথের দাবী উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে যে বিরাজমান সে সব্যসাচী,—অপূর্ব নয়। তবুও অপূর্ব অন্যতম প্রধান চরিত্র। অপূর্ব এম. এসসি পাশ করলেও আচার-আচরণে হিন্দুয়ানা পুরা বজায় রেখেছে। পড়া-শোনাতেই সে শুধু ভাল নয়, খেলাধূলাতেও তার দক্ষতা প্রচুর। আসলে অপূর্ব একটি হীরের টুকরো ছেলে। মাতৃভক্ত অপূর্ব মাতার হিন্দু আচরণের পক্ষপাতী। এ হেন অপূর্ব চাকরিসূত্রে বর্মায় এসে যেন অকূলে পড়ল। মাতার সান্নিধ্যে যে অপূর্বর এত গুণপনা, চাকুরিক্ষেত্রে সে যেন নিতান্তই অসহায়।

সেই সময় ভারতীর সঙ্গে বিরোধের মধ্য দিয়ে তার পরিচয়ের সূত্রপাত। তলওয়ারকরও অপূর্বকে অনেক সময় সাহায্য করেছে। শেষ পর্যন্ত তাকে পরিচালনা করেছে সব্যসাচী। দেশের কাজে অপূর্বর আগ্রহ, আবার ভয়ে পিছিয়ে যাওয়া—ইত্যাদি দোদুল্যমান মানসিকতার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র তাকে সাধারণ মানুষের মতই অঙ্কিত করতে চেয়েছেন, কোন আদর্শবাদী নায়করূপে নয়। তবুও এই অপূর্ব তার মাতার মৃত্যুর পর যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে তখন তার সব দুর্বলতা ক্ষমা করা যায়। অপূর্বর দেশপ্রেম অকৃত্রিম।

অবিনাশ (নববিধান/১৩) ঊষার ছোট ভাই। সে তার দিদিকে নিয়ে যাবার জন্যে শৈলেশের বাড়ি এসেছিল।

অবিনাশ মুখুজ্জে (শেষ প্রশ্ন/১)। আগ্রার কলেজের প্রফেসর। বহুদিন হল স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। ঘরে বছর দশেকের একটি ছেলে। বিধবা শ্যালী নীলিমা সংসার দেখা-শোনা করে। অবিনাশ সদানন্দ গাছের মানুষ। তাই তার বাড়িতে অনেকের আড্ডা বসে। অবিনাশ স্বামী-স্ত্রীব প্রেমসম্পর্কের চিরন্তনতায় আস্থাশীল। তাই মৃত পত্নীর স্মৃতিতে প্রতি বুধবার তার ছবিতে মালা দেয়। কিন্তু কমল-শিবনাথ-মনোরমা-অজিত প্রভৃতির আবির্ভাবে অবিনাশের মনেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তাই এক সময় খবর পাওয়া গেল অবিনাশ দেশে গিয়ে আবার বিবাহ করেছে।

অভয়া (শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড ৪র্থ পর্ব) অভয়ার সঙ্গে রেঙ্গুনে যাবাব পথে শ্রীকান্তের আলাপ হয়। প্রথম আলাপের সময় তার সঙ্গে একটি যুবক ছিল। শ্রীকান্ত তাকে বিবাহিত দেখে মনে করেছিল যুবকটি অভয়ার স্বামী। পরে জানতে পারে তা নয়, তার স্বামী আট বৎসব পূর্বে বর্মায় চাকরি করতে এসেছিল। বছর দুই তার চিঠিপত্র সে পায়, কিন্তু পবে ছয় বছর হোল সে তার কোন খোঁজ পায়নি। তাই সে তার স্বামীর খোঁজে পাড়ার রোহিণীদাকে রাজী করে বর্মায় চলেছে।

অমরনাথ (মন্দির/৬)। অপর্ণার স্বামী। অপর্ণাকে সে নিজের করে পেতে চায়, কিন্তু এক অদৃশ্য ব্যবধান যেন তাকে অপর্ণার কাছে আসতে দেয় না। এর জন্য অমরনাথের দুঃখ। অমরনাথের অকালে মৃত্যু হয়।

অমূল্য (বিন্দুর ছেলে/১)। অমূল্য বিন্দুর আসল ছেলে নয়, বড়মা অন্নপূর্ণার ছেলে। ফিটের ব্যামো সারাবার ওষুধ হিসেবে,একদিন অন্নপূর্ণা ছেলেকে বিন্দুর কোলে দিয়েছিল। তারপর থেকে বিন্দু অমূল্যকে দেখাশোনা করতে থাকে। সে দেখাশোনার মধ্যে আতিশয্য এতো বেশি থাকত যে মা-কেও

মাঝে মাঝে বিরক্ত হতে হল। অমূল্যকে কেন্দ্র ক'রে উপন্যাসের ঘটনাসংঘাত গড়ে উঠলেও তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য ব্যাপক প্রকাশিত হয়নি।

অরুণ (বামুনের মেয়ে/৪)। শিক্ষিত যুবক। বিলাত থেকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করে আসে। বিলাত যাবার জন্য তাকে সমাজচ্যুত হতে হয়। সন্ধ্যাকে সে পছন্দ করে, কিন্তু ব্রাহ্মণ হলেও কৌলীন্যের পার্থক্যের জন্য তাদের বিবাহ হবার নয়। তবুও সন্ধ্যারা জাতিচ্যুত হবার পর অরুণ তাকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হয়ে উদারতার পরিচয় দিয়েছে।

অশোক চৌধুরী (বিপ্রদাস/২১)। অশোক বাবু ব্যার-অ্যাট-ল। বন্দনার মাসী বন্দনার সঙ্গে তাঁর ভাইপো অশোকের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। অশোকের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তাঁকে ভদ্র ও মার্জিত বলেই মনে হয়। বন্দনারও তার প্রতি বিরূপ মনোভাব ছিল না।

আকবর আলি (পল্লীসমাজ/১১)। মুসলমান লাঠিয়াল। বেণী ঘোষালের নির্দেশে সে মাঠ রক্ষা করতে গিয়ে রমেশের লাঠিতে আহত হয়। শত্রু হলেও সে রমেশের শক্তির প্রশংসা করে। বেণী ঘোষালের নির্দেশ সত্ত্বেও সে রমেশের বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা কথা বলতে চায় নি। এই চরিত্রটির মধ্যে সত্যবাদিতার সাহস উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

আন্নাকালী (পরিণীতা/১)। গুরুচরণের তৃতীয়া কন্যা। আন্নাকালী ললিতাকে ভালবাসে। এই আন্নাকালীর সঙ্গে গিরীনের বিবাহ হয়।

আমিনা (মহেশ/১) গফুরের বছর দশেকের মেয়ে। মহেশের মৃত্যুর পর গফুর তাকে নিয়ে গ্রামত্যাগ করল।

আশুতোষ গুপ্ত (শেষ প্রশ্ন/১)। আশুবাবু কন্যা মনোরমাকে নিয়ে আগ্রায় আগমনেই 'শেষ প্রশ্নে'র কাহিনীর সূত্রপাত। আশুবাবু প্রৌঢ়, বাতে পঙ্গু। দেহটা তাঁর যেমন বিরাট, মনটি তদপেক্ষা বিশাল। এরকম সজ্জন সামাজিক লোক সচরাচর দেখা যায় না। তাই সকলের জন্যই তাঁর হৃদয়ের দ্বার খোলা। কিন্তু এই মানুষটিরই হৃদয় নানা আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। সবচেয়ে বেদনা দিয়েছে কন্যা মনোরমার শিবনাথকে বিবাহের ঘটনা। নর-নারীর দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে আশুবাবুর চিরকালের ধারণা আগ্রায় এসে বদলে যায়। নীলিমা যে প্রৌঢ় আশুবাবুকে ভালবাসতে পারে, এ কথা তাঁর পক্ষে স্বপ্নেরও অতীত ছিল। আশুবাবুর যে পূর্বপরিচয় দেওয়া হয়েছে তাকে তাঁকে বিলেতফেরত, শিক্ষিত, অর্থবান ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইন্দ্রনাথ (শ্রীকান্ত/১)। এক সাহসী যুবক। তার দৈহিক গঠনের

বর্ণনা লেখকের ভাষায—"ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশীর মত নাক, প্রশস্ত-সুডৌল কপাল, মুখে দুই-চারিটি বসন্তের দাগ।" ছেলেটির বুকের ভিতরের সাহস ও করুণা দুই অসাধারণ। সে খুব সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারতো। শ্রীকান্তর প্রতি তার ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম। অন্নদাদিদিকে সে নানাভাবে সাহায্য করেছে। ইন্দ্রনাথের পরে আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ইন্দুমতী (দর্পচূর্ণ/১)। দর্পচূর্ণ গল্পেব নায়িকা। ইন্দুমতীব পিতা বড়লোক। স্বামী নবেন্দ্রের অভাবেব সংসাবে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ কবে না। তাই স্বামীব সঙ্গে নানা ব্যাপারে তার মতবিবোধ ঘটে। তাছাড়া ইন্দুমতীব স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপারে ধারণাটাই একটু উগ্র। স্বামীর বিরোধিতা করাকেই সে স্ত্রী-স্বাধীনতাব চরম পরাকাষ্ঠা বলে মনে কবে। অথচ ইন্দুমতী হৃদযের দিক থেকে যে খুব একটা কঠিন তা নয। তাই স্বামীব সঙ্গে ঝগড়া ক'বে মেয়েকে নিযে বাপের বাড়িতে গিযে সে সুখে-স্বস্তিতে থাকতে পাবে না! স্বামীর দুর্দশায সাহায্য ক'বে সে গর্বিত হতে চায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিক্ত স্বামীব কাছে রিক্ত হাতে ফিরে এসে তাকে প্রাযশ্চিত্ত করতে হযেছে।

উপেন্দ্র (চরিত্রহীন/১)। উপেন্দ্র পশ্চিমেব একটি শহবে ওকালতি কবে। ওকালতি ছাড়াও সভা-সমিতি ও সামাজিক কর্মে তাব যথেষ্ট উৎসাহ। বৃহৎ একান্নবর্তী পবিবাবে উপেন্দ্রেব মতামতেব যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বিশেষতঃ সতীশ ও দিবাকরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাব দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এই জন্যই সে সতীশ ও দিবাকবেব শিক্ষাব ব্যবস্থা কবতে চায। উপেন্দ্র স্ত্রী সুরবালাকে ভালবাসে। কিন্তু সে ভালোবাসাব মধ্যে কর্তব্যবোধই প্রবল। এই কর্তব্যবোধই উপেন্দ্রচরিত্রে প্রবল। তার জন্যই রুগ্ন বন্ধুর সেবা কবতে তাকে বাববার কলকাতায ছুটতে হয। অবশেষে বন্ধুপত্নী কিরণময়ীর দায়িত্বও নিতে হয় বন্ধুব মৃত্যুব পব। কিবণময়ী যে উপেন্দ্রকে ভালবেসেছে এ তথ্য উপেন্দ্র সহজেই উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু তাব নৈতিকতা, তার কর্তব্যবোধ তাকে এই অবৈধ ভালোবাসাকে প্রশ্রয় দিতে দেযনি। কিন্তু কিরণময়ীর দুর্বাব বাসনা যে উপেন্দ্রকে বিচলিত করেছিল সে কথা ঠিক। তাই উপেন্দ্র ক্রমে মানসিক সংঘাতে দুর্বল হযে পড়েছিল। স্ত্রীর মৃত্যুব পর উপেন্দ্রের সাংসারিক অবলম্বন যখন আরও ভেঙে পড়ল তখন সে নিজেকে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলেছে। একজন সৎ-নিষ্ঠ সামাজিক ব্যক্তিব জীবনসংসারে মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যার সংঘাতে কিভাবে অকালে নষ্ট হতে পারে, উপেন্দ্র তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উমা (মেজদিদি/৬)। বিপিন ও হেমাঙ্গিনীর কন্যা। সেও মায়ের মত স্নেহশীলা ছিল। সেও কেষ্টকে খুব ভালবাসত।

উমা (নববিধান/৮)। বিভার ননদ, ক্ষেত্রমোহনের অবিবাহিতা বোন। ক্ষেত্রমোহন বোনকে উষার কাছে বাঙালী আচার-আচরণ শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করেছে।

উষা (নববিধান/৩)। উমেশ ভট্টাচায্যির মেয়ে। 'নববিধান' উপন্যাসের নায়িকা। বিয়ের পর শ্বশুরালয়ে বাস করার সুযোগ তার হয়নি, সে বাপের বাড়িতেই ছিল। তার সম্বন্ধে যে রকম কুশিক্ষা ও সংস্কারের আশঙ্কা প্রথমে করা হয়েছিল, তা সত্য নয়। স্বামীর গৃহে সে এসে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। তার নিরাসক্ত স্বামী-পুত্র-সেবা চরিত্রটিকে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত করেছে। সকলকে আপন করে নেবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা তার আছে। স্বামিগৃহের আচরণের সঙ্গে বিরোধ বাধায় সে নীরবে পুনরায় বাপের বাড় চলে গেছে। পুনরায় ফিরে আসার মধ্যে তার অন্তরেও স্বামীর প্রতি ভালোবাসারই প্রকাশ ঘটেছে।

এককড়ি নন্দী (দেনাপাওনা/১)। জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর গোমস্তা। অত্যন্ত ধূর্ত। প্রজাদের কাছে চাপ দিয়ে কিভাবে অধিক অর্থ আদায় করতে হয়, তা সে ভালভাবেই জানে। দুর্বিনীত প্রজাদেব কৌশলে দমন করতেও সে ওস্তাদ। কিন্তু ষোড়শীকে সে শায়েস্তা করতে না পারায় ক্ষুব্ধ ছিল। তাই জমিদারের আগমনে এককড়ি ষোড়শীর বিরুদ্ধে জীবানন্দকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল।

এলোকেশী (বিন্দুর ছেলে/৪)। যাদব মুখুজ্জের বিধবা পিসতুতো বোন। একমাত্র ছেলে নরেনকে নিয়ে ভাইযের সংসারে এসে উপস্থিত হল। পুত্রের প্রতি অন্ধস্নেহে তার অন্যায় আবদারকে প্রশ্রয় দেয়। সুযোগ বুঝে এলোকেশী বিন্দু ও অন্নপূর্ণার মাঝে বিভেদের প্রাচীর গড়ার ইন্ধন যোগায়।

এলোকেশী (বড়দিদি/৭ম)। বারবনিতা। সুরেন্দ্রের বাগানবাড়িতে তার উপস্থিতি।

কমল (শেষপ্রশ্ন/৩)। বাংলাসাহিত্যের এক আশ্চর্য চরিত্র। কমলের যে পূর্বপরিচয় প্রকাশিত হয়েছে তা খুব গৌরবের নয়। তার মার চরিত্র ভাল ছিল না। বিধবা হবার পর তার জন্ম হয়। কিন্তু যে পিতা কমলকে মানুষ করে তার কাছ থেকেই কমলের যা-কিছু শিক্ষা। কমল তার প্রতি বারবার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে।

কমল রূপসী। তার রূপের তুলনা নেই। শিবনাথের সঙ্গে তার বিবাহ

অনুষ্ঠানিক না হলেও সে তা মেনে নিয়েছে, তাই তার অপর নাম শিবানী। কমলকে প্রথমে ঝি-শ্রেণীর মেয়েরূপে চিহ্নিত করা হলেও পরে সকলে তার স্বরূপ বুঝতে পেরেছে। কমলের চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলে না। প্রেম, দেশপ্রেম, নর-নারীর দাম্পত্যজীবন, সামাজিক সম্পর্ক—সমস্ত কিছুরই প্রচলিত ধারণার প্রতি তার যেন সহজাত বিদ্রোহ। সবসময়েই সে যেন যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রচলিত বিশ্বাসগুলিকে ধূলিসাৎ করতে চায়। এইজন্য অনেক-সময় কমলকে যেন তার্কিক বলে মনে হয়।

কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে কম'লর নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্যটুকুও কম উল্লেখ্য নয়। সে আহারে যে কৃচ্ছ্র্া সাধন করে তা ভোগের নয়, ত্যাগের প্রতীক। তার আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত প্রবল। শিবনাথ-মনোরমার বিবাহকে সমর্থন করার মধ্যে তার মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। অজিতকে সে মোহগ্রস্ত করতে চায়নি। রাজেনের দেশপ্রেমকে সে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। আশুবাবুকে সে যথার্থ ভালবাসলেও অন্ধ ভক্তিতে তাকে আচ্ছন্ন করেনি। একদিকে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে কঠোর ব্যক্তিত্ব চরিত্রটিকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে।

কমললতা (শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব/২)। বৈষ্ণবী। তার পূর্বজীবন খুব মনোরম নয়। পদস্খলনের সেই ইতিহাস নিয়ে কমললতা বৈষ্ণবী হলেও সে চেয়েছে নিজেব হৃদয়কে পবিত্র ক'রে তুলতে। শ্রীকান্তকে দেখে কমললতা জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি করতে থাকে। তার প্রতি কমললতার যে প্রেম তা বাস্তবসম্পর্কশূন্য ঐশ্বরিক প্রেম। শ্রীকান্তও এই প্রেমের মর্যাদা দিয়েছে।

কমলা (দর্পচূর্ণ/৬)। ইন্দুর কন্যা। তার মাধ্যমে ইন্দু স্বামীর সঙ্গে মতামত জানার চেষ্টা করেছে।

কমলা (কাশীনাথ/১)। কাশীনাথের স্ত্রী। জমিদারের একমাত্র কন্যা। আদরে মানুষ। কমলা কাশীনাথকে ভালবাসে, তার প্রতি সহানুভূতিশীলও। কিন্তু কাশীনাথের মনের মধ্যে সে প্রবেশ করতে পারে না। জমিদারি হাতে আসার পর কমলার ধীরে ধীবে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ক্ষমতার দম্ভ তার নারীত্বকে বিধ্বস্ত করেছে। শেষপর্যন্ত কাশীনাথের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিযে কমলার চরিত্রমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

করুণাময়ী (পথের দাবী/১)। অপূর্বর মা করুণাময়ী বিধবা। বাড়িতে অন্যান্য ছেলেরা মৃত পিতার মত আচার-আচরণে সাহেবীয়ানা পালন করায় তিনি বাড়িতে থেকেও যেন স্বতন্ত্র। তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা অপূর্ব—যে তাঁর মতই হিন্দু আচার-আচরণে অভ্যস্ত। তাই পুত্রের বর্মায় চাকরি করতে যাবার কথা

শুনে তাঁর চিন্তার অন্ত নেই। শুদ্ধ আচার রক্ষার জন্য সঙ্গে রাঁধুনি বামুন দিলেন। শেষপর্যন্ত এই করুণাময়ীকে বর্মাতে এসে মরতে হল।

কল্যাণী (বিপ্রদাস/২৩)। কল্যাণী বিপ্রদাস-দ্বিজদাসের বোন, দয়াময়ীর কন্যা। তার বিয়ে হয়েছে জমিদারবাড়িতে। স্বামী শশধরের অপমানে সে মায়ের কাছে এসে বাপের বাড়ি থেকে চলে যাবার প্রস্তাব করেছে। কল্যাণী ব্যক্তিত্বহীনা, অবুঝ ধরনের নারীচরিত্ররূপেই অঙ্কিত।

কাঙালী ছেলে (বিরাজ বৌ/১৪)। এর পানসীতে করে সুন্দরী বিরাজকে জমিদারপুত্রের বজরায় তুলে দেয়।

কাত্যায়নী (শুভদা/৫ম পর্ব)। এক পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া কাল কাল মোটাসোটা সর্বাঙ্গে উল্কি পরা মানানসই যুবতী। সে ছোটলোকের মেয়ে। তাই সে অনায়াসে চীৎকার করে যা মুখে আসত তাই হারাণ মুখুজ্যেকে বলতো। তার মুখের সামনে হারাণ মুখুজ্যে দাঁড়াতে পারত না। সে পরিষ্কার হারাণকে জানিয়েছিল যেখানে টাকা সেইখানে তার যত্ন, সেইখানে ভালবাসা। তাই হারাণ যখন চাকরি করত, তহবিল ভেঙে টাকা দিয়েছিল ততক্ষণ সে হারাণকে ভালবাসত। কিন্তু তার চাকরি যাওয়ার পর কাত্যায়নী তাকে নিজের বাড়িতে ঢুকতে দিত না।

কাদম্বিনী (মেজদিদি/-)। কেষ্টধনের বৈমাত্রেয় বড় বোন। তাঁর শ্বশুরবাড়ি ছিল রাজহাটে। কাদম্বিনীর স্বামী নবীন মুখুজ্যের ধানচালের আড়ত ছিল। তাঁদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালই ছিল। কিন্তু তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন। তাই মাতৃহারা কেষ্টধন যখন তাঁদের সংসারে এল তখন তাঁরা উভয়েই সে আগমনকে ভালচোখে দেখলেন না। এ ছাড়া কাদম্বিনী দেবী অত্যন্ত স্নেহান্ধ ছিলেন। তিনি নিজের ছেলে পাঁচুগোপালকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু কেষ্টকে তিনি বিনা কারণে বকাঝকা করতেন। কেষ্ট মৌন হয়ে থাকলে তাঁর রাগ আরও বেড়ে যেত। তিনি নিরপরাধ নিরাশ্রয় কেষ্টকে শাসন করে, লাঞ্ছনা করে, অপমান করে, দণ্ড দিয়ে চলে যেতেন। কেষ্ট মৃত মাকে স্মরণ করে, মেজদির নাম করে ফুলে-ফুলে কাঁদতো।

কানাইলাল (নিষ্কৃতি/১)। শৈলজার সপত্নীপুত্র। কিন্তু স্নেহে নিজপুত্রের সঙ্গে পার্থক্য করে না।

কামাখ্যাচরণ চৌধুরী (বোঝা/১)। সরলার পিতা। বর্ধমান জেলার দিলনাজপুরের জমিদার।

কামিনীর মা (পল্লীসমাজ/৯)। জাতিতে সদ্‌গোপ। গরীব হলেও

তার মন আছে। তাই দ্বারিকঠাকুরের নাবালক ছেলে সমাজে অবহেলিত হলেও কামিনীর মা তাকে সাহায্য করত। পিতার মৃত্যুর পর সেই তাকে নিয়ে এসেছিল রমেশের কাছে সাহায্যের জন্য।

কালিদাসবাবু (শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব/৪)। এঁর পুত্রের সঙ্গে পুঁটুর বিয়ের ঠিক হয়। শ্রীকান্ত বিয়ের জন্য টাকা দেবে বলে। কালিদাসবাবু দাম্ভিক ও রুক্ষ মেজাজের। পণের টাকা নিয়ে যখন তিনি অর্থের দম্ভ করছিলেন তখন শ্রীকান্ত তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়।

কালিপদ (দত্তা/১৬)। বিজয়াদের বাড়ির পুরাতন ভৃত্য। তাকে দিয়েই বিজয়া নরেনের মাইক্রোস্কোপটি স্টেশনে ফেরত পাঠিয়েছিল। রাস-বিহারী এই কালিপদকে তাড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

কালীচরণ (শুভদা য় পরিচ্ছেদ/৬)। জনৈক চাষী। সে হাটে তরিতরকারি বিক্রি করে সংসার চালাত। সে সদানন্দকে খুব ভালবাসত। তাকে দাদাঠাকুর বলে ডাকত।

কালীচরণ (পল্লীসমাজ/৪)। পরাগ হালদারের ভাগ্নে। সে পাটের ব্যাবসা করে। সে মাতুলের সঙ্গে রমেশের পিতার শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন খেতে এসে-ছিল। কিন্তু তার ভগ্নির চরিত্র নিয়ে সরব আলোচনায় সে বিব্রত হয়ে পড়ে।

কালীতারা (বামুনের মেয়ে/১০)। জগদ্ধাত্রীর শাশুড়ী। তিনি কাশীবাস করতেন। নাতনী সন্ধ্যার বিয়েতে আসেন। কিন্তু তাঁর কলঙ্কের কথা প্রকাশ হওয়ায় সে বিয়ে ভেঙে গেল। তাঁর কুলীন স্বামী নাপিত অনুচরকে পাঠাতেন শ্বশুরবাড়ি। তারই ঔরসে কালীতারার সন্তান হয়। সে কথা কালী-তারা স্বীকার করেন। জীবনসায়াহ্নে এসে কালীতারা সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্রাহ্মণ্য অহংকারের অসারতা বুঝতে পারেন। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে প্রগতির পরিচয় আছে।

কালীদাসী (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব/১১)। কুলী রমণী। সতীশ ভরদ্বাজের কাজ করত।

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কাশীনাথ/১)। 'কাশীনাথ' উপন্যাসের নায়ক। দরিদ্র মেধাবী ছাত্র। জমিদারকন্যার সঙ্গে তার বিবাহ সুখের হয়নি। কিন্তু কাশীনাথের চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল অপারসীম, কর্তব্যবোধ ছিল প্রগাঢ়। তার ফলে চরিত্রটি একটি আদর্শ চরিত্ররূপে গণ্য হবার যোগ্য। আপাত:দৃষ্টিতে তাকে কঠোর বলে মনে হলেও, কাশীনাথের হৃদয় স্নেহকোমল।

কাশীরাম কুশারী (শ্রীকান্ত। ৩য় খণ্ড/৪র্থ পর্ব) রাজলক্ষ্মীর গঙ্গামাটি গ্রামের গোমস্তা। লোকটির বয়স পঞ্চাশের ওপরে। কিছু কৃশ—

রঙটা ফর্সার দিকেই। গঙ্গামাটি গ্রামের উত্তর দিকে জলনিকাশের যে বড় নালা, তারই ওপারে পোড়ামাটি গ্রামে কুশারী মশায়ের বাড়ি। তাঁর সন্তান নেই। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ আলাদা হয়ে যাওয়ায় মনে দুঃখ। অথচ মর্যাদাতেও বাধছে তাদের ফিরিয়ে আনতে। তাই রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তর শরণাপন্ন হয়েছিল। কুশারী মহাশয় অর্থলোভী হলেও খুব একটা খারাপ লোক নন।

কিরণময়ী (চরিত্রহীন/১২)। কিরণময়ী বাংলাসাহিত্যের এক জটিল চরিত্র। অসুস্থ স্বামী হারান ও বৃদ্ধা শাশুড়ীকে নিয়ে সে পাথুরেঘাটার অন্ধ গলিতে বদ্ধ জীবনযাপন করত। একদিকে রয়েছে তার অসামান্য রূপ-যৌবন, অন্যদিকে জীবনভোগের তীব্র কামনা। তাই বলে কিরণময়ী সহজে দেহ বিক্রি করতে চায়নি, তাহলে সে ডাক্তারকেই প্রশ্রয় দিত। সে চেয়েছিল ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার কামনা উগ্র হয়ে উঠল স্বামীর বন্ধু উপেন্দ্রকে দেখে। উপেন্দ্র সুরবালার সাংসারিক জীবনের ছবি তাকে ব্যাকুল ক'রে তুলল। কিন্তু উপেন্দ্রকে পাবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তখনই তার মনে বিকৃতি হল। দিবাকরকে সে উপেন্দ্রের বিরুদ্ধে দাবার ঘুটির মত ব্যবহার করল। সরল দিবাকর কিরণময়ীর মনের স্বরূপ বুঝতে পারল না। দিবাকরকে নিয়ে গৃহত্যাগ কিরণময়ীর মনের এক জটিল মানসিকতারই প্রকাশ। বর্মায় গিয়ে দিবাকর-কিরণময়ীর জীবনযাত্রা অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করে। অভাবের জ্বালায় কিরণময়ীকে পাপের পথে আর-এক ধাপ নীচে নামতে হয়। শেষ পর্যন্ত সতীশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে। কিন্তু তখন কিরণময়ী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। 'বিষবৃক্ষ'-র হীরাকে পাগল হতে হয়েছিল, কুন্দকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়। শরৎচন্দ্রও কিরণময়ীকে মানসিক বিভ্রান্তির শাস্তি দান করেছেন।

কিশোরীবাবু (পথনির্দেশ/৪)। নবদ্বীপের এক ধনী ব্যক্তি। বয়স ছত্রিশের কাছাকাছি। তাঁর নিজের বলতে ছিল এক পিতামহী এবং এক অবিবাহিত ছোট ভাই। কিশোরীবাবু বিপত্নীক। তিনি বিপত্নীক হয়ে অবধি একটি ডাগর মেয়ে খুঁজছিলেন, তাই হেমনলিনীকে দেখেই তাঁর পছন্দ হয়ে গেল। হেমের সঙ্গে বিয়ে হবার এক বছর বাদেই তিনি মারা যান।

কিশোরী সিং (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/১ম পর্ব) শ্রীকান্তের পিসেমশায় দ্বারিকবাবুর বাড়ির দারোয়ান। পালোয়ান অথচ ভীতু। সে জাতিতে হিন্দুস্থানী।

কুঞ্জ বোষ্টম (পণ্ডিতমশাই/১) জনৈক দরিদ্র বোষ্টম। তার মাতাকে ভিক্ষে করে প্রতিপালন করে। বড় হয়ে কুঞ্জ ফেরিওয়ালার ব্যাবসা করে।

একটি বড় ধামায় ঘুন্‌সি, মালা, চিরুনি, কৌটো, সিঁদুর, তেলের মসলা, শিশুদের জন্য পুতুল প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য এবং বোন কুসুমের হাতের নানারকম সূচের কারু-কার্য ইত্যাদি নিয়ে পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে ফেরি করে বেড়ায়। সমস্তদিন বিক্রি করে যা পায় দিনান্তে সেই পয়সাগুলি বোনটির হাতে এনে দেয়। তাই দিয়ে কুসুম সংসার চালায়।

কুঞ্জ খুব ভীতু প্রকৃতির এবং নিরীহ ছিল। সে তার শিক্ষিতা তেজস্বী বোনকে খুব ভয় করত। নলডাঙার গোকুল বৈরাগীর মেয়ের সঙ্গে কুঞ্জর বিয়ে হয়। কুঞ্জ তার শ্বাশুড়ীকেও খুব ভয় করত। তবে কুঞ্জ বোনকে ভয় করলেও তাকে খুব ভালওবাসত। তাই সে তার বোনের চরম দুঃখের দিনে জমিদার কুঞ্জনাথবাবুর সাজ ছেড়ে খালি পায়ে খালি গায়ে পাগলের মত দ্রুত পথে বের হয়ে পড়ে।

কুঞ্জর শাশুড়ী (পণ্ডিতমশাই/৭) নিরতিশয় অশিক্ষিতা ও অপ্রিয়-বাদিনী। তাঁর শ্বশুরগৃহ ছিল নলডাঙায়। স্বামীর নাম ছিল গোকুল বৈরাগী, কন্যার নাম ব্রজেশ্বরী। কুঞ্জর শাশুড়ী খুব হৃদয়হীনা ছিলেন। এছাড়া তিনি যেমন মুখরা, তেমনি কলহপটু ছিলেন।

কুশারী-গৃহিণী (শ্রীকান্ত ৩য় খণ্ড/৬)। কাশীরাম কুশারীর স্ত্রী। কৌশলে কাজ আদায় করতে ও কথা বলতে পটু।

কুসুম (পণ্ডিতমশাই/১ম পর্ব)। কুঞ্জ বোষ্টমের ছোঁট বোন। যখন সে দু'বছরের শিশু তখন তার বাবা মারা যান, মা ভিক্ষে করে কুঞ্জ ও কুসুমকে প্রতিপালন করেন। যখন কুসুমের ৫ বছর বয়স তখন তার রূপে মুগ্ধ হয়ে বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গোবদাস অধিকারী তাঁর পুত্র বৃন্দাবনের সঙ্গে কুসুমের বিয়ে দেন। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই কুসুমের বিধবা মায়ের দুর্ণাম ওঠায় গৌরদাস কুসুমকে পরিত্যাগ করে ছেলের পুনর্বার বিয়ে দেন। কুসুমের মাও স্থানান্তরে নিযে গিয়ে একজন বৈরাগীর সঙ্গে মেয়ের কণ্ঠীবদল-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কিন্তু ছয়মাসের মধ্যেই সেই বৈরাগী মারা যান। তারপর কুসুম বিধবা হয়ে পুনরায় বাপের বাড়িতে ফিরে আসে। কুসুম খুব সুন্দরী, কর্ম-পটু ছিল। এছাড়া সে লেখাপড়াও শিখেছিল।

বৃন্দাবনের বাবাও দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সে কুসুমকে পুনরায় গ্রহণ করতে চাইলো। কিন্তু কুসুম তাতে রাজী হল না। পরে সে বৃন্দাবনের পুত্র চরণকে ভীষণভাবে ভালোবাসে এবং চরণের মাধ্যমেই কুসুম ও বৃন্দাবনের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশ্য তখনও কুসুম বৃন্দাবনের বাড়িতে যায়নি। পরে চরণের অসুখের সময় সে বৃন্দাবনের গৃহে গিয়ে বাস করতে

থাকে। পরে চরণের মৃত্যুর পর বৃন্দাবন যখন দেশত্যাগ করবে সঙ্কল্প গ্রহণ করে তখন কুসুমও তাকে অবিচল চিত্তে জানায় যে, সেও বৃন্দাবনের যাত্রার সঙ্গী হবে।

কৃষ্ণ আইয়ার (পথের দাবী/১৮)। পথের দাবী-র সদস্য। দেশের সেবার জন্যই তিনি বর্মায় প্র্যাক্‌টিস করতে আসেন।

কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী (শুভদা/১ম)। হলুদপুর গ্রামের এক কলহপ্রিয়া বিধবা নারী। তিনি এমন পাড়াকুঁদুলি ছিলেন যে, গ্রামের কেউ সাহস করে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করত না।

কেদার মুখুজ্জে (গৃহদাহ/৩)। ব্রাহ্ম—বৃদ্ধ। বিপত্নীক। কন্যা অচলাকে নিয়ে তাঁর সংসার। মহিমের সঙ্গে অচলাব বিবাহ তিনি স্থিরই করে-ছিলেন, এমন সময় সুরেশের আগমন তাঁর সিদ্ধান্ত ওলটপালট করে দেয়। কেদারবাবুর আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। তাই সুরেশের মত বড়লোক পাত্র তাঁর মনকে কিছুটা প্রলুব্ধ করেছিল। কিন্তু তাই বলে কেদারবাবু অর্থ-পিশাচ নন। যখন তাঁর মনে হয়েছে অর্থের সুযোগে সুরেশ অচলার ওপর অধিকার খাটাতে চাইছে, তখন তিনি সে অর্থ বাড়ি বন্ধক দিয়েও শোধ দিতে চেয়েছেন। মহিমের সঙ্গে অচলার বিবাহের পর কেদারবাবু চেয়েছিলেন—সব নারীর মত সেও স্বামীর ঘর করুক। তাই সুরেশ-অচলার পলায়নে কেদারবাবু ব্যথিত হয়েছেন, ঘৃণা প্রদর্শন করেছেন। মৃণালের মধ্যে কেদারবাবু যথার্থ কন্যার আস্বাদ পেয়ে ধন্য হতে চেয়েছেন।

কেবলরাম (দেবদাস/১৫)। গ্রাম্য বালক। তাকে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রমুখী কলকাতায় দেবদাসের খোঁজে আসে।

কেশব (পণ্ডিতমশাই/১০) ইনি বৃন্দাবনের ভূতপূর্ব ইংরাজী শিক্ষক দুর্গাদাসবাবুর ভাগিনেয়। ইনি যখন মামার কাছে বেড়াতে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনের অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। দুর্গাদাসবাবুর মৃত্যুর পর কেশব চলে যান, সেই অবধি বৃন্দাবনের সঙ্গে কেশবের আর দেখা হয়নি। তথাপি কেউ কাউকে বিস্মৃত হননি। কেশব ৫।৬ বছর হল এম. এ. পাশ করে কলেজের শিক্ষকতা করছিলেন, সম্প্রতি সরকারী চাকরিতে বিদেশ যাচ্ছেন। তাই দেশ ছেড়ে যাবার আগে বৃন্দাবনকে দেখতে গেলেন। কেশবের কোন রকম প্রেজুডিস ছিল না। তাই ব্রাহ্মণ হলেও যে কোন জ ত্তব হাতের রান্না খেতে তাঁর বাঁধত না।

কেশব (ছোড়দা)ঃ (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/১ম পর্ব) শ্রীকান্তের পিসে-মশায় বারিকবাবুর পুত্র। সে শ্রীকান্তের সহপাঠী ছিল। নাম ছিল কেশব।

কেষ্টধন (মেজদিদি/১) জনৈক দরিদ্র কিশোর। কেষ্টর মা মুড়ি কড়াই ভেজে, চেয়েচিন্তে অনেক দুঃখে কেষ্টধনকে চোদ্দ বছরেরটি করে মারা যান। নিজের গ্রামে কেষ্টর দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। ফলে মায়ের মৃত্যুর পর ভিক্ষা করে শ্রাদ্ধ করে সে রাজহাটে তার বৈমাত্রেয় বড়বোন কাদম্বিনীর কাছে আসে। কিন্তু দিদি তার এই আগমন মোটেই পছন্দ করে না। সে তাকে প্রচুর পরিশ্রম করাত কিন্তু খেতে দিত না। কিন্তু দিদির মেজ জা হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে খুব ভালবাসত এবং কেষ্টও মেজ দিদিকে অত্যন্ত ভালবাসত। এটা মোটেই দিদি কাদম্বিনীর পছন্দ হত না। তাই সে হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়া করত। একদিন সেই ঝগড়া চরমে উঠল। তখন কেষ্টর মেজদিদি হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে নিয়ে তাদের গ্রামের দিকে রওনা হোল। পথে হেমাঙ্গিনীর স্বামী শপথ করেন যে, তিনি বেঁচে থাকতে কেষ্ট ও হেমাঙ্গিনী এই দুই ভাই-বোনকে আর কেউ পৃথক করতে পারবে না, তখন তারা ফিরে আসে।

কেষ্টা (পণ্ডিতমশাই/১১) শিবুর ছোট পুত্র, ষষ্ঠীচরণের ছোট ভাই। পিতার মৃত্যুর পর সেও কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

কে সাহেব (দেনাপাওনা/৪)। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি জীবানন্দের ঘরে ষোড়শীর বন্দী থাকার সংবাদ পেয়ে তাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। জীবানন্দের প্রতি তিনি বিরক্ত ছিলেন।

কৈলাশচন্দ্র (চন্দ্রনাথ/৬)। কাশীর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি পেন্সনের সামান্য কটি টাকা অবলম্বন করে একাকী বাস করেন। বাড়ি বাড়ি সতরঞ্চ খেলে বেড়ান। আত্মভোলা এই লোকটি যে কত দৃঢ় তার প্রমাণ মিলল, সুনাম যাবার ভয়ে যখন দয়াল রাখালের কাছে চন্দ্রনাথের ঠিকানা বলতে চেয়েছেন, এই বৃদ্ধের তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে। এই বৃদ্ধই শেষ পর্যন্ত সরযূকে আশ্রয় দিয়েছেন। সরযূ ও তার শিশুপুত্রকে নিয়ে কৈলাস খুড়োর আনন্দের দিনগুলো দারিদ্র্যের মধ্যেও কাটছিল। কিন্তু সরযূকে নিয়ে চন্দ্রনাথ চলে যেতে বৃদ্ধের কাছে সব শূন্য মনে হল। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাস শেষ হয়েছে।

কৈলাস নাপিত (পল্লীসমাজ/১৯)। গ্রামবাসী। রমেশের কাছে নিজেদের বিচারের নিষ্পত্তি করতে এসেছিল।

খেঁদা (বামুনের মেয়ে/১)। রাসমণির নাতনী। তাকে উপলক্ষ করে রাসমণির শুচিবায়ুগ্রস্ততা দেখান হয়েছে।

ক্ষ্যান্তমাসি (পল্লীসমাজ/৪)। প্রৌঢ়া রমণী। তার বিধবা মেয়ের

চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করে রমেশের পিতার শ্রাদ্ধের দিন পরান হালদার প্রমুখ গ্রামের মাতব্বরের দল আক্রমণ চালায়। কিন্তু ক্যান্তমাসি কাউকে ছেড়ে কথা বলেনি। সে পরান হালদার ও অন্যান্যদের গোপন খবরও ফাঁস করে দেয় প্রকাশ্যে। তার উপযুক্ত মুখর প্রতিবাদে গ্রামের মাতব্বরের জব্দ হয়।

ক্ষেত্রমণি (দেবদাস/১৫)। বেশ্যা। চন্দ্রমুখী দেবদাসের খোঁজে তার বাড়ি এসে ওঠে।

ক্ষেত্রমোহন (নববিধান/৬)। বিভার স্বামী ক্ষেত্রমোহন আধুনিক হলেও সংসারের স্বামী-স্ত্রীর বাহ্যিক আড়ম্বর অপেক্ষা অন্তরের মিলটুকু পছন্দ করে। তাই শৈলেশ-উষার সংসারে উষার দ্বারা যে শ্রী ফিরে আসছিল তাকে সে সমর্থন করেছে। কিন্তু স্ত্রীর আচরণের প্রতিবাদ করলেও, সবসময় অশান্তির আশঙ্কায় সার্থক হতে পারেনি। গভীর কথাকে হাল্কা চালে রসিকতার সঙ্গে প্রকাশ করাতে ক্ষেত্রমোহনের দক্ষতা আছে।

গগনবাবু (দর্পচূর্ণ/১)। বিমলার স্বামী। গগনবাবুর নেপথ্য উপস্থিতি গল্পে টের পাওয়া যায়।

গফুর (মহেশ/১)। দরিদ্র চাষী। পোষা গরু মহেশের জন্য তার দরদের অন্ত নেই। কিন্তু দারিদ্র্যের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সে যখন মহেশের মৃত্যুর কারণ হল তখন তার দুঃখের অন্ত রইল না।

গণেশ চক্রবর্তী (নিষ্কৃতি/৮)। চাটুজ্জেবাড়ির সরকার। ছোট বৌ শৈলজার চলে যাবার পর সরকার মশাইয়ের বাজার খরচের হিসাব সিদ্ধেশ্বরীর মনঃপূত হয়নি।

গহর (পল্লীসমাজ/১১)। লাঠিয়াল আকবর আলির ছেলে। সে নিজেও লাঠিয়াল। রমেশের বিরুদ্ধে সে লাঠি ধরাকালে আহত হয়।

গহর (শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব/২) শ্রীকান্তর পাঠশালার বন্ধু। কবিতা লেখার নেশা আছে। বহুদিন পরে শ্রীকান্তর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে তাকে নিজের বাড়িতে কবিতা শোনাবার জন্য নিয়ে গেছে। এককালে অবস্থাপন্ন হলেও বর্তমানে তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গহর মুসলমান হলেও হিন্দু আচার ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থাবান। গহরের মৃত্যু শ্রীকান্তকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে। গহরের সূত্রেই শ্রীকান্তর কমললতার সঙ্গে পরিচয়।

গিরি (স্বামী)। সৌদামিনীর বিধবা মা। মেয়ের বিয়ের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

গিরীশ (পরিণীতা/২)। ব্রাহ্ম যুবক। বাঁকিপুরে থেকে পড়াশোনা করত। কোলকাতায় বোনের বাড়ি এসে ললিতার সঙ্গে পরিচিত হয়।

তার উদারতা লক্ষণীয়। সে ললিতার বিয়ের জন্য সাহায্য করতে চেয়েছিল। গুরুচরণবাবু তার টাকাতেই বন্ধকী বাড়ি ছাড়ান। গিরীশ আন্নাকালীকে বিয়ে করে আর-একবার উদারতার পরিচয় দেয়।

গিরীশ চাটুজ্জে (নিষ্কৃতি/১) ওকালতি করে বহু অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু সংসারের ব্যাপারে বিশেষ চিন্তা করেন না। আত্মভোলা সংসার-অনভিজ্ঞ এই ব্যক্তিই কিন্তু শেষপর্যন্ত খুড়তুতো ভাই রমেশের স্ত্রীকে দেশের সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে যথেষ্ট বিবেচনা-বুদ্ধির পরিচয় দেন।

গিরীশ মহাপাত্র (পথের দাবী/৬)। সব্যসাচীব এক রূপ। এই ছদ্মবেশে জাহাজঘাটা থেকে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে তিনি পলায়ন করতে সমর্থ হন। তার বর্ণনাটি এরকম "লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। বয়স ত্রিশ বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু যেমন রোগা তেমনি দুর্বল। এইটুকু কাশিব পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। মনে হয় না যে সংসাবের মেয়াদ আর তাহার দীর্ঘ দিন আছে, ভিতরের কি একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে ক্ষযের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোট কি বড়, টানা কি গোল, দীপ্ত কি প্রভা-হীন, এ সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা,— অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মত কি যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন। ইহাব কোন অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকান আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস কবে না। কেবল এই জন্যই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে।"

"মাথার সম্মুখ দিকে বড় বড় চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে,—এমনি ছোট করিয়া ছাঁটা। মাথায চেরা সিঁথি,—অপর্যাপ্ত তৈল-নিষিক্ত, কঠিন রুগ্ন কেশ হইতে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানি সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবী, তাহার বুকপকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটি রুমালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোন বালাই নাই। পরনে বিলাতি মিলের কালো মকমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ী, সবুজ রঙের মোজা—হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা, বার্নিশ করা পাম্প-শু, তলাটা মজবুত ও টিকসই করিতে আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো, হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি,—কয়দিনের জাহাজের ধকলে সমস্তই নোংরা হইয়া আসিয়াছে।"

গিরীশ মহাপাত্রের কাছে গাঁজার কলকে পাওয়া গেছে।

গুণেন্দ্র (পথনির্দেশ/২)। কোলকাতার এক ধনী লোকের সন্তান।

তার বাবা লোহার ব্যবসা করে মৃত্যুকালে এত টাকা রেখে গিয়েছিলেন যে, তাঁর এক সন্তান না থেকে দশ সন্তান থাকলেও কারো উপার্জন করবার প্রয়োজন হত না। গুণেন্দ্র নিজে উকিল ছিল। সে সংসারের আর পাঁচজনের মত সরস্বতীর কাছে কাজ আদায় করে তাঁকে নির্মমভাবে ছুঁড়ে ফেলেনি। সে চিরদিন দেবীর সেবা করে। তাই পড়ার ঘরে তার বই ভয়ে উঠেছিল। গুণেন্দ্র গুছান প্রকৃতির লোক ছিল না। তাই সে তার পড়ার ঘর গুছিয়ে রাখতে জানত না। ফলে যে বই আলমারির বাইরে আসত তা আর ভিতরে ঢুকতো না। গুণেন্দ্রের বাড়ির পাশে একসময় সুলোচনারা থাকতেন। যে বছর গুণেন্দ্রের পৈতা হয় সে বছর সুলোচনারা কোলকাতা ছেড়ে তাঁদের দেশের বাড়িতে চলে যান। ৭ বছর বয়সে গুণেন্দ্রের মা মারা গেলে সুলোচনাই তাঁকে মানুষ করেন। সে সুলোচনাকে 'সইমা' বলে ডাকত। এরপর দীর্ঘদিন সইমার সঙ্গে গুণীর দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। সুলোচনার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কন্যা হেমাকে নিয়ে গুণের আশ্রয়ে আসেন। গুণী তখন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। গুণী হেমকে খুব ভালবাসত। কিন্তু তাদের মিলন হয়নি। তবে এই বিচ্ছেদে গুণী ভেঙে পড়েনি। কারণ তার ধারণা—অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ করে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য, অশ্রু সঞ্চিত করে রেখে যায়, যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হয় কেন রাধার শত-বর্ষব্যাপী বিরহ বৈষ্ণবের প্রাণ, কেন সে মিলনের অভাবে সুসম্পূর্ণ, ব্যথাতে মধুর তখন সব বিরহ সহ্য হয়।

গুরুচরণ (পরিণীতা/১)। ষাট টাকা মাইনের ব্যাংকের কেরানী। শুষ্ক শীর্ণ চেহারা। অনেকগুলি কন্যার জনক। পৈতৃক বাড়িটাও অভাবের তাড়নায় বাঁধা পড়েছে। মেয়েদের বিবাহ না দিতে পেরে শেষ পর্যন্ত গুরুচরণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু মন তাতে সায় দেয়নি। রোগ-শোকে তার মৃত্যু হয়।

গুরুদেব (শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড : ১২ পর্ব)। ইনি রাজলক্ষ্মী ওরফে পিয়ারী বিবিকে দীক্ষা দেন। ভদ্রলোকে খুব উদারচেতা ছিলেন। গুরুদেব প্রথম যখন রাজলক্ষ্মীকে দীক্ষা দিতে চান তখন সে নিতে নারাজ হয়। সে জানায় সে মহাপাপিষ্ঠা। এর উত্তরে গুরুদেব বলেন, পাপিষ্ঠাদেরই তো দীক্ষা বেশী দরকার। রাজলক্ষ্মীর এই গুরুদেব কাশীতে থাকতেন। রাজলক্ষ্মী প্রায় তাঁর কাছে যেত।

গোকুল (বৈকুণ্ঠের উইল/১)। বৈকুণ্ঠ মজুমদারের প্রথম পক্ষের

সন্তান। মাতৃহারা হয়ে সৎমা ভবানীকেই আপন মায়ের মত জানে। ছেলেবেলা থেকেই গোকুলের লেখাপড়ায় দক্ষতা নেই, কিন্তু সততা আছে। বৈকুণ্ঠ বাল্যকালেই গোকুলকে তাই লেখাপড়া ছাড়িয়ে দোকানের কাজে নিযুক্ত করে। গোকুল তার বৈমাত্রেয় শিক্ষিত ভাই বিনোদকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে। কিন্তু বিনোদের চরিত্রদোষ তাকে ব্যথিত করে। বৈকুণ্ঠ মৃত্যুকালে উইলে সব সম্পত্তি গোকুলকে দিয়ে যাওয়ায় গোকুলের মোটেই পছন্দ হয়নি। তাই পিতার মৃত্যুর পর তার পাগলামি ও গোঁয়াতুর্মি অত্যন্ত বেড়ে যায়। তারপরও তার নির্বুদ্ধিতার সুযোগে স্ত্রী ও শ্বশুরের ষড়যন্ত্র তাকে বিভ্রান্ত করে তোলে। কিন্তু সমস্ত বিপদ থেকে গোকুল উদ্ধারলাভ করে শুধুমাত্র মাতৃভক্তি ও ভাইয়ের প্রতি আন্তরিক ভালবাসার জোরে। বিনোদ শেষপর্যন্ত তার এই মূর্খ বৈমাত্রেয় দাদার প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝতে পেরেছে। গোকুলও দুভাইয়ের ব্যাখ্যা সম্পত্তিতে উভয়ের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

গোকুল (নববিধান/৪)। শৈলেশের চাকর। গিরিধারীর পবিবর্তে বাঙালী চাকর গোকুলকে উষা নিয়োগ করে।

গোপাল ডাক্তার (পণ্ডিত মশাই/১৪) তারিণী মুখুজ্যের ভাগ্নে। বোড়াল গ্রামের একমাত্র ডাক্তার। বৃন্দাবনের পুত্রের ভেদবমি হলে সে গোপাল ডাক্তারের কাছে গিয়ে ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করে। কিন্তু তিনি যেতে রাজি হন না। শেষে পয়সার লোভে যেতে স্বীকৃত হলেও, একঘরে হবার ভয়ে যেতে পারেন না। অর্থাৎ মানসিক দিক দিয়ে তিনি অত্যন্ত দুর্বল।

গোপাল সরকার (পল্লী-সমাজ/৬) রমেশের জমিদারির গোমস্তা। নির্বিরোধী মানুষ। রমেশের তিনি মঙ্গলই চান।

গোবর্ধন (পণ্ডিত মশাই/১৩) কুঞ্জর স্ত্রী ব্রজেশ্বরীর মামা। গোবর্ধন অপরিমেয় তাড়ি ও গাঁজা খেত। ফলে তার চেহারা এমন হয়েছিল যে, বয়স ৩৫ কি ৬৫ তা ধরবার জো ছিল না। কেউ মেয়ে দেয়নি বলে সে অবিবাহিত ছিল। কুসুম ব্রজেশ্বরীদের বাড়িতে আসার পর সে ঘন ঘন সে বাড়িতে আসতে থাকে। একদিন ব্রজেশ্বরী কুসুমকে নিয়ে পুকুরে গা ধোবার সময় ঘাটের অদূরে এক ঘন কামিনী ঝাড়ের আড়ালে গোবর্ধনকে দেখতে পায় এবং তাকে অপমান করে। তারপর সে আর ও বাড়ির ছায়া মাড়ায় না।

গোবিন্দ (রামের সুমতি/২)। নারায়ণী শ্যামলালের শিশুপুত্র। সে রামের বাহন। রামলাল গোবিন্দকে তার নানা কাজে-অকাজে নিযুক্ত করে।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী (পল্লীসমাজ/২)। গ্রামবাসী। রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাদের আচরণ গ্রামীণ সংকীর্ণতাকে প্রকাশ করেছে।

গোবিন্দ ডাক্তার (শ্রীকান্ত/২য় খণ্ড/১৭পর্ব) জনৈক গ্রাম্য ডাক্তার। শ্রীকান্ত চিকিৎসা করেন।

গোবিন্দ পণ্ডিত (দেবদাস/১)। পাঠশালার পণ্ডিতমশাই। জাতিতে কায়স্থ। দেবদাসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তার বাবাকে নালিশ জানাতে গিয়েছিলেন।

গোলকনাথ (অরক্ষণীয়া/১)। প্রিয়নাথের বড় ভাই। উপন্যাসে উপস্থিতি নেই, নামোল্লেখ মাত্র আছে। তার বিধবা স্ত্রী স্বর্ণমঞ্জরীর কথা আছে।

গোলোক চাটুয্যে (বামুনের মেয়ে/৩)। ধনী ব্যক্তি। সমাজের মাথা। মুখে ব্রাহ্মণত্বের বড়াই। কিন্তু এমন কোন নোংরা কাজ নেই, যা তিনি করতে পারেন না। যুদ্ধের সময় ছাগল-ভেড়া চালান দেওয়া, গরু চালান দেওয়ার কাজে সুদে টাকা ধার দিতেও তাঁর বাধে না। স্ত্রী বিয়োগের পর মুখে বৈরাগ্যের ভাণ করলেও সন্ধ্যার মত অল্পবয়সী মেয়েকে বিয়ে করার জন্য তিনি লোলুপ। সর্বোপরি বিধবা শালী জ্ঞানদার সতীত্ব নাশ করে, তাকে বদনাম দিয়ে তাড়িয়ে দিতেও তাঁর বাধেনি। এরকম ঘৃণচরিত্র সত্যই সমাজের কলঙ্ক।

গৌরী তেওয়ারীর কন্যা (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড ঃ ১১ পর্ব) গৌরী তেওয়ারীর বাড়ি বর্ধমান জেলার রামপুর গ্রামে। সে সমাজের চাপে পড়ে নিজের দেশে স্বজাতির পাত্র না পেয়ে বিহারের মিঠোরা গ্রামে হিন্দুস্থানীর ঘরে তার দুই কন্যার বিবাহ দেয়। বড় কন্যা শ্বশুড়বাড়ির অত্যাচারে গলায় দড়ি দেয়। ছোট কন্যার করুণ ও মলিন উদাস চাহনি দেখে শ্রীকান্ত আকৃষ্ট হয় এবং ভিক্ষার ছলে তার শ্বশুরবাড়ির দ্বারে এসে উপস্থিত হয়। সে শ্রীকান্তের কাছে তার বাপের বাড়ির খবর জানতে চায়। শ্রীকান্ত কন্যাটির মুখে তার করুণ জীবনের কাহিনী শুনে ব্যথিত হয় এবং তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তার বাবার ঠিকানায় চিঠি দেয়।

ঘনশ্যাম (স্বামী)। বৈষ্ণব। প্রথমবার বিবাহের একমাস পরে স্ত্রী মারা গেলে অনেকদিন বিয়ে করেনি। সাতবছর পরে সৌদামিনীকে বিয়ে ক'রে আনে সৌদামিনী প্রথমে তাকে উপেক্ষা করলেও ঘনশ্যাম স্বামীর কর্তব্য করেছে। সংসারে অবহেলা পেলেও সে সংসারের প্রতি কর্তব্যে অবিচল। এমন কর্তব্যনিষ্ঠ, সহনশীল চরিত্র দুর্লভ। সৌদামিনীর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে ঘনশ্যামের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

ঘোষাল মহাশয়। (পণ্ডিতমশাই/১১) ইনি তারিণী মুখুয্যের আত্মীয়। ইনিও তারিণী মুখুয্যের মত বৃন্দাবনকে অভিশাপ দেন। ঘোষাল মশাই নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞানী বলে প্রচার করতেন, কিন্তু তাঁর আচার-আচরণে তা প্রমাণিত হতনা।

জ্ঞানদা (বামুনের মেয়ে/৩)। গোলক চাটুজ্জ্যের বিধবা শ্যালী। দিদির অসুস্থতায় সেবা করতে আসে। দিদির মৃত্যুর পর বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীব কাছে ফিরে যাবার আগেই গোলক চাটুজ্জের ফাঁদে পড়ে তাকে দেহ দান করে বসে। ফলে তার মাতৃত্ব দেখা দেয়। কিন্তু সে গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করতে স্বীকৃত হয়নি। ফলে গোলক চাটুজ্জের কৌশলে সে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

জ্ঞানদা (অরক্ষণীয়া/১)। অরক্ষণীয়া গল্পের নায়িকা। বাঙালী-ঘরের অবিবাহিতা মেয়ের মনস্তাপ তার চরিত্রে প্রতিফলিত। অতুলকে ভাল-বাসলেও স্বাভাবিক সংকোচবশতঃ তার বহিঃপ্রকাশ নেই। বিবাহের জন্য বার-বাব কিম্ভূতকিমাকার সেজে বয়স্ক পাত্রের মনোরঞ্জনের চেষ্টা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

চক্রবর্তী (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব/১৩)। পথ হারিয়ে শ্রীকান্ত এই ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে ওঠে। চক্রবর্তী দরিদ্র হলেও অতিথিপরায়ণ।

চক্রবর্তী (চরিত্রহীন/১)। সতীশদের মেসের রাঁধুনি। সে সাবিত্রীকে স্নেহ করে।

চক্রবর্তী-গৃহিণী (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব/১৩)। পথ হারিয়ে শ্রীকান্ত এদেব আশ্রয়ে এলে প্রথমে রুক্ষভাবে শ্রীকান্তকে তাড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু ক্রমে তার স্নেহশীলা হৃদয়েব পরিচয় পাওয়া যায়।

চন্দ্রনাথ (চন্দ্রনাথ/১)। চন্দ্রনাথ উপন্যাসের নায়ক। এম. এ. পাশ। অবস্থাপন্ন। তিনি কাশীতে গিয়ে রাঁধুনীর বালিকা কন্যা সরযূকে বিয়ে করেন। চন্দ্রনাথ সরযূকে ভালোবাসলেও, সরযূর মন পান না। দীর্ঘদিন পরে সরযূর মাতার চরিত্রের কলঙ্ক কানে এলে তাঁকে বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু মন থেকে এতে তাঁর সায় ছিল না। শেষপর্যন্ত তিনি সরযূকে যখন খুঁজে বের করেন, তখন তাঁর পুত্র হয়েছে। তিনি মাতা-পুত্রকে গৃহে ফিরিয়ে আনেন। চন্দ্রনাথ চরিত্রটিতে জটিলতা যেমন নেই, তেমনি দৃঢ়তার অভাবও লক্ষিত হয়।

চন্দ্রবাবু (অনুপমার প্রেম/১)। অনুপমার বড়দাদা। বিধবা অনুপমাকে চাকরের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে এই মিথ্যা অজুহাত দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

চন্দ্রমুখী (দেবদাস/৯)। গণিকা। চুনিলাল তার কাছে দেবদাসকে আনে। দেবদাস তাকে ঘৃণা করলেও চন্দ্রমুখী দেবদাসকে ভালবেসে ফেলে। এই ভালোবাসাই চন্দ্রমুখীকে গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করে সৎ জীবন যাপনে প্রবৃত্ত করে। গণিকার এইজাতীয় আদর্শ ভালোবাসা চরিত্রটিকে আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছে।

চরণ (পণ্ডিতমশাই/৫)। বৃন্দাবনের দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুত্র। সে ছয় বছরের হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর শিশু। চরণ তার বাবা ও ঠাকুমার চোখের মণি ছিল। কুসুমও তাকে খুব ভালবাসত। কলেরা রোগে চরণ মারা যায়। চরণের মৃত্যু বৃন্দাবনকে ভীষণভাবে আঘাত করে। সে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করে। কুসুমও বৃন্দাবনের পথের সাথী হয়।

চারুবালা (পরিণীতা/২) ললিতাদের পাশের বাড়ির ব্রাহ্ম মেয়ে, তার সই। তার সূত্রেই ললিতার সঙ্গে তার মামা গিরীনের পরিচয় হয়।

চুনিলাল (দেবদাস/৭)। কলিকাতায় দেবদাসের চুনিলালের সঙ্গে আলাপ হয়। চুনিলালই দেবদাসকে মদ্যপান এবং বেশ্যালয়েগমনে দীক্ষা দেয়।

চৌধুরীর পো (শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড/৪)। একজন বৃদ্ধ খালাসী। রেঙ্গুনে যাবার পথে শ্রীকান্তের সঙ্গে আলাপ হয়।

ছলনা (শুভদা/৪)। শুভদা ও হারাণ মুখুজ্জের কনিষ্ঠা কন্যা। সে একাদশবর্ষীয়া, অনূঢ়া। ললনা যেমন স্বল্প কথা বলতো, ছলনা তেমনি অধিক কথা বলতে ভালবাসতো। সে খুব অবুঝ ছিল। গায়ে গহনা নেই বলে সে মুখ ভার করত, মোটা চালের ভাত খাওয়া যায় না বলে কলহ করত, পাতে মাছ নেই বলে থালাশুদ্ধ ঠেলে ফেলে দিত। তাকেও দেখতে খুব সুন্দর ছিল। তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ, গোলাপ ফুলের মত মুখখানি। তার ভ্রূদুটি যেন তুলি দিয়ে আঁকা। ঠোঁট দুটিও খুব পাতলা ছিল। সে কবে ধনী হয়ে গহনা-গাঁটি পরবে তার স্বপ্ন দেখতো।

ছোটবৌ (অরক্ষণীয়া/৩)। অনাথনাথের পত্নী। ছোট বৌ একটু আয়েসী ধরনের। সংসারের কাজকর্ম বড় জা ও মেজ-জায়ের দ্বারা সম্পন্ন হলেই সে সুখী হয়। সে মুখরা হলেও, বড় জায়ের মত অতটা নীচ নয়। বরং কখনো কখনো মেজজার হয়ে বড়জাকে দু কথা শুনিয়েছে। অতুল যাতে তার মেয়েকে বিয়ে না ক'রে জ্ঞানদাকেই বি[illegible] করে—এমন ইঙ্গিতও সে দিয়েছে। আপাত-কর্কশ হলেও চরিত্রটির অন্তরে মধুর প্রস্রবণ প্রবাহিত।

জগত (শেষ প্রশ্ন/৫)। অবিনাশের দশ বছরের পুত্র।

জগদীশ (দত্তা/১)। নরেন্দ্রনাথের পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান।

হুগলীর দীঘড়া গ্রামে তাঁর বাড়ি। তিনি ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। কিন্তু অবস্থা ছিল নিতান্ত খারাপ। উপন্যাসে তাঁর কথা আছে, কিন্তু উপস্থিতি বিশেষ নেই। তবে শেষ জীবনে তিনি যে অত্যন্ত সুরাসক্ত হয়েছিলেন এবং দেনার দায়ে বাড়ি ও সমস্ত সম্পত্তি বন্ধু বনমালীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন, তার উল্লেখ আছে। ছাদ থেকে মাতাল অবস্থায় পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

জগদীশবাবু (পথের দাবী/৬)। পুলিশ কর্মচারী।

জগদ্ধাত্রী (বামুনের মেয়ে/১)। সন্ধ্যাব মা, প্রিয় মুখুজ্জের স্ত্রী। স্বামীর ঔদাসীন্যে বিরক্ত। সম্পত্তিরক্ষার ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়। জগদ্ধাত্রী সমাজকে ভয় করে। তাই রাসমণি ও গোলোক চাটুজ্জেকে সে মানিয়ে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃদ্ধ গোলোক চাটুজ্জের সঙ্গে সন্ধ্যার বিয়েতে সে সম্মতি দিতে পারেনি। তাই শেষ রক্ষা করতে পারল না জগদ্ধাত্রী। সন্ধ্যার বিয়ের রাত্রে সমাজ তাদেব পরিবারেব কলঙ্কের কথা রটনা করে তার বিয়ে ভেঙে দিল। জগদ্ধাত্রীকে আপাত-কঠোর বলে মনে হলেও তার মধ্যে কিছু স্নেহ-কোমলতাও ছিল।

জগবন্ধুবাবু (অনুপমার প্রেম/১)। অনুপমার পিতা। বড়লোক। স্ত্রীর অনুরোধে কন্যার জন্য সুরেশের সঙ্গে বিবাহের জন্য পিতা-মাতার মত করান। কিন্তু বিবাহবাসরে সুরেশেব অনুপস্থিতিতে বিরক্ত হয়ে বৃদ্ধ রামদুলালের সঙ্গে বাধ্য হয়ে বিবাহ দেন।

জগৎতারিণী (চরিত্রহীন/৩৭)। সরোজিনীর মা। বিধবা। সতীশের প্রতি কন্যার আগ্রহ দেখে তিনি তাদের মিলন ঘটাবার জন্য উৎসাহী ছিলেন।

জনার্দন রায় (দেনাপাওনা/৭)। ধনী ব্যক্তি। কিন্তু অত্যন্ত চতুর ও প্রতিশোধপ্রয়াসী। অর্থের দ্বারা ইনি বহু লোককে বশীভূত করে রাখেন। এমনকি সময়ে সময়ে জমিদারকেও টাকা ধার দেন। ষোড়শীর প্রতি তিনি প্রীত নন। তাই ষোড়শীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। কন্যা হৈমর স্বামীর টাকায় তিনি অবস্থাপন্ন। তাই মেয়ে-জামাইকে খাতিব কবেন। তবে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর কৌশলের শেষ নেই।

জলদবালা (দেবদাস/১৪)। মহেন্দ্রের স্ত্রী। সে সৎমা পার্বতীর বিরুদ্ধে স্বামীকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করলেও সক্ষম হয়নি। শেষপর্যন্ত সে পার্বতীর বশীভূত হয়।

জয়লাল বাঁড়ুজ্জে (বৈকুণ্ঠের উইল/২)। শিক্ষক। ভবানীর কাছে তার পুত্র বিনোদের শিক্ষার সুখ্যাতি করে স্বার্থসিদ্ধির জন্য এসেছিলেন।

ভবিষ্যতেও জয়লাল নানারকম ফন্দি-ফিকিরে গোকুলের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেছেন।

জয়াবতী (শুভদা/২য় পরিচ্ছেদ/১ম পর্ব)। এক যুবতী গায়িকা। তার বয়স বোধ হয় বিংশতি। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুডৌল শরীর—দেখতে মন্দ নয়। বহুদিন থেকে সে নারায়ণপুরের জমিদার সুরেন্দ্রবাবুর অনুগ্রহ পেয়ে আসছে। সুরেন্দ্রনাথ যখন বজরা নিয়ে ভ্রমণে বের হন তখন জয়া তাঁর সঙ্গে ছিল। সুরেন্দ্রনাথের বজরা যখন কোলকাতা থেকে কিছুদূরে নঙ্গর করে তখন জয়াবতী সুরেন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে যায়। ফেরার পথে তার পান্‌সির সঙ্গে একটি স্টীমারের ধাক্কা লাগে এবং পান্‌সি ডুবে জয়া মারা যায়।

জয়াবতীর মা (শুভদা/১২ পর্ব)। নারায়ণপুরের কিছু উত্তরে তিনি কন্যা জয়াকে নিয়ে বাস করতেন। পরে জয়াবতী নারায়ণপুরের জমিদারবাবুর ভবনের একাংশে স্থান পেলে সেও মেয়ের সঙ্গে সেখানে এসে বাস করতে থাকে। কিন্তু জয়া ও তার মার মধ্যে প্রায় কলহ হত। ফলে ছয়মাস জমিদারবাটীতে বাস করার পর জয়ার মা প্রাসাদবাসলালসা ত্যাগ করে তার পুরাতন পরিত্যক্ত ভবনে চলে যায়। জমিদারবাবু তাকে তাঁর বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করে দেন। পরে মেয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে আসেন এবং মাথা ঠুকে, বুকে আঘাত করে, চুল টেনে শোক প্রকাশ করতে থাকেন। পরে মালতী ওরফে ললনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রস্থান করেন। মালতী তাকে বলে যে, সুরেন্দ্রনাথ যাকে বিয়ে করেছেন তিনি কামরূপ থেকে 'বাণমারা' বিদ্যে শিখে এসেছেন। এই কথা শুনে জয়ার মা আর ভবিষ্যতে সুরেন্দ্রনাথের বাড়ির ছায়া মাড়ান না।

জীবানন্দ চৌধুরী (দেনাপাওনা/১)। বীজগাঁয়ের জমিদার। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নায়ক। জীবানন্দ মদ্যপ ও চরিত্রহীন। কিন্তু তার সমস্ত অনাচার ও অত্যাচারের মধ্যে যে একটি হৃদয় লুকিয়ে ছিল তার পরিচয় মিলল ষোড়শীর সঙ্গে পরিচয় তথা সংঘাতের মাধ্যমে। এই ষোড়শীই জীবানন্দের একদা বিবাহিতা স্ত্রী অলকা। এতদিন পরে জীবানন্দের স্নেহস্পর্শহীন জীবনে নতুন করে ঘর বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। সেই আকাঙ্ক্ষা ষোড়শী কর্তৃক যতই প্রতিহত হয়েছে, ততই তার অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে চলেছে। ষোড়শীর প্রতি ভালবাসাই অত্যাচারী জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীকে প্রজাদরদী জমিদারে পরিণত করেছে। অলকাও জীবানন্দকে ধরা দিয়েছে।

জে. ডি. জোসেফ (পথের দাবী/২)। ভারতীর পিতা, গোয়ানীজ।

মদ্যপ। তার অত্যাচারে এবং দুর্ব্যবহারে বর্মায় অপূর্বকে অতিষ্ঠ হতে হয়।

জ্যোতিষ (চরিত্রহীন/১৩)। উপেন্দ্রর বন্ধু, উকিল। কোলকাতায় এঁদের বাড়িতে উপেন্দ্র ওঠে। সেখানে সতীশের সঙ্গে জ্যোতিষের বোন সরোজিনীর পরিচয় হয়। জ্যোতিষ ভালমানুষ, সরল, সাদাসিধা ধরনের লোক।

টগর (শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড/৩য় পর্ব)। নন্দমিস্ত্রীর পরিবার না হলেও বিশবছর তার সঙ্গে ঘর করে। সে জাতিতে বোষ্টম ছিল—এটাই ছিল তার অহংকারের বস্তু। তাই নন্দ তাকে পরিবার বলে পরিচয় দিলে সে রেগে যেত। সে বলত, সে জাতবোষ্টমের মেয়ে, সে কৈবর্তের পরিবার হতে পারে না। সে বিশ বছর নন্দর সঙ্গে ঘর করছে বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও নন্দকে হেঁসেলে ঢুকতে দেয়নি। শ্রীকান্ত তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, টগরের ডাঁটার মত চোখ ও জোড়া ভুরু। এরকম চেহারা পূর্বে তিনি আর কখনও দেখেননি।

টুনি (মেজদিদি/৩)। কাদম্বিনীর ছোট মেয়ে। মেজ খুড়িমাকে বাড়ির সকল ছেলেমেয়ে যেমন ভালবাসতো সেও তেমনি ভালবাসত।

টুনুবাবু (চরিত্রহীন/৩৯)। সতীশের বৈমাত্রেয় বড় ভাই। সতীশের প্রতি তাঁর মনোভাব ভাল ছিল না।

ঠাকুর্দা (শ্রীকান্ত ৪/১)। শ্রীকান্তর পাড়াসম্পর্কে ঠাকুর্দা। তিনি শ্রীকান্তর ঘাড়ে নাতনিকে চাপাবার ব্যবস্থা করতে নানারকম প্রয়াস করেছিলেন।

ঠাকুরদাস মুখুজ্জে (অভাগীর স্বর্গ/১)। অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে ঘটা করে শবযাত্রা ও শ্রাদ্ধশান্তি হয়।

ডাক্তারবাবু (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/৩য় পর্ব)। তিনি তখন শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং বিনা দক্ষিণায় বাঙালীর বাড়িতে চিকিৎসা করতেন। এঁর সহায়তায় শ্রীকান্তরা প্রায়শ্চিত্ত করার হাত থেকে রেহাই পায়।

ডাক্তারবাবু (শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড/৪র্থ পর্ব)। ইনি জাহাজের ডাক্তার। মানুষটি খুব ভাল। তিনি একটু স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। শ্রীকান্তের সঙ্গে জাহাজে এই ডাক্তারের আলাপ হয়। তিনি তাঁর কেবিনে শ্রীকান্তকে আশ্রয় দেন।

তারাদাস চক্রবর্তী (দেনাপাওনা/৪)। ষোড়শীর পিতা। তিনি অলকাকে ষোড়শী করে চণ্ডীর ভৈরবী করেন। কিন্তু তা নিছক ধর্মপ্রাণতার জন্য নয়, দেবোত্তর সম্পত্তির লোভে। তাই স্বার্থে আঘাত লাগতে তিনিই

আবার ষোড়শীকে পদচ্যুত করে অন্য একজন আত্মীয়াকে ভৈরবী বানাবার ও ষোড়শীর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচার চালাবার কাজে রত হয়েছেন।

তারিণী ঘোষাল (পল্লীসমাজ/১)। রমেশের বাবা। উপন্যাসে উপস্থিতি নেই। তাঁর মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে।

তারিণী মুখুজ্জ্যে (পণ্ডিতমশাই/১১)। বোড়াল গ্রামের এক ব্রাহ্মণ। তিনি বৃন্দাবনদের প্রতিবেশী। তাঁর ছোট ছেলে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সেই মড়ার কাপড়-চোপড় তারিণীর স্ত্রী বৃন্দাবনদের ঘাটে কাচতে আসেন। বৃন্দাবন নিষেধ করায় তারিণী তাকে অভিশাপ দিয়ে বলেন— "ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্বংশ হবি।"

তুলসী (বিরাজবৌ/১১)। চণ্ডাল। বিরাজ স্বামীকে খাওয়াবার জন্য রাত্রে তার বাড়ি চাল ধার করতে গিয়েছিল।

তেওয়ারী ঠাকুর (পথের দাবী/২)। অপূর্বদের বাড়ির পুরাতন ভৃত্য। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাই তাকেই অপূর্বর মা সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন ছেলের বর্মাপ্রবাসের সঙ্গী হিসাবে। তেওয়ারী নিষ্ঠারক্ষার চেষ্টা করলেও অসুখে পড়ে ভারতীর সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিল। তেওয়ারী অপূর্বকে নানাভাবে প্রবাসে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল। ভৃত্য হলেও তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ত্রৈলোক্য (বামুনের মেয়ে/৫)। গ্রামবাসী। তারা সাঁকো তৈরির জন্য প্রিয়নাথের কাছে বাঁশ চাইতে এসেছিল।

দয়াময়ী (বিপ্রদাস/২)। বিপ্রদাস-দ্বিজদাস-এর মা। প্রৌঢ়া বিধবা। বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ, কিন্তু রূপের অবধি নেই। নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা। আচার-আচরণ পালনের আতিশয্য আছে। নিজপুত্র দ্বিজদাস অপেক্ষা সৎ ছেলে বিপ্রদাসের প্রতিই তাঁর আস্থা ও পক্ষপাতিত্ব। দয়াময়ী সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু হলেও প্রয়োজনে তিনি সংস্কারমুক্ত মনেরও পরিচয় দিয়েছেন। তাই বন্দনা ম্লেচ্ছ হলেও দয়াময়ী তাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দয়াময়ী চরিত্রে কিঞ্চিৎ অস্থিরতা আছে। তাই বন্দনার কাছে আশাহত হয়ে তিনি যেমন হঠাৎ বিরূপ হয়ে ওঠেন, তেমনি আবার তার আগমনে ভাঁড়ারের চাবি দিয়ে দিতেও তাঁর বাধে না। বিপ্রদাসের প্রতি তাঁর যেমন প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল, তেমনি জামাইয়ের জেদে বিপ্রদাসকে ত্যাগ করতেও দেখি। জামাইয়ের বাড়িতে থেকে পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা করার কথাও যেমম শুনি, তেমনি আবার হঠাৎ উদয় হয়ে বিপ্রদাসের সঙ্গে সন্ন্যাসের সংকল্প গ্রহণ করতেও দেখা যায়। সতীর প্রতি ভালোবাসা ও বিরাগ দুরকমই দেখা যায়। দয়াময়ী কেবল জব্দ হয়েছেন পুত্র দ্বিজদাসের কাছে।

দ্বিজদাসের ওপর তাঁর বিশেষ জোর খাটেনি। দয়াময়ী চরিত্রটি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী হতে গিয়েও শেষরক্ষা হয়নি।

দয়াল (দেবদাস/১৫)। মুদী। তার সাহায্যে চন্দ্রমুখী বাড়ি ভাড়া করে।

দয়ালচন্দ্র ধাড়া (দত্তা/১৩)। ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বিজয়ার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম মন্দিরের জন্য রাসবিহারী দয়ালকে পুরোহিত নিযুক্ত করেন। কিন্তু রাসবিহারীর আশামত দয়াল সব কাজ করতে পাবেননি। দয়াল অত্যন্ত ভাল লোক। তিনি বিজয়াকে যথার্থই ভালবাসতেন। নরেন্দ্রর প্রতিও তাঁর ভালোবাসা ছিল। শেষ পর্যন্ত দয়ালচন্দ্রের মাধ্যমেই বিজয়া-নরেন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

দাঠাকুর (শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড/৬ষ্ঠ পর্ব)। রেঙ্গুনের একজন হোটেল-ওয়ালা। শ্রীকান্ত হরিপদ মিস্ত্রীর সঙ্গে এর হোটেলে এসেছিলেন। হোটেল-টিতে জীর্ণ কাঠের ছোট ছোট কুটির ছিল। এতে চীনা, বর্মী, মাদ্রাজী, ওড়িয়া, তেলেঙ্গী, চট্টগ্রামী মুসলমান ও হিন্দু বাস করত।

দ্বারিকঠাকুরের ছেলে (পল্লী-সমাজ/৯)। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর সৎকারের জন্য সে রমেশের কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিল।

দ্বারিকাদাস (শ্রীকান্ত ৪র্থ/১৩)। কমললতাদের আশ্রমের গোস্বামী।

দাসু (অরক্ষণীয়া/৫)। হরিপাল গ্রামের ডাকপিয়ন। তার কাছে দুর্গামণি অতুলের চিঠি এসেছে কিনা বারবার খোঁজ করত।

দিগম্বরী (বামের সুমতি/২)। নারায়ণীর বিধবা মা। দশ বছরের মেয়ে সুরধুনীকে নিয়ে এতদিন তিনি কোনমতে ভাইয়ের বাড়িতে ছিলেন, এখন মেয়ে-জামাইয়ের কাঁধে ভর করলেন। এ বাড়িতে এসেই রামের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধল। এই জাতীয় নারী সংসারের অশান্তির মূল। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে এঁরা সচেতন নন, অনাবশ্যক অশান্তি সৃষ্টি করতে এঁদের জুড়ি নেই। দিগম্বরী-রামের দুষ্টবুদ্ধির কাছে যত যা জব্দ হয়েছে, তার চেয়ে বেশী জব্দ হয়েছে মেয়ে নারায়ণীর কাছে। মেয়ে তার মাকে যথার্থই চিনতে পেরেছিল।

দ্বিজদাস (দেবদাস/১২)। দেবদাসের দাদা। পিতার মৃত্যুর পর দ্বিজদাস দেবদাসের খেয়ালের সুযোগ নিয়ে কৌশলে তার সম্পত্তির অনেকাংশ আত্মসাৎ করে।

দ্বিজদাস (বিপ্রদাস/২)। দ্বিজদাস শিক্ষিত যুবক, স্বদেশী করে। জমিদারির কাজে তার উৎসাহ নেই। দাদা বিপ্রদাসকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে।

দাদার বিচার ও বুদ্ধির ওপর তার অগাধ আস্থা। বৌদি সতীর কাছে তার যত আবদার। তাকে মায়ের মত ভালবাসে। মা দয়াময়ী দ্বিজদাসের যেন সৎমা। ভ্রাতুষ্পুত্র বাসুকে দ্বিজদাস আপন হাতে মানুষ করে। দ্বিজদাসের বাইরেটা রুক্ষ বলে মনে হলেও তার অন্তরটা কোমল। অপ্রিয় সত্য কথা বলতে সে ভয় পায় না। পরিহাসের ছলে সে অনেক গভীর কথা বলে।

বন্দনা দ্বিজদাসের জীবনে আলোর মত এসে উপস্থিত হল। দ্বিজদাস বন্দনাকে প্রথম থেকেই ভালবাসলেও, কোথাও কাঙালপনা করেনি। সহজ-ভাবেই সে যেমন বন্দনাকে স্বীকার করেছে, তেমনি বন্দনার অসম্মতি জেনে সহজভাবেই তাকে মুক্তি দিয়েছে। বন্দনাকে ভালোবাসার জোরেই দ্বিজদাস তার কথামত মৈত্রেয়ীকে প্রশ্রয় দিয়েছে। শেষপর্যন্ত বন্দনা যখন দ্বিজদাসকে বিবাহ করেছে তখন দ্বিজদাসের ভালবাসার যথার্থ মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে।

দ্বিজদাসকে প্রথমে যত দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে মনে হয়েছিল, আসলে সে তা নয়। বিপ্রদাস ছাড়া দ্বিজদাসকে প্রথমে কেউ যথার্থভাবে চিনতে পারেনি। তাই তার ওপর সব দায়িত্ব দিয়ে বিপ্রদাস নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল। শেষে বন্দনাও দ্বিজদাসের যথার্থ পরিচয় পেয়েছে।

দ্বিজদাস ও বিপ্রদাস দুই বিপরীত কোটীর ব্যক্তিত্ব—দুইই সমান আকর্ষণীয়, সমান শ্রদ্ধেয়।

দ্বিজদাসের স্ত্রী (দেবদাস/১৫)। অলঙ্কারপ্রিয়। খুব একটা বুদ্ধিমতী নয়।

দিবাকর (চরিত্রহীন/১)। উপেন্দ্র দিবাকরের মামাতো ভাই। শিশু অবস্থায় দিবাকর মাতৃপিতৃহীন হয়ে মামার বাড়িতে মানুষ হচ্ছিল। বয়স প্রায় উনিশ, এফ. এ. পাশ করে বি. এ. পড়ছিল। উপেন্দ্র তার বড়লোক শ্বশুরের অবিবাহিতা কন্যা সতীর সঙ্গে দিবাকরের বিবাহের ঠিক করেছিল। সতী একটু খোঁড়া হলেও দিবাকরের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই উপেন্দ্রের এই মতলব। দিবাকর প্রথমে আপত্তি করলেও, যখন জানলো সুরবালারও সেই ইচ্ছা—তখন আর বাধা দেয়নি। দিবাকর সুরবালার কাছ থেকে যথেষ্ট স্নেহ পেয়েছিল, তাই তার প্রতি ভালোবাসাও ছিল অকৃত্রিম। কিরণময়ীকে দেখাশোনার জন্য উপেন্দ্র যখন দিবাকরকে কোলকাতায় তাদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনার ব্যবস্থা করল, তখন থেকেই দিবাকরের জীবনের আর-একটি নূতন অধ্যায় শুরু হল।

কিরণময়ীর ইচ্ছাশক্তির কাছে সরল দিবাকর অসহায় হয়ে পড়ল।

উপেন্দ্রকে শাস্তি দেবার জন্য কিরণময়ী দিবাকরকে ব্যবহার করল। কিরণময়ী-দিবাকরের গৃহত্যাগ দিবাকরের সমূহ সর্বনাশ করল। ঘটনাচক্রে মানুষ নীচে নামলে যে কত ভয়ানক হতে পারে কিরণময়ীর প্রতি দিবাকরের বস্তিজীবনের আচরণ তার উদাহরণ। শেষপর্যন্ত সতীশ দিবাকরকে উদ্ধার করেছে। দিবাকর যখন জেনেছে কিরণময়ীর হৃদয়ে উপেন্দ্রর জন্য একটি স্থায়ী আসন পাতা আছে, তখন সে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে।

দীনু ভট্টাচার্য (পল্লীসমাজ/২)। দরিদ্র গ্রামবাসী। রমেশের পিতার শ্রাদ্ধে যে ভালমন্দ খাবারের প্রতি লোভ দিয়েছে এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে পেটপুরে খেয়েছে। রমেশকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছে। লোকটি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির।

দুর্লভ বসু (অনুপমার প্রেম/২)। পুত্র ললিতমোহনের হাতে প্রচুর অর্থ রেখে তিনি পরলোকগমন করেন।

দেবদাস (দেবদাস/১)। 'দেবদাস' উপন্যাসের নায়ক। বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেবদাসের পরিণতি দেখানো হয়েছে। জমিদারের ছেলে দেবদাস। বাল্যকাল থেকেই সে দুর্দান্ত। পাঠশালার পণ্ডিত ও পোড়োদের ওপর অত্যাচার করত, লুকিয়ে তামাক খেত। তার সবচেয়ে আধিপত্য ছিল বালিকা পার্বুলের ওপর। তাকে সে যেমন মারধর করত, ভালও বাসত। দেবদাসের লেখাপড়া হচ্ছে না দেখে তার বাবা কোলকাতায় পাঠাল। পার্বুলের বয়স হলে তার বিবাহের চেষ্টা হতে লাগল। পার্বুলের বাড়ি থেকে দেবদাসের সঙ্গে বিয়ের কথা হলেও দেবদাসের বাড়ি থেকে তা নাকচ হয়ে যায়। অন্যের সঙ্গে পার্বুলের বিয়ে হয়। তার আঘাত দেবদাস সইতে পারে না। কলকাতায় গিয়ে সে অত্যন্ত মদ্যপান করতে থাকে ও বেশ্যালয়ে যায়। সেখানে চন্দ্রমুখী নামে একজন পতিতার সঙ্গে পরিচয় হয়। চন্দ্রমুখী দেবদাসকে সংশোধন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে দেবদাসের পিতা মারা যাওয়ায় সে অর্ধেক সম্পত্তির অধিকারী হয়। বাঁধনছেঁড়া হয়ে দেবদাস অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত পার্বুলের শ্বশুরবাড়ির গ্রামে পথের ধারে দেবদাসের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে।

দেবদাস চরিত্রটির মধ্যে সম্ভাবনা অনেক ছিল, কিন্তু বাল্যপ্রণয়ের ব্যর্থতা তার জীবনে শোচনীয় বিষাদান্তক পরিণতি ডেকে এনেছে।

দেবদাসের জননী (দেবদাস/৫)। দেবদাসের স্নেহময়ী জননীর ইচ্ছা ছিল, পার্বতীর সঙ্গে দেবদাসের বিয়ে হোক, কিন্তু কর্তার মতের বিরুদ্ধে তাঁর কথা বলার সাহস নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কাশীবাস করেন।

দুর্গাদাসবাবু (পণ্ডিতমশাই/২) ইনি বোড়াল গ্রামের একজন অবসর-প্রাপ্ত ইংরাজী শিক্ষক। বৃন্দাবন নিজের ইংরাজী শিক্ষার জন্য তাঁকে নিযুক্ত করে। ইনি বৃন্দাবনকে খুব ভালবাসতেন। দুর্গাদাসবাবু প্রকৃত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ছিলেন। বৃন্দাবন যখন পুত্রের মৃত্যুর পর সংসার ত্যাগ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করে তখন তিনি বৃন্দাবনকে বলেন—দুঃখ যত বড়ই হোক, সহ্য করাই ত মনুষ্যত্ব।

দুর্গামণি (অরক্ষণীয়া/১)। জ্ঞানদার মা। স্বামী মারা যাবার পর অরক্ষণীয়া মেয়েকে নিয়ে তাঁর দুর্দশার অন্ত ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনি মরে শান্তি পেলেন।

দুলেবৌ (বামুনের মেয়ে/৫)। একে বাড়িতে স্থান দেবার জন্য জগদ্ধাত্রীদের বিরুদ্ধে রাসমণি অভিযোগ করে। সন্ধ্যার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তারা অরুণের বাড়ি আশ্রয় পায়।

ধর্মদাস (পল্লীসমাজ/২)। গ্রামবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। রমেশের পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাদের লোভ, সংকীর্ণতা, ব্রাহ্মণ্য অহংকারের প্রকাশ দেখানো হয়েছে।

ধর্মদাস (দেবদাস/১)। দেবদাসদের বাড়ির ভৃত্য। সে দেবদাসকে যেমন স্নেহ করে, পার্বতীর প্রতিও তার স্নেহদৌর্বল্য আছে।

নতুনদা (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/৭ম পর্ব)। ইন্দ্রের মাসতুতো ভাই। তিনি কোলকাতার ভয়ঙ্কর বাবু। লেখক তাঁর পোশাকের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন "সিল্কের মোজা, চকচকে পাম্পসু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়ে,গলায় গলাবন্ধ, হাতে দাস্তানা, মাথায় টুপি"। নতুনদা অত্যন্ত স্বার্থপর এবং অসজ্জন ব্যক্তি এবং মুখে বড়াই করলেও অত্যন্ত ভীতু লোক।

নন্দ জেলেনী (শুভদা ১৩ পর্ব) হলুদ গ্রামের এক জেলেনী। যেদিন ললনা মৃত্যুর জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দেয় তার ছয়দিন পরে এই জেলেনীই গঙ্গায় মাছ ধরতে এসে বালিমাখা ললনার কাপড় পড়ে থাকতে দেখে। এরপর গ্রামময় প্রচার হয়ে গেল, মুখুজ্জেদের ললনা জলে ডুবে মরেছে।

নন্দমিস্ত্রী (শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড/৩য় পর্ব) রেঙ্গুন যাবার পথে জাহাজে নন্দ মিস্ত্রীর সঙ্গে শ্রীকান্তের পরিচয় ঘটে। নন্দ জাতিতে কৈবর্ত।

নবতারা (পথের দাবী/১১)। 'পথের দাবী'র একজন সদস্যা। স্বামীর দুর্ব্যবহারে স্বামীর ঘর ত্যাগ ক'রে দেশসেবার ব্রত নিয়েছে। নবতারা শশীপদকে বিয়ে না করে আহমদকে বিয়ে করেছিল।

নবীন (অরক্ষণীয়া/৫)। শম্ভু চাটুজ্জের শ্যালক। তার সঙ্গে সে

জ্ঞানদার বিয়ের ঠিক করেছিল। নবীনের গুণ অনেক। সে তাড়ি গাঁজা খেয়ে পাঁচ ছেলের মা বৌটাকে আট মাস পেটের ওপর লাথি মেরে, মেরে ফেলে। নবীনের বোনের বাধাদানেব জন্যই শেষ পর্যন্ত জ্ঞানদাব সঙ্গে তার বিয়ে হল না। উপন্যাসে উপস্থিতি নেই।

নবীন (**বড়দা**) (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/১ম পর্ব) শ্রীকান্তের পিসিমার বড় ছেলে। তার নাম নবীন।

নবীন (শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব/২)। গহরদের বাড়ির পুরাতন ভৃত্য। গরু-বাছুর, চাষবাস দেখে, বাড়ি আগলায়। গহরকে সে ভালবাসে।

নবীন ডোম (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব/৮)। স্ত্রী মালতীকে বশ করতে না পেরে শ্রীকান্তের কাছে নালিশ জানাতে এসেছিল।

নবীন মুখুজ্জ্যে (মেজদিদি/১) রাজহাটের এক ধনী চাল-ব্যবসায়ী। তাঁর ধানচালের আড়ত ছিল। সে পৃথিবীতে কারবার ও টাকা ছাড়া আর কিছু বুঝতো না। নবীন মুখুজ্জ্যেব স্ত্রীর নাম ছিল কাদম্বিনী। তিনিও স্বামীর মতই সমান কৃপণ ছিলেন। নবীন মুখুজ্জ্যে ও কাদম্বিনীর একমাত্র পুত্র ছিল পাঁচু-গোপাল। নবীন কৃপণ হলেও স্ত্রীর মত অত নিষ্ঠুব ছিলেন না। ফলে তাঁব স্ত্রীব স্বামীর উপবে একটুও বিশ্বাস ছিল না। তাঁব ষোল আনা ভয় ছিল, সাদাসিধা ভালোমানুষ বলে যে কেউ তাঁকে ঠকিযে নিতে পারে।

নবীন রায় (পরিণীতা/২)। শেখরের বাবা। নবীন বায শুধু টাকা চেনেন। গুরুচরণকে টাকা ধার দিয়েছিলেন যাতে সে ধার শোধ করতে না পারলে পার্শ্ববর্তী তাব বাড়িটা দখল করতে পারেন। কিন্তু সেই টাকা শোধ দেওয়ায় তাঁর দুঃখেব অন্ত রইল না।

নরেন (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব/১২)। শ্রীকান্তের সঙ্গে আলাপে ইংরেজ শাসনের সুফল কুফল সম্বন্ধে আলোচনা করেছিল।

নরেন (বিন্দুব ছেলে। ১)। এলোকেশীব পুত্র। অন্যায় আবদার পেয়ে অল্পবয়সেই সে বখে গেছে।

নরেন (স্বামী)। শিক্ষিত যুবক, জমিদারবাড়ির ছেলে। বাল্যকালে সৌদামিনীকে ভালবাসে। সৌদামিনীর বিয়ে হয়ে গেলে সে তার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। এতে তার সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে সৌদামিনী যখন তাকে দাদা সম্বোধন করে মুক্তি চেয়েছে তখন নরেন দুষ্কৃতকারী চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেনি।

নরেন্দ্র (দর্পচূর্ণ। ১)। 'দর্পচূর্ণ' গল্পের নায়ক। নরেন্দ্র লেখক। তার অভাবের সংসারে সে লেখার মধ্যে সার্থকতা খুঁজে পায়। তার উপন্যাস

জনমনোরঞ্জকও বটে। কিন্তু সংসারে তার শান্তি নেই। স্ত্রী ইন্দুমতীর আর্থিক চাহিদার সে যোগান দিতে পারে না, তবুও মুখ বুজে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। নরেন্দ্র বহু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ইন্দুমতীর মনোভাব পরিবর্তন করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিল। দারুণ অভিমানে নিজের দুর্দিনেও সে স্ত্রীকে কিছু জানায়নি। নরেন্দ্রর মধ্যে একটি অভিমানী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আদর্শ স্বামীর পরিচয় পাওয়া যায়।

নরেন্দ্রনাথ (দত্তা/৪)। 'দত্তা' উপন্যাসের নায়ক। সে ডাক্তারী পাশ। কিন্তু ডাক্তারী করা অপেক্ষা নূতন কিছু আবিষ্কারে তার আগ্রহ। তাই গ্রামে একটি মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কাটায়, দরিদ্রদের পড়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু জমিদারের কাছে তার পিতার বন্ধকী সম্পত্তি চলে যাওয়ায় তাকে গ্রাম ত্যাগ করতে হয়। ইতিমধ্যে বিজয়াব সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। বিজয়াকে সে নিজের পরিচয় দেয় নি। নরেন্দ্র নিজের জন্য না হলেও অন্যের জন্যে বিজয়কে অসংকোচে অনুরোধ করে। নরেন্দ্র যে বিজয়াকে ভালবেসেছিল তার প্রকাশ ঘটেনি। বিজয়াকে পাওয়া দুরাশা বলেই সে দাবী করার সাহস করেনি। নরেন্দ্র চরিত্রে পরবর্তীকালের 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। নরেন্দ্র রোগা হলেও তার শরীরে অসীম শক্তি। তার ডাক্তারীরও দক্ষতা দেখানো হয়েছে।

নলিনা (দত্তা/১১)। দয়ালবাবুর অবিবাহিতা ভাগ্নী। শিক্ষিতা। বিজয়ার সঙ্গে নলিনীর আলাপ হয়। নরেন্দ্রর সঙ্গে পরিচিত হবার পর নলিনী তার গুণমুগ্ধ হয়ে পড়ে। এই ঘটনাকে বিজয়া নলিনী-নরেন্দ্রর প্রেম বলে ভুল করে বসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোঝা যায় নলিনী যথার্থই নগেন্দ্রকে শ্রদ্ধা করত।

নলিনা (বোঝা/৪)। সত্যেন্দ্রর দ্বিতীয় পত্নী। কলকাতার মেয়ে, শিক্ষিতা। স্বামীর ভালবাসা পাবার অনেক চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়। স্বামীর তৃতীয়া পত্নীকে সে আশীর্বাদ ক'রে উপহার পাঠায়। মৃত্যুকালে এটাই ছিল তার কামনা।

নয়নতারা (নিষ্কৃতি/২)। মেজবৌ। হরিশের স্ত্রী। অত্যন্ত সংকীর্ণমনা। তার চেষ্টাতেই সিদ্ধেশ্বরী ও শৈলজার মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। পুত্রের প্রতি অন্ধ স্নেহে নয়নতারা তার অন্যায় আবদারকেও মেনে নেয়। সংসারে অশান্তির মূলে এই জাতীয় নারীচরিত্র।

নয়নতারার মা (বড়দিদি/৯ম পরি)। মাধবীর দাসী।

নারায়ণ মুখুজ্জে (দেবদাস/১)। দেবদাসের পিতা। জমিদার।

হয় না। নীলিমা আশুবাবুকে ভালবেসে ফেলেছিল। অবিনাশের পুনর্বিবাহ নীলিমাকে আহত করে। শেষপর্যন্ত তাকে হরেন্দ্রের আশ্রয়ে চলে যেতে হয়।

নৃত্যকালী (রামের সুমতি/১)। শ্যামলালের বাড়ির দাসী। কিন্তু বাড়ির একজনের মতই তার ভূমিকা অনেকখানি।

পটল (নিষ্কৃতি/১)। শৈলজার পুত্র।

পতিতপাবন (পথনির্দেশ/১)। মাঝারি গৃহস্থ ঘরের কর্তা। তাঁর স্ত্রীর নাম সুলোচনা এবং ত্রয়োদশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যার নাম হেমনলিনী। বর্ষাধিককাল রোগে ভুগে একদিন বর্ষার দুর্দিনে গভীর রাত্রে তিনি দেহত্যাগ করেন।

পদ্মা (শ্রীকান্ত/৪র্থ)। কমললতাদের আশ্রমের মেয়ে।

পরন হালদার (পল্লীসমাজ/৪)। কুঁয়াপুর গ্রামের মাতব্বর শ্রেণীর ব্যক্তি। রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধে তিনি ক্ষ্যান্তমাসির মেয়ের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ-পাত করে একটি গণ্ডগোল সৃষ্টি করবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিশ্বেশ্বরীর হস্তক্ষেপে ঘটনাটি বেশিদূর গড়ায়নি।

পরেশ (দত্তা/১০)। বিজয়দের বাড়ির দাসীর ছেলে। তাকে বাতাসার লোভ দেখিয়ে বিজয়া নরেন্দ্রব খোঁজখবর নিতে পাঠায়। কিন্তু তার সারল্য বা নির্বুদ্ধিতার জন্য মাঝে মাঝে বিজয়কে লজ্জায় পড়তে হয়েছে।

পরেশের মা (দত্তা/১৪)। বিজয়দের বাড়ির দাসী।

প্রফুল্ল (দেনাপাওনা/১৩)। জীবানন্দের অনুচর। শৌখীন যুবক। জীবানন্দকে সে দাদার মত ভক্তি করে। জীবানন্দের সমস্ত পাপাচারের মধ্যেও সে একটা মহত্ত্বের সন্ধান পায়। তাই তার বক্তব্যের দ্বারা সে জীবানন্দকে এই পথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা করে। জীবানন্দের পরিবর্তনের পশ্চাতে পরেশের প্রভাব ছাড়াও প্রফুল্লর প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়।

প্রতুলকুমারী (আলো ও ছায়া/৬)। ঝি-এর মেয়ে, রূপসী নয়। যজ্ঞদত্ত তাকে যে দয়া করে বিয়ে করেছিল এর জন্য সে কৃতজ্ঞ। সুরমার ভালোবাসাতেও সে মুগ্ধ। স্বামী তাকে যে ভালোবাসে না এ বোধ তার থাকলেও, প্রতিবাদের সাহস নেই। সে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বামীর বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়ে গেল।

প্রমীলা (শুভদা—২য়) বিন্দুবাসিনী ও অঘোরনাথের পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা।

প্রমীলা (বড়দিদি—২য়)—ব্রজরাজের ছোট কন্যা। সাত বছর বয়স। সুরেন্দ্রকে তাকে পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়।

প্রসন্ন ঠাকুরদা (শ্রীকান্ত/২য় খণ্ড/১৫ পর্ব) শ্রীকান্তের বাবার মামা, শ্রীকান্তের দাদু। শ্রীকান্তদের দেশের বাড়িতে ইনি থাকতেন।

পার্বতী (দেবদাস/১)। 'দেবদাস' উপন্যাসের নায়িকা। বাল্যকাল থেকেই সে দেবদাসের অনুচর। দেবদাস তাকে মারধোর করা সত্ত্বেও সে দেবদাসকে ভালবাসে। দেবদাসের সঙ্গে তার বিবাহ হল না সত্য, কিন্তু সে দেবদাসকে হৃদয়ে স্বামীর আসনেই বসিয়েছে। অথচ বাইরে সে তার বর্তমান স্বামীর প্রতি কর্তব্যে অবহেলাও করেনি। বিশেষতঃ স্বামীর পূর্বপক্ষের পুত্র-কন্যাকে সে নিজের বলে গ্রহণ করেছে। ভালোবাসার দ্বারা তাদের জয় করেছে। দান-ধ্যান করে সকলের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। এ পার্বতী যেন মানবী নয়, যোগিনী। আসলে দেবদাসের সঙ্গে বিবাহ না হওয়ায়, প্রকৃত পার্বতীর মৃত্যু ঘটেছে। যে পার্বতী দেবদাসের গৃহিণী হয়ে একটি সুখী সংসার গড়ে তুলতে পারত, সেই পার্বতী হল অন্যের সংসারের রক্ষাকর্ত্রী মাত্র। পার্বতী আর একবার পুরাতন রূপে দেখা দিয়েছে দেবদাসের গাছতলায় মরে থাকার কথা শুনে তাকে দেখতে যাবার আকুলতায়।

দেবদাসের অন্তর্বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও, পার্বতীর বেদনা তার অন্তরের গভীরে যথেষ্ট আলোড়ন এনেছে, এ কথা আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

পার্বতীর ঠাকুরমা (দেবদাস/২)। স্নেহময়ী এই ঠাকুমার কাছে বালিকা পার্বতীর যত আবদার। তিনিও নাতনীর জন্য বৌমার কাছে সুপারিশ করেন।

পার্বতীর মা (দেবদাস/২)। পার্বতীর জননী মেয়েকে শাসন করতে দ্বিধা করেন না।

পাঁচুগোপাল (মেজদিদি/৩) নবীন মুখুয্যে এবং কাদম্বিনীর একমাত্র পুত্র। পাঁচু যোগ্য মায়ের যোগ্য সন্তান। তাই সেও কারণে অকারণে মায়ের কাছে কেষ্টর নামে নালিশ করত এবং তাকে মার খাওয়াত।

পাঁচুঘোষাল (অরক্ষণীয়া/৫)। ভামিনীর বাবা। উপন্যাসে উপস্থিতি নেই, নামোল্লেখমাত্র আছে।

পিসিমা (১ম খণ্ড/১ম পর্ব)। শ্রীকান্তের পিসিমার বাড়িতে থেকে শ্রীকান্ত লেখাপড়া করতে আসে। তাঁর স্বামীর নাম দ্বারিকবাবু। পিসিমা অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা এবং দয়ালু মহিলা ছিলেন। "পিসিমা অত্যন্ত রাসভারী লোক বাড়িসুদ্ধ সবাই তাঁহাকে ভয় করিত।"···তাঁহার আদেশ অবহেলা করিবার সাধ্য বাড়িতে কাহারও নাই। পিসিমার একটা স্বভাব আমরা চিরদিন লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি; কখনও, কোন কারণই, তিনি চেঁচামিচি করিয়া লোক জড়

করিয়া তুলিতে ভালবাসিতেন না। হাজার রাগ হইলেও তিনি জোরে কথা বলিতেন না।"

পিসেমশাই (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/১ম পর্ব) শ্রীকান্তের পিসেমশাই। নাম দ্বারিকবাবু। ধনী ব্যক্তি। মুখে আস্ফালন, বুকে ভয়।

পিয়ারী বাইজী (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/৮)। দ্র. রাজলক্ষ্মী।

প্রিয়নাথ (অরক্ষণীয়া/২)। জ্ঞানদার বাবা। উপন্যাসে উপস্থিতি অল্প। তাঁর মৃত্যুতে তিনি অতুলকে দিয়ে জ্ঞানদাকে বিয়ে করার শপথ করিয়ে নেন।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (কাশীনাথ/২)। জমিদার। কুলীন। একমাত্র কন্যা কমলার জন্য দরিদ্র কাশীনাথকে ঘরজামাই করেন। বিবেচক ব্যক্তি ও সদাশয়। তাই মৃত্যুকালে জামাইয়ের নামে সম্পত্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মেয়ের কথায় তা দিতে না পারায় দুঃখিত হয়েছিলেন।

প্রিয় মুখুজ্জে (বামুনের মেয়ে/২)। সন্ধ্যার বাবা, জগদ্ধাত্রীর স্বামী। সংসারে সম্বন্ধে সে উদাসীন। লোককে হেমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে বেড়ায়। তার চিকিৎসার নিন্দা সে সহ্য করতে পারে না। গ্রামের লোকেরা তার সরলতার সুযোগ নিয়ে সুবিধা আদায় করে নেয়।

কিন্তু এই প্রিয় মুখুজ্জে গোলোক চাটুজ্জের কথাতে তার বিধবা শ্যালী জ্ঞানদার অবৈধ সন্তানকে হত্যা করতে চায়নি। তাই তাকে অযথা কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে দেশত্যাগ করতে হয়।

পীতাম্বর চক্রবর্তী (বিরাজ-বৌ/১)। নীলাম্বরের ভাই। তার চরিত্র নীলাম্বরের বিপরীত। সে খর্বকায় এবং কৃশ। হুগলীর আদালতে সমস্ত দিন আর্জি লিখে সে জীবিকা নির্বাহ করত। তার অবস্থা চলনসই। তার বাস্তব-বুদ্ধি আছে। তাই বোনের বিয়েতে দাদার উচ্চ ঘরে অর্থব্যয়কে সে ভাল চোখে দেখেনি। সমাজের নিন্দা রটনাকে সে ভয় করে। তাই স্ত্রীকে সে বাইরে যেতে বাধা দেয়। স্ত্রীকে মার-ধোর করতেও সে কুণ্ঠা বোধ করে না। তবে দাদাকে সে ভয় করে। সর্পাঘাতে পীতাম্বরের মৃত্যু হয়।

পুরুষোত্তম (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/৮)। কুমারবাহাদুরের শিকারদলের সঙ্গী। সে কম কথা বলত।

পুঁটু (শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব/১)। এই মেয়েটির সঙ্গে শ্রীকান্তর বিয়ে দেবার সব ব্যবস্থা পাকা হয়। কিন্তু শ্রীকান্তর চেষ্টাতেই তার অন্যের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

ফকিরসাহেব (দেনাপাওনা/৮)। ফকিরসাহেব জাতিতে মুসলমান। মুসলমান ফকির হলেও তাঁর মতামত অত্যন্ত উদার। ষোড়শীকে তিনি মা বলেছেন। ষোড়শীর জন্য তিনি সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফকিরসাহেবের দৃঢ়তা তাঁর ব্যবহারের কমনীয়তার মধ্যে সহজে ধরা পড়ে না।

বঙ্কু (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/১১)। রাজলক্ষ্মীর সতীনপো। কিন্তু সে রাজলক্ষ্মীর পেটের ছেলের মতই ছিল। তার পাশের বাড়িতে থেকে বঙ্কু কলেজে পড়াশোনা করত। পরে রাজলক্ষ্মী এই বঙ্কুর বিয়ে দিয়ে সংসার পাতার ব্যবস্থা করে দেয়, নিজের সম্পত্তি দান করে। বঙ্কুর উল্লেখ থাকলেও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বিশেষ প্রকাশিত হয়নি। তবে রাজলক্ষ্মীকে সে ভক্তি করত বলেই মনে হয়।

বনমালী (দত্তা/১)। কৃষ্ণপুরের জমিদার। মেয়ে বিজয়াকে রেখে তিনি মারা যান এবং মৃত্যুর সময়ে বন্ধু জগদীশের বন্ধক সম্পত্তি ছেড়ে দেবার কথা বলে যান। তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় গ্রাম ছেড়ে শহরে বাস করতে থাকেন। এর জন্য তাঁর মানসিক দুঃখের শেষ ছিল না।

বনমালী পাড়ুই (পল্লীসমাজ/৫)। রমেশদের স্কুলের হেডমাস্টার মশাই। শিক্ষকজনোচিত আত্মসম্মানবোধ অপেক্ষা ভৃত্যজনোচিত আচরণই তাঁর চরিত্রে দেখানো হয়েছে। বেণী ঘোষালের মত প্রজাদের কাছে তিনি বঞ্চনা পেতেই অভ্যস্ত, তাই রমেশের মত প্রভুর দেওয়া সম্মান তাঁর কাছে অকল্পনীয়।

বন্দনা (বিপ্রদাস/৩)। বন্দনা সতীর খুড়তুতো বোন। মাতৃহারা বন্দনা পিতার স্নেহে বোম্বাইয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মধ্যে মানুষ হয়েছে। 'গায়ের রঙটা যেন সাদার ধার ঘেঁষিয়া আছে—এমনি ফর্সা। দেহের গঠন ও মুখের শ্রী অনিন্দ্যসুন্দর।' বন্দনা পিতার সঙ্গে দিদির বাড়ি বলরামপুরে এসে একটি নূতন জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। গোঁড়া হিন্দু পরিবারের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতির মিল হয়নি। ফলে বেধেছে সংঘাত। বন্দনার তেজস্বিনী স্বভাবের জন্য বিরোধ বেধেছে। বিশেষতঃ বিপ্রদাসের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বকে সকলে নির্বিচারে যে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, বন্দনা তাকে সহজে মেনে নিতে চায়নি। শেষ-পর্যন্ত বিপ্রদাসের যথার্থ পরিচয় বন্দনা যখন উপলব্ধি করতে পেরেছে, তখন সে বিপ্রদাসকে যথার্থ শ্রদ্ধা করেছে। বিপ্রদাসের নিঃসঙ্গ একাকিত্ব সে অনুভব করেছে। বিপ্রদাসকে ভালবেসেছে। এ হল বন্দনার একধরনের বীরপূজা।

দ্বিজদাসকেও বন্দনা যথার্থ ভালবেসেছিল। কিন্তু বিপ্রদাসের ব্যক্তিত্বের পাশে দ্বিজদাসের আপাতলঘু চপল ভঙ্গী তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে দেয়নি। শেষপর্যন্ত বন্দনা যখন দ্বিজদাসের স্ত্রীরূপে নিজের পরিচয় দিয়েছে এবং বাসুর

দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তখন সে যেন তাদের বাড়িতে সতীর শূন্যস্থান পূরণ করেছে।

বন্দনার হিন্দু আচার-আচরণের প্রতি প্রাথমিক বিরাগ দেখানো হলেও, প্রকৃতপক্ষে সে অন্তরে হিন্দু। বাঙালী নারীর চিরন্তন আদর্শকে সে হিন্দুধর্মের মধ্যেই আবিষ্কার করেছে। এইখানেই চরিত্রটি হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়'।

বন্দনার মাসী (বিপ্রদাস/১৭)। বন্দনার বড় মাসী স্বামীর কর্মস্থল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে থাকেন। মেয়ের বিয়ের জন্য কোলকাতায় এসেছিলেন এবং সেখানেই বন্দনাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় বিশ্বাসী। বন্দনাকে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র অশোকের সঙ্গে বিবাহ দিতে তিনি আগ্রহী। সে আশা তাঁর ব্যর্থ হয়।

বল্লভ (দর্পচূর্ণ/৫)। স্যাকরা। ইন্দু গোপনে তার গয়না বিক্রি করে স্বামীর চিকিৎসা করাবে বলে তাকে বাড়িতে ডেকেছিল।

বল্লভ ডাক্তার (দেনাপাওনা/৬)। গ্রাম্য ডাক্তার, জমিদার জীবনান্দের পেটেব ব্যথা বাড়লে চিকিৎসার জন্য এঁকে ডাকা হয়। ইনি যেভাবে বিজ্ঞের মত হয়-নয় গোছের উত্তব দিয়েছেন তাতে চরিত্রটি হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছে।

ব্রজকিশোর (চন্দ্রনাথ/১)। চন্দ্রনাথের মামা। চন্দ্রনাথের বাড়িতে থেকে তাদের বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করেন। ভালোমানুষ ধরনের চরিত্র। কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে অন্যায় করতে বাধ্য হন। অপুত্রক।

ব্রজরাজ লাহিড়ী (বড়দিদি/২)। পূর্ববঙ্গের জমিদার। 'মাথায় দুই চারিগাছা চুলও পাকিয়াছে।' দয়াশীল এবং লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে আশ্রয় দেন।

ব্রজানন্দ (শ্রীকান্ত ৩য় খণ্ড/১ম পর্ব)। গঙ্গামাটিতে যাবার পথে এই সাধুর সঙ্গে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের প্রথম পরিচয় হয়। সাধুজীর বয়স বেশি নয়, বোধহয় কুড়ি-একুশের মধ্যে, কিন্তু যেমন সুকুমার তেমনি সুশ্রী। রঙ তপ্ত কাঞ্চনের মত। চোখ, মুখ, ভ্রূ ও কপালের গঠন নিখুঁত বললেই হয়। গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি, পরনে গেরুয়া বস্ত্র। সাধুজীর সন্ন্যাসজীবনের নাম ব্রজানন্দ, আসল নাম আনন্দ। পরোপকার করা ছিল সাধুর ব্রত। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে আনন্দের যখন দেখা হয় তখন সে গোপালপুর নামে একটি গ্রামে কলেরা রোগীদের চিকিৎসা করতে যাচ্ছিল। পরে আনন্দের সঙ্গে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। আনন্দ রাজলক্ষ্মীকে দিদি বলে ডাকতে থাকে।

ব্রজেন্দ্র (পথের দাবী/১৯)। চট্টগ্রামী মগ। অসুরের মত চেহারা

ও শান্ত। পথের দাবীর সভ্য হলেও সব্যসাচীর সঙ্গে সবসময় তার মতের মিল হয়নি। সব্যসাচী তার স্বরূপ জানত বলে তাকে শাসন করতেও অসুবিধা হয়নি।

ব্রজেশ্বরী (পণ্ডিতমশাই/১৩)। কুঞ্জ বোষ্টমের স্ত্রী। বয়স বছর পনের। সে যেমন মুখরা, তেমনি কলহপটু। কথার বাঁধুনি ও বিষের জ্বলনে তার মাকেও সে হার মানিয়ে চোখের জল ফেলিয়ে দিত। কিন্তু এই ব্রজেশ্বরী ননদিনী কুসুমকে চোখে দেখা মাত্রই ভালবেসে ফেলেছিল। এতে তার মা খুশি হননি। তিনি মেয়ের চোখের আড়ালে টিপে টিপে তাকে যা-তা বলতেন। কিন্তু সে কোন কথা গ্রাহ্য করত না। কুসুম যখন চরণের ভেদ-বমির কথা শুনে কাউকে না বলে বাড়লে চলে যায় তখন ব্রজেশ্বরী জোর করে বিপদ জেনেও তার স্বামীকে কুসুমের খোঁজ আনতে পাঠান।

বাড়ীউলি (চরিত্রহীন/৩৪)। দিবাকর-কিরণময়ীকে পাপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করতে প্ররোচনা দেয়।

বাসু (বিপ্রদাস/১৩)। বিপ্রদাস-সতীর পুত্র। তার উপস্থিতি উপন্যাসে বিশেষ উল্লেখ নেই। বাসু দ্বিজদাসের কাছে মানুষ ও দ্বিজদাসকে যথেষ্ট ভালবাসে—এই ইঙ্গিত উপন্যাসে আছে।

বাঁড়ুয্যে মশায় (পল্লীসমাজ/৫)। গ্রামবাসী। মধুপালের দোকানে ধার শোধ করতে পারে নি, অথচ কি ভাবে পুনরায় জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে, সেটি বেশ আকর্ষণীয়। চরিত্রটির মধ্যে কিন্তু শঠতা নেই, আছে বাক্‌চাতুর্য।

ব্যারিষ্টার সাহেব (বিপ্রদাস/৭)। পাঞ্জাবে প্র্যাক্‌টিস করেন। বিলেতফেরত। বিপ্রদাস বলরামপুর থেকে বন্দনাদের ট্রেনে তুলে দিতে গেলে সস্ত্রীক ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে পরিচয় হয়। ব্যারিস্টার সাহেব বিপ্রদাসকে বিলাতের শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ ইত্যাদি দিতে প্রবৃত্ত হন। ট্রেন এলে যখন কামরায় সাহেবরা মত্ত অবস্থায় প্রকৃত যাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করে তখন বিপ্রদাসই সাহসিকতা দেখিয়ে এই ব্যারিস্টারসাহেবদের রক্ষা করেন। ব্যারিস্টার সাহেব ক'দিন কলকাতায় বিপ্রদাসের বাড়িতে কাটিয়ে যান। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে অন্তঃসারশূন্য পাশ্চাত্যশিক্ষিতদের শূন্যগর্ভ আস্ফালনকে যেন শরৎচন্দ্র কটাক্ষ করেছেন।

বিজলী (আঁধারের আলো/২)। এক রূপসী বাইজী। জোড়াসাঁকোয় সে থাকতো। গঙ্গার জগন্নাথ ঘাটে তার সঙ্গে সত্যেনের প্রথম আলাপ হয়েছিল। তারপর একদিন সত্যেন আবিষ্কার করেছিল সে বিজলীকে যথার্থই ভালবেসেছে—চোখের নেশা নয়, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। এরপর একদিন

সত্যেন বিজলীর এক দাসীর সঙ্গে বিজলীর ঘবে এসেছিল। সেদিন প্রথমে বিজলী তাকে মুখচোরা শান্ত লোক ভেবে খুব অপমান করেছিল। আসলে কিন্তু বিজলীও তাকে ভালবেসেছিল। তাই সে তার নোংরা জীবনের সঙ্গে সত্যেনকে জড়াতে চায় নি বলেই অপমানের ভান করেছিল। এরপর বিজলী গানবাজনা ছেড়ে দিয়েছিল এবং সত্যেন দেশে ফিরে গিয়ে মায়ের মনোনীতা পাত্রী রাধারাণীকে বিয়ে করেছিল। সত্যেন তার ছেলের অন্নপ্রাশনে বিজলীকে অপমানি· করার জন্যে তাকে অনেক টাকা দিয়ে ভাড়া করে এনেছিল। কিন্তু রাধারাণীর জন্য শেষ পর্যন্ত সত্যেন তাকে অপমান করতে পারে নি। বরং সে রাধারাণীর কাছ থেকে সত্যেনের একটি ছোট ফটোগ্রাফ চেয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছিল এবং তার একটা ছোট বাড়ি ছিল সেটা বিক্রি করে দেশ থেকে চলে গিয়েছিল।

বিজয়কিশোর দাস (কাশীনাথ/৭)। বি. এ. পাশ। কমলা তাকে জমিদারিব নূতন ম্যানেজাব কবে। বিজয় কাশীনাথকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চায়নি।

বিজয়া (দত্তা/২)। 'দত্তা' উপন্যাসের নায়িকা। জমিদাব-কন্যা। ব্রাহ্ম হলেও হিন্দুধর্মের আচার-আচরণের প্রতি আস্থাশীল। বিজয়া অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না। কথা অল্প বললেও চারিত্রিক দৃঢ়তায় বিলাসবিহারী ও রাসবিহারীর অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবহারকে প্রতিরোধ করেছে। নরেন্দ্রকে বিজয়া ভালবেসে-ছিল। কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশে সে দ্বিধা করেছে। জেদ ও অভিমান বিজয়া-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নরেন্দ্রের দুরবস্থায় সে একদিকে যেমন ব্যথিত, তেমনি কখনো কখনো তাকে আঘাত দিতেও তার বাধেনি। শেষ পর্যন্ত বিজয়া বিলাসবিহারীকে প্রত্যাখ্যান করে নরেন্দ্রকে বিবাহ করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

বিধু (বোঝা/৯)। সত্যেন্দ্রের তৃতীয়া পত্নী।

বিধু (চবিত্রহীন/৯)। একজন পতিতা রমণী। মোক্ষদার সঙ্গে ঝগড়া-সূত্রে তার উপস্থিতি।

বিধু চাটুজ্জে (বড়দিদি/৮ম)। মাধবীর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সব সম্পত্তি ভোগ করতে থাকেন। পরে মাধবী ফিরে এলে তাকে ফাঁকি দেবার জন্য জমিদারের নায়েবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন।

বিনোদ (বৈকুণ্ঠের উইল/১)। বৈকুণ্ঠ মজুমদারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র সন্তান বিনোদ বাল্যকাল থেকেই লেখাপড়ায় খুব ভাল। কিন্তু শহরে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়ার পর তার চরিত্রবিকৃতি ঘটে, ফলে সে পিতার সম্পত্তি

থেকে বঞ্চিত হয়। এর জন্য প্রথমে সে মা ও দাদার ওপর অভিমান করলেও পরে সে নিজের ভুল বুঝতে পারে। মূর্খ দাদার চরিত্র-মাহাত্ম্যের পরিচয় উপলব্ধি করতে পেরে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করে।

বিনোদকুমার হালদার (পথের দাবী/১)। অপূর্বর বড়দাদা। মাকে সে অপূর্বর বাইরে যাবার প্রশ্নে দু-চার কথা বলেছিল।

বিনোদবাবু (শুভদা/৩য় পর্ব)। বামুনপাড়ার জমিদার ভগবানবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

বিন্দু (বড়দিদি/৫ম)। ব্রজরাজবাবুর বাড়ির দাসী। মাধবী ও সুরেন্দ্রের সম্পর্ক নিয়ে সে কটাক্ষ করেছে।

বিন্দুবাসিনী (শুভদা/১ম পর্ব)। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বৌ। তাই গ্রামের সবাই তাকে খাতির করত। কিন্তু খুব সহৃদয়া। তাই শুভদাদের দুঃখের দিনে সে তাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। তার দেওয়া বালা নিয়ে গিয়েই শুভদা [illegible] স্বামীকে ছাড়িয়ে এনেছিল।

বিন্দুবাসিনী (কাশীনাথ/৩)। মধুসূদন মুখোপাধ্যায়-এর দ্বিতীয়া কন্যা। কাশীনাথের মামাতো বোন। বিবাহিতা। সে কাশীনাথকে ভালবাসত, তার প্রতি সহানুভূতিশীলা ছিল। যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে সে চিকিৎসা করাতে অপারগ হলে কাশীনাথ তাকে অর্থসাহায্য করে। কাশীনাথ আহত হলে বিন্দুবাসিনী অক্লান্ত সেবার দ্বারা তাকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যায়।

বিন্দুবাসিনী (বিন্দুর ছেলে/১)। 'বিন্দুর ছেলে' গল্পের নায়িকা। ধনাঢ্য জমিদারের একমাত্র কন্যা, অতুলনীয়া রূপসী। মাধবের সঙ্গে বিবাহের পর সে যাদবের সংসারে আসে। বিন্দু ভয়ানক জেদী মেয়ে। রেগে গেলে তার জ্ঞান থাকে না। তার ওপর ফিটের ব্যামো আছে। এই ব্যামো সারাবার উপায় হিসাবে বড় মা অন্নপূর্ণা ছেলে অমূল্যকে একদিন তার কোলে বসিয়ে দেয়। তখন থেকেই বিন্দু অমূল্যর দায়িত্ব নেয়। কিন্তু সেই স্নেহের মধ্যে আতিশয্য এত বেশী যে মাঝে মাঝে বাড়ির সকলকে বিব্রত হতে হয়। কিন্তু অমূল্যর প্রকৃত শিক্ষার দিকে বিন্দুর যথেষ্ট নজর ছিল। তাই এলোকেশীর পুত্র নরেনের বদ অভ্যাসের স্পর্শ সে এড়াতে চেয়েছিল। বিন্দুর জেদ যতই হোক না কেন, সে ভাশুর যাদবকে যথার্থই পিতার মত ভক্তি করত। চরিত্রটি কোমলে-কঠিনে অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

বিপিন (মেজদিদি/২)। রাজহাটের ধনী ব্যক্তি নবীন মুখুজ্যের মেজ ভাই বিপিন মুখুজ্যে। বিপিনেরও নবীনের মত ধানচালের কারবার। তাঁর

অবস্থাও ভাল, কিন্তু বড় ভাই নবীনের সমান নয়। তথাপি তাঁর বাড়িটাই দোতলা। তাঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী শহরের মেয়ে। তিনি দাসদাসী রেখে, লোক-জন খাইয়ে, জাঁকজমকে থাকতে ভালবাসেন। পয়সা বাঁচিয়ে গরিবী চালেন না বলেই দুই ভাইয়ের মনোমালিন্য ও পৃথক্। বিপিন স্ত্রী হেমাঙ্গিনীকে খুব ভালবাসতেন। হেমাঙ্গিনীর মাঝে মাঝে জ্বর হত। পাছে তাঁর মৃত্যু ঘটে এ জন্য বিপিন সর্বদা তাঁকে চোখে চোখে রাখতেন। একবার কেষ্টকে নিয়ে যখন দুই জায়ের ঝগড়া হয় তখন বিপিন হেমাঙ্গিনীকে কিছু কড়া কথা বলেন। ফলে হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে নিয়ে তাঁদের গ্রামের বাড়ির দিকে রওনা হন। এর পর বিপিন অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন।

বিপিন (শ্রীকান্ত ৩য় খণ্ড/৫)। মধু ডোমেব মেয়েকে বিয়ে করতে এসেছিল।

বিপিনবাবু (চরিত্রহীন/২)। বিপিনবাবু বড়লোক। তার সঙ্গে সতীশের এলাহাবাদে আলাপ হয়, কোলকাতায় এসে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়। বিপিন-বাবু সতীশকে নানারকম কুসংসর্গে মেশার কাজে দিক্ষা দেয়।

বিপ্রদাস (বিপ্রদাস/১)। বিপ্রদাস শরৎসাহিত্যের মধ্যে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক অনবদ্য চরিত্র। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসেব নায়ক। বিপ্রদাস বলরামপুবের জমিদার। পিতাব মৃত্যুর পব তিনি জমিদাবির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন নিরাসক্ত কর্মযোগীর মত। বিমাতা দয়াময়ীকে তিনি আপন মাতা অপেক্ষা সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন। সৎভাই দ্বিজদাসকে ভালবাসেন প্রাণাপেক্ষা অধিক। দ্বিজদাসের খেয়ালীপনাকে তিনি স্নেহশীল হৃদয়ে প্রশ্রয় দেন। বিপ্রদাস অপরূপ সুন্দর, যথার্থ পুরুষ। কঠোর নিয়মব্রত তিনি পালন কবেন, নিয়মিত ধ্যান করেন। স্কুল কলেজের ডিগ্রী তাঁর না থাকলেও, পড়াশোনা প্রচুর। নিজস্ব বিরাট লাইব্রেরিতে নিয়মিত বিবিধ বিষয়ে পড়াশোনা করেন। এইসব সত্ত্বেও বিপ্রদাসকে নিঃসঙ্গ-একাকী বলে মনে হয়। স্ত্রী সতীকে ভালবাসলেও, সতী তাঁর যথার্থ সহধর্মিণী হয়ে উঠতে পারেনি। তাই বন্দনা বিপ্রদাসের জীবনে আলোড়ন এনেছে। সে আলোড়ন অবশ্য বিপ্রদাসের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না। তবুও বন্দনাকে বিপ্রদাস যে ভালবেসেছিলেন, তা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয় না। সমাজ ও ধর্মের দোহাই দিয়ে বিপ্রদাস বন্দনাকে তথা নিজেকে সংযত করেছেন।

বিপ্রদাসের আত্মত্যাগ উল্লেখযোগ্য। পিতার মতের বিরুদ্ধে তিনি ভ্রাতা দ্বিজদাসের জন্য সম্পত্তি রক্ষা করেছেন। নিজের সম্পত্তি খুইয়ে ভগ্নীর মর্যাদা

রক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভিখারীর মত নিঃসম্বল হয়ে স্ত্রীকে নিয়ে চলে যেতে হয়েছে। বিনা-চিকিৎসায় স্ত্রীর মৃত্যু দেখতে হয়েছে। বিপ্রদাসের এই দুর্দশার মধ্যেও তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ রক্ষিত হয়েছে। বিপ্রদাসকে যথার্থ গৃহী-সন্ন্যাসী বললে অন্যায় হয় না।

বিভা (নববিধান/৩)। শৈলেশের বোন। অপুত্রক। আধুনিকা। হিন্দু সংস্কার অপেক্ষা ইংরেজীয়ানাতেই অভ্যস্ত। দাদা ও তার পুত্র সোমেনকে সে যথার্থ ইংরেজীয়ানায় মানুষ হতেই উদ্‌বুদ্ধ করে। তাই ঊষার সঙ্গে তার বিরোধ বিভা কিন্তু স্বামীর সঙ্গে কথায় পেরে ওঠে না। বিভা অত্যন্ত অভিমানী। এত সত্ত্বেও বিভার মনটি সরল। তাই শেষপর্যন্ত ঊষার সঙ্গে তার মনের মিল ঘটেছে।

বিমলা (দর্পচূর্ণ/১)। নরেন্দ্রের মামাতো ভগিনী বিমলা ইন্দুর সখী। নরেন্দ্রের বাড়ির কাছেই তাদের বাড়ি। ইন্দু প্রায়ই তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে বা বেড়াতে যায়। কিন্তু বিমলার সংসার সম্বন্ধে ধারণা ইন্দুর ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বামী-সংসারের সেবার মধ্য দিয়েই বিমলা নারীজীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। বিমলা নরেন্দ্রকে যেমন ভালবাসে, ইন্দুকেও তেমনি ভালবাসে। সে অনেক চেষ্টা করেছিল ইন্দুর স্বামীর প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন করার। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বিরক্ত হয়। অবশ্য শেষপর্যন্ত বিমলার মতই থেকেছে—ইন্দুকে স্বামীর কাছে ফিবে যেতে হয়েছে সার্থকতার সন্ধানে।

বিরাজ দত্ত (বিপ্রদাস/২৬)। বিপ্রদাস দ্বিজদাসদের জমিদারির ম্যানেজার।

বিরাজ বৌ (বিরাজ বৌ/১)। 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের নায়িকা। নায়িকা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তার কিছু নেই। সে দরিদ্র ঘরের বধূ। নয় বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল, এখন তার বয়স ১৯-২০। সে অসামান্যা সুন্দরী। ৪-৫ বছর আগে তার একটি পুত্রসন্তান হয়ে আঁতুড়েই মারা যায়। তারপর থেকে সে নিঃসন্তান। দুর্দান্ত স্বামী নীলকণ্ঠকে সে ভালবাসার দ্বারা শাসন করে। বয়স্ক স্বামীকে শিশুর মত সেবা-যত্ন আহার করায়। সংসারের অভাবের কথা স্বামীকে না বলে নিজেই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে। স্বামীর ভালবাসাই তার একমাত্র সম্বল। জমিদারের প্রলোভনকে সে উপেক্ষা করে। কিন্তু স্বামীর কাছে অপবাদ সে সহ্য করতে পারে না। তাই সে সংসার ত্যাগ করে। কিন্তু তার মৃত্যু হয় না। অশেষ দুঃখভোগের পর স্বামীর পায়ে মাথা রেখেই বিরাজ মৃত্যুবরণ করে।

বিলাসবিহারী (দত্তা/৩)। 'দত্তা' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। খানিকটা

ভিলেন চরিত্রও বটে। তবে বিলাসকে শরৎচন্দ্র গোঁয়ার ও নির্বোধরূপে অঙ্কন করলেও, পাঠকের ঘৃণার সামগ্রী করে তোলেন নি, বরং বিলাসের প্রতি পাঠকের কিছুটা সমবেদনা থাকে। ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্নিহিত উপদেশের প্রতি না হলেও বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রতি তার আগ্রহ অধিক। বিজয়ার ওপর সে কর্তৃত্ব করতে চায়। কিন্তু তার মনের খবর সে জানাতে চায় না। পিতাকে তাই মাঝে মাঝে তাকে সামলাতে হয়। নরেন্দ্রকে বিলাস সহ্য করতে পারে না। তাই তাঁকে ছোট করতে গিয়ে সে নিজেই ছোট হয়ে গেছে। বিলাসের প্রতি বিজয়ার ভালবাসা না থাকলেও, ঘৃণা ছিল না বলেই মনে হয়।

বিশ্বম্ভর আচার্য (দেনাপাওনা/১)। বীজগাঁযের জমিদারির পেয়াদা। গোমস্তা এককড়িব সঙ্গে তার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তার পাপকর্মের সহায়ক।

বিশ্বেশ্বর (চন্দ্রনাথ/১৪)। চন্দ্রনাথ-সরযূর শিশুপুত্র। কৈলাসচন্দ্রের কোলে চেপে সে সতরঞ্চ খেলার সঙ্গী হয়। লাল মন্ত্রীটাব প্রতি তার আকর্ষণ। এই শিশু পিতৃগৃহে চলে গেলে কৈলাসচন্দ্রের কাছে জগৎ শূন্য হয়ে পড়ে।

বিশ্বেশ্বরা (পল্লীসমাজ। ৩)। বেণী ঘোষালের মা, রমেশের জ্যাঠাইমা। বিশ্বেশ্বরীর বয়স পঞ্চাশের মত কিন্তু গঠনের বৈশিষ্ট্যে চল্লিশের বেশি মনে হয় না। এককালের সৌন্দর্য আজও অনেকাংশে বিদ্যমান। বিশ্বেশ্বরীর চরিত্রের যে পরিচয় উপন্যাসে আছে তাতে তাঁকে বেণী ঘোষালের মা বলে চিনতে কষ্ট হয়। নীরব সর্বংসহা এই মাতৃমূর্তি বাঙালী মায়ের অটুট ধৈর্যের প্রতীক। পুত্রের অন্যায আচরণের বেদনা তিনি নীরবে বুক পেতে সহ্য করেছেন, রমার দুঃখ তিনি উপলব্ধি করেছেন। রমেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং কর্তব্যের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও বিশ্বেশ্ববী কিছু প্রতিকার করতে পারেননি। বাঙালী মাযের চিবন্তন ট্র্যাজেডির মত তাঁকে নিষ্ক্রিয়তার মর্মবেদনা ভোগ করতে হয়েছে। তবু তিনি যথেষ্ট প্রতিবাদ করেছেন নীরবে।

বিষ্ণু চোঙদার (বামুনের মেয়ে/৩)। দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল ও ভেড়া চালান দেবার গোপন কারবারে গোলোক চাটুজ্জের অংশীদার। তবে টাকা ধার নিয়ে সে গোলোক চাটুজ্জের কাছে বাঁধা। তাই গোলোকের পাপ কাজের সহায়তা করতে হয় তাকে।

বীণাপাণি (গৃহদাহ/২৭)। দ্রঃ রাক্ষসী।

বৃদ্ধ পাগল (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/১০ম পর্ব)। শ্রীকান্তদের গ্রামে বৃদ্ধ পাগলের বাড়ি ছিল। সে দিনের বেলা বাড়ি (২) ভাত চেয়ে খেত আর রাতে ছোট মইয়ের ওপর কোঁচার কাপড়টা তুলে দিয়ে, সেটা সুমুখে উচু করে ধরে পথের ধারে বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়াত, সে চেহারা দেখে

অন্ধকারে অনেক লোকের দাঁতকপাটি লাগতো, নিরর্থক মানুষকে ভয় দেখিয়েই সে আনন্দ পেত। তাই কখনো শুকনো কাঠের আঁটি গাছের ডালে বেঁধে আগুন দিত, মুখে কালিঝুলি মেখে খাঁড়া নিয়ে বসে থাকত। গভীর রাত্রিতে ঘরের কানাচে খোলা গলায চাষাদের নাম ধরে ডাকত। নিজের গ্রামেই নয়, আট-দশ খানা গ্রামে সে একাজ করত। অথচ কেউ কোনদিন তাকে ধরতে পারেনি, মরার সময় সে নিজে নিজের বজ্জাতি স্বীকার করে যায়।

বৃন্দাবন (পণ্ডিতমশাই/১ম পর্ব) বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস অধিকারীর পুত্র। বৃন্দাবন লোকটি সেই প্রকৃতির মানুষ যারা কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয়ে মাথা গরম করাকে অত্যন্ত-লজ্জাকর ব্যাপার বলে ঘৃণা করে। বৃন্দাবন ছিল যথার্থ মানুষ। তাই অনেকেই তাকে শ্রদ্ধা করত।

বৃন্দাবনের দুই স্ত্রী ছিল। প্রথমা স্ত্রী কুসুমের মায়ের নামে দুর্নাম ওঠায় বৃন্দাবনের বাবা কুসুমকে পরিত্যাগ করে ছেলের আবার বিয়ে দেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী চরণ নামে একটি পুত্রকে রেখে মারা যায। বাবাও দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৃন্দাবনকে দিয়ে পুনরায় কুসুমকে গ্রহণ করাতে চায়। কিন্তু কুসুম রাজি হয় না। পরে চরণের মৃত্যুতে কুসুম ও বৃন্দাবনের মধ্যে পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

বৃন্দাবনের গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর বৃন্দাবন নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বিনা বেতনের একটা পাঠশালা খোলে। বৃন্দাবন নিজের চেষ্টায় বাঙলা লেখাপড়া শিখেছিল এবং গ্রামের একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে ইংরাজী শিখেছিল। স্বপ্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় বৃন্দাবন কৃষকের ছেলেদের লেখা-পড়া শেখাত। তাই গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাকে পণ্ডিতমশাই বলত।

বৃন্দাবনের মা (পণ্ডিতমশাই/২)। প্রৌঢ়া গ্রাম্য বিধবা স্ত্রীলোক হলেও বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্না। বৃন্দাবন ও তার মাতার মধ্যে বন্ধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বৃন্দাবন অকপটে মায়ের কাছে সব কথা স্বীকার করত। পুত্রের মন বুঝে বৃন্দাবনজননী কুসুমকে নিজ গৃহে নিয়ে যাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কুসুম রাজি হয না।

বৃন্দাবনের জননী খুব ঘটা করে ঠাকুরের দোল-উৎসব সম্পন্ন করতেন। তিনি শুধু ধর্মপরায়ণাই ছিলেন না, অত্যন্ত স্নেহশীলাও ছিলেন। তাই গ্রামে কলেরা লাগলে পুত্রের সঙ্গে তিনিও গ্রামবাসীর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। এই কলেরা রোগেই বৃন্দাবনের জননী স্বর্গারোহণ করেন।

বেণীমাধব ঘোষাল (পল্লীসমাজ/১)। পল্লীসমাজের অন্যতম চরিত্র। বেণী ঘোষাল অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, জমিদার। কিন্তু তার মধ্যে সংকীর্ণতা,

স্বার্থপরতা, নীচতা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তারই চেষ্টায় রমেশের সমস্ত উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ ব্যর্থ হয়। ধনসম্পত্তি এবং জেদ বজায় রাখার জন্য সে মানুষের মাথাতে লাঠি মারতেও দ্বিধা করে না। অথচ আবার বাঁচার তাগিদে সে সম্মান বিসর্জন দিয়ে রমেশের দলে ভিড়তেও দ্বিধা করে না। এই ধরনের শুধুমাত্র স্বার্থপর চরিত্রগুলি সমাজের পক্ষে নিদারুণ ক্ষতিকর।

বেলা (শেষ প্রশ্ন/২১)। সুশিক্ষিতা। বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী হলেও 'সযত্ন সতর্কতায় যৌবনের লাবণ্য আজও পশ্চিমে হেলে নি'। সাজে উগ্র আধুনিকা। বেলার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গিযেছিল। তখন আশুবাবু তাতে মত দিয়েছিলেন, কারণ স্বামী ছিল চরিত্রহীন। বেলা আশুবাবুদের দূর সম্পর্কেব আত্মীযা। শেষপর্যন্ত বেলার সঙ্গে তাব স্বামীর পুনর্মিলন ঘটেছে।

বেহারী (চরিত্রহীন/২)। সতীশদের কোলকাতার মেসবাড়ির চাকর। বেহারী ভৃত্য হলেও উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সতীশ ও সাবিত্রীর প্রতি বেহারীর ভক্তিশ্রদ্ধা অত্যন্ত প্রবল। তাই সে নিজেকে এই দুজনের সুখ-দুঃখ ও সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে।

বৈকুণ্ঠ মজুমদার (বৈকুণ্ঠের উইল/১)। বাবুগঞ্জের বৈকুণ্ঠ মজুমদার মুদির দোকান করে উন্নতি করেছিল। সে মৃত্যুকালে তার সম্পত্তি প্রথম পক্ষের মূর্খ সন্তান গোকুলকে উইল ক'রে দিয়ে গিয়েছিল। কারণ সে যথার্থ বুঝেছিল, সম্পত্তি রক্ষা করতে পারবে গোকুলই, শিক্ষিত ছেলে বিনোদ নয়।

ভগবান নন্দী (শুভদা/৩য় পর্ব)। বামুনপাড়ার জমিদার ভগবান নন্দী। তিনি বৃদ্ধ ও ধার্মিক। তাই শুভদা যখন বালার বিনিময়ে হারাণকে ছাড়াবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিল তখন তিনি বালা না নিয়েই হারাণকে ছেড়ে দেবেন, একথা দিয়েছিলেন।

ভগা বাগ্দী (রামের সুমতি/৩)। ভগা বাগদী জাল ফেলে রামের পোষা মাছ কার্তিক-গণেশকে ধরেছিল।

ভজুয়া (পল্লীসমাজ/৬)। রমেশের হিন্দুস্থানী চাকর। অত্যন্ত সাহসী। প্রভুর জন্য সে লাঠি ধরে বহুজনের মোকাবিলা করতেও পিছপা নয়।

ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় (শুভদা ২য় পরিচ্ছেদ ৬ষ্ঠ পর্ব)। হলুদপুর গ্রামের একজন বিষয়ী লোক। সদানন্দ যখন তার ধান, কলাই, আলু ইত্যাদি নিজের বাড়ি থেকে এনে শুভদাদের বাড়িতে রাখে তখন গাঙ্গুলী মশায় ঈর্ষা-কাতর হন এবং সদানন্দকে ডেকে বিশেষ করে উপদেশ দিয়ে দেন। কিন্তু

সদানন্দ তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। এতে তিনি সদানন্দের ওপর রেগে তাকে বলেন—'উৎসন্নে যাও'।

ভবানী (বৈকুণ্ঠের উইল/১)। বৈকুণ্ঠ মজুমদারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। নিজপুত্র বিনোদ অপেক্ষা সপত্নীপুত্র গোকুলের প্রতিই তার ভালবাসা অধিক। স্বামীকে শান্তি দেবার জন্য ভবানীদেবী নিজ পুত্রকে বঞ্চিত ক'রে গোকুলকে সম্পত্তি দেবার উইলে সাক্ষ্য দিয়ে যথার্থ উদারতার পরিচয় দিয়েছে। গোকুলকে ভবানীদেবীর চিনতে ভুল হয়নি। এর ফল পরিণামে মধুর হয়েছে।

ভবানী ঘোষাল (গৃহদাহ/১৪)। মৃণালের স্বামী। বয়স্ক ব্যক্তি। তিনিও রসিক। মৃণালের প্রতি তাঁর নির্ভরশীলতা লক্ষণীয়।

ভামিনী (অরক্ষণীয়া/৪)। জ্ঞানদার মামী। 'শম্ভুর এটি দ্বিতীয় পক্ষ।...উপস্থিত ইনিই যেমন কাল তেমনই রোগা ও লম্বা ম্যালেরিয়া জ্বরে রঙটা যেন পোড়া কাঠের মত। মেদিনীপুর জেলার মেয়ে। কথাগুলো একটু বাঁকা বাঁকা'। চেহারা কদাকার হলেও তার মনটা ভাল। সে জ্ঞানদা ও তার মাকে সাধ্যমত যত্ন করেছে এবং তাদের বিদায়ের সময় যথেষ্ট যত্ন করতে পারেনি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছে। সর্বোপরি টাকার লোভে বৃদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে জ্ঞানদার বিবাহ দেবার তার স্বামীর যে চক্রান্ত তা সে ব্যর্থ করেছে।

ভারতী (পথের দাবী/২)। ভারতী খ্রীস্টান, কিন্তু অন্তরে বাঙালী। বিরোধের মধ্যে অপূর্বর সঙ্গে তা পরিচয় হলেও, তার অন্তঃকরণ যথেষ্ট কোমল। অপূর্বকে সে সাহায্যই করতে চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত ভারতীর চেষ্টাতেই অপূর্ব 'পথের দাবী'তে প্রবেশাধিকার পায়। ভারতীর সাহায্যে অপূর্ব দেশের কাজে দীক্ষা নেবার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু অপূর্বর দুর্বল-চিত্ততার জন্য ভারতীকে বারবার বিপর্যস্ত হতে হয়। তবুও ভারতী অপূর্বকে ভালবেসেছিল এবং সব্যসাচীর কাছে এ তথ্য গোপন থাকেনি। ভারতীও সব্যসাচীকে শ্রদ্ধা যেমন করেছে তেমনি তার মানবিক সত্তাকেও প্রকাশ করেছে।

ভিখু বাঁড়ুজ্জে (গৃহদাহ/২০)। মহিমের গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি। মহিমের গৃহদাহের পর অচলাকে ত্যাগ করার কথা বলতে এলে মহিম তাঁকে ফিরিয়ে দেয়।

ভীম (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব/১৩)। পথ হারিয়ে এর সাহায্যে শ্রীকান্ত চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় পায়।

ভুবন মুখুজ্জে (চরিত্রহীন/১০)। হোটেলের বামুন। সে উপেন্দ্রের কাছে সাবিত্রীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা ব্যক্ত করেছে।

ভুবনমোহন চৌধুরী (দেবদাস/৮)। হাতীপোতা গ্রামের জমিদার ভুবনমোহন চৌধুরীর সঙ্গে পাবতীর বিবাহ হয। পার্বতী তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ভুবনবাবু সংবেদনশীল মানুষ। তাই পার্বতীর মত অল্পবয়সী মেয়েকে বিয়ে করে তিনি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি সংসারী ও ধর্মপ্রাণ।

ভুবনেশ্বরী (পরিণীতা/২)। শেখরের মা। "বয়স ·····নাই।" (২০৪ পৃ ৫ম)। ভুবনেশ্বরীও ললিতাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। কিন্তু তিনি বোঝেননি যে ললিতা শেখরকে ভালবাসে। যখন তিনি তা জানতে পারলেন, তখন উভয়ের মিলনে সম্মতি দিলেন। এই উদারতা চরিত্রটিকে মহিমাময়ী করে তুলেছে।

ভূতনাথ (নববিধান/২)। শৈলেশের মামাতো ভাই। তাকে শৈলেশ প্রথম পক্ষের স্ত্রী উষাকে বাপের বাড়ি থেকে আনতে পাঠিয়েছিল।

ভূপতিবাবু (চরিত্রহীন/১)। ছাঁটা দাড়ি, টেরি-চশমাধারী যুবক। সে উপেন্দ্রকে সভায় নিমন্ত্রণ করতে এসে সতীশের পরীক্ষার ফল নিয়ে সে রসিকতা করেছিল, সতীশও তার উপযুক্ত জবাব দিতে ছাড়েনি।

ভৈরব (দেবদাস/১৫)। গোয়ালা। চন্দ্রমুখীর অনুগত। তার সাহায্যেই চন্দ্রমুখী দেবদাসের সন্ধানে তাদের জমিদারিতে যায়।

ভৈরব আচার্য (পল্লীসমাজ/১)। গ্রামবাসী। রমেশের পক্ষ তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু অর্থের লোভে এবং সমাজের ভয়ে রমেশের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেও তিনি দ্বিধা করেননি। এটি তাঁর সংকীর্ণ মনোভাবেরই প্রকাশ।

ভৈরব আচার্যের স্ত্রী (পল্লীসমাজ/১৫)। তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। তাই রমেশের উপকারের পরিবর্তে ভৈরব আচার্যের কৃতঘ্নতাকে তিনি নিন্দা করেছেন। তার মেয়ে রমাকে যে অপবাদ দিয়েছে তাকেও তিনি নিন্দা করেন।

ভোলা (রামের সুমতি/৩)। রামলালদের বাড়ির ভৃত্য।

ভোলা (অনুপমার প্রেম/৫)। চন্দ্রবাবুর ভৃত্য। বিধবা বোন অনুপমার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের মিথ্যা ইঙ্গিত দিয়ে চন্দ্রবাবু তাকে অমানুষিক প্রহার করে।

ভোলা (দর্পচূর্ণ/৮)। বিমলাদের বাড়ির চাকর।

ভোলানাথ বা ভুলো (দেবদাস/১)। গোবিন্দ পণ্ডিতের পাঠশালার সর্দার পোড়ে। তাকে দেবদাস চুনের গাদার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

মজুমদার গৃহিণী (অনুপমার প্রেম/১)। সুরেশের মা। তার কাছে অনুপমার মা গিয়ে ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা পাড়ে।

মণি (দেবদাস/১)। পাঠশালার একজন ছাত্র।

মণিশঙ্কর (চন্দ্রনাথ/১)। চন্দ্রনাথের কাকা। তিনি চন্দ্রনাথের পিতৃ-শ্রাদ্ধের সময় কোন একটি কারণে চন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপ হন। তারপর আর ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি। কিন্তু পরে তাঁর মাধ্যমেই চন্দ্রনাথের স্ত্রী সরযূর পারিবারিক কলঙ্কের কথা প্রকাশ পায়। এর জন্য মণিশঙ্করের অনু-শোচনার অন্ত ছিল না। চন্দ্রনাথের বৈরাগ্য তাঁকে ব্যথা দেয়। মণিশঙ্কর চরিত্রটি আপাতদৃষ্টিতে কুটিল মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা নয়।

মণীন্দ্র (নিষ্কৃতি/৩)। গিরীশের বড় পুত্র। পালোয়ান। শৈলজার প্রতি অতুলের দুর্বিনীত ব্যবহারের সমুচিত জবাব দিতে সে অতুলকে প্রহার করে। মণির উপরেও শৈলজার আদেশ খাটে। তার আদেশেই মণি অতুলকে প্রহার করা থেকে নিবৃত্ত হয়।

মতিমোড়ল (বিরাজ বৌ/২)। গ্রামের ছোটজাতের মানুষ। তার পুত্রের অসুখে সে নীলকণ্ঠকে নিয়ে যেতে চায়, তার ধারণা নীলকণ্ঠ গেলেই তার ছেলের অসুখ সারবে।

মথুরানাথবাবু (বড়দিদি/৭ম)। সুরেন্দ্রনাথের জমিদারির ম্যানেজার। অত্যাচারী ও কুকর্মে সিদ্ধ। তিনি জমিদার সুরেন্দ্রনাথের উপর কর্তৃত্ব করতে সচেষ্ট ছিলেন।

মধু ডোম (শ্রীকান্ত ৩য় খণ্ড/৫)। অন্ত্যজ সমাজের গ্রাম্য লোক। এর মেয়ের বিয়েতে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তকে যেতে হয়েছিল।

মধুপাল (পল্লীসমাজ/৫)। মুদী। রমেশ উপযাচক হয়ে তার দোকানের ধার শোধ দিতে এলে সে অবাক হয়, কারণ গ্রামে সাধারণতঃ বারবার তাগিদ দিয়েও টাকা পাওয়া যায় না।

মধুসূদন ভট্টাচার্য (মন্দির/৪)। জমিদার বাড়ির নিষ্ঠাবান পুরোহিত।

মধুসূদন ভট্টাচার্য (কাশীনাথ/১)। কাশীনাথের মাতুল। যজমান-বাটীতে নিত্যপূজা ক'রে জীবিকা নির্বাহ করেন। ভাগ্নে কাশীনাথের সঙ্গে জমিদার-কন্যার বিবাহে তিনি অর্থগ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি।

মনোরমা (পরিণীতা/৩)। চারুবালার মা। তাস খেলার ঝোঁক। ভাই গিরীশ ললিতাদের আর্থিক সাহায্য করতে চাইলে তিনি তা ভাল মনে গ্রহণ করতে পারেন নি।

মনোরমা (শেষ প্রশ্ন/১)। আশুবাবুর কন্যা মনোরমাকে প্রথমে যে-রকম ব্যক্তিত্বময়ী রূপে অঙ্কন করা হয়েছে, শেষেরদিকে সেরকম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মনোরমা বিদুষী, ধনী পিতার একমাত্র কন্যা, সামাজিক। সে এ পর্যন্ত বিবাহ করেনি, কারণ অজিতকে সে ভালবাসে—তারই জন্য প্রতীক্ষা। কিন্তু সেই অজিত যখন ফিরে এল তখন মনোরমার সঙ্গে তার মনের মিল হল না কেন—এর কোন বিশ্লেষণ করা হয়নি। হঠাৎ একদিন মনোরমাকে দেখা গেল রুগ্ন শিবনাথের বুকের ওপর ঘুমিয়ে থাকতে। অজিত-মনোরমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হল। মনোরমাও পিতৃগৃহ ত্যাগ করে শিবনাথকে বিবাহ করল। মনোরমার চরিত্রে এই জাতীয় বিষম-ব্যাপারগুলির উপযুক্ত বিশ্লেষণ না থাকায় তাকে ভুল বোঝার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

মনোরমা (দেবদাস/৫)। পার্বতীর বান্ধবী। তার কাছে পার্বতী জানিয়েছে যে সে দেবদাসকেই স্বামী বলে মনে করে।

মনোরমা (বড়দিদি/৪র্থ)। মাধবীর বাল্যকালের সখী। মাধবীর তাকে চিঠি লেখার কথা বলা হয়েছে। চিঠির মাধ্যমে সুরেন্দ্রনাথের উদাসীনতাব কথা বলা হয়েছে। মনোরমা মাধবীর কাছে এসে সুরেন্দ্রের কথা যখন জিজ্ঞেস করেছে, তখন সুরেন্দ্র মাধবীদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। মনোরমার কাছে ধরা পড়েছে সুরেন্দ্রের প্রতি মাধবীর ভালবাসার কথা।

মনোরমা (বৈকুণ্ঠের উইল/৫)। গোকুলের স্ত্রী। স্বার্থপর। স্বামীকে সে বিমাতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে সমস্ত সম্পত্তি দখলের চেষ্টায় ছিল।

মনোরমার স্বামী (বড়দিদি/৬ষ্ঠ)। মনোরমা তার স্বামীকে চিঠিতে সুবেন্দ্রের প্রতি মাধবীর ভালবাসার কথা জানিয়েছে। তিনি বেশ রসিকতাপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন। উপন্যাসে উপস্থিতি নেই।

মনোহর (পথের দাবী/১১)। 'পথের দাবী'র সদস্য। নবতারার স্বামীব বন্ধু বলে কথিত। তিনি নিজেকে অ্যাডভোকেট বলে দাবী করেছেন। নবতারার স্বামীব সঙ্গে বিচ্ছেদ করে দেশসেবা করাকে তিনি ভালচোখে দেখতে পারেন নি। এর জন্য সুমিত্রার সঙ্গে তর্কে তিনি শালীনতার সীমাও লঙ্ঘন করেছেন, শেষপর্যন্ত দম্ভ করে দলত্যাগ করেছেন।

. **মনোহর চক্রবর্তী** (২য় খণ্ড/১১শ পর্ব)। ইনি একজন প্রাজ্ঞব্যক্তি। দাঠাকুরের হোটেলে হরিসংকীর্তন শুনে পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। তিনি খুব ধনী ছিলেন। ঐ হোটেলেই শ্রীকান্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি শ্রীকান্তকে গুটিকয়েক সৎপরামর্শ দেন। তাঁর কাছে

এই পরামর্শগুলো সৎ বলে মনে হলেও শ্রীকান্ত বাইরে কোন প্রতিবাদ না করলেও এই পরামর্শগুলো মোটেই মেনে চলেন নি।

মহিম (গৃহদাহ/১)। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নায়ক। মহিম শিক্ষিত যুবক। কিন্তু তার অবস্থা স্বচ্ছল নয়। গ্রামে সামান্য বাড়ি আছে। কোলকাতায় পড়াশোনার সময় বড়লোক বন্ধু সুরেশ তাকে নানাভাবে সাহায্য করতে চাইলেও, মহিম তা গ্রহণ করেনি। মহিমের চরিত্রে একটি আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এইজন্য মহিমকে অনেকেই ভুল বোঝে। তাকে নির্বিকার, কঠোর বা অহংকারী বলে ভুল হয়। ব্রাহ্ম মেয়ে অচলা মহিমকে ভালবেসেছিল। সে ভালবাসার মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। কিন্তু মহিমের বন্ধু সুরেশের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসের পাশে মহিমের আপাত নির্বিকারত্ব তাকে মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু মহিমের দায়িত্ববোধ অসীম। অচলাকে সে বিবাহ ক'রে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেছে। সেখানে গ্রামের লোকের বিরোধিতা নীরবে সহ্য করেছে, অচলাকে জানতে দেয়নি। শেষপর্যন্ত গৃহদাহের ঘটনায় সে মর্মাহত হয়েছে। সুরেশের সঙ্গে অচলার পলায়ন মহিমকে যে কী পরিমাণ ব্যথিত করেছে, তা তার বাইরের ব্যবহার দেখে বোঝার উপায় নেই। অথচ সে যে কত গভীর তা একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। শেষ পর্যন্ত মহিম যে অচলাকে ক্ষমা করতে পেরেছিল তার ইঙ্গিত উপন্যাসে আছে। এর দ্বারা মহিমের মহত্ত্বই প্রকাশিত। বাংলাসাহিত্যে মহিমের মত বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত চরিত্র খুব কমই আছে।

মহেন্দ্র (দেবদাস/১০)। ভুবনবাবুর প্রথম পক্ষের সন্তান। বয়স কুড়ি বছর। পার্বতীর স্নেহে মহেন্দ্র তাকে যথার্থ মাতারূপেই গ্রহণ করে।

মহেশ্বরী (চরিত্রহীন/৪)। মহেশ্বরী উপেন্দ্রর বড়দিদি। বছর চারেক পূর্বে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এসে সেখানকার গৃহিণীপনায় নিযুক্ত হয়েছেন। পূজা-অর্চনায় তাঁর দৃষ্টি প্রখর।

মাতঙ্গিনী (বোঝা/৮)। নলিনীদের বাপের বাড়ির দাসী। সত্যেন্দ্রর তৃতীয়বার বিবাহের সময় সে নলিনীর বাড়ি থেকে তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল।

মাধব মুখোপাধ্যায় (শুভদা/২য়)। হারান মুখুজ্জের কনিষ্ঠ পুত্র। তার বয়স আট বছর। ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহায় সে পীড়িত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল। তার পীড়া এমন কিছু কঠিন নয়। রীতিমত চিকিৎসা হলে আরোগ্য হয়ে যেত। কিন্তু পয়সার অভাবে তার চিকিৎসা না হওয়ায় বহুদিন ভোগার পর সে মারা যায়।

মাধব মুখুজ্জে (বিন্দুর ছেলে/১)। যাদবের ভাই। উকিল। আপন

ভাই না হলেও মাধব যাদবকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। বৌদিকেও সে শ্রদ্ধা করত। তাই স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর ব্যবহারের প্রতিবাদ জানাত বৌদির কাছে। কিন্তু তাই বলে মাধব যে স্ত্রীর প্রতি বিরূপ ছিল তা নয়। মাধব বিন্দুর ব্যবহারের কোন প্রতিবাদ করেনি। তাদের সংসারে বিচ্ছেদ এলেও বিন্দুকে আপনা থেকেই ভুল সংশোধনের সুযোগ দিয়েছে।

মাধবী (বড়দিদি/২য়)। ব্রজরাজের বড় কন্যা। ষোল বছর বয়সে স্বামীহারা। 'এগারো বৎসর বয়সে মাধবীর বিবাহ হইয়াছিল। তিন বৎসর সে স্বামীর কাছে ছিল।' এখানে হিসাবের একটু গোলমাল আছে : ১১+৩=১৪ বছর বয়সে স্বামীহারা হবার কথা। স্বামীর কাছে সে স্নেহভালবাসা-যত্ন সবই পেয়েছিল। স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে সে পিতৃগৃহে আসে। সেখানে মা না থাকায় সে-ই কর্ত্রী। সবাই তাকে 'বড়দিদি' বলে জানে। বড়দিদির ভালোবাসায় সবাই মুগ্ধ।

মাধুরী (অরক্ষণীয়া/৮)। অনাথনাথ ও ছোট বৌয়ের কন্যা। 'মাধুরী শিশুকাল হইতেই কলিকাতায় মামার বাড়ি থাকে। মহাকালী পাঠশালায় পড়ে। ইংরাজি, বাঙলা, সংস্কৃত শিখিয়াছে। গাহিতে, বাজাইতে, কার্পেট বুনিতেও জানে ; আবার শিব গড়িতে, স্তোত্র আওড়াইতেও পারে। দেখিতেও অতিশয় সুশ্রী।' তার সঙ্গে অতুলের বিয়ের ঠিক হয়। মাধুরীর চরিত্রের বিশেষ কোন পরিচয় দেওয়া হয়নি। জ্ঞানদার সঙ্গে সে স্বাভাবিক ব্যবহারই করেছে। অতুলকে খেতে দেবার সময় সে লজ্জাবশতঃ জ্ঞানদাকে দায়িত্ব দিয়ে পলায়ন করেছে।

মাধুরীর মামা (অরক্ষণীয়া/৯)। বোনকে নিতে এসে অতুলের সঙ্গে খেতে বসে সে জ্ঞানদার পরিচয় জানার কৌতূহল প্রকাশ করেছিল।

মানদা (পথনির্দেশ/৩)। মানদা গুণীন্দ্রের বাড়ির দাসী। সেই হেমের বাড়িতে গুণীর অসুখের সংবাদ নিয়ে গিয়েছিল।

মালতী (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব/৮)। নবীন ডোমের স্ত্রী। রূপ ও যৌবনের জৌলুস আছে। তার চরিত্রে নানারকম বদনাম শোনা যায়।

মালিনী (শেষপ্রশ্ন/১২)। আগ্রার নূতন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পত্নী।

মুক্ত (স্বামী)। দাসী। এর দ্বারাই নরেন সৌদামিনীর সঙ্গে তার শ্বশুরালয়ে যোগাযোগ করেছিল এবং তাকে বাড়ির বাইরে এনেছিল। তবে শেষপর্যন্ত সেও তার ভুল বুঝেছিল।

মৃণাল (গৃহদাহ/১৪)। সম্পর্কে মহিমের বোন। মৃণালের বাবা ছিলেন মহিমের বাবার আশ্রিত। মৃণালের মা মহিমের মা মারা যাবার পর তাকে

মানুষ করে। ছেলেবেলা থেকে মৃণাল মহিমকে সেজদা বলে ডাকে। মৃণালের বয়স কুড়ি বছর। এক বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে পলাশীর ঘোষালবাড়িতে তা। বিয়ে হয়েছে। মহিম অচলার বিয়েতে এসে সংসারের ভার গ্রহণ করে। তার আচরণে যেমন গ্রাম্যতা আছে, তেমনি আবার মিশুকে ভাবও রয়েছে। তার গ্রাম্য রসিকতাগুলি অচলা গ্রহণ করতে না পারলেও, সেগুলির মধ্যে মৃণালের স্বচ্ছ হৃদয়ের পরিচয় মেলে। মৃণাল মহিমকে কোনদিন সত্যই ভালবেসেছিল কিনা বোঝা যায় না, তবে মহিমের প্রতি তার শ্রদ্ধা যে অকৃত্রিম তা ঠিক। বিবাহের পর মৃণাল স্বামীকে বৃদ্ধ বলে রসিকতা করলেও তার প্রতি কর্তব্যে তার অবহেলা নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতিও সে কর্তব্যনিষ্ঠ। মহিম-অচলার বিচ্ছেদে মৃণাল দুঃখিত। তাই সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে তাদের মিলন ঘটাবার। শেষপর্যন্ত তার চেষ্টাতেই উভয়ের মিলনের ইঙ্গিত আছে। বৃদ্ধ কেদারবাবুকে সেবার দ্বারা জয় করা মৃণালের কৃতিত্ব। মৃণাল বাংলাসাহিত্যের এক অনবদ্য চরিত্র। এই চরিত্রের মাধুর্য ও স্নেহশীলতা বাঙালী নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য (বামুনের মেয়ে/৯)। ঘটক। সে গোলকের জন্য মেয়ের ব্যবস্থা করে ও সন্ধ্যাদের সর্বনাশের জন্য তার পিতৃকুলের কলঙ্কের সন্ধান করে। বিনিময়ে সে অর্থ পাবে।

মৈত্রেয়ী (বিপ্রদাস/২২)। মৈত্রেয়ীর সঙ্গে দ্বিজদাসের বিবাহের সম্বন্ধ-হয়। মৈত্রেয়ী হিন্দুবাড়ির আচারনিষ্ঠ কন্যা। রূপও তার আছে। স্কুল-কলেজে পড়াশোনা না করলেও অধ্যাপক পিতার কাছে সে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তাই বিপ্রদাস ও দয়াময়ী তাঁদের পরিবারের জন্য মৈত্রেয়ীকেই উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন করেছেন। দয়াময়ীর পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার সময় বৃহৎ কর্মযজ্ঞে মৈত্রেয়ী তার দায়িত্বের পরীক্ষা দিয়েছে। আবার বিপ্রদাসের সঙ্গে দয়াময়ীর ছাড়াছাড়ির সময় সে হাল ধরার চেষ্টা করেছে। মৈত্রেয়ীর প্রতি দ্বিজদাসের কোন বিরাগ ছিল না। তবুও বন্দনা ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে সে বন্দনাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে বেছে নিয়েছে।

মোক্ষদা (চরিত্রহীন/৮)। মোক্ষদা এককালে সতীশদের পশ্চিমের বাড়িতে দাসীর কাজ করত। কলকাতায় তার কাছ থেকেই সতীশ সাবিত্রীর পরিচয় সংগ্রহ করার চেষ্টা করে।

মোহিনী (বিরাজবৌ/৫)। পীতাম্বরের স্ত্রী। মোহিনী বড় জা বিরাজকে ভালবাসে, বড়ভাসুর নীলাম্বরকে পিতার মত শ্রদ্ধা করে। কিন্তু স্বামীর ভয়ে তার প্রকাশ নেই। বিরাজদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে সে যথাসাধ্য

সাহায্য করার চেষ্টা করে। স্বামীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে এবং বিরাজ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে সে কন্যার মত নীলাম্বরের সেবা করে। এই চরিত্রটি নীরবে যে আত্মত্যাগ ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে তাতে চরিত্রটি অত্যন্ত উল্লেখ-যোগ্য বলে গণ্য হবে।

যজ্ঞদত্ত মুখুজ্জে (আলো ও ছায়া/১)। শিক্ষিত যুবক। সুরমাকে যজ্ঞদত্ত আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু সুরমার আপত্তিতেই যজ্ঞ তাকে বিয়ে করতে পারেনি। সুরমার অনুরোধে যাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিল, তাকে দয়া করেছিল কিন্তু ভালবাসতে পারেনি। প্রতুলের মৃত্যুতে যজ্ঞদত্ত উপলব্ধি করল স্ত্রীকে ভালবাসা উচিত ছিল।

যজ্ঞদত্তের পিসী (আলো ও ছায়া/৫)। বর্ধমানে বাড়ি। এই পিসীর কাছেই যজ্ঞদত্ত বিয়ের পর বৌকে রেখে এসেছিল।

যজ্ঞেশ্বর (বিপ্রদাস/২)। বিপ্রদাস দ্বিজদাসের পিতা। উপন্যাসে নাম উল্লেখমাত্র আছে, উপস্থিতি নেই।

যতীন (পল্লীসমাজ/১)। রমার ভাই। সে নিতান্তই বালক। তার হয়ে দিদি রমা বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করে। যতীন রমেশের ভক্ত। রমেশের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ তার চোখে শ্রদ্ধার বস্তু।

যতীনদা (শ্রীকান্ত ১মখণ্ড/১ম পর্ব)। শ্রীকান্তের পিসতুতো ভাই। ৪র্থ শ্রেণীর পড়ুয়া।

যদু (বিরাজবৌ/২)। নীলাম্বরের বাড়ির চাকর।

যদু (গৃহদাহ/১৪)। মহিমের গ্রামের বাড়ির ভৃত্য।

যদুনাথ (মন্দির/১১)। রাজনারায়ণবাবুর বাড়ির আচার্য। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

যদুবাগদী (অরক্ষণীয়া/৩)। মেজবৌ ও জ্ঞানদাকে নিয়ে গাড়োয়ান যদু-বাগদী হরিপাল যাবার সময় স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেল।

যদু মুখুজ্জে (পল্লীসমাজ/১)। রমার বাবা। উপন্যাসে উপস্থিতি নেই।

যশোমতী (দেবদাস/১০)। ভুবনবাবুর ১ম পক্ষের কন্যা। অভিমানী। পার্বতীর সঙ্গে প্রথমে তার বনিবনা না হলেও পার্বতীর ধৈর্য ও উদারতার গুণে শেষ পর্যন্ত যশোদা তার বশীভূত হয়।

যাদব চক্রবর্তী (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব/১২)। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। শ্রীকান্তর সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। মামুদপুর গ্রামের বাসিন্দা।

যাদব মুখুজ্জে (বিন্দুর ছেলে/১)। যাদব অতিশয় শান্ত প্রকৃতির

লোক। জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবি করতেন এবং ঘরে এসে পূজার্চনা করতেন। দরিদ্র যাদব অনেক কষ্টে ছোট ভাই মাধবকে আইন পাশ করান। মাধব তাঁর সহোদর ভাই না হলেও, তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। মাধবের সঙ্গে তিনি জমিদার-কন্যা বিন্দুবাসিনীর বিবাহ দেন। বিন্দুর জন্যে দোষ ধরলেও যাদব নিজগুণে সব জানিয়ে নিজগুণে সব মানিয়ে নিতেন। সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর ছিল সহজ ঔদাসীন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংসারের সংঘাত এই যাদবকেও বিব্রত করেছে, নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

যোগেন্দ্রনাথ (বড়দিদি/৩য় পরি)—শিক্ষিত, রূপবান, সৎ, সাধুচরিত্র। মাধবীর সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। মাত্র তিন বছর সংসার-জীবন যাপন করার পর অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি মাধবীর জন্য চিন্তান্বিত ছিলেন। মাধবীকে মৃত্যুকালে তিনি উপদেশ দিয়ে যান—'মাধবী, এ-জীবন তুমি আমার সুখের জন্য সমর্পণ করিতে, সেই জীবন সকলের সুখে সমর্পণ করিও।'

রঘুবীর (গৃহদাহ/৪২)। সুরেশের প্রবাস-বাসের ভৃত্য। তাকে নিয়েই অচলা সুরেশকে খুঁজতে যায় এবং দেখে সুরেশের মৃত্যু হয়েছে।

রতণ পরামাণিক (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/৮)। পিয়ারী বাইজীর খানসামা। অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি। নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করলেও, মাঝে মাঝে তার ব্যবহার হাস্যরসের খোরাক জোগায়। রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তর জীবনের সঙ্গে রতনের যোগ অচ্ছেদ্য হয়ে পড়ে। রতন রাজলক্ষ্মীকে যেমন শ্রদ্ধাভক্তি করত, তেমনি শ্রীকান্তর জন্যও তার সহানুভূতির অন্ত ছিল না।

রমা (পল্লীসমাজ/১)। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নায়িকা বলা যেতে পারে। রমা বিধবা এবং পৈতৃক জমিদারির তত্ত্বাবধায়ক। রমেশের প্রতি তার দুর্বলতা আছে, কিছু জমিদারির শরিকী দ্বন্দ্বে সে রমেশের বিরোধিতা করতেও কুণ্ঠিত নয়। সে ক্ষেত্রে সে রমেশের বিরোধী—বেণী ঘোষালের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কিন্তু রমা রমেশের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপকে সমর্থন না করে পারে না। একদিকে সম্পত্তিরক্ষা, অন্যদিকে ভালোবাসার দ্বন্দ্বে রমা চরিত্রটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বঞ্চিত এই নারীচরিত্রের বেদনাময় দিকটি বিশ্বেশ্বরী ছাড়া সহজে কেউ অনুভব করতে পারেন নি।

রমার মাসী (পল্লীসমাজ/১)। বিধবা মাসী রমার অভিভাবিকা-স্থানীয়া। তিনি অনেক সময় রমাকে চালনা করার চেষ্টা করলেও, রমার ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রতিবাদে সমর্থ হন নি। অত্যন্ত মুখরা, নীচ মনের এই চরিত্র।

রমেশ চাটুজ্জে (নিষ্কৃতি/১)। রমেশ বৈষয়িক নয়। ব্যবসা বুদ্ধিও

তার নেই। তাই ব্যবসা করতে গিয়ে সে লোকসান দেয়। কিন্তু তার চাহিদাও অল্প। দারিদ্র্যের মধ্যেও সে অবিচল।

রমেশ ঘোষাল (পল্লীসমাজ/১)। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নায়ক। বাংলার বাইরে থেকে সে কলেজে পড়াশোনা করেছে। পিতার মৃত্যুর পর সে গ্রামে ফিরে এসে পিতার জমিদারি দেখাশোনা করতে চায়। কিন্তু প্রচলিত প্রথায় সে প্রজাদের শোষণ না করে তাদের মঙ্গল করতে চায়। গ্রামবাসীদের দলাদলি, কুসংস্কার দূর করে—শিক্ষা-দীক্ষায় তাদের উন্নতির চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রাম্য দলাদলির সে শিকার হল। তাঁর শরিক জমিদার বেণী ঘোষালের বিষয়বুদ্ধি তাকে পদে পদে বাধা দিতে লাগাল। অপর জমিদারীর শরিকের প্রতিনিধি বিধবা রমার প্রতি রমেশের দুর্বলতা রয়েছে। রমাকে সে বিশ্বাস করে, তার সৎকর্মের পাশে থাকতে চায় কিন্তু কার্যগতিকে রমা বেণী ঘোষালকেই সমর্থন করে। গ্রাম সম্বন্ধে নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয় রমেশের। তবুও সে চেষ্টা চালায় সংস্কারের। কিন্তু শেষপর্যন্ত বেণী ঘোষালের চক্রান্তে মিথ্যা মামলায় রমেশের জেল হয়। শরৎচন্দ্র রমেশের মধ্য দিয়ে গ্রামসংস্কারের একজন আদর্শ নায়ককে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। রমেশের আদর্শবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রশংসনীয়।

রসিক চক্রবর্তী (বৈকুণ্ঠের উইল/৫)। বৈকুণ্ঠবাবুদের বাড়ির বহু-দিনের কর্মচারী। বাড়ির সকলে তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

রাক্ষসী (গৃহদাহ/২৭)। রাক্ষসী তার আসল নাম নয়, ট্রেনে সে অচলাকে এই নামই বলেছিল। তার আসল নাম বীণাপাণি। আরায় তার স্বামী-শ্বশুর থাকে। সুরেশের অসুখের সময় অচলাকে এদের বাড়িতেই উঠতে হয়েছিল। এই মেয়েটির সরলতা ও অচলার প্রতি ভালবাসা লক্ষণীয়।

রাখাল পণ্ডিত (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব/৫)। অন্ত্যজ সমাজের পুরোহিত। মন্ত্রতন্ত্র না জানলেও জানার অহংকার আছে।

রাখালবাবু (চরিত্রহীন/২)। রাখালবাবু সতীশদের কোলকাতার মেসবাড়ির বাসিন্দা। সতীশ ও সাবিত্রীর ঘনিষ্ঠতায় রাখাল ঈর্ষাকাতর। সে নানারকম কুৎসা রটাবার চেষ্টা করে। সতীশের নামে রাখাল উপেন্দ্রর কাছে নানারকম গুজব সরবরাহ করে।

রাখাল ভট্টচার্য (চন্দ্রনাথ/৬)। মদ্যপ ও লম্পট। সে সরযূর মা সুলোচনাকে নিয়ে গৃহত্যাগ করে। কিন্তু তার মদ্যাসক্তি ও অর্থের আকাঙ্ক্ষার জন্য সুলোচনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়। কিন্তু রাখাল পুনরায় সুলোচনার খোঁজ পায় এবং সরযূর ঠিকানা যোগাড় করে সেখানে যায় টাকার লোভে।

মণিশঙ্করের বুদ্ধির বলে রাখাল টাকা চুরির অপরাধে জেলে যায়। শরৎচন্দ্র এই ঘৃণ্য চরিত্রটিকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন।

রাখাল মজুমদার (অনুপমার প্রেম/১)। সুরেশের বাবা। স্ত্রীর অনুরোধে তিনি পুত্রের সঙ্গে অনুপমার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন।

রাঙাদিদি (শ্রীকান্ত/২য় পর্ব ও/১৫ পর্ব)। শ্রীকান্তের জ্ঞাতিবোন। কাশী থেকে দীর্ঘদিন পরে যখন শ্রীকান্ত নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে তখন রাঙাদিদি তাঁর স্বামী-পুত্র নিয়ে সে বাড়িতে বাস করতেন। ফলে শ্রীকান্তের সেখানে আগমন ও কিছুদিন বাস করার সঙ্কল্প শুনে তাঁদের মুখ আনন্দে কালি হয়ে যায়।

রাজনারায়ণ বাবু (মন্দির/৪)। জমিদার। কন্যা অপর্ণার জন্য তাঁর স্নেহ ও চিন্তার অন্ত নেই।

রাজলক্ষ্মী (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/৮)। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মীর প্রথম আবির্ভাব পিয়ারী বাইজী রূপে। জমিদার পুত্রের শিকারের শিবিরে সে গান করতে এসেছিল। বাইজি পাটনার মেয়ে। অতিশয় সুশ্রী ও সুকণ্ঠী। শ্রীকান্তর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে শ্রীকান্ত এইটুকুই জানত। ক্রমে ক্রমে পিয়ারী বাইজীর আসল পরিচয় প্রকাশিত হল। তার আসল নাম রাজলক্ষ্মী। সে বাঙালী। রাজলক্ষ্মী ছিল শ্রীকান্তের বাল্যসহচরী। তারা দুবোন ছিল— রাজলক্ষ্মী ও সুরলক্ষ্মী। তার মা স্বামী-পরিত্যক্তা ছিলেন। তিনি দুই মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসেন। ছোটবেলায় রাজলক্ষ্মী ম্যালেরিয়ায় ভোগায় তার প্লীহায় পেটটা ধামার মত ছিল এবং হাত-পা ছিল কাঠির মত। শ্রীকান্তের মারের ভয়ে তখন সে বঁইচির বনে ঢুকে প্রত্যহ একছড়া পাকা বৈঁচির মালা গেঁথে এনে তাকে দিত। কোনদিন যদি সেই মালা ছোট হত, তবে শ্রীকান্ত তাকে পুরানো পড়া জিজ্ঞাসা করে প্রাণ ভরে চপেটাঘাত করত। মার খেয়ে লক্ষ্মী ঠোঁট কামড়ে গোঁজ হয়ে বসে থাকত। রাজলক্ষ্মীর যখন আট বছর বয়স তখন এক বামুন ঠাকুরের সঙ্গে একই রাত্রে দুবোনের বিবাহ হয়। বিয়ের দু'দিন পরে সেই ঠাকুর নিজের দেশ বাঁকুড়ায় পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর বড় বোন মারা যায় এবং ছোট মেয়েকে নিয়ে মা কাশীবাসী হন। হঠাৎ তার মামা দেশে এসে রটায় যে রাজলক্ষ্মী কাশীতে মারা গেছে।

এই রাজলক্ষ্মীর জীবনের নতুন করে যখন যবনিকা উঠল তখন সে সুন্দরী, অর্থবান। কিন্তু শ্রীকান্তকে সে ঠিকই চিনতে পেরেছিল। শ্রীকান্তের ভবঘুরে জীবনের অবসান ঘটাতে সে সচেষ্ট হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে সে নিজেকে নতুন করে শ্রীকান্তর জীবনের সঙ্গে জড়িত করে ফেলে। শ্রীকান্তর প্রতি রাজলক্ষ্মীর

ভালবাসা অকৃত্রিম। কিন্তু তার হিন্দু-সংস্কার বারবার তাকে শ্রীকান্তকে নিয়ে ঘর বাঁধতে দেয়নি। অথচ রাজলক্ষ্মীর মধ্যে সংসার বাঁধার সমস্ত গুণই বিদ্যমান। বাইজী রাজলক্ষ্মী ও প্রেমিকা রাজলক্ষ্মীর মধ্যে খুব একটা বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্র দেখাবার চেষ্টা করেননি। রাজলক্ষ্মীর পরিণাম দেখানো হয় নি।

রাজার ছেলে (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/৮)। শ্রীকান্তের সহপাঠী। গোপনে শ্রীকান্ত এর আঁক কষে দিত। পরে এন্‌ট্রান্স ক্লাস থেকে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়। এরপর ছেলেটি যখন সাবালক হয়, তখন সে পুনরায় বাল্যবন্ধু শ্রীকান্তকে এক শিকার পার্টিতে আহ্বান জানায়। এখানেই দীর্ঘদিন পরে বাঈজীরূপী রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তর দেখা হয়।

রাজেন (শেষপ্রশ্ন/১৪)। হরেন্দ্রের আশ্রমের বাসিন্দা। রাজেন্দ্রের পূর্ব ইতিহাস বিচিত্র। সে ডাক্তারি পড়ত, তার বড়লোক পিসীমা পড়ার খরচ দিত। পড়াশোনাতে সে ভাল হলেও, হঠাৎ পড়া ছেড়ে দেয়। দেশের কাজে সে নিজেকে নিযুক্ত করে। হরেন্দ্র তাকে আশ্রমের কাজে নিয়ে এলেও, সে এই কাজে নিজেকে নিযোজিত করতে পারেনি। সে একাকী দেশের দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। নারীর প্রতি রাজেনের ঔদাসীন্য। কমল এই জিনিসটি লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হয়েছে। রাজেন শেষ পর্যন্ত অন্যকে রক্ষা করতে গিয়ে আগুনে পুড়ে মারা গেছে।

রাজেন্দ্রকুমার (বিরাজবৌ/৩)। জমিদারপুত্র। লম্পট। বিরাজের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সে তাকে পাবার চেষ্টা করে। সুন্দরীর চেষ্টায় বিরাজকে সে নিয়ে পালায়। কিন্তু বিরাজ যখন তার নৌকা থেকে নদীতে ঝাঁপ দেয়, তখন তার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। সে বিরাজের আশা ত্যাগ করে।

রাণীর মা (দেনাপাওনা/৭)। কায়স্থের মেয়ে। ষোড়শীর কাজকর্ম করে। সে ষোড়শীকে ভালবাসে।

রাধা (পল্লীসমাজ/১৯)। রমার দাসী। রমেশকে ডাকার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল।

রাধারাণী (আঁধারে আলো/১)। মৃত অতুল মুখুজ্জের দরিদ্র বিধবার ১১ বছরের একমাত্র মেয়ে। সত্যেন্দ্রদের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসলে সত্যেন্দ্রের মার তাকে খুব পছন্দ হয় এবং তিনি তাকে পুত্রবধূ রূপে নির্বাচিত করান। সত্যেন্দ্র প্রথমে তাকে বিয়ে করতে রাজী না হলেও পরে তারই সঙ্গে সত্যেন্দ্রের বিয়ে হয় এবং তাদের একটি পুত্র জন্মায়। রাধারাণী

খুব উদারচেতা রমণী। তাই স্বামীর পূর্ব প্রণয়ের সব কথা শুনেও বিজলীকে নিজের ঘরে ডেকে এনেছিল এবং স্বামীর হাতে তাকে অপমানিত হতে দেয়নি।

রামকমল ভট্টাচার্য (শ্রীকান্ত ১মখণ্ড/১ম পর্ব)। আফিংখোর এক বৃদ্ধ। থেলো হুঁকোয় ধূমপান করতেন। এই গ্রন্থে তাঁর হিন্দি ও বাংলায় মেশানো বুলি পাঠককে হাসির খোরাক জোগায়—

"এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া।"

রামচন্দ্র সিংহ (শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড/১ম পর্ব)। ইনি পূর্ণিয়া জেলার জমিদার। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ তাঁর কুটুম্ব ছিল। পিয়ারীবিবির পাটনার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে শ্রীকান্তের আলাপ ঘটে। তিনি জানান পিয়ারী তাঁর পূর্ণিয়ার বাড়িতে তিন-চার বার মুজ্‌রা করে এসেছে। তিনি নিজেও পাটনায় অনেকবার গান শুনতে আসেন এবং কখনো সে দশ-বারো দিন থাকেন।

রামচরণ লাহিড়ী (গৃহদাহ/৩১)। নিষ্ঠাবান হিন্দু। প্রবাসে সুরেশ-অচলার বিপদে তিনি আশ্রয় দেন। অচলাকে তিনি কন্যার মত ভালবেসে-ছিলেন। অচলার হাতে অন্নগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরে অচলার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে তিনি মর্মাহত হন। সরলচিত্ত এই বৃদ্ধ উপন্যাসে একটি স্নিগ্ধ প্রলেপ দান করেছে।

রামটহল (দর্পচূর্ণ/৫)। ইন্দু-নরেন্দ্রের বাড়ির ভৃত্য।

রামদাস তলওয়ারকর (পথের দাবী/২)। মারাঠী ব্রাহ্মণ। দীর্ঘা-কৃতি, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ পুরুষ। পরনে পায়জামা ও লম্বা কোট, মাথায় পাগড়ি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। ইংরাজী কথাবার্তা সুন্দর, হিন্দীও জানে। অপূর্ব-দের অফিসের অ্যাকাউণ্টাণ্ট। প্রথমে অপূর্বকে নানাভাবে সাহায্য করে। তার-পর জানা যায় রামদাস বিপ্লবীদলের সদস্য। অত্যন্ত নির্ভীক, জ্বলন্ত বক্তৃতাদানে অভ্যস্ত। পুলিশের শাসনকেও সে অগ্রাহ্য করতে পারে। অপূর্বর প্রতি রাম-দাসের ভালোবাসা প্রবল ছিল।

রামদুলাল দত্ত (অনুপমার প্রেম/৩)। বিপত্নীক বৃদ্ধ। বিবাহবাসরে অনুপমার বর না আসায় তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়। তিনি শ্বশুরালয়ে শত অপমান সত্ত্বেও বাস করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

রামময় (বামুনের মেয়ে/২)। একজন মধ্যবয়সী চাষীগোছের লোক। সে সন্ধ্যার কাছে ওষুধ নিতে এসে প্রিয় মুখুজ্জের সামনে পড়ে। সন্ধ্যার ওষুধেই তার বিশ্বাস।

রামলাল (রামের সুমতি/১)। অল্পবয়সী বালক রামলালকে কেন্দ্র

করেই 'রামের সুমতি' গল্পের বিন্যাস। আড়াই বছরের শিশু রামলালকে রেখে তার বিধবা মা মারা গেলে, তার বৈমাত্র দাদা শ্যামলালের স্ত্রী নারায়ণী তাকে মানুষ করে। নারায়ণীর স্নেহে মানুষ হলেও রামলাল ছিলো অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির। তার দুর্বুদ্ধির জ্বালায় গ্রামের লোকেরা অতিষ্ঠ ও শঙ্কিত। রাম অত্যাচার যাই করুক না কেন—তার মধ্যে যুক্তি বা যথার্থতা দেখান হয়েছে। তাই রামকে দুষ্টু বলা চললেও বখাটে বলা চলে না। নারায়ণীর মা দিগম্বরীর চেষ্টায় রামলালের সঙ্গে তার দাদার বিরোধ বাধে। এই বিরোধে উঠোনে বেড়া দিয়ে সম্পত্তি ভাগাভাগি করলেও রামলাল মনে শান্তি পায় নি। শেষ পর্যন্ত নারায়ণীর উদারতায় মিলন হয়। রামলালেরও সুমতি দেখা দেয়। স্নেহের দ্বারা দুষ্টু শিশুকে কিভাবে সুপথে আনা যায় রামলাল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রামবাবু (শ্রীকান্ত ১ম/১১)। শ্রীকান্ত যখন সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের দিকে যাচ্ছিলেন তখন বাধিয়া নামে এক গ্রামে এই রামবাবু নামে বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। রামবাবু বাধিয়ায় তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং গুটি তিন-চার পুত্র কন্যা নিয়ে বাস করতেন। রামবাবুর দুই পুত্র বসন্ত-রোগাক্রান্ত হলে শ্রীকান্ত সেবা করে তাদের সারিয়ে তোলেন। পরে অন্যত্র তাঁর সঙ্গে শ্রীকান্তের দেখা হয়। কিন্তু তিনি তখন শ্রীকান্তকে চিনতে পারেননি।

রায়সাহেব (বিপ্রদাস/৪)। বন্দনার পিতা, সতীর কাঁকা। বোম্বাই-প্রবাসী। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কন্যাকে তিনি স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। রায়-সাহেব আপনভোলা, স্নেহশীল চরিত্র। সংসারের খুঁটিনাটিতে তাঁর দৃষ্টি নেই। তাই সতীর বাড়ি গিয়ে তাঁকে একা খেতে দিয়ে অপমান করা হল কিনা সে বিষযে তাঁর ধারণা নেই। খবরের কাগজের সংবাদেই তাঁর উৎসাহ। বন্দনাকে রায়সাহেব যে কত ভালবাসেন এবং তার ওপর আস্থা রাখেন তা বন্দনার স্বাধীনতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। দ্বিজদাসকে বিবাহ করার পিছনে রায়সাহেবের সমর্থন ছিল।

রাসবিহারী (দত্তা/১)। হুগলীর রাধাপুর গ্রামে কৈবর্ত পরিবারে জন্ম। অবস্থা স্বচ্ছল। বন্ধু বনমালীর জমিদারি তদারকির.কাজ করতেন। তিনিও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ছেলে বিলাসবিহারীর সঙ্গে বনমালীর কন্যা বিজয়ার বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তির মালিকানালাভ তাঁর অভিপ্রায়। রাসবিহারীর শান্ত ও ভদ্র আচরণের অন্তরালে লোভী ও ক্রুর মনটি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। পুত্র তাঁর হাতের দাবার ঘুটি মাত্র। শেষ পর্যন্ত রাসবিহারীর পরাজয়ে সকলের স্বস্তি।

রাসমণি (বামুনের মেয়ে/১)। গ্রামের বিধবা ব্রাহ্মণ রমণী। শুচিবায়ুগ্রস্তা। ব্রাহ্মণ সমাজের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার রক্ষার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধা। কিন্তু প্রতিভাশালী গোলক চাটুজ্জের অন্যায়কে তিনি সমর্থন করেন। রাসমণি বাক্‌পটীয়সী, কখনো হাসি, কখনো অশ্রুর মধ্য দিয়ে বাক্‌চাতুরীর মাধ্যমে তিনি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে অভ্যস্ত।

রাসমণি (শুভদা/২)। হারান মুখুজ্জের বড় ভগিনী। তিনি ছিলেন বিধবা। তাই ভাইয়ের সংসারেই থাকতেন।

রোজেন সাহেব (পথের দাবী/৩)। বোথা কোম্পানির অংশীদার, পূর্বাঞ্চলের ম্যানেজার। বিশেষ চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি।

লক্ষ্মণ (শ্রীকান্ত ২য়/৬ষ্ঠ পর্ব)। একজন মিস্ত্রী। সে পেটের জ্বালায় বাঙলা দেশ ছেড়ে রেঙ্গুনে এসেছিল। লক্ষ্মণ জাতিতে কায়স্থ হলেও ওর আচার আচরণ ভাল ছিল। দু-দুবার জেলে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছিল।

লক্ষ্মণ গয়লা (মেজদিদি/৮)। রাজহাটের জনৈক গয়লা। তার কাছে কেষ্ট তিন টাকা নিয়ে মেজদিদির অসুখ যাতে সারে তার জন্য বিশালাক্ষ্মী দেবীর পূজা দিতে গিয়েছিল।

লখিয়ার মা (চন্দ্রনাথ/২০)। কৈলাশচন্দ্রের বাড়ির ঝি।

লক্ষ্মী (পল্লীসমাজ/১৫)। ভৈরব আচার্যের বড় মেয়ে। সে রমাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি, রমেশের প্রতি তার দুর্বলতার ইঙ্গিত দিয়ে।

ললনা (শুভদা/২)। হারান মুখুজ্জের সপ্তদশবর্ষীয়া বড় কন্যা। ললনা বালবিধবা। সে গৃহকর্মে নিপুণা ছিল। তাকে দেখতেও খুব সুন্দর ছিল। তাই যখন সে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে যেত তখন বর্ষীয়সীরা বলাবলি করতেন, 'ঠাকুর বিধবা করবেন বলেই ছুঁড়ির এত রূপ দিয়েছিলেন।' ললনা স্বল্পভাষী, সেজন্য সমবয়স্করা তাকে পছন্দ করত না। ললনা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল।

ললিত (মেজদিদি/৮)। হেমাঙ্গিনী ও বিপিনের পুত্র। সে মাকে খুব ভালবাসত। মাও পুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ললিতও মায়ের মত নরম ছিল। তাই কেষ্টকে যখন পাঁচুগোপাল মাথায় দুটো থান ইট দিয়ে নাড়ুগোপাল করে বসিয়ে রেখেছিল তখন তার মুখ শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল।

ললিতমোহন (অনুপমার প্রেম/)। পিতার মৃত্যুর পর ললিতমোহন লেখাপড়া ছেড়ে দেয় ও অর্থের জন্য মাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। অনুপমার প্রতি তার আসক্তি ছিল। একদিন অনুপমা যখন বাড়ির বাগানে বেড়াচ্ছিল তখন সে তাদের পাঁচিলে ওঠে এবং ধরা পড়ে। অনুপমার সাক্ষ্যে

তার জেল হয়ে যায়। বিধবা অনুপম, ভ্রাতৃগৃহ থেকে লাঞ্ছিত হয়ে আত্মহত্যা করতে পুকুরে ডুব দিলে ললিতমোহন তাকে তুলে নিয়ে বাড়িতে আসে।

ললিতমোহনের মা (অনুপমার প্রেম/২)। স্বামীর মৃত্যুর পর অর্থ নিয়ে যাতে পুত্র ললিতমোহন নয়-ছয় করতে না পারে তার চেষ্টা করেছিলেন।

ললিতা (পরিণীতা/১)। পরিণীতা গল্পের নায়িকা। ল'লতা মামা গুরুচরণের বাড়িতে থাকে। মামার অভাবের সংসারে যথাসাধ্য কাজকর্ম সেবার দ্বারা শ্রী ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। পাশের বাড়ির শেখরদার সঙ্গে তার ব্যবহার অসংকোচ। সে যখন খুশী শেখরদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসে। কিন্তু সেই অন্তঃসলিলা ভালোবাসা একদিন যখন প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন ললিতা শেখরের কাছে সংকোচ বোধ করে। মামা ব্রাহ্ম হওয়ায় শেখরদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতা তাকে বেদনাহত করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত শেখরের পরিণীতা ললিতা শেখরকেই পায়।

শক্তিনাথ (মন্দির/১)। মন্দির গল্পের নায়ক। শক্তিনাথ ব্রাহ্মণপুত্র হলেও ছেলেবেলা থেকেই কুমারের কাছে চিত্রকলায় দক্ষতা লাভ করে। জমিদারের বিধবা কন্যা অপর্ণা তাকেই মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত করে। শক্তিনাথের পূজার অদক্ষতা অপর্ণা সহ্য করে। একবার শহর থেকে অপর্ণার জন্য শক্তিনাথ এসেন্স নিযে আসে। সেই উপহার দেখে অপর্ণা ক্রুদ্ধ হয়। মনোব্যথায় শক্তিনাথের মৃত্যু হয়।

শচী (চরিত্রহীন/৫)। সুরবালার অবিবাহিতা বোন। একটু খোঁড়া। তার সঙ্গে দিবাকরের বিয়ের ঠিক হয়। নাম উল্লিখিত হলেও চরিত্রটি উপন্যাসে উপস্থিত হয়নি।

শম্ভু চাটুজ্জে (অরক্ষণীয়া/৪)। জ্ঞানদার মামা। ম্যালেরিয়া রোগী। লোভী ও ক্রুর। জ্ঞানদার সঙ্গে একজন বয়স্ক ব্যক্তির বিবাহ দিয়ে কিছু অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ছিল। শেষপর্যন্ত স্ত্রীর ভয়ে পারেনি। স্ত্রীকে সে বড় ভয় করে।

শম্ভুবাবু (দর্প চূর্ণ/২)। মহাজন। এঁর কাছে নরেন্দ্রর পিতা তথা নরেন্দ্রের বেশ কিছু ঋণ ছিল। এঁর টাকা দিতে না পারার জন্য নরেন্দ্রর কয়েকদিন জেল হয়।

শম্ভুমিশির (চন্দ্রনাথ/১৪)। কৈলাশচন্দ্রের সতরঞ্জ খেলার সঙ্গী।

শশধর (বিপ্রদাস/২৩)। শশধর বিপ্রদাসের বাল্যবন্ধু। বিপ্রদাসই কল্যাণীর সঙ্গে তার বিবাহ দেয়। শশধরদের অবস্থা খুবই ভাল—জমিদারি, কারবার প্রভৃতি। তারা পাবনা অঞ্চলের বিত্তশালী ব্যক্তি কিন্তু শশধরের বিয়ের

চার বছর বাদে হঠাৎ তাদের অবস্থা-বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন কল্যাণীর দরবারে বিগলিত হয়ে বিপ্রদাস নিজ অংশের সম্পত্তির বিনিময়ে তাদের সম্পত্তি রক্ষা করে। কিন্তু এই উপকারের বিনিময়ে শশধরের কৃতঘ্নতা প্রকাশ করতেও বাধে না। তাই দয়াময়ীর পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার উৎসবে শশধর যেভাবে স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরালয় ছেড়ে চলে যাবার বায়না ধরে, তাতে তাকে কোনমতেই ভদ্রসন্তান বলা চলে না। শশধর কিন্তু জব্দ হয়েছে দ্বিজদাসের বলিষ্ঠ প্রতিরোধে। আসলে শশধর ভীরু এবং কাপুরুষ চরিত্র।

শশাঙ্কমোহন (চরিত্রহীন/১৫)। শশাঙ্কমোহন বিলাতপ্রত্যাগত। খর্বাকৃতি, গোঁফদাড়ি কামানো, গুলিভাঁটার মত শক্তসমর্থ। সরোজিনীকে বিবাহ করার জন্য শশাঙ্কমোহনের উৎসাহের অন্ত নেই, এজন্য সে বহু পরিশ্রম করেছে। শশাঙ্কমোহনের মান-অপমানবোধ নিতান্তই কম।

শশীপদ (পথের দাবী/২৪)। বেহালাবাদক। শশীপদ শিল্পী-কবি। সে শিল্পের রং দিয়েই দেশের সাধনা করবে, এই কামনা সব্যসাচীর। শশীপদ খেয়ালী, বাস্তবজ্ঞানবর্জিত, আত্মভোলা, মদ্যপ পুরুষ। কিন্তু তার অন্তঃকরণ পবিত্র। এইজন্যই তার প্রতি সব্যসাচীর ভালোবাসা প্রবল।

শান্তিদেবী (বড়দিদি/৭ম পরি)। সুরেন্দ্রের পত্নী। অত্যন্ত ভালো-মানুষ চরিত্রের এই নারী। স্বামীর প্রতি তার বিশ্বাস অবিচল।

শ্যামলাল (রামের সুমতি/১)। শ্যামলাল ঠিক শান্ত প্রকৃতির লোক ছিল না। গ্রামের জমিদারী কাছারীতে সে কাজ করত এবং নিজের জমিজমা তদারক করত। অবস্থা স্বচ্ছল। স্ত্রী নারায়ণী, বৈমাত্রেয় ভাই শ্যামলালকে নিয়ে তার সংসার। বিধবা শাশুড়ী দিগম্বরী এসেই তাদের সংসারে আলোড়ন সৃষ্টি করল। শ্যামলাল স্ত্রী নারায়ণীর দৃষ্টিতেই রামলালকে দেখে। সংসারে সাধারণ পুরুষ হিসাবে তার ভূমিকা।

শারদাচরণ (শুভদা/৯ম পর্ব)। হলুদপুর গ্রামের হরমোহন রায় নামে এক বর্ধিষ্ণু লোকের একমাত্র সন্তান। শারদা বয়সে যুবক। সে বেশ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং কর্মদক্ষ। শারদার জননী জীবিত নেই। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন হারাণ মুখুজ্জের বাড়ির সঙ্গে তাঁদের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। হারাণের ভগ্নী রাসমণি ও শারদার জননীর সঙ্গে অত্যন্ত প্রণয় ছিল। বালিকা বয়স থেকেই শারদার সঙ্গে ললনার খুব ভাব ছিল। তারপর ললনার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যে ললনা দুবছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসে। তখনও শারদার সঙ্গে ভাব ছিল। ক্রমে বাল্যকালের এই ভাব প্রণয়ে পরিণত হয়। তখন ললনা নিজেকে সরিয়ে

নেয়। পরে একবার ছোটবোন ছলনাকে বিয়ে করার জন্য সে শারদাকে অনুরোধ করে। শারদা তার সে অনুরোধ রাখেনি। অবশ্য পরে সদানন্দের সহায়তায় শারদার সঙ্গে ছলনার বিয়ে হয়।

শিবচন্দ্র (বড়দিদি/৪র্থ পরি)। ব্রজরাজের পুত্র ও মাধবীর বড়দাদা। বি. এ. পড়ে।

শিবনাথ (শেষ প্রশ্ন/২)। 'ঈষৎ শ্যামবর্ণ, কিন্তু রূপের আর অন্ত নাই। যেমন দীর্ঘ ঋজু দেহ, তেমনি সমস্ত অবয়বের নিখুঁত সুন্দর গঠন। নাক, চোখ, ভ্রূ, ললাট, অধরের বাঁকা রেখাটি পর্যন্ত—একটিমাত্র নরদেহ এমন করিয়া সুবিন্যস্ত হইলে যে কি বিস্ময়ের বস্তু হয় তাহা এই মানুষটিকে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। চাহিয়া হঠাৎ চমক লাগে। বয়স বোধকরি বত্রিশের কাছে গিয়াছে, কিন্তু প্রথমে আরও কম মনে হয়।' শিবনাথ প্রথমে আগ্রার কলেজের অধ্যাপক ছিল। কিন্তু মদ্যপানের জন্য তার চাকুরি যায়, তখন সে পাথরের ব্যবসা শুরু করে। কমলকে সে বিবাহ করেছিল রূপের জন্য। সে বিবাহ আনুষ্ঠানিক ছিল না। কিন্তু হঠাৎ কেন শিবনাথের সঙ্গে কমলের বিচ্ছেদ হল তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। মনোরমার জন্যই কি শিবনাথ কমলকে ত্যাগ করল ? মনোরমাকে শিবনাথ শেষপর্যন্ত বিবাহ করেছে। শিবনাথ সুগায়ক। তার চরিত্রে অনেকগুণ থাকা সত্ত্বেও তার চরিত্রমর্যাদা বিশেষ রক্ষিত হয়নি।

শিবপ্রসাদ (চরিত্রহীন/৪)। বাড়ির কর্তা। সরকারি চাঁকরিতে পেন্সন নিয়ে পশ্চিমের বাড়িতে এসে আছেন। সংসার অপেক্ষা পাশা খেলাতেই বেশী উৎসাহ।

শিবু গোয়ালা (পণ্ডিতমশাই/১১)। বোড়াল গ্রামের জনৈক গোয়ালা। সে বছর বোড়াল গ্রামে ওলাওঠার প্রাদুর্ভাব হয়, সে বছর শিবু ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। শিবুর মৃত্যুর পর স্বামীর গতি করে দেবার জন্য শিবুর সদ্যবিধবা স্ত্রী বৃন্দাবনের পায়ের কাছে কেঁদে পড়ে। বৃন্দাবন তার গতি করে অপরাহ্ণবেলায় ঘরে ফিরে আসে।

শিবু পণ্ডিত (শ্রীকান্ত ৩য় খণ্ড/৫) অন্ত্যজ সমাজের পুরোহিত। শাস্ত্র-জ্ঞানের অহঙ্কার আছে।

শ্রীকান্ত (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/১)। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নায়ক ও উপন্যাসটির কথক। পাড়াগাঁয়ের ছেলে শ্রীকান্ত পরের বাড়িতে থেকে মানুষ। বাল্যকাল থেকেই তাকে ঘোরার নেশা পেয়ে বসে। তার ভবঘুরে জীবনের ইতিহাস যেমন বিচিত্র তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। শ্রীকান্তর মধ্যে একটি নির্লিপ্ততা আছে, সন্ন্যাসী পুরুষ আছে। তাই রাজলক্ষ্মীর প্রেম, কমললতার

আকর্ষণ কোনটাকেই সে স্থায়িভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই বলে শ্রীকান্ত হৃদয়হীন নয়। সমগ্র উপন্যাসে তার দরদী মনের বহু পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে।

শ্রীকান্তের মার গঙ্গাজল (শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড/১ম পর্ব)। শ্রীকান্তদের দেশে এঁর বাড়ি ছিল, শ্রীকান্তের মা তাঁর গঙ্গাজলকে কথা দিয়েছিলেন যে, তাঁর গঙ্গাজল-দুহিতার বিয়ের সমস্ত দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করবেন এবং তার সুপাত্র যদি না জোটে নিজের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। মায়ের মৃত্যুর দীর্ঘদিন বাদে শ্রীকান্তের মার গঙ্গাজল শ্রীকান্তকে তার মায়ের লেখা চিঠি পাঠায়। পিয়ারী বিবির সাহায্যে শ্রীকান্ত সেই কন্যাটির বিবাহ দেয়।

শ্রীনাথ বহুরূপী (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/৫ম পর্ব)। তার পরিচয় লেখকের ভাষায় —"বাড়ি বারাসতে। সে প্রতিবৎসর বর্ষাকালে একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে।" সে নিজের নাম ভাল করে উচ্চারণ করতে পারতো না। বলত—ছিনাথ বউরূপী।

শুভদা (শুভদা/২)। হলুদপুর গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ হারাণ মুখুজ্জের স্ত্রী। সে দেখতে যেমন সুশ্রী ছিল, তার স্বভাবটিও ছিল তেমনি সুন্দর। তাই গ্রামের সকলেই তাকে ভালবাসতো। শুভদার সহনশক্তি ছিল অসাধারণ। তাই বিনা প্রতিবাদে সাংসারিক অভাব অনটন সে সহ্য করেছে। তার পতিভক্তি তো ছিল অসাধারণ। সে দিনের পর দিন নিজে অনাহারে থেকে নেশাখোর স্বামীর জন্য ভাতের থালা সাজিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করেছে।

শেখর (পরিণীতা/১)। 'পরিণীতা' উপন্যাসের নায়ক। শিক্ষিত যুবক। চাকুরিজীবী। শৌখীন, স্বাস্থ্যবান, সুরূপ। পাশের বাড়ির ললিতাকে সে স্বাভাবিকভাবেই দেখত, তার আব্দার সহ্য করত। সে জানতেও পারেনি এই বাহ্যিক সহজ সম্পর্কের ভিতরে একটি প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাই ললিতার হঠাৎ মালা পরিয়ে দেবার প্রত্যুত্তর দিতে শেখর দ্বিধা করেনি। কিন্তু ললিতার মামার ব্রাহ্ম হয়ে যাবার ঘটনায় যে সামাজিক বাধা দেখা দেয় শেখর সহজে তা ভাঙতে পারেনি। কিন্তু তার জন্য ললিতার ত্যাগের কথা জানতে পেরে শেখর মাকে তার দৃঢ় মতামত জ্ঞাপন করেছে।

শৈলজা (নিষ্কৃতি/১)। রমেশের স্ত্রী। একান্নবর্তী পরিবারে সংসারের হাল অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ধারণ করেছে। তার শাসনে ছেলেপুলেরা ঠিক থাকে। অথচ তাকে ভয়ের সঙ্গে তারা ভালোও বাসে। শৈলজা স্বামীর নিন্দা সহ্য করতে পারে না। ভাসুরের কোলকাতার বাসা থেকে গ্রামে এসে সে একে একে নিজের গহনা দিয়ে মামলার খরচ জুগিয়েছে। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্র।

শৈলেশ্বর ঘোষাল (নববিধান/১)। 'নববিধান' উপন্যাসের নায়ক। কলকাতার একটি নামজাদা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক। বয়স বত্রিশ। বেতন আটশত। সম্প্রতি একটি পুত্র রেখে স্ত্রী মারা যায়। শৈলেশ্বরের বাবা প্রথমবার যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন, তাকে ঘরে নেননি। দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যুর পর শৈলেশ্বর প্রথমা স্ত্রী ঊষাকে নিয়ে এলেন সংসারে। শৈলেশ্বর সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত। খরচে কুলায় না। কিন্তু ঊষা দুদিনেই সব সামঞ্জস্য সাধন করেন। শৈলেশ্বরও তার গৃহিণীপনায় মুগ্ধ হল। হৃদয়ে নূতন করে ভালোবাসার সঞ্চার হল। কিন্তু বোন বিভার জন্য স্ত্রীর সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝি হল। ঊষা পুনরায় বাপের বাড়ি গেল। শৈলেশ্বর শেষ পর্যন্ত ধর্ম নিয়ে মাতল। পুনরায় ঊষার আবির্ভাবে শান্তি এল। আত্মভোলা দর্শনের অধ্যাপকরূপে বেশ মানিয়েছে।

ষষ্ঠীচরণ (বামুনের মেয়ে/৫)। গ্রামবাসী। বৃদ্ধ। তারা সাঁকো তৈরীর জন্য প্রিয়নাথের কাছে বাঁশ চাইতে এসেছিল।

ষষ্ঠীচরণ (পণ্ডিতমশাই/১১)। বোড়ালগ্রামের দরিদ্রচাষী শিবুর বড়পুত্র।

ষোড়শী (দেনাপাওনা/২)। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নায়িকা। সে চণ্ডীর ভৈরবী। ভৈববীদেব ছেলেবেলায় বিবাহ হলেও স্বামীর ঘর করার অধিকার তাদের নেই। তবে ষোড়শীর পূর্ববর্তী ভৈরবীদের যে ধরনের চারিত্রিক দুর্বলতা ছিল, তার তা নেই। ফলে তার মধ্যে একটি দৃঢ়তা ছিল। উপন্যাসে ষোড়শী যখন উপস্থিত হয়েছে, তখন তার বয়স হয়েছে। তার উপবাসকঠিন দেহ নিপীড়িত যৌবনের রুক্ষতা তার রূপকে একটি আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব দান করেছে।

কিন্তু ষোড়শী একদিন অলকা ছিল। তার সঙ্গে জীবানন্দের বিয়ে হয়েছিল, তা সে দীর্ঘদিন পরেও ভোলেনি। তাই রাগের বশে জমিদারের কাছে প্রতিবাদ জানাতে এসে হঠকারিতা করলেও, জীবানন্দের রোগক্লিষ্ট মুখ দেখে তাকে ধিক্কার দেবার বদলে যে সেবা করেছে এবং পুলিশে ধরিয়ে দেয়নি —তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ জীবানন্দকে দেখেই সে চিনতে পেরেছিল। নারীর চিরন্তন সংস্কারবশেই সে জীবানন্দের প্রতি এই দুর্বলতাটুকু প্রকাশ করে ফেলেছে। কিন্তু এই দুর্বলতা জয় করতে তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে, সমাজের সঙ্গে—পিতা তারাদাসের সঙ্গে। এই সংঘাতের মধ্য দিয়েই ষোড়শী চরিত্রের উজ্জ্বলতা প্রকাশিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত ষোড়শীকে জীবানন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। এর দ্বারা ত্যাগ অপেক্ষা গার্হস্থ্যধর্মের জয় দেখানো হয়েছে। এ যেন আর এক 'দেবী চৌধুরাণী'।

সতী (বিপ্রদাস/৩)। বিপ্রদাসের স্ত্রী। সতী বড়লোকের মেয়ে, সাহেবী-

য়ানায় মানুষ হলেও আচারনিষ্ঠ বিপ্রদাসের গৃহে যথার্থ মানিয়ে নিয়েছে। দেবর দ্বিজদাসকে সতী যথার্থ স্নেহ করে, তার আবদার রক্ষা করে। সতীকে বিপ্রদাসের ছায়ারূপে অঙ্কন করা হয়েছে। সতীর চরিত্রে যে ত্যাগ-নিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্ব ছিল তাকে যথার্থভাবে প্রকাশের চেষ্টা করা হয় নি। দ্বিজদাসের দৃষ্টিতেই সতীকে যথার্থ মূল্য দেওয়া হয়েছে।

সতীশ (চরিত্রহীন/১)। সতীশ চরিত্রহীন উপন্যাসের অন্যতম নায়ক। সতীশের আর্থিক অবস্থা ভাল। শরীরচর্চা থেকে আরম্ভ করে সামাজিক কাজকর্মে তার যত বেশি উৎসাহ, লেখাপড়ায় তত নয়। এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করতে না পেরে সে এবার ঠিক করেছে হোমিওপ্যাথি পড়ে গরিব দেশবাসীর সেবা করবে। সতীশ উপেন্দ্রর যথার্থ শিষ্য। উপেন্দ্রকে সে অগ্রজের মত শ্রদ্ধা করে।

কলকাতায় হোমিওপ্যাথি স্কুলে পড়তে এসে সতীশের পরিচয় হল মেসের ঝি সাবিত্রীর সঙ্গে। সাবিত্রী ঝি হলেও নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মেয়ে নয়। তার ব্যক্তিত্ব আছে—তাই সতীশ তার প্রতি আকৃষ্ট হল। সাবিত্রীর প্রতি সতীশের ভালোবাসা যে ক্ষণিক রূপজ মোহ নয় তার প্রমাণ সে দিয়েছে শেষপর্যন্ত। সাবিত্রীর জন্য তার অপেক্ষার অন্ত নেই। সতীশ কিরণময়ীর মনোবেদনা বুঝেছিল, বুঝেছিল উপেন্দ্ররও মনোভাব। দিবাকরকেও সে ভুল বোঝেনি। তার চেষ্টাতেই সে সকলকে পুনরায় একত্র করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

'গৃহদাহে'র সুরেশের সঙ্গে সতীশ চরিত্রটির অনেক মিল আছে।

সতীশ (শেষপ্রশ্ন/১৪)। হরেন্দ্রর আশ্রমের পরিচালক। তার শাসন অত্যন্ত কঠোর। হরেন্দ্র নীলিমা বৌদিকে বাসায় এনে তুললে সতীশ আশ্রম ত্যাগ ক'রে চলে যায়।

সতীশ (মেজদা) (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/১ম পর্ব) এই গ্রন্থের একটি হাস্যকর চরিত্র, তাঁর নাম সতে অর্থাৎ সতীশ। লেখকের ভাষায়—"গম্ভীর প্রকৃতির মেজদা বার দুই এনট্রান্স ফেল করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয় বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।" এই চরিত্রটি বাইরে আস্ফালন দেখালেও আসলে খুব ভীরু।

সতীশ ভরদ্বাজ (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব/১০)। রেলের কুলি লাইনে কাজ করতে আসার সময় শ্রীকান্তের সঙ্গে দেখা হয়। পরনে ছিন্ন মলিন পোশাক। বাল্যকালে স্কুলের বন্ধু, নাম ছিল ব্যাঙ। সতীশ অসুস্থ হয়ে পড়লে শ্রীকান্ত তার সেবা করে, কিন্তু বাঁচাতে পারেনি।

সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র (বোঝা/১)। ছাত্রাবস্থায় সত্যেন্দ্রর সঙ্গে সরলার বিবাহ হয়। বালিকা বধূকে সে যথার্থ ভালবেসেছিল। কিন্তু সরলার অকাল মৃত্যু তাকে আঘাত হানে। তখন সে নলিনীকে বিবাহ করে। কিন্তু সরলার স্মৃতি তাকে নলিনীর প্রতি বিরূপ করে তোলে। সত্যেন্দ্র নলিনীকে ত্যাগ করে পুনরায় বিবাহ করে। শিক্ষিত সত্যেন্দ্রর এ জাতীয় আচরণ বিস্মিত করে।

সত্যেন্দ্র চৌধুরী (আঁধারে আলো/১) জমিদারের ছেলে। বি.এ. পাশ। সে বিধবার একমাত্র সন্তান। বাবা মারা যাবার পর থেকে তার মা নায়েব গোমস্তার সাহায্যে মস্ত জমিদারি শাসন করতেন। ছেলে কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ত, বিষয়-আশয়ের কোন সংবাদই রাখত না। সত্যেনের মা মনে মনে ভেবেছিলেন ছেলে ওকালতি পাশ করলে তার বিয়ে দেবেন এবং পুত্র-পুত্রবধূর হাতে জমিদারী এবং সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু অন্যরূপ ঘটে গেল। তাঁর এক ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে গ্রামের অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়েছিল। গ্রামের মৃত অতুল মুখুয্যের দরিদ্র বিধবা ১১ বছরের মেয়েকে নিয়ে নিমন্ত্রণ রাখতে এলেন। মেয়েটিকে তাঁর খুব মনে ধরলো। তাই ছেলে বি.এ. পাশ করে বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাকে বিয়ে করার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে সে-অনুরোধ না রেখে এম.এ. পাশ করতে কোলকাতায় এলো। সেখানে বিজলী নামে এক বাঈজীকে দেখে সে মুগ্ধ হয়। কিন্তু বাইজীর কাছ থেকে অপমানিত হয়ে সে নিজের ভুল শুধরে নেয়। এরপর দেশে ফিরে গিয়ে সে মায়ের মনোনীত পাত্রী রাধারানীকে বিয়ে করে। তার একটি পুত্র জন্মায়। সেই পুত্রের মুখেভাতে বিজলী গান গাইবার জন্য আসে। সত্যেন্দ্র মনে করেছিল বিজলীকে অপমান করে সে পূর্বের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। কিন্তু রাধারানীর জন্য তা সম্ভব হয় না।

সত্যেন্দ্রর জননী (বোঝা/৩)। স্নেহশীলা এই চরিত্রটি শেষপর্যন্ত পুত্রের দ্বিতীয়া পত্নী নলিনীকে বিদায় সরলমনে গ্রহণ করতে পারেনি।

সদানন্দ চক্রবর্তী (শুভদা/৬ পর্ব)। হলুদপুর গ্রামের অর্ধেক লোক তাকে 'সদাদাদা' বলে ডাকত, অর্ধেক লোক 'সদাপাগলা' বলে ডাকত। সে লেখাপড়া শেখেনি। জমি দেখে, রামপ্রসাদী গান গায়, মড়া পোড়ায়, এবাড়ি ওবাড়ি করে, এমনি করে মনের আনন্দে দিন কাটায়। দূর সম্পর্কের এক পিসি ভিন্ন আপনার বলতে তার আর কেউ নেই। তার গ্রামের সকলেই তার আত্মীয়, সকল স্থানেই তার অবারিত দ্বার। সদানন্দ মনে মনে হারান মুখুজ্জের বড় কন্যা ললনাকে ভালবাসত। তার জন্যই ছলনার শারদাচরণ

রায়ের মত ধনীর সন্তানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। সদানন্দ শুভদাকে মায়ের মত মনে করত। শুভদার চরম বিপদের দিনে সে শুভদার একমাত্র অবলম্বন ছিল।

সদানন্দের পিসিমা (শুভদা/৬ষ্ঠ পর্ব)। হলুদগ্রামের এক নিঃসন্তান বিধবা। পিসিমার আপনার বলতে ভাইপো সদানন্দ ছাড়া আর কেউ ছিল না। এই পিসিমার কাছ থেকে হারান মুখুজ্জের বড় মেয়ে ললনা মাঝে মাঝে টাকা ধার নিয়ে যেত। পিসিমা ভাইপোর সঙ্গে কাশীতে বিশ্বেশ্বর দেখতে এসে সেখানেই মারা যান।

সনাতন হাজরা (পল্লীসমাজ/১৬)। বৃদ্ধ গ্রাম্য চাষী। রমেশের জেল হবার পর মুসলমান প্রজারা বেণীর উপর কিরকম ক্রুদ্ধ হয়েছে সেকথা সে অসঙ্কোচে বেণীর কাছে ব্যক্ত করেছে। বেণীব প্ররোচনা উপেক্ষা করে সে রমেশের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রেখেছে।

সন্তোষকুমার (বড়দিদি/৮ম পরি) মাধবীর ভাগিনেয়। তাকে নিয়েই সে শ্বশুরগৃহে বাস করতে থাকে।

সন্ধ্যা (বামুনের মেয়ে/১)। গ্রামের মেয়ে হলেও সন্ধ্যা কিছু লেখাপড়া শিখেছে। পিতার কাছে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় দীক্ষা নিয়ে সে রোগ আরোগ্য করতে পারে। চিকিৎসা-বাতিকগ্রস্ত পিতার প্রতি সন্ধ্যার প্রগাঢ় ভালবাসা। বিলেতফেরত অরুণকে সন্ধ্যা ভালবাসলেও, সমাজের ভয়ে তাকে বিয়ে করার সম্মতি দিতে পারেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজের কাছ থেকে আঘাত খেয়ে তার সব ভুল ভেঙে গেছে। কিন্তু তখন সে অরুণেব কাছে ফিরে না গিয়ে বাবার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে। বিয়ে না করেও মেয়েরা জীবন যাপন করতে পারে কিনা এটা সে দেখতে চায়।

সব্যসাচী মল্লিক (পথের দাবী/৬)। সব্যসাচী নামেই পরিচিত। উপন্যাসে গিরিশ মহাপাত্র রূপেই তার প্রথম আবির্ভাব (দ্র. গিরীশ মহাপাত্র) ডাক্তার বলেও তাকে উল্লেখ করা হয়েছে। 'সব্যসাচী' নামটি নাকি ছেলেবেলায় মাস্টার মশাইয়ের দেওয়া, কারণ সে দু হাতে ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়তে পারত। কিন্তু বিপ্লবী জীবনে এই সব্যসাচী নামটি সার্থক। সে বহুমুখী প্রতিভাধর। তার রোগা দেহে অসীম শক্তি, সরু হাতে বজ্রদৃঢ় কঠোরতা, চোখে গভীর দৃষ্টি। নির্ভীকচিত্ত এই পুরুষটি জানে না এমন কাজ নেই—নৌকা চালাতে দক্ষ, ছদ্মবেশ গ্রহণে নিপুণ, লোকচরিত্রনিরূপণে নির্ভুল, সংগঠনক্ষমতায় অসামান্য।

সব্যসাচীর রাজনৈতিক চেতনা সন্ত্রসবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার ধারণা বিপ্লবের রক্তাক্ত পথ দিয়েই যথার্থ দেশের কল্যাণ আসবে। এর জন্য আপাতত

যে প্রাণ বিনষ্ট হবে তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিপ্লবী হলেও সব্যসাচী যে নিষ্ঠুর নয়, তার প্রমাণ সে বরাবর দিয়েছে। অপূর্ব, ভারতী ও শশীপদর প্রতি তার সহানুভূতি কোমল হৃদয়েরই পরিচয় বহন করে। কিন্তু নিজের প্রতি সে কঠোর নির্মম। তাই সুমিত্রার প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হয় সব্যসাচীকে। সব্যসাচী বাংলা সাহিত্যে এক অসামান্য বিপ্লবী চরিত্র, বাস্তবে না হোক কল্পনার এক উজ্জ্বল নায়ক।

সর্বেশ্বর শিরোমণি (দেনাপাওনা/৭)। গ্রাম্য ব্রাহ্মণ। সমাজের নেতৃস্থানীয়। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৌশল অবলম্বনে পিছপা নন। তিনি যোড়শীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।

সরযূ (চন্দ্রনাথ/২)। দরিদ্রকন্যা হয়েও সরযূর বিবাহ হল ধনী চন্দ্রনাথের সঙ্গে। স্বামীর ভালোবাসা সত্ত্বেও তার সংকোচ কাটেনি। কিন্তু স্বামীকে সে দেবতার মত ভক্তি করে। স্বামীর সেবা করে। ছেলেমানুষ বা সরলা হলেও সে যে দৃঢ় চরিত্রের নারী তার প্রমাণ মেলে হরকালীর ব্যবহারের উপর তার নীরব প্রতিবাদে। মাতার কলঙ্কের দায়ে যখন তাকে গৃহত্যাগ করতে হল, তখনই যথার্থ সরযূ-চরিত্র পরিস্ফুট হল। দুঃখের আঘাতে সে সন্তানকে নিয়ে জীবন নির্বাহ করতে ব্রতী হল। পুনরায় চন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সাক্ষাতের সময় সরযূ অনেক সহজ স্বাভাবিক।

সরলা (বোঝা/১)। সত্যেন্দ্রর প্রথম পত্নী। বালিকা বয়সে তার বিবাহ হয়। সে স্বামীকে যথার্থ ভালবেসেছিল। বিসূচিকা রোগে তার অকাল-মৃত্যু হয়।

সরলা (শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড/১৪ অধ্যায়)। একটি দরিদ্র প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোকের রুগ্না কন্যা রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি। তবে একদিন তার বাবা যখন অফিস সেরে রুগ্না মেয়ের আবদারমত দু আনা দিয়ে মাটির পাখি কিনে ট্রেন ধরার জন্য ছুটছিলেন তখন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগে এবং পাখিটি ভেঙে যায়। তখন তার বাবা মেয়েকে দেখাবেন বলে ভাঙা টুকরোগুলো তুলছিলেন। তখন তা দেখে রাজলক্ষ্মীর দু চোখ অশ্রুজলে ভেসে যায়। পরে রাজলক্ষ্মীর আমন্ত্রণে একই কামরায় ভদ্রলোক যান। নামার আগে রাজলক্ষ্মী সরলাকে একটি দামী শাড়ি উপহার দেয়।

সরোজিনী (চরিত্রহীন/১৩)। সরোজিনী আধুনিক শিক্ষিতা মহিলা। সতীশকে দেখে তার ভাল লাগে, এবং সতীশের প্রতি তার ভালবাসা প্রবল হয়। এমনকি সতীশ হিন্দুয়ানা পছন্দ করত বলে সরোজিনী হিন্দু আচার-আচরণও পালন করতে থাকে।

স্বর্ণমঞ্জরী (অরক্ষণীয়া/২)। স্বামী গোলকনাথের মৃত্যুর পর তিনি কনিষ্ঠ দেবর অনাথনাথকে আশ্রয় করেন। তাঁর প্রতাপে জ্ঞানদাদের বিব্রত হতে হয়।

সাগর (দেনাপাওনা/১২)। ডাকাত। কিন্তু ষোড়শীকে সে ভালবাসে। ষোড়শীর জন্য প্রাণও দিতে পারে।

সাধুজী (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/১১ পর্ব)। ইনি গৃহত্যাগী, মুক্তিপথান্বেষী। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে ছিল গোটাদুই উট, গোটাদুই টাট্টু, একটি সবৎসা গাভী এবং গোটাদুই শিষ্য। পাটনার কাছেই গাড় গ্রামে এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে শ্রীকান্তের দেখা হয় এবং শ্রীকান্ত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

সাপুড়ে শাহজী (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/৪র্থ পর্ব) 'সে বাড়িতে বাড়িতে সাপ খেলা দেখাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহার মাথায় জটা, দীর্ঘকায় পাতলা গোছের লোক। গলায় বিবিধ প্রকারের ছোট বড় মালা। পরনের কাপড় ও জামা হলদে রঙে ছাপানো।' সে হিন্দুস্থানী। মুসলমান।

সাবিত্রী (চরিত্রহীন/২)। সাবিত্রী সতীশদের কোলকাতার মেসের ঝি। 'একহারা অতি সুশ্রী গঠন। বয়স বোধ করি একুশ-বাইশের কাছাকাছি, কিন্তু মুখ দেখিয়া যেন আরও কম বলিয়া মনে হয়। সাবিত্রী ফরসা কাপড় পরিত এবং ঠোঁট দুটি পান ও দোক্তার রসে দিবারাত্রি রাঙা করিয়া রাখিত।' ঝি হলেও সাবিত্রী ভদ্রকন্যা। তার আচার ব্যবহার ও শিক্ষা ভদ্রোচিত। সতীশের প্রতি তার যত্নের একটু আতিশয্য ছিল। সেই যত্নকে সতীশ ভালোবাসা বলে ভুল করলে। সাবিত্রী প্রথমে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সতীশের প্রতি তার ভালোবাসার ভাব গোপন করতে পারেনি। সাবিত্রী কিন্তু শেষপর্যন্ত সতীশের ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিয়ে বিবাহ করতে পারেনি। দুঃখের অশ্রুজলে নিষিক্ত হয়ে তার ভালোবাসার হোমশিখাটিকে পবিত্র ক'রে তুলেছে।

সুরেন্দ্রনাথ রায় (বড়দিদি/১ম পরি)। বড়দিদি গল্পের প্রধান চরিত্র। এম. এ. পাশ।

সুরেন্দ্রনাথের পিতা (বড়দিদি/১ম পরি)। তিনি সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতি করতেন। তাঁকে রায় মহাশয় ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথের বিমাতা (বড়দিদি/১ম পরি)। বিমাতা হলেও তাঁর সুরেন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট স্নেহদুর্বলতা ছিল। তাঁর আন্তরিক যত্নেই সুরেন্দ্রনাথ আত্মনির্ভরশীল হতে পারে নি।

সুরেশ (গৃহদাহ/১)। পুরানাম সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেশ

মহিমের বন্ধু। বড়লোক। বাড়িতে পিসীমা ছাড়া আর কেউ নেই। ডাক্তারি পাশ করেছে। সুস্থ-সবল সুরেশ পরোপকারে সিদ্ধহস্ত। বন্ধু মহিমকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে। মহিমের আর্থিক অনটন দূর করবার জন্য তার চেষ্টার অন্ত নেই, কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সুরেশের চরিত্রে উচ্ছ্বাস প্রবল। কোন একটি জিনিসকে বিশ্বাস করলে তার জন্য সে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। সুরেশ হিন্দুধর্মের গোঁড়া সমর্থক ছিল। তাই মহিমের ব্রাহ্মবাড়িতে যাতায়াত সে পছন্দ করত না। কিন্তু সেই বাড়িতেই অচলাকে দেখে সুরেশের উচ্ছ্বাস-প্রবলভাবে অচলার দিকে ধাবিত হল। সুরেশ অচলাকে ভালবেসেছিল। সে ভালবাসা সার্থক হত যদি উভয়ের বিবাহ হত। কিন্তু একদিকে বন্ধু মহিম, অন্যদিকে অচলা—সুরেশকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। যদিও সেই মানসিক আলোড়ন তার দেখানো হয়নি, বাইরের অস্থিরতাই তাকে স্থির সিদ্ধান্তের বিপক্ষে নিয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত অচলা মহিমের বিবাহকে সুরেশ সহজ মনেই গ্রহণ করে-ছিল। কিন্তু মহিমের গ্রামে গিয়ে অচলার অবহেলা সে সহ্য করতে পারেনি। পরোপকারের উদগ্র কামনা থেকেই সুরেশ অচলার ভাল করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে যে তার যথার্থ ভাল করা যায় না, এ তথ্য সুরেশ জানতে পেরেছে অনেক পরে। তখন তাকে প্রাণ দিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। সুরেশের সব অপরাধের মধ্যেও তাকে ক্ষমা করা যায় তার শিশুসুলভ-উচ্ছ্বাসপ্রবণ চরিত্রের জন্য।

সুরেশের পিসীমা (গৃহদাহ/১৩)। স্নেহশীলা প্রৌঢ়া বিধবা। তিনি সুরেশের বাড়ির গৃহিণী। মহিমকেও তিনি সুরেশের মত ভালবাসেন। ব্রাহ্মকন্যা অচলাকে আহ্বানের মধ্যে তাঁর স্নেহকোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের আচার-আচরণের মধ্যে তিনি যে সার্থকতা খুঁজে পান তা তাঁর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত।

সুলোচনা (চন্দ্রনাথ/১)। সরযূর মা নবদ্বীপের কাছে কোন এক গ্রামে বাড়ি ছিল। বিধবা হবার পর ছোট মেয়ে সরযূকে নিয়ে রাখাল নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। পরে রাখালের দুর্ব্যবহারে তাকেও ত্যাগ করে। মেয়েকে নিয়ে রাঁধুনির কাজ করে হরিদয়াল পাণ্ডার গৃহে আশ্রয় নেয়। মেয়ের বিয়ে চন্দ্রনাথের সঙ্গে হলেও সে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি, পাছে মেয়েকে তার বদনামের ভাগী হতে হয়। কিন্তু যখন রাখাল তার সন্ধান পায় তখন সে হরিদয়ালের গৃহ ত্যাগ করে। তারপর আর তার কোন উল্লেখ নেই। পদস্খলন হলেও তাঁকে অসচ্চরিত্রা রূপে অঙ্কন করা হয়নি।

সুলোচনা (পথনির্দেশ/১)। এক মাঝারি গৃহস্থ পরিবারের বধূ।

তাঁর স্বামীর নাম পতিতপাবন ও কন্যার নাম হেমনলিনী। স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজন কেউ না থাকায় তিনি তাঁর আম-কাঁঠালের বাগান যা অবশিষ্ট ছিল তা পাড়ার লোকের সাহায্যে একশো টাকায় বিক্রি করে স্বামীর শেষ কাজ সমাধা করে তাঁর পালিত পুত্র গুণেন্দ্রর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুণেন্দ্র তাঁকে জননীর আদর দিয়ে গৃহে গ্রহণ করেন। কিন্তু সুলোচনা যখন শোনেন যে, গুণেন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছে তখন থেকে তিনি গুণেন্দ্রের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করেন। তিনি জানতেন যে, গুণীকে হেমনলিনী ভালবাসে। তথাপি তিনি যোগ্য পাত্র জেনেও গুণী ব্রাহ্ম বলে তাঁর সঙ্গে কন্যার বিয়ে না দিয়ে অন্য জায়গায় কন্যার বিয়ে দেন। কিন্তু এক বছর পরে হেমাঙ্গিনী যখন বিধবা হয়ে ফিরে আসে তখন সুশীলা নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তাই মৃত্যুকালে তিনি কন্যাকে বলেন—"আমার গুণীর যে মুখ আমি চোখে দেখেছি—পাষাণেরও বোধকরি তাতে দয়া হত কিন্তু আমার হয়নি, অথচ সে আমাদের কি না করেছে।"

সুশীলা (বোঝা/২)। সরলার দিদি। তার ছেলের অন্নপ্রাশনে গিয়ে সরলা অসুস্থ হয়ে মারা যায়।

সরযূ (শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড/৮)। রাজকুমারের শিকারদলের প্রিয় পার্শ্বচর।

সেখ মতিলাল (পল্লীসমাজ/১৯)। গ্রামবাসী। রমেশের কাছে নিজেদের বিচারের নিষ্পত্তি করতে এসেছিল।

সোমেন্দ্র (নববিধান/৩)। শৈলেশের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। মা-বাবার সাহেবিয়ানায় সে মানুষ হলেও যথার্থ ভালবাসা পায়নি। তাই ঊষার স্নেহে তার পরিবর্তন ঘটে। সে এই নতুন মাকে ভালবাসে।

সৌদামিনী বা **সদু** (বামুনের মেয়ে/৮)। দাসী। সে জ্ঞানদার শ্বশুরের সঙ্গে এসেছিল জ্ঞানদাকে গোলোক চাটুজ্জের বাড়ি থেকে নিয়ে যাবার জন্য। জ্ঞানদা না যেতে চাওয়ায় তাকে দুকথা শোনাতে সে কসুর করেনি।

সৌদামিনী (স্বামী)। 'স্বামী' গল্পের নায়িকা। তার মুখ দিয়েই এই উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সৌদামিনী বিবাহের পূর্বে নরেনকে ভালবেসেছিল। কিন্তু নরেনের সঙ্গে বিবাহ না হয়ে হল ঘনশ্যাম নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে। সৌদামিনী স্বাভাবিক বিতৃষ্ণায় প্রথমে স্বামীকে সুনজরে দেখতে পারেনি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন সে দেখল তার স্বামীকে সংসারের সকলে অবহেলা করে, অথচ ঘনশ্যাম নির্বিবাদে তা মেনে নেয়, তখন তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এই সহানুভূতি থেকে ক্রমে ভালবাসার সঞ্চার হল। সেই সময় নরেন্দ্রর চেষ্টায় ঘটনাচক্রে সৌদামিনী স্বামীগৃহ

ত্যাগ করে যায়। কিন্তু সে তার ভুল বুঝতে পারে। স্বামীর উদারতায় সৌদামিনী স্বামী-গৃহে ঠাঁই পায়। অপরাধ সত্ত্বেও সৌদামিনীর চরিত্রমাধুর্য অক্ষুণ্ণ।

সৌদামিনীর শাশুড়ী (স্বামী)। ঘনশ্যামের সৎমা। ঘনশ্যামের টাকায় নিজের ছেলেমেয়েদের ভালমন্দ খাওয়াতে তার বাধে না। সৌদামিনীকে সে ভাল চোখে দেখেনি। ছেলের ঘরে আড়ি পাততেও তার দ্বিধা নেই। অত্যন্ত নীচ ধরনের চরিত্র।

হরকালী (চন্দ্রনাথ/১)। চন্দ্রনাথের মামী। ব্রজকিশোরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। অত্যন্ত চতুরা ও নীচ। তিনি কৌশলে চন্দ্রনাথের সম্পত্তি হস্তগত করার ষড়যন্ত্র করেন।

হরদেব মিত্র (বোঝা/১)। সাগরপুরের জমিদার। তিনি স্ত্রীর অনুরোধে অল্পবয়সে ছেলের বিবাহ দেন।

হরমোহন রায় (শুভদা—২য় পরিচ্ছদ/৬ পর্ব)। হলুদপুর গ্রামের একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি বিষয়ী লোক। এই হরমোহন রায়ের পুত্র শারদা-চরণর সঙ্গে সদানন্দ হারাণ মুখুজ্জের ছোট কন্যা ছলনার বিয়ে দেয়। পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে হরমোহন মোটা টাকা ও দানসামগ্রী আদায় করেন।

হরি (কশীনাথ/৩)। কাশীনাথের মামাতো ভাই।

হরিচরণ (নিষ্কৃতি/১)। সিদ্ধেশ্বরীর পুত্র।

হরিদয়াল ঘোষাল (চন্দ্রনাথ/১)। কাশীর পাণ্ডা। চন্দ্রনাথদের পাণ্ডাগিরি কবেন। চন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতে এসেই সরযূকে বিবাহ করেন। হরিদয়ালের চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই। তাই তিনি সুনাম যাবার ভয়ে সরযূর কলঙ্কের প্রচাবে প্রকারান্তে সাহায্য করেন এবং সরযূকে গৃহে স্থান দিতে অস্বীকার করেন।

সিদ্ধেশ্বরী (নিষ্কৃতি/১)। গিরীশের স্ত্রী। বাড়ির বড়বৌ। রুগ্না। তিনি বড়বৌ হলেও ছোটবৌ শৈলর ওপরে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত। কেবল শিশুদেব আহার ও স্বাস্থ্যের জন্য তাঁর চিন্তা। কিন্তু মেজবৌ এসে তাঁর মন ছোটবৌয়ের প্রতি বিরূপ করে তোলে। কিন্তু সে বিরূপতা আন্তরিক নয়। তাই স্বামী যখন ছোটবৌয়ের নামে দেশের বাড়ি লিখে দেন, তখন তাঁর চেয়ে বেশি খুশী আর কেউ হননি।

সুধীর (বিপ্রদাস/১৩)। বন্দনার পাণিপ্রার্থী। বিলাত থেকে পাশ করে এসে মাদ্রাজের শিক্ষা বিভাগে ভাল চাকুরি করে। কোলকাতায় বিপ্রদাস-দের বাড়ি এলে রায়সাহেব সুধীরের সঙ্গে সবাইর পরিচয় করিয়ে দেন, এবং

বন্দনার সঙ্গে তার অবিলম্বে বিবাহের সংবাদ ঘোষণা করেন। এই সংবাদে দয়াময়ীর মনের গোপন ইচ্ছা (দ্বিজদাসের সঙ্গে বন্দনার বিবাহ) বাধা পায়। মূল উপন্যাসে সুধীরের প্রয়োজন এখানেই। সুধীরকে বন্দনা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে। এতে সুধীরের যে বিশেষ মানসিক ক্লেশ ঘটে তা নয়।

সুনন্দা (শ্রীকান্ত ৩য় খণ্ড/৭)। কাশীরাম কুশারীর ভ্রাতৃবধূ। গ্রাম্য মেয়ে হলেও বাড়িতে ভালই লেখাপড়া শিখেছিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ জানবার জন্য স্বামী-পুত্র নিয়ে দুঃখকে বরণ ক'রে নিতেও তার বাধেনি। ছাত্রদের শিক্ষা-দানেও পটু। অসঙ্কোচে সে অন্য পুরুষের সঙ্গে মিশতে পারে। অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব-ময়ী চরিত্র। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর চেষ্টায় সুনন্দা ও তার ভাশুরের বিরোধ মেটে।

সুন্দরী (বিরাজবৌ/৩)। নীলাম্বরের বাড়ির দাসী। তার স্বভাব ভাল নয়। সেই সুন্দরী বিরজাকে লম্পট জমিদারের কাছে সমর্পণ করে অর্থলাভ করতে চায়। বিরাজ জানতে পেরে তাকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সুন্দরী নীলাম্বরকে ভক্তি করে। নীলাম্বরের জন্য তার বেদনাবোধ আছে। এই সহায়তার জন্যই চরিত্রটাকে সহ্য করা যায়।

সুমিত্রা (পথের দাবী/১১)। 'পথের দাবী'র প্রেসিডেণ্ট। "বয়স বোধ করি ত্রিশের কাছে পোঁছিয়াছে, কিন্তু যেন রাজরাণী। বর্ণ কাঁচা সোনার মত, দাক্ষিণাত্যের ধরনে এলো করিয়া মাথার চুল বাঁধা, হাতে গাছকয়েক করিয়া সোনার চুড়ি, ঘাড়ের কাছে সোনার হারের চিক্ চিক্ করিতেছে, কানে সবুজ পাথরের তৈরী দুলের উপর আলো পড়িয়া যেন সাপের চোখের মত জ্বলিতেছে —···ললাট, চিবুক, নাক, চোখ, ভ্রূ, ওষ্ঠাধর,—কোথাও যেন আর খুঁত নাই,—এ কি ভয়ানক আশ্চর্য রূপ!" সুমিত্রার জীবনকাহিনীও বড় বিচিত্র। সব্যসাচীই তাকে কলঙ্কময় জীবনের হাত থেকে উদ্ধার করে। সুমিত্রা সব্যসাচীকে ভালবেসেছিল। কিন্তু তার চরিত্রে নারীসুলভ কোমলতা অপেক্ষা পুরুষোচিত কঠোরতা প্রকাশিত। সুমিত্রা বিদুষী, বিদেশের অভিজ্ঞতা তার আছে।

সুমিত্রার পূর্বপরিচয় এইরকম। তার মা ইহুদি মেয়ে, বাবা বাঙালী ব্রাহ্মণ। সুমিত্রার পূর্ব নাম রোজদাউদ। লুকানো আফিং-গাঁজা আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে সে নিযুক্ত ছিল। একবার সে যখন আফিম চালান দেবার সময় পুলিশের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়, তখন সব্যসাচী তাকে স্ত্রী-পরিচয় দিয়ে উদ্ধার করে। সুমাত্রায় তার সঙ্গে পরিচয় হয় বলে সব্যসাচীই তার নাম দেয় সুমিত্রা।

সুরধুনী (রামের সুমতি/২)। দিগম্বরের দশ বছরের অবিবাহিত কন্যা, নারায়ণীর বোন।

সুরবালা (চরিত্রহীন/৪)। উপেন্দ্রের পত্নী। সুরবালা বড়লোকের মেয়ে, বিয়ের পরও বাপের বাড়ি থেকে সাহায্য পায়। স্বামী উপেন্দ্রের প্রতি তার ভক্তি অপরিসীম। স্বামীর কথাই তার কাছে বেদবাক্য। তাই তার বোনের সঙ্গে দিবাকরের বিবাহপ্রস্তাবে সে প্রথমে উপেন্দ্রের বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়। কিন্তু স্বামীর অসুস্থ শরীরে কোলকাতা যাবার সময় সে সঙ্গে যাবার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ ক'রে ব্যক্তিত্বের ঘোষণা করেছে। কিরণময়ী সুরবালার স্বামী-ভক্তি দেখে তার হৃদয়ে হাহাকার অনুভব করেছে। সুরবালা সাধারণ নারীচরিত্র হলেও তার স্বামী-প্রীতি লক্ষণীয়। সুরবালার অকাল-মৃত্যু উপেন্দ্রকে আঘাত করেছে। সুরবালা চরিত্রের বিস্তারিত অন্তর্দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্র প্রকাশ করেন নি।

ছোটবেলায় বাপের বাড়িতে সুরবালার নাম ছিল পশুরাজ। কারণ সে বহু পশুপাখিকে সযত্নে লালন পালন করত। এই স্নেহ-মমতা সে সংসারজীবনেও প্রকাশ করেছে।

নিজের বোন যে খোঁড়া এ সত্যটিকে স্বীকার করে সুরবালা সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। স্বার্থের খাতিরে সত্যকে গোপন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি।

সুরমা (গৃহদাহ/২৭)। অচলার ছদ্মনাম। এই নাম দিয়ে অচলা আরায় সুরেশের সঙ্গে ছিল। দ্র. অচলা।

সুরমা (আলো ও ছায়া/১)। সুরমা বৈষ্ণবী ছিল। পশ্চিমে বেড়াতে গিয়ে যজ্ঞদত্ত তাকে নিয়ে আসে। সেই থেকে যজ্ঞদত্তের সংসারে সে গৃহিণী। সুরমা সুন্দরী, কিন্তু বিধবা। যজ্ঞকে সে ভালবাসলেও বিবাহ করতে পারে না। যজ্ঞকে সংসারী করার জন্য সে তাড়া দেয় বিবাহ করার। প্রতুলের সঙ্গে যজ্ঞের বিবাহে তার দুঃখ হলেও, বৌয়ের ন্যায্য প্রাপ্য সে যজ্ঞকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে।

সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (শুভদা ২য় পরিচ্ছেদ ১ম পর্ব)। নারায়ণপুরের জমিদার। তাঁর বয়স পঞ্চবিংশতির অধিক হবে না। তাঁর শরীর খারাপ হওয়ায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি এক জলযাত্রার আয়োজন করেন। তারপর পাঁজি খুলে ইয়ার, বন্ধু, গায়ক ও বাদক ও এক গায়িকাকে নিয়ে রূপনারাণের নদে তিনি বজরা ভাসান। তাঁর বজরা যখন চন্দননগর অতিক্রম করে আরও কিছুটা গিয়েছে এই সময় একদিন বিকেলে তিনি ললনাকে জলের ওপর

চতুর্দিকে চুল ভাসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন, এর পর তিনি ললনাকে বস্ত্রদান করেন এবং নিজের বজরায় তুলে আনো। ললনা সুরেন্দ্রনাথকে মালতী এই মিথ্যা পরিচয় দেয়। পরে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ললনা ওরফে মালতীর বিয়ে হয়।

হরিপদ মিস্ত্রী (শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড/ষষ্ঠ পর্ব)। রেঙ্গুনের রাস্তায় এর সঙ্গে শ্রীকান্তের পরিচয় ঘটে এবং সেই শ্রীকান্তকে নন্দ মিস্ত্রীর বাড়ি খুঁজে দিয়েছিল।

হরিবালা (চন্দ্রনাথ/৫)। চন্দ্রনাথের গ্রামসম্পর্কীয়া ঠানদিদি। বুড়া হলেও তাঁর মনটি সরস। তিনি সরযূর একাকিত্ব ঘোচাবার জন্য তার সঙ্গে 'সই পাতান এবং প্রতিদিন সরযূর সঙ্গে গল্পগুজব করতে আসেন। চন্দ্রনাথ-সরযূর প্রতি তাঁর ভালোবাসা অকৃত্রিম।

হরিমতি (পুঁটি) (বিরাজ বৌ/১)। নীলাম্বরের ভগিনী। তার ডাকনাম পুঁটি। মাতৃহারা এই মেয়েটি দাদা-বৌদিব আদরে মানুষ। প্রথম দিকে হরিমতির বালিকাসুলভ আচরণের পরিচয় আছে। তারপর হরিমতির বিবাহ হয়। প্রতিশ্রুতিমত অর্থ দান করতে না পারায় শ্বশুরবাড়িতে তার উপেক্ষার অন্ত থাকে না। দাদার কাছে সে আসতে পায় না। তার একমাত্র সান্ত্বনা স্বামীর সহৃদয় ব্যবহার। সে দাদাকে শ্বশুরালয়ে আর অর্থ দিতে বারণ করে। বৌদির অন্তর্ধানে সে মর্মাহত। দাদাকে সে সেবা করে, তাকে নিয়ে দেশভ্রমণে বেরোয়। শেষপর্যন্ত বৌদির মৃত্যুতে সে মর্মাহত হয়। হরিমতির একটি পুত্র।

হরি মোড়ল (শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড/৬ষ্ঠ পর্ব)। রেঙ্গুনে দাদাঠাকুরের হোটেলের একজন খদ্দের। জাতিতে সে ডোম ছিল। কিন্তু প্রথমে হোটেলে নিজের পরিচয় গোপন করে কৈবর্ত বলে পরিচয় দিয়েছিল। পরে অবশ্য আসল সত্য জানাজানি হয়ে যায়। তবে সে জাতিতে ডোম হলেও তার আচার আচরণ খুব ভাল ছিল। ফলে সহজে কেউ তাকে নিম্নশ্রেণীর লোক বলে ধরতে পারতো না।

হরির মা (গৃহদাহ/১৪)। অচলার বাপের বাড়ির দাসী। সে বিবাহের পর অচলার সঙ্গে মহিমের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে মহিমের দারিদ্র্য দেখে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

হরিশ চাটুজ্জে (নিষ্কৃতি/১)। ওকালতি করেন। স্ত্রী নয়নতারার বশীভূত। হরিশের মন সঙ্কীর্ণ। তাই একান্নবর্তী পরিবারের অনুপযুক্ত। অর্থের প্রতি তাঁর লোভ যথেষ্ট।

হরিশ ভট্টাচার্য (চরিত্রহীন/৩৪)। দিবাকর-কিরণময়ী যখন আরাকানে পালাচ্ছিল তখন তাদের সঙ্গে এই বাড়িওলা হরিশ ভট্টাচার্যের জাহাজে আলাপ হয়। সে জাতিতে কৈবর্ত। ব্রাহ্মণ বলে দিবাকরকে খাতির করেছে।

হরিহর (দেনাপাওনা/১২)। ডাকাত। সাগরের খুড়ো। ষোড়শীর অনুগত।

হরেন্দ্র (শেষ প্রশ্ন/২)। হরেন্দ্র উদার চরিত্রের লোক। দেশের সেবায় তার আগ্রহ। তাই সে তার আশ্রয়ে কয়েকজন নিরাশ্রয় ছেলেমেয়েকে আদর্শ নিষ্ঠায় গড়ে তোলার চেষ্টা করে। হরেন্দ্র অক্ষয়ের পিছনে লাগতে ভালবাসে। সে অজিতকে যেমন আশ্রয় দিয়েছিল, তেমনি নীলিমা বৌদির বিপদের দিনে তাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে যায়। কমলের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম।

হারান (চরিত্রহীন/১২)। কিরণময়ীর স্বামী। অসুস্থ থাকায় তার মেজাজ খিটখিটে। তার মৃত্যুর পর স্ত্রী ও মাতার ব্যবস্থার জন্য সে বন্ধু উপেন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছিল।

হারান মুখুয্যে—(শুভদা/১ম পর্ব) হলুদপুর গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁর বাড়িটি দ্বিতল, পুরাতন ইষ্টকনির্মিত। বাড়ির চারিদিকে বাঁশঝাড়। দু-চারটি কলাগাছ, গোটা দুই বেলগাছ, গোটা দুই আমগাছ, একটা কতবেল গাছ। এটাই হল মুখোপাধ্যায় মশায়ের পার্থিব সম্পত্তি। হলুদপুরের একমাইল দুরে বামুনপাড়ার জমিদারমশায়ের কাছারিতে তিনি চাকরি করতেন। কুড়ি টাকা মাইনে পেতেন। বাড়িতে পোষ্যবর্গ অনেকগুলি—স্ত্রী শুভদা, দুটি কন্যা, দুটি পুত্র, এক বিধবা ভগিনী। যখন তিনি মাসে কুড়িটা টাকা স্ত্রীর হাতে দিতেন, তখন তাঁর সংসারের অভাব কেউ টের পায়নি। কিন্তু হঠাৎ তিনি জমিদারের তহবিল ভেঙে দু'শো টাকা চুরি করায় তাঁর চাকরি যায়। জমিদার তাঁকে পুলিশের হাতে দেন। জমিদার দয়ালু ব্যক্তি। তাই শুভদা এসে অনুরোধ করায় তিনি তাঁকে জেলে না দিয়ে ছেড়ে দেন। হারানবাবু গাঁজা খেতেন। এছাড়া আনুষঙ্গিক আরও দোষ তাঁর ছিল। তাঁর নিজের কোন যোগ্যতা ছিল না। তথাপি মুখে বড় বড় কথা বলতেন অবশ্য তাঁর স্ত্রী জানতো যে, তার স্বামীর অর্ধেক কথারই কোন অর্থ থাকে না।

হীরা সিং (পথের দাবী/১৯)। পথের দাবীর সভ্য না হলেও অত্যন্ত বিশ্বাসী। জাতিতে পাঞ্জাবী শিখ। আগে হংকঙে পুলিশে চাকরি করত, এখন রেঙ্গুনে টেলিগ্রাফ অফিসে পিয়নের কাজ করে।

হেমনলিনী (পথনির্দেশ/১) পতিতপাবন ও সুলেখার একমাত্র ত্রয়োদশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা, পিতার মৃত্যুর পর তারা গুণেন্দ্রর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সে ছিল ভীষণ অভিমানিনী। তাই সুলোচনা যখন প্রথম গুণীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন তিনি হেমকে নিচে বসিয়ে রেখে যান। পাছে সবকথা শুনে দুঃখ পায় সেজন্য তাকে সুলোচনা সঙ্গে নিয়ে আসেন নি। হেমের রূপ ও গুণ দুই ছিল। তার বাবা তাকে অনেক লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। ফলে গুণীর বাড়িতে এসে সে গুণীর পড়বার ঘরে আশ্রয় পেল এবং তার গুণীর পড়ার ঘর গুছিয়ে সুন্দর করে তুলল। গুণী হেমকে খুব ভালবাসত। এই ভালবাসা ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। কিন্তু ধর্মের ব্যবধানের জন্য তাদের উভয়ের মিলন হয় না। নবদ্বীপের এক বড়লোকের ঘরে হেমের বিয়ে হয়। বিয়ের একবছরের মধ্যেই হেম বিধবা হয়ে গুণীর কাছে ফিবে আসে। হেম গুণীকে গুরুদেবের মত শ্রদ্ধা করত। সে বিধবা হয়ে ফিরে আসার পর গুণীকে বিধবার বিযে হওয়া ভাল কিনা প্রশ্ন করে। তখন গুণী তাকে বলে যে যারা স্বামীকে ভালবাসে তারা বিয়ে করে না। হেম জানায় সে তার স্বামীকে কোনদিন ভালবাসেনি, গুনীকেই ভালবাসে। সুতরাং সে মরণকালে মনে করবে সে গুনীর কাছেই যাচ্ছে। গ্রন্থেব শেষে গুণী তাকে কাশী থাকার কথা বলেছে। এবং বলেছে তাদের প্রেম মিলনের অভাবে সুসম্পূর্ণ, ব্যথাতেই মধুর।

হেমাঙ্গিনী (বৈকুণ্ঠের উইল/৭)। গোকুলের বড় মেয়ে।

হেমাঙ্গিনী (মেজদিদি/২) নবীনেব মেজভাই বিপিনের স্ত্রী। শ্বশুরবাড়ির সকলের কাছে সে 'মেজ বৌ' নামে এবং বড়দা কাদম্বিনীর ভাই কেষ্টর কাছে তিনি 'মেজদিদি' নামে পরিচিতা। হেমাঙ্গিনী শহরেব মেয়ে। তিনি দাসদাসী রেখে, লোকজন খাইযে জাঁকজমকে থাকতে ভালবাসেন। পয়সা বাঁচিয়ে গরিবী চালে চলব না বলেই বছর চারেক পূর্বে দুই জায়ে কলহ করে পৃথক হয়েছিলেন। সেই অবধি কলহ অনেকবার হযেছে, অনেকবার মিটেছে, কিন্তু মনোমালিন্য একদিনের জন্যও ঘুচেনি। এই মনোমালিন্য আরও প্রবল আকার ধারণ করে বড় জায়ের ভাই কেষ্টকে নিয়ে। হেমাঙ্গিনী অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা ও জেদী। তিনি নিজের ছেলে ললিতকে ও মেয়ে উমাকে যেমন অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন তেমনি কেষ্টাকেও অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই কেষ্টর ওপর বড় জায়ের অত্যাচার তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তার প্রতিবাদ করতেন। ফলে দুইজায়ে প্রবল কলহ উপস্থিত হত।

হেমাঙ্গিনী (বোঝা/৬)। নলিনীর প্রিয় সখী। তার বিদায়ের সময় নলিনী স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার বাড়ি গিয়ে স্বামীর বিরাগভাজন হয়।

হৈমবতী (দেনাপাওনা/৭)। জনার্দন রায়ের কন্যা। স্বামী নির্মল ব্যারিস্টার। ঐশ্বর্যের মধ্যে কাটালেও, ঐশ্বর্যের অহঙ্কার তার নেই। তার মধ্যে সরলতা আছে, হৃদয় ও সহানুভূতিও রয়েছে। তাই সে সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ষোড়শীকে দিয়েই ছেলের মানতের পূজা দিতে চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত ষোড়শীর বাধাতেই তা সম্ভব হল না।

শরৎচন্দ্রের সমাজভাবনা

বিনয় সরকার

• শরৎ-শতাব্দী-সমীক্ষা আজ আমাদের সামনে উপস্থিত। শিল্পী শরৎ-চন্দ্রকে যেন আমরা সেকালের পারিপার্শ্বিক পবিবেশ ও পরিমণ্ডল থেকে পৃথক-ভাবে বিচার না করি—তাহলে বিচারে ত্রুটি থেকে যাবে।

অপরাজেয় কথাশিল্পীর উপন্যাস ও গল্পের পটভূমিকা ছিল শোষক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-শাসিত সমাজ।

রাজা রামমোহন রায় থেকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাঙালী .রনেসাঁসের আলোড়ন স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথে পর্যবসিত হলেও সেই সময় শরৎচন্দ্র গল্প-উপন্যাসে নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানুষের কথা তুলে ধরে সাহিত্যাকাশে এক নবদিগন্ত উন্মোচিত করলেন।

'জেনারেশন গ্যাপ' থেকে বর্তমান কালেব পাঠক পরিবারগত তৃতীয় পুরুষ। স্বাধীনোত্তর আজকের (সমাজবাদী ?) সমাজ থেকে শরৎ-সমাজ সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। তাই শরৎ-সাহিত্যের যে নতুন পাঠক আজকের যে সমাজবাদী সমাজ এসেছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে শরৎ-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণের তাৎপর্য-পূর্ণ এক নতুন এষণা প্রেরণা পাবার ছবি রয়েছে। কারণ শরৎচন্দ্রের কাল আর আজকের কাল, যত ফারাকই থাক না কেন, শাশ্বত সত্য চিরকালই গণমানসের কাছে সমাদৃত হবে।

জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্রের বিষয় ও বক্তব্য : 'সংসাবে যাবা শুধু দিলে পেলে না কিছুই, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনো হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের কাছেও কি আমার ঋণ কম ? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে।"

এদেরই নিয়ে দরদী শিল্পী তাঁর সাহিত্য-স্তম্ভের গাঁথুনিকে সুদৃঢ় করেছেন। লাঞ্ছিত ও নিষ্পেষিত মানুষের প্রতি তাঁর যে সুগভীর দরদ তা তাঁর অশ্রু সজল ভাষায় রাগিণীর এক সকরুণ সুরমূর্ছনায় ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, সমাজ ও চিন্তা ভাবনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ থাকলেও বর্তমানে স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত পর্যায়ে কথাশিল্পীর শাশ্বত কথার সঙ্কলন উপস্থাপিত করার চেষ্টা করছি। অবশ্য কিছু অংশে এ হবে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার আয়োজন।

শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন সম্পূর্ণ নিটোল মানুষ। সুতরাং তাঁর জীবনের সেই বিচিত্র দিক ও চিন্তা-ভাবনার সোপানগুলিও পরিপূর্ণ উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্রের বাস্তব জীবন-গাথা সত্যের শিখরে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি যেন মানুষের সঙ্গে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। নিজের জীবনদর্শনকেও আমরা যেন স্পষ্টভাবেই দেখতে পাই তাঁর সাহিত্য-আরসিতে। শরৎচন্দ্র স্পষ্টই যেন তাঁর নায়ক-নায়িকার মাঝ দিয়ে নিজেব মতবাদকেই প্রচার করে যান। অন্যায় অবিচার আর অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল বিদ্রোহ করে-ছেন। সমাজেব ভণ্ড গোঁড়ামিকে আঘাত করেছেন মাথা উঁচু করে—"মানুষই ভুল করতে, অন্যায করতে জানে আর সমাজই জানে না? উভয়েরই সীমা নির্দিষ্ট আছে—সে সীমা মূঢ়তার হোক, প্রবৃত্তির ঝোঁকে হোক, অন্যায় জিদের বশে হোক—যেভাবেই হোক লঙ্ঘন করলেই অমঙ্গল।" (চরিত্রহীন) তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'সমাজকে আঘাত করা এবং সমাজের অবিচারকে আঘাত করা এক জিনিস নয়। তোমাকে পূর্বে ত বলেছি, সব জিনিসেরই একটা সত্যিকার অধিকার আছে। সমাজ উদ্ধত হয়ে যখন তার সত্যিকার সীমাটি লঙ্ঘন করে তখন তাকে আঘাত করাই উচিত, এ আঘাতে সমাজ মরে না—তার চৈতন্য হয়, মোহ ছুটে যায়।"

সমাজনীতি ও রাজনীতি উভয়ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূরীকরণে শরৎচন্দ্রেব উদ্-গ্রীবতা তাঁর ১৯২৯ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে রংপুর যুব সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন, 'বৈদেশিক শাসন আমাদিগকে অস্ত্রহীন ও দুর্বল করিয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ ভেদ-বৈষম্যই আমাদিগকে অধিকতব দুর্বল করিয়াছে এবং প্রকৃত উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এই হৃদয়হীন সমাজ, প্রেমহীন ধর্ম, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিরোধ, আর্থিক বৈষম্য এবং নারীর উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার—এই সবই আমাদের দুর্দশার কারণ।"

শরৎচন্দ্র শক্তিমান, বিত্তশালী শোষকদের যেমন ঘৃণা করতেন তেমনি অসহায় দরিদ্র শোষিতদের ভালবাসতেন হৃদয় দিয়ে। অন্যায়-সুযোগলব্ধ ক্ষমতা শোষণকার্যে সহায়তা করবে, এ তিনি কিছুতেই সহ্য করতেন না। তিনি জানতেন, 'সকল মানুষ জন্মগত অধিকারে সমান।' তাই নিপীড়িত শোষিত

হিন্দুমুসলমান নিম্নস্তরের মানুষদের একত্রিত করতে না পারলে দেশের উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়।

দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্র একবার বরিশাল যাচ্ছিলেন। স্টীমারের ডেকে বসে দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন, "ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে পাঁচকোটি লোকও যদি সুতা কাটে, তাহলে ষাট কোটি টাকার সুতা হতে পারে।"

কথাটা শরৎচন্দ্রের বেশ খানিকটা কষ্টকল্পনা বলে মনে হয়েছিল। তিনি আরও বাস্তবদৃষ্টিতে সমস্যার দিকে তাকাতে অনুরোধ করে দেশবন্ধুকে উত্তর দিয়েছিলেন, "তা পারে। দশ লক্ষ লোক একসঙ্গে হাত লাগালে একদিনেই একটা বাড়ি তোলা যেতে পারে। কিন্তু মানুষগুলোকে এক করতে হবে। নমশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী, পোদ এদের সসম্মানে কোলে টেনে নিন, মেয়েদের ওপর অন্যায় নিষ্ঠুর সামাজিক অবিচারের অবসান ঘটান—তাহলে আর লোকের অভাব হবে না।"

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনায় শ্রেণী-সংঘর্ষের অভিব্যক্তি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। যে চেতনার অভাবের জন্যে নিপীড়িত অবহেলিতরা মাথা তুলতে পাবে না সেই চেতনা সৃষ্টি করা শরৎচন্দ্রের সাধনা হয়ে উঠেছিল। তিনি শোষক ও শোষিতের সমতা সৃষ্টির যে আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন, তার পথ লড়াই-এর পথ, শান্তির পথ নয়। মানুষের কল্যাণে মানুষের তৈরী দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটন করতে সর্বদা তিনি ছিলেন উৎসুক। এই ধ্বংস অবশ্যই শুধু ধ্বংসের জন্য নয়, নতুন সৃষ্টির জন্য। এই অর্থে শরৎচন্দ্র সমাজতান্ত্রিক। তাঁর 'পথের দাবী'তে সব্যসাচী ভারতীকে শ্রেণীসংগ্রামের গুরুত্ব বোঝাতে চাইছে—"ভারতী, অশান্তি ঘটিয়ে তোলা মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়। শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এই অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো, পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যা মন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত, নবনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে তাদের এমন করে তুলেছে যে আজ তারাই অ-শান্তির নামে চমকে উঠে ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল। বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেচ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না।...না ভারতী, সে হবে না।...আজ সব আমাদের ভেঙে ফেলতেই হবে। ধুলো ত উড়বেই, বালি ত ঝরবেই, ইট-পাথর খসে মানুষের মাথায় ত পড়বেই ভারতী, এই ত স্বাভাবিক।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সুবিধাভোগীদের অমানুষিক শোষণ, শোষিতদের

অসহায়তা ও নিষ্ক্রিয়তা এবং অত্যন্ত বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এই অন্যায় ও সামাজিক সাম্য-বিনষ্টের শোষণ অবসানের জন্য তিনি একান্তই আগ্রহী। এবং এদের ঘাতপ্রতিঘাতে শরৎচন্দ্রের মনোজগৎ আলোড়িত।

দেশের নিরাশ্রয় বুভুক্ষু মানুষের হয়ে মানুষের কাছে এসে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের হয়ে প্রতিবাদ তুলেছিলেন, বাঁচার মন্ত্র দিয়েছিলেন, সেইসব বিদ্রোহীদের তিনি অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের আত্মার যোগাযোগ ছিল। বিদ্রোহী কবি তখন জেলে, অত্যাচারী ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তিনি কারাবরণ করেছিলেন। মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে জেলের মধ্যেই আমরণ অনশন করেছিলেন নজরুল ইসলাম। শরৎচন্দ্র শ্রীমতী লীলা গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে বলেছিলেন : "হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল উপোস করিয়া মরমর হইয়াছে। বেলা একটার গাড়িতে যাইতেছি, দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী হয়। না হইলে তার কোন আশা দেখি না। একজন সত্যকার কবি! রবিবাবু ছাড়া বোধহয় এখন আর কেহ এত বড় কবি নাই।' (শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী)

জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র অহিংস নীতিতে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন না—অথচ সেই অহিংসার পূজারী মহাত্মাজীকেও তিনি.ভক্তি করতেন অন্তর দিয়ে। এর কারণ সম্ভবতঃ তাঁর মানবপ্রীতি। গান্ধীজী যেমন সমাজের মুচি, মেথর, ডোম, বাগদী প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে কোলে টেনে নিয়ে তাদেরকে 'হরিজন' আখ্যায় আখ্যায়িত করে সম্মান ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শরৎচন্দ্রের মানসিকতাও ছিল তদ্রূপ। 'মহাত্মাজী' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'স্বার্থ বলিয়া যাঁহার কোথাও কিছু নাই, আর্তের জন্য পীড়িতের জন্য যিনি সন্ন্যাসী,—এ দুর্ভাগা দেশে এমন আইনও আছে যাহার অপরাধে এই মানুষটিকেও আজ জেলে যাইতে হইল।"

ইংরেজ শাসনের মুখে আমাদের দেশের অসংখ্য প্রাণ পিতামাতার স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে জেলের কারাগারে বন্দী-জীবন যাপন করেছেন, দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছেন—শরৎচন্দ্র সেইসব তেজস্বী মহীয়ান দেশপ্রেমিকদের অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন ও সাহায্য করতেন। দেশের এই তরুণ তাপসদের তিনি সর্বদাই উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতেন। মালিকান্দা অভয় আশ্রমে

পশ্চিম বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীর অধিবেশনের এক সভায় তিনি বলে-ছিলেন : 'জগৎ মানুক আর না মানুক, আমরা মস্ত বড় জাতি, একথা বহু আস্ফালনে দিকে দিকে ঘোষণা করে বেড়াতেও যেমন আমি গৌরব বোধ করি নে, হে ইংরাজ তোমরা কিছুই নও, কারণ অতীতকালে আমরা যখন এই এই মস্ত.বড় বড় কাজ করেছি, তোমরা তখন শুধু গাছের ডালে ডালে বেড়াতে। ...বিগত দিনে তোমার আমার কি ছিল এ নিয়ে গ্লানি বাড়িয়ে কি হবে,— আমি বলি, ইংরাজ আজ তুমি বড় ; শৌর্য্যে, বীর্য্যে স্বদেশপ্রেমে তোমার জোড়া নেই ; কিন্তু আমারও বড় হবার সমস্ত মাল-মশল. মজুত ।.আজ দেশের যৌবনচিত্ত পথের খোঁজে চঞ্চল হয়ে উঠেছে ; তাকে ঠেকাবার শক্তি কারও নেই, তোমার-ও না। তুমি যত বড়ই হও, সে তোমারই মত বড় হয়ে জন্মের অধি-কার আদায় করে নেবেই নেবে।"

শরৎচন্দ্রের বাণী আদর্শস্বরূপ হয়ে 'দেশের যৌবনচিত্ত'কে পথ খোঁজার প্রেরণা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাক, এই কামনা করি।

শরৎ-পত্রে সাহিত্য-ভাবনা ও সমালোচনা

ড. তুষারকান্তি মহাপাত্র

শবৎচন্দ্রের দীর্ঘজীবন, বিস্তৃত কর্মপবিধি ও পরিচিতির তুলনায তাঁব পত্র-সংখ্যা বেশি নয়, প্রাপকসংখ্যাও অতিসীমিত। তাঁর স্বভাব এবং প্রকৃতিগত আলস্যই এর মূল কারণ ;[১] তাছাড়া, পত্রকে সাহিত্য করে তোলার মানসিকতা তাঁর ছিল না। যে আবেগ এবং প্রকাশ-উন্মুখতা পত্ররচনায় লেখককে প্রাণিত করে, শরৎচন্দ্রের চিঠিতে তার একান্ত অভাব, প্রয়োজনে ও উত্তেজনার তাগিদেই সেগুলি লিখিত। যুক্তির প্রতি অতিরিক্ত নিষ্ঠা এবং বিচলিত-চিত্তেব প্রকাশ থাকায় ভাষাব রমণীয়তার প্রতি মনোযোগী হওযাব অবকাশ গেছে কমে ; পরন্তু, বিষযেব সজ্জার অভাবে সেগুলি এলোমেলো অথবা নানা কথাব চাপে ভারগ্রস্ত। শরৎচন্দ্র নিজে এ বিষযে যে সচেতন ছিলেন, একাধিক চিঠিতে তাব প্রমাণ মেলে। এছাড়াও, তাঁব চিঠি ছিল একান্ত ব্যক্তিগত ; প্রকাশের সম্ভাবনা লেখকের মনে সম্ভবতঃ ছিলই না, কয়েকটিতে চিঠির গোপনীযতা সম্বন্ধে প্রাপককে সচেতন করাও হযেছে।[২] তবু শবৎচন্দ্রেব চিঠিগুলির মূল্য কমে না। তাঁব হৃদয়ের সত্যপাঠ এখানে ; তাঁব রুচি, নীতি, জীবন-ইতিহাস, সাহিত্য-বোধ, সমালোচনাবৃত্তিব সঠিক পরিচয় শুধু এগুলিতেই পাওয়া সম্ভব। মনেব অকপট প্রকাশের জন্যে চিঠিগুলিতে ব্যক্তিক আনন্দবেদনার সঙ্গে লেখকেব মানস-প্রকৃতিও উন্মোচিত হযেছে উল্লেখনীযরূপে এবং সমগ্র সৃষ্টির না হলেও তাব একটি বৃহৎ অংশের আলোচনা তিনি এগুলিতে কবেছেন।

শরৎ-পত্রের একটি বিশিষ্ট অংশ জুড়ে বযেছে তাঁর সাহিত্য-ভাবনা। নিজের ও অপরেব রচনা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ও অন্যজনেব মতামত এবং প্রসঙ্গ-ক্রমে সাহিত্যেব প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত, মূলতঃ তাঁব চিঠির বিষয। কৈশোরেব রচনাগুলির অসংস্কৃত রূপে প্রকাশে ক্ষোভ[৪] এবং সেগুলি সংস্কাবের কথা রেঙ্গুন থেকে লিখিত লিখিত চিঠিতে প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু চিঠিগুলিতে সর্বাধিক গুরুত্ব 'চরিত্রহীনে'র। উপন্যাসটি রচনার সূচনা থেকেই শরৎচন্দ্র বারবার বিড়ম্বিত হন। স্বল্প প্রশংসার সঙ্গে বহুজনের বিরুদ্ধ সমালোচনা ও কটূক্তি, সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম হওয়া, পর পর দুই সম্পাদকের 'চরিত্রহীন' প্রকাশে আগ্রহ ও পরে নিরাসক্তি, বন্ধুজনের বিরূপ সমালোচনা শরৎচন্দ্রকে ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন, ক্ষুব্ধ এবং পরিশেষে ক্রুদ্ধ করে তোলে।

এই ক্রোধের প্রকাশ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অন্য রচনাগুলির সমালোচনায় মোটেই প্রচ্ছন্ন থাকে নি, এমন কি এজন্যে অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে কটূক্তি করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। বেশ বোঝা যায়, টলস্টয়ের 'রিসারেকসান' উপন্যাসের অনুসরণে তিনিও একটি 'গ্রাণ্ড' রচনা করতে চান, কিন্তু তাঁর স্বদেশীয়দের অর্থহীন গোঁড়ামি, অপরিণত সাহিত্যবোধ, সাহিত্যের শ্লীলতা সম্পর্কে অদ্ভুত নীতিশীলতা তাঁকে প্রায় বিপর্যস্ত করে তোলে। আশা ও আশ্বাস, হতাশা ও দুর্ভাবনার এমন ইতিহাস তাঁর অন্য কোন উপন্যাস সম্পর্কে নেই, এবং বাংলাসাহিত্যে এ দুর্ভাগ্য অন্য কোন ঔপন্যাসিকের হয়েছে কিনা সন্দেহ।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ২২.৩.১২. তারিখের চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

> ইচ্ছা ছিল যা হোক একটা এ বৎসরে publish করিব। আমার দ্বারা কিছুই হয় এ বোধ হয় হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিবার এমন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল। সবই গেল।...

প্রায় এক বছর পরে এই বন্ধুকেই সঙ্কোচের সঙ্গে ('একটা অহঙ্কার করব, মাপ করবে ?') জানাচ্ছেন (৪ এপ্রিল ১৯১৩) :

> আমার চেয়ে ভাল novel কিম্বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না, যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য বলে মনে হবে সেইদিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো তার পূর্বে নয়।

এর কয়েক দিন মাত্র পরে একই ব্যক্তিকে জানানো হচ্ছে (১৭ এপ্রিল ১৯১৩):

> তোমাকে অন্ততঃ পড়িবার জন্যেও 'চরিত্রহীন'-এর যতটা আবার লিখিয়াছিলাম (আর অনেকদিন লিখি নাই) পাঠাইব মনে করিয়াছি।* * * তুমি যদি সত্যই মনে কর এটা তোমাদের কাগজে ('ভারতবর্ষ') ছাপার উপযুক্ত তা'হলে হয়তো ছাপিতে মত দিতেও পারি।

যদিও তাঁর মনে দ্বিধা ও সন্দেহ ছিল যে 'চরিত্রহীন'কে সহজভাবে গ্রহণ করা সে যুগে অনেকের পক্ষেই কঠিন হবে (পত্রটিতে তার আভাস আছে), সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ এত উন্নতমানের উপন্যাস লিখতে পারবেন না এই দৃঢ় বিশ্বাসও তাঁর ছিল এবং সেইজন্যেই ৪ঠা এপ্রিলের পরে ১৭ এপ্রিল প্রকাশের ইচ্ছায় 'চরিত্রহীনে'র আংশিক পাণ্ডুলিপি পাঠাচ্ছেন। নিজের রচনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের এই দৃঢ় প্রত্যয় থেকেই পত্রটিতে উচ্চারিত হয়েছে :

> যদি আংশিক পরিবর্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহা কিছুতেই

হইতে পারিবে না। উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না।
শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়াই চরিত্রহীন মনে করিয়ো না। আমি একজন Ethics-এর student, সত্য student. Ethics বুঝি, এবং কাহারও চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না।…ওটা বটতলার বই নয়।
আমি যা' তা' যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না। গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য করে লিখি এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না।

তাঁর এই আত্মবিশ্বাস ও সাবধানবাণী সত্ত্বেও 'ভারতবর্ষ' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'চরিত্রহীন' প্রকাশ যখন সম্ভব হোল না, তাঁর আশা, আশঙ্কায় রূপান্তরিত হোল। শরৎচন্দ্র ভেঙে পড়েন নি, বরং জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। উপন্যাসটি নিয়ে যতই বিরুদ্ধ সমালোচনা হোল, শরৎচন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থনে পত্রে, প্রবন্ধে নানাভাবে আপন মত ব্যক্ত করতে থাকলেন। শরৎ-প্রকৃতি ও শরৎ-সাহিত্য-ভাবনায় একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এগুলি থেকে পাওয়া কষ্টসাধ্য নয়:

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

১০.৫.১ : শেষে হয়ত একদিন আপশোষ করিবে কি রত্নই হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে!
নিজেই তাহারা বলিতেছে চরিত্রহীনের শেষ দিকটা (অর্থাৎ তোমরা যতদূর পড়িয়াছ তাহার পরে আরও ততটা) রবিবাবুর চেয়েও ভাল হয়েছে (style এবং চরিত্র বিশ্লেষণে) তবুও তাদের ভয় শেষ দিকটা বিগড়াইয়া ফেলি। তারা এটা ভাবে নাই, যে লোক ইচ্ছা করিয়া একটা 'মেসের ঝি.'কে আরম্ভেই টানিয়া আনিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা জানিয়াই করে।

ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত পত্র

১০.৫.১৩ : মেসের ঝি থাকাতে রুচি নিয়ে একটু খিটিমিটি বাধিবে। তা বাধুক। লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না, যারা যত নিন্দা করিবে, তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা art-এর ধার ধারে না তারা হয়ত নিন্দা করবে, কিন্তু নিন্দা করলেও কাজ হবে। তবে ওটা Psychology এবং analysis সম্বন্ধে যে খুব ভাল তাতে সন্দেহই নেই। এবং এটা

একটা সম্পূর্ণ scientific Ethical Novel. এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না।

১০.১০.১৩ : ভাল বই যাহা art হিসাবে--Psychology হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে! কৃষ্ণ-কান্তের উইলে নাই? পাঁচজনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কি আছে?

কে বলিতেছে আমি গীতার টীকা করিতেছি? 'চরিত্রহীন' এর নাম!* * এটা সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়! টলস্টয়ের 'রিসরেকসন' তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলার থাকিবে না।

১৪.৯.১৩ ইহার (চরিত্রহীন) শেষ কয়েক চ্যাপ্টার যথার্থই grand করিব। আমি মিথ্যা বড়াই করা ভালবাসি না এবং নিজের ঠিক ওজন না বুঝিয়াও কথা বলি না, তাই বলিতেছি, শেষটা সত্যই ভালো হইবে বলিয়াই মনে করি।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র :

সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়া দেখিয়াছ। প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই।* * এ একটা scientific Psych : and Ethical Novel. আর কেউ এরকম করিয়া বাঙলায় লিখিয়াছে বলিয়া জানি না। এইতেই ভয় পেলে ভাই? কাউণ্ট টলস্টয়ের 'রিসরেকসন' পড়েছ কি? His best book একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া। (১২।৩৬২-'৬৩)

ডাকমোহর

১২ মে ১৯১৩. শুধু সৌন্দর্যসৃষ্টি করা ছাড়াও উপন্যাস লেখকের আরো একটা গভীর কাজ আছে। সে কাজটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়— তাই করিতে হইবে। Austin, Mary Corelli প্রভৃতি এবং Sara Grand সমাজের অনেক ক্ষত উদঘাটন করিয়া-ছেন, আরোগ্য করিবার জন্য, লোককে শুধু শুধু দেখাইয়া ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য নয়।

দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র :

জ্যৈষ্ঠ ৪০ : সাবিত্রী সত্যই ঝি ক্লাসের মেয়ে নয়। পুরাণে আছে, একবার

লক্ষ্মীদেবীও দায়ে পড়ে এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীবৃত্তি করে-
ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের এত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, প্রশংসা সত্ত্বেও 'চরিত্রহীনের লেখা চরিত্রহীন'[৭] যখন সম্পাদরেব আদরলাভে বঞ্চিত হোল ক্ষুব্ধ লেখক তখন সমকালীন বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা কবে তার 'immoral' অপবাদ দূর করার জন্যে সচেষ্ট হলেন। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা একটি চিঠিতে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ

> আমার 'চরিত্রহীন' তোমাদের বদনামের গুণে সাংঘাতিক ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। অর্থাৎ কাল ফণী Telegraph করিয়াছে 'Charitrahin creating alarming sensation.' আমি জিজ্ঞাসা করি কি আছে ওতে? একজন ভদ্রঘরেব মেয়ে যে-কোন কারণেই হোক, বাসার ঝি-বৃত্তি করিতেছে **আর একজন ভদ্র যুবা তাবই প্রেমে পড়িতেছে—অথচ শেষ-পর্যন্ত এখন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না। অথচ রবিবাবুর 'চোখের বালি' ভদ্র ঘরের বিধবা নিজেব ঘরের মধ্যে এমন কি আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই! (কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীকে মনে পড়ে?) 'মানসী'তে প্রভাত বাবু এক ভদ্রযুবার মুখে আর এক ভদ্রবিধবাব সতীত্ব হরণের মতলব আঁটিতেছেন। সোনার হরিণ কত কি কীর্ত্তিই সুরু কবিযা দিয়াছে।***কোন দোষ নাই, কেননা নাম 'রত্নদীপ' (এবং লেখক প্রভাত বাবু!)

শরৎচন্দ্রেব নিঃসীম দুঃখের কারণ ছিল অন্যদেব সঙ্গে বন্ধু প্রিয়নাথও 'চরিত্রহীন'-এর মর্ম ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। যুক্তিতর্কে কোন অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পাবায় তাঁর ক্ষোভ ক্রোধে পরিণত হয়। এর প্রমাণ প্রমথনাথকে লেখা (ঢাকা শহর ২৪ মে ১৯১৩) তাঁর চিঠি :

> তোমার view এত narrow হইয়া গেল কিরূপে এই একটা কথা আমি কেবলই মনে করিতেছি। ১২/৩৬৫

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর হাস্যবসের অনুসরণে কিছু শ্লেষ-এর পরিচয়ও এ-প্রসঙ্গে দেখা গেছে

> যদি ধারাবাহিক নভেল বার কর তাহ'লে যাতে বেশ সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী—তপ-জপ-কুলকুণ্ডলিনী থাকে তার চেষ্টা দেখাবে। **আর দেখবে যাতে শেষের দিকে হয় দুটো চারটে হুড়মুড় করে

> মরে যাবে (একটা বিষ খাওয়া চাই !) ...আমাকেও যদি অনুমতি কর আমি চরিত্রহীনের বদলে ঐরকম একটা চমৎকার জিনিষ অতি সত্বর লিখে দিতে পারব।...যদি আমাকে হুকুম দাও ত ঐ সঙ্গে দুটো লাল কালিতে ছাপা তন্ত্র টন্ত্র পাঠাবে বিশেষ আবশ্যক। ওগুলো এখানে পাওয়া যায় না। লিখে জানাবে কতগুলো (অর্থাৎ দুটো কি চারটে) সন্ন্যাসী ফকিরের আবশ্যক। নায়িকা সতীত্ব রক্ষার জন্য কি রকম বীরত্ব করবে তারও একটু আভাষ দিয়ে দিলে ভাল হয়। এবং ষট্‌চক্রভেদের আবশ্যক কি না তাহাও লিখিবে। ১২।৩৬০

অন্য কোন উপন্যাস সম্পর্কে শরৎচন্দ্রকে এত বিচলিত দেখা যায়নি, অবশ্য এত তীক্ষ্ণ সমালোচনার সম্মুখীনও তাঁকে কখনও হতে হয়নি। সম্ভবতঃ ঔপন্যাসিক দুঃসাহসের যে পরিচয় তিনি চরিত্রহীনের মাধ্যমে রাখতে চেয়েছিলেন সমালোচক ও প্রকাশকের তীব্র বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি বলে, অকারণ আক্রমণে তিনি এত উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বিস্মিত হতে হয় উত্তরকালে এই উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর নীরবতায়। হয়তো বা তাঁরও ধারণা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিল। অথবা সমালোচনার ঝড় স্তিমিত হওয়ার পরে প্রতিবাদের সম্ভাবনা ও বাসনাও স্বাভাবিক কারণে তিরোহিত হয়েছিল। অবশ্য সমালোচনায় নতি স্বীকার করে তিনি উপন্যাসটির সামান্য পরিবর্তন করেন।

'শেষপ্রশ্ন', শরৎ-আলোচিত আর-একটি উপন্যাস। এ বই যে 'বহু লোককেই নিরাশ করবে' এবং 'তারা কোন আনন্দই পাবে না' এ-ধারণা তাঁর ছিল। এর কারণও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন,— 'একে তো গল্পাংশ নিতান্ত কম, তাতে আবার ভেবে ভেবে পড়তে হয়, হু হু করে সময় কাটানো বা ঘুমের খোরাকের মত নিশ্চিন্ত আরামে অর্ধেক চোখ বুজে উপভোগ করা চলে না। এ ভালো লাগবার কথা নয়।'[৬] তবু এ-জাতীয় রচনায় তিনি মনোনিবেশ করেন, কারণ :

> ভাবীকালের তোমরা এই আভাসটুকু হয়ত পাবে যে নোংরা না করেও অতি আধুনিক সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল, পেলব রসানুভূতিই নয়, intellect-এর বলকারক আহার্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রস-সাহিত্যের একটা বড় কাজ।

প্রায় এই একই উদ্দেশ্য দিলীপকুমার রায়কেও ব্যক্ত করা হয়েছে :

> শেষ-প্রশ্নে অতি-আধুনিক সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই

> একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেচি। "খুব করবো, গর্জন কোরে নোঙরা কথাই লিখবো" এই মনোভাবটাই অতি-আধুনিক সাহিত্যের central pivot নয়—এরই একটু নমুনা দেওয়া।

সাধারণকে নিরাশ করলেও উপন্যাসটি যে সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করার যোগ্য, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল এবং সে-জন্যই শ্রীঅরবিন্দকে তা পড়াবার বাসনা তিনি পোষণ করেছেন।[৯] শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের মতো সমকালীন সামাজিক সমস্যা 'শেষপ্রশ্নে'রও কেন্দ্রীয় বিষয় এবং সে-জন্যেই রাধারাণী দেবীর অনেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁকে দ্বিতীয়বার 'শেষপ্রশ্ন' পড়ার নির্দেশ দেন।[১০] বঙ্কিম-উপন্যাসের উদ্দেশ্যমূলকতা শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেনি, কিন্তু তিনি নিজেই পরিশেষে এই রীতি আশ্রয় করেছিলেন ; যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে উপন্যাসের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ না করে শরৎচন্দ্র উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

শরৎচন্দ্রের একটি বিতর্কিত উপন্যাস 'পথের দাবী'। চরিত্রহীনের ক্ষেত্রে তর্কের সুযোগ ছিল বেশি, প্রতিপক্ষ ছিলেন বন্ধু, সমকক্ষ বা সাধারণ পাঠক। কিন্তু 'পথের দাবী'কে কেন্দ্র করে যে ঝড় উঠেছিল, তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিনিময়ে যাঁর স্নেহহীনতা ও উপেক্ষা শরৎচন্দ্রকে আহত করেছিল। এখানে উপদেশপ্রচারের অবকাশ ছিল না, তাই ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশের উপায় ছিল তির্যক এবং সেজন্যে শরৎচন্দ্রকে কম অনুতাপও ভোগ করতে হয়নি।

'পথের দাবী' ফাল্গুন ১৩২৯ থেকে বৈশাখ ১৩৩৩-এর 'বঙ্গবাণী'র সংখ্যাগুলিতে এবং ভাদ্র ১৩৩৩-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজদ্রোহরূপে গণ্য করে ইংরেজ সরকার পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করেন। শরৎচন্দ্র চেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রতি এই অবমাননার যথোপযুক্ত জবাব রবীন্দ্রনাথ দিন। তিনি কবিগুরুকে 'পথের দাবী' দিয়ে তাঁর মতামত প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথের উত্তর শরৎচন্দ্রকে ব্যথিত ও আহত করে। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র-বক্তব্যের মূল কথা তুলে ধরেছেন (৬ ফাল্গুন ১৩৩৩):

> শ্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি পেলাম। তাঁর অভিমত মোটের উপর এই যে, বইখানি পড়লে ইংরাজ গভর্নমেণ্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে স্বদেশে বিদেশে যত রাজশক্তি আছে, ইংরাজের মত ক্ষমাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি চাপা

দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা। অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল এ-বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন। ১৩।৪৪৮

প্রায় একই বক্তব্য রাধারাণী দেবীকে জানিয়ে মন্তব্য করেছেন :

ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে? ১০।৩৮৯

এই আঘাতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর প্রত্যাশার ইঙ্গিতটিও পত্রটিতে পাওয়া যায় :

'পথের দাবী' যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয় যে পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে গভর্নমেণ্ট কিরকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেছে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না। ইংরেজ সে পাত্রই নয়। তবু সংসারের লোকে খবরটা পাবে। ১০।৩৮৮

রবীন্দ্র-আচরণের প্রতিক্রিয়া শরৎচন্দ্রের দুটি রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছে। একটি অপ্রকাশিত পত্রে এবং অন্যটি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের সমালোচনায় ('সাহিত্যের রীতি ও নীতি', বঙ্গবাণী, আশ্বিন ১৩৩৪)।

পত্রটি (২ ফাল্গুন ১৩৩৩) 'বন্ধুদের পরামর্শে' রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠান হয়নি তবে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও ('রাজনৈতিক)-ভাবনা (এবং রবীন্দ্রভক্তি) স্পষ্ট ভাষায় এখানে প্রকাশিত :

আপনি লিখেছেন ইংরাজ রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে (বইটি পড়লে)। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম তাহলে লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুই-ই ছিল। কিন্তু জ্ঞানত তা আমি করিনি। করলে politicianদের propaganda হ'ত, কিন্তু বই হ'ত না। ১৩। ৫৪

* * বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা' বলা উচিত মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরেজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্যসেবাটাই এ ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি। ১৩।৪৫৫

শরৎচন্দ্র চেষ্টা করলেই যে নিখুঁত চিঠি লিখতে পারতেন এবং চিঠির ভাষা 'এলোমেলো' হয়ে যেত না এই চিঠিটি তার নিদর্শন।

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া যে প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে তার বিশদ আলোচনা বর্তমান

প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। তবে প্রবন্ধ রচনার কারণ সম্বন্ধে রাধারাণী দেবীকে লিখিত পত্রে যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তা এ প্রসঙ্গে মূল্যবান (১০ অক্টোবর ১৯২৭)

> আমার লেখা 'সাহিত্যের রীতি-নীতি' পড়ে তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছো লিখেছো। তোমার মনে হয়েছে রবিবাবুকে আমি অযথা কটূক্তি করেছি।***
>
> ঠিক বলতে পারিনে হয়ত এই কথা (রবীন্দ্রনাথের 'পথের দাবী' সংক্রান্ত মন্তব্য) আমার মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ছিল যখন সাহিত্যের রীতিনীতি লিখি। তাতেই বোধ হয় কোথাও কোন জায়গায় একটু আধটু তীব্রতার ঝাঁঝ এসে গেছে। ১৩।৩৯০-৯১

'ঝাঁঝ' অবশ্যই ছিল, তবে যুক্তিও উপেক্ষিত থাকেনি। শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্র সমালোচনা যুক্তি ও প্রচ্ছন্ন কটূক্তির অপূর্ব সংশ্লেষণে রচিত, শেষ জীবনে অনেক উক্তি তিনি নিজেই প্রত্যাহার করেন, অনেকগুলি এখনও স্বতন্ত্র বিচারের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

শরৎচন্দ্রের অন্য রচনাগুলি লেখকের দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ-বঞ্চিত। একটি দুটি বিশ্লেষণ বা বাক্যের মধ্য দিয়েই সেগুলি সম্পর্কে রচয়িতার মন্তব্য ব্যক্ত। 'ভাল', 'সুমিষ্ট', 'আতিশয্যপূর্ণ' এ-জাতীয় মামুলি বক্তব্যই তাদের ভাগ্যে জুটেছে।[১] পল্লীসমাজ নিয়ে সুবোধ রায়কে একটি পত্রে (১.৩.১৬) যা লিখেছেন (১৩।৪১৫) তা শুধু উপন্যাসটির পরিবেশ বিষয়ে। তবে শ্রীকান্ত-এর সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে তাঁর যে উচ্চ ধারণা ছিল দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে অনুবাদ সংক্রান্ত আলোচনা থেকে তা সহজে অনুমান করা চলে

৭ চৈত্র, ৪১ বশীশ্বর সেনের American স্ত্রী নিষ্কৃতির অনুবাদ আমেরিকায় প্রকাশ করতে চান। এ সম্পর্কে আমি ভাবি এটা নিষ্কৃতি না হলে শ্রীকান্ত হলেও না হয় কিছু আশা ছিল, কিন্তু ওদেশে নিষ্কৃতি আদর পাবে কিসের জোরে।

মণ্টু, এবার শ্রীকান্ত ধরো। বেঁচে থাকতে এর অনুবাদটা চোখে দেখে যাই। ১২।৩৫৯

৩ মাঘ '৪১ বইটার (নিষ্কৃতি) নিজস্ব গুণ এমন কি আছে মণ্টু? কেন যে শ্রীঅরবিন্দর ভালো লাগলো জানিনে।*** তুমি শ্রীকান্ত যবে প্রচার করতে পারবে তখনই শুধু আশা করবো হয়ত বাঙালী একজন গল্প লেখককে পশ্চিমের ওরা একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। ১২/৩৫৬

[রমাঁ রলাঁর অনূদিত শ্রীকান্তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় এই সত্য প্রমাণিত]

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব সম্বন্ধে একটি চিঠিতে (জ্যৈষ্ঠ [?] ১৩৪০) দিলীপ-কুমার রায়কে তিনি কিছু লিখেছেন যাব থেকে প্রমাণিত হয় 'উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্য নয়, ঘটনার অসামান্যতা নয়', 'পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি নয়' উপন্যাসে তিনি চান 'গভীরতা,' 'ইঙ্গিত'— শুধু রসিক যাঁরা, তাঁদের আনন্দের জন্য[১৩] ; এবং গৌরব বোধ করেছেন (উপন্যাস-সাহিত্যে) তিনি অন্ততঃ অসংযত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার স্বরূপ প্রকাশ কবেন নি বলে ।

আপন সৃষ্টি ছাড়া বহুজনের রচনা সম্পর্কে মন্তব্য বা সমালোচনাও চিঠি-গুলিতে পাওয়া যায় । তাঁর প্রশংসার শ্রেষ্ঠ ভাষা 'সুমিষ্ট' বা সমজাতীয় শব্দ, এবং কটু সমালোচনাব বাহন 'বটতলাব বই' কথাটি । শ্রেষ্ঠ সমালোচনার যে নমুনা তিনি সংগ্রহ করেছেন তা রীতিমতো কৌতূহলোদ্দীপক

> তোমাদের হরিদাসবাবুর মত যেন লোকে মন্তব্য প্রকাশ করে 'রামেব সুমতির নারায়ণীর মত একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছা করে।' এই সমালোচনাই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা ।

ছোটগল্পের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রেব ধারণার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়েব 'ক্রয়-বিক্রয়' ও 'লক্ষ্মীলাভ' গল্প দুটি সম্বন্ধে মন্তব্যে

> তোমার ক্রয়-বিক্রয় গল্পটা সত্যি ভাল । কিন্তু আরও একটু বড় করা উচিত ছিল ।* * * অমন গল্পটিকে যে তুমি এত তাড়াতাড়ি শেষ করলে জানি না । একটা কথা মনে রেখো, গল্প অন্ততঃ ১২।১৪ পাতা হওয়া চাই এবং conclusionটা যেন স্পষ্ট করা চাই ।
>
> তোমার লক্ষ্মীলাভ পড়িলাম ।* * * আমাব যথার্থ মত, এমন মধুর গল্প অনেক দিন পড়ি নাই । হয়ত তোমার best এটি । অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই, লোকের দোষ দেখানো, সংসারের দুঃখের দিকটা তুলিয়া ধরা ইত্যাদি কিছু নেই— শুধু একটি সুন্দর ফুলের মত নির্মল এবং পবিত্র । মধুর, অতি মধুর ! (২১.৮.১৩) পৃ. ৬৪

অবনীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনার প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাবই শরৎচন্দ্র পোষণ করতেন । সম্ভবতঃ অবনীন্দ্রনাথের ভাষার বিশেষ ভঙ্গি (সরলতা ও স্পষ্টতার অভাব) [?] এবং প্রভাতকুমারের উপন্যাসে লোক-জীবনচিত্রণ অপেক্ষা সন্ন্যাসী ইত্যাদির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে জীবনসত্যকে উপেক্ষা, তাঁকে বীতস্পৃহ করে তুলেছিল । প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একটি পত্রে (২৫শে জুলাই ১৯৩১) তিনি জানাচ্ছেন :

নোলকটা না থাকলে (ভারতবর্ষ পত্রিকায়) আরো ভাল হত। এই অবনীন্দ্র ঠাকুরের ওপর আমার ভয়ানক রাগ আছে—অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা হয় এক চোট ঝাল ঝাড়ি- কিন্তু কোনদিন করি নি। ১৩।৩৮০

এই রাগের অন্যতম কারণ হয়ত তাঁর একটি ভাবনা, যা এই বন্ধুকেই তিনি একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন :

শুনছি ঠাকুরবাড়ির প্রায় সবাই শুধু নামের জোরেই আজকাল যা তা লিখছেন। ১২।৩৬১

এই ধারণার ফলশ্রুতিতে ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কান কাটার ইতিহাস' প্রবন্ধের সমালোচনা (অনিলাদেবী ছদ্মনামে) একটু বেশি তীক্ষ্নতা পেয়েছিল (পত্রটিতে তার ইঙ্গিত আছে)।

'সাহিত্য' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পরিচালকেরা 'চরিত্রহীন'কে immoral মনে করায় (মূলতঃ এদেরই সমালোচনার ফলে শরৎচন্দ্র চরিত্রহীন উপন্যাসের সামান্য পরিবর্তন ('modified') করেন। স্বভাবতই শরৎচন্দ্র এই পত্রিকা-গোষ্ঠীর ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। ফলে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে (ভারতবর্ষ পত্রিকার অন্যতম পরিচালক) লিখিত পত্রগুলিতে এই দুটি পত্রিকার রচনা, রচয়িতা ও সেগুলির নির্বাচকদের সম্বন্ধে সকারণে, সামান্য কারণে, কখনও অকারণে তীব্র কটূক্তি করেছেন। এই সমালোচনার নেপথ্যে তাঁর একটি ধারণাই সক্রিয় ছিল—চরিত্রহীনকে যাঁরা 'immoral' মনে করেন, তাঁরা সত্য সত্যই 'immoral' রচনা প্রকাশ করেন। তিনি প্রভাতকুমারের রচনার অনুরাগী ছিলেন না বলে তাঁর প্রতি কটাক্ষের পরিমাণটা ছিল কিছু বেশি, এই বীতরাগের দুটি কারণ অন্য পত্রগুলিতে প্রকাশিত :

ভদ্রলোক প্রায় শতাবধি গল্প লিখিয়াছেন। আর যে কি চর্বিত চর্বণ করিবেন আমি ত ভাবিয়াই পাই না। ১৩।৩৭৬

কিংবা প্রভাত মুখুয্যের ··বর্ণনায় নিপুণতা, ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারি, ক'টা সোফা, প্রদীপে ক'টা সলতে দেওয়া এবং আলনায় ক'টা এবং কি পাড়ের কোঁচানো শাড়ি—এ সকলের দিনও গেছে, প্রয়োজনও শেষ হয়েছে। ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো (৪ ফাল্গুন ১৩৩৭)। ১০।৩৭৭

রচনায় অসংযম ছিল তাঁর সহ্যাতীত। শুধু প্রভাতকুমার নন, জলধর সেনকেও এ-জন্যে তিনি আক্রমণ থেকে রেহাই দেন নি (তাঁর 'মন্দির' গল্পকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন জলধর সেন) :

জলধরদা * * তাঁর কি একটা বইয়ে মরা-ছেলের বাপ-মায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইল কাঁদবার ফুসরৎ পেলে না। বস্তুতঃ লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট করে দেয়। ১০।৩৭৬

রচনায় অসংযমের নিদর্শন হিসেবে পত্রটিতে আরও দুজনের সমালোচনায় তিনি মুখর হয়েছেন :

বাড়ুয্যে চমৎকার লিখতেই পারেন কিন্তু চমৎকার না-লিখতে পারেন না। ১০।৩৭৯

আর এক ধরণের অসংযম দেখি অ-র লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে,——এ যাওয়াটাও একটা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকর ভক্তিগদ্‌গদ্ 'আদেক্‌লেপনা' প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে। ১০।৩৭৬

এই 'আদেক্‌লেপণা' অনুপস্থিত বলে দিলীপকুমার রায়ের রচনা উচ্ছ্বসিত প্রশংসিত এবং এমন একজন সংযমী লেখক সাহিত্যক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে আশ্রমবাসী হওয়ায় তিনি একাধিক পত্রে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এমন কি আপন সন্ন্যাসীজীবনের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে তাঁকে পুনঃপ্রত্যাবর্তনে উৎসাহিত করার চেষ্টাও কম করেন নি।[১৭]

অসংযমের প্রতি আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের অতিনিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করে। একাধিক প্রবন্ধে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার সময় তিনি এই ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সে সময়ে শরৎচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্র-বিরোধী এবং আধুনিকদের পুরোধা। কিন্তু রবীন্দ্রবিরোধিতার নামান্তরে আধুনিক সাহিত্যকে সমর্থন দীর্ঘকাল তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।[১৮] পত্রগুলিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর সে-মনোভাব পরিস্ফুট :

যারা নির্বিচারে স্ত্রীজাতির গ্লানি প্রচার করাকেই রিয়ালিসম্ ভাবে, তাদের আইডিয়ালিসম তো নেই-ই, রিয়ালিসম্-ও নেই। (জ্যৈষ্ঠ (?) ১৩৪০) পৃ. ১০৮

আধুনিক কথাসাহিত্যের এই দুরবস্থার কথা চিন্তার ফসল 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস :

'খুব করবো, গর্জন ক'রে নোঙরা কথাই লিখবো।' এই ধরনের মনোভাবটাই অতি আধুনিক সাহিত্যের central pivot নয়, এরই একটু নমুনা দেওয়া। (৪ কার্তিক '৩৮) পৃ. ১০৫

সাম্প্রতিক সাহিত্যের ত্রুটিবিচ্যুতির আরেক দিক উন্মোচিত হয়েছে সমকালীন পুরুষ ও মহিলা সাহিত্যিকদের রচনার তুলনামূলক বিচারে, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে (২৯. ৭. ১৯)। তাঁর ক্ষুব্ধ মন্তব্য পুরুষদের লেখা বই প্রায়ই 'অন্তঃসারশূন্য অপাঠ্য,' পনের আনাই অন্য লোকের চুরি এবং 'ইহাতে তাহারা লজ্জা পর্যন্ত অনুভব করে না।' (১৩।৪২৫) অন্যপক্ষে লেখিকাদের রচনাগুলি 'অন্ততঃ কাহারো চুরি নয়। তাহারা যাহা কিছু ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে দেখিয়াছে, নিজের জীবনে যথার্থ অনুভব করিয়াছে তাহাই কলম দিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং তাহাতে কৃত্রিমতাও বেশি থাকে না' (১৩।৪২৫)। এই গুণের জন্যেই পত্রের প্রাপিকার রচনা প্রশংসিত হয়েছে ('রচনা হিসাবে খুব ভাল না হইলেও')

অবশ্য লেখিকাদের রচনার কৃত্রিমতা যে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তা নয়। রাধারাণী দেবীর 'লীলাকমল' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষার 'বাঁধুনি' ও প্রকাশভঙ্গী'র জন্যে কাজটির প্রশংসা করে পরিশেষে লিখছেন :

> তবু একটা কথা যেন মাঝে মাঝে ছুঁচের মত বেঁধে—সে এই যে, ভাবুকতায় এই কাব্যগ্রন্থখানির এত শোভা এত বর্ণচ্ছটা শব্দবিন্যাসের এমন মাধুর্য্য—কিন্তু কোথাও তাদের বনিয়াদ প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হৃদয়ের সম্পর্কে এদের নিগ্যতা নেই। ১২।৩৪৯

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও যে সাহিত্য রচনা করা যায়, এ-সত্য শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল, তাই মহিলাকবির 'হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে' একান্ত কৃত্রিম মনে করা আরও সহজ হয়েছে। (অবশ্য লীলাময় রায় ছদ্মনামের আড়ালে অন্নদাশঙ্কর রায়ের সমালোচনাকে সমর্থনের পরিবর্তে তিনি ব্যঙ্গই করেছেন।)

স্নেহ ও প্রীতির স্পর্শে দুজনের রচনা তাঁর অননুমোদন থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে--একজন নিরুপমা দেবী, অন্যে দিলীপকুমার রায়। নিরুপমা দেবীর রচনার প্রশংসায় এই মহিলা কথাসাহিত্যিককে তিনি নিজেরও ওপরে স্থান দিয়েছেন।[১°] অথচ সেকালের শক্তিমতী লেখিকা অনুরূপা দেবী বেশি জ্ঞান প্রকাশ ও প্রচারের অজুহাতে তাঁর রচনার যথার্থ মূল্যটিও আদায় করে নিতে পারেন নি। আর দিলীপকুমার রায়ের সংযম ও সংলাপ-এর 'প্রৌঢ়-শোভন নিপুণতা' অতি সহজে শরৎচন্দ্রের হৃদয় কেড়ে নিয়েছিল। ইতস্তত দু-একটি ত্রুটির উল্লেখ করলেও তিনি দিলীপকুমার রায়ের মধ্যে রবীন্দ্র-শরতোত্তর যুগের অন্যতম মহৎ স্রষ্টার সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছিলেন।

চিঠিপত্রে সাহিত্য-আলোচনায় একটা ঢিলেঢালা, 'এলোমেলো' ভাব পূর্বোক্ত আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কিন্তু এর ঠিক বিপরীত চিত্র প্রমথ চৌধুরীর

সঙ্গে পত্রালাপে। এখানে শরৎচন্দ্র মনোযোগী, সাবধানী, প্রতিটি শব্দ-প্রয়োগেও সতর্ক, সমালোচনায় সংযমী, প্রশংসায় স্বল্পবাক অথচ উচ্ছ্বসিত। বিনয় ও শ্রদ্ধায় তিনি অনুগত, কিন্তু সমালোচনায় নম্র হয়েও স্পষ্টবাক। প্রমথ চৌধুরী উপহৃত 'চার ইয়ারী কথা' পাঠের প্রতিক্রিয়ায় তিনি লিখছেন :

> এর বিশেষ সুখ্যাতি করতে যাওয়ার নাম এর সমালোচনা করা।* * এ লেখার মধ্যে যে কত জোর, কত সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে, এর নিজস্ব সৌন্দর্য্য কোন্‌খানে, কোথায় এর মধুর কাব্যরস—সবচেয়ে এ লেখা লিখতে পারা যে কত শক্ত, একথা বুঝবে বোধকরি শুধু তারাই যাদের নিজেদের হাতে-কলমে লেখার বাতিক আছে। (২১. ৯. ১৬)
>
> ১৩।৪১৮

> এক রবিবাবুর লেখা পড়ে মনে হয়েছে চেষ্টা করলেও আমি এমন পারিনে, আর কাল আপনার এই গল্পের বইটা পড়ে মনে হ'ল চেষ্টা করলে আমি এমন করে কিছুতেই লিখতে পারিনে। ১৩।৪১৯

> 'সোনানাথের গল্প'টা শেষ করে * * আমার মত এই বলে যে, এ বই পড়া উচিত তাদেরই বেশি কোরে যারা নিজেরা বই লেখে। এর নির্মল লিখনভঙ্গী, সোজা সরল কথোপকথন অথচ এমনি রসে ভরা, মনের ভাবটা বলবার এই অনাবিল মুক্ত পথ তাঁরা যত শিখতে পারবেন, যারা বই লেখে না তারা তেমন করে শিখতে পারবে না। তাদের শুধু ভালই লাগবে কিন্তু গ্রন্থকারদের ভালও যেমন লাগবে শিক্ষাও তেমনি হবে।* * আপনি দয়া করে এইটে মনে করবেন না যে আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ভেতর এতটুকু অত্যুক্তি—'খোসামদ' নাই আছে।
>
> ১৩।৪১৯

> পাঠকের Intelligence এবং culture একটা বিশেষ সীমায় না পৌঁছন পর্যন্ত তারা এ বইয়ের সমঝদার হতেই পাবে না। ৪১৯।২০

এই প্রশংসার পাশেই মার্জিত সমালোচনা :

> 'বড়বাবুর বড়দিন' * * আমার কিন্তু ভাল লাগল না। বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের খোঁচায় মানুষের বিশেষ কোন একটা বাঁদরামি প্রবৃত্তিকে পাঠকের কাছে রিডিক্লাস করে তুলতে আপনি ভারি পারেন, কিন্তু আমি দেখি মানুষকে মানুষ ক'রে দেখাবার ক্ষমতা এর চেয়েও আপনার ঢের বেশি।
>
> (১২. ১০. ১৬.) ১৩।৪২১

চেষ্টা করলে তিনিও যে অন্ততঃ কখনো কখনো 'তেমন করে' লিখতে পারতেন এ-লেখা তারই প্রমাণ। শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে, তিনি 'নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ' করেছেন।

শরৎ-পত্রে রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রসঙ্গ এসেছে মূলতঃ সাহিত্যিক আদর্শের নিদর্শন হিসেবে। চোখের বালি, সম্পর্কে মন্তব্য (তাও রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা নয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পরিচালকদের চরিত্রহীন সম্পর্কে মন্তব্যের উত্তর (ছাড়া কটাক্ষ কোথাও নেই, তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বলতার সুন্দর ছবি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন সংক্ষিপ্ত আলোচনায় (প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে এর নিদর্শন পাওয়া গেছে) ঃ

> রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার সফল চেষ্টা করিয়াছেন। (১৫. ১১. ১৫) ১৩।৪০৭
>
> বঙ্গদর্শনে যখন রবিবাবুর 'চোখের বালি' আর 'নৌকাডুবি' বার হয় লোকে যেন বঙ্গদর্শনের আশায় পথ চেয়ে থাকত (২২ মে ১৯১৩)। ১২।৩৬৬

প্রতিভার ক্রমস্তিমিত ভাবের ছবিও আছে একটি ক্ষেত্রে ঃ

> বুড়ো হওয়ার পুরোপুরি লক্ষণই হচ্ছে এই বকা। বাজে বকা। ধান ভানতে দিয়েছ কি তান ধরবে সেই সময়ে শিবঠাকুরের গানের। দেখছ না তোমাদের গুরুদেবের কলমের কাণ্ড। একটা পয়েণ্টে কথা সুরু করে কোথায় কোন্ দিকে কোন্ পথে যে চলে যান তার আর হালহদিশ খুঁজে মেলা (?) দায় হয়। যদিও তোমরা (তার সঙ্গে উনিও [রবীন্দ্রনাথ] তা কিছুতেই মানতে চাও না। (রাধারাণী দেবীকে) ১২।৩৫২-'৫৩

রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে হিউমার, এই একবার মাত্র করা হয়েছে।

রবীন্দ্রভাবনার বিরোধিতা পাওয়া যায় দুটি মাত্র ক্ষেত্রে—'পথের দাবী' সম্পর্কে রবীন্দ্রবক্তব্যেব (পূর্বে আলোচিত) এবং দিলীপকুমার রায়কে লিখিত একটি পত্রে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সাহিত্যের ভোজে অনেকেরই 'মানসিক ঔদার্যে'র একান্ত অভাব তাই একদলের জন্যে 'সন্দেশ' অপরদলের জন্যে চিঁড়ে-দইয়েব ব্যবস্থা করা হয়। এর জবাবে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন :

> আজকের দিনে তাঁরা চিঁড়ে মুড়কিতেই thrive করে এ কথা অস্বীকার করবে কি করে' (২২ ভাদ্র ১৩৩৬) পৃ. ১০২

ববীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ধারণা ছিল, সেগুলি অকারণ উপমা ও উদাহরণ-ভারাক্রান্ত এবং অস্পষ্ট। একাধিকার, রবীন্দ্রবক্তব্য না অনুধাবন করতে পারবার অভিযোগও তিনি এনেছেন। এই সমালোচনাও সম্ভবতঃ সেই দোষদুষ্ট। সর্বসাধারণের সাহিত্য কথাটা তিনি বুঝতে চাননি অথবা বুঝেও তা সমর্থন করতে পারেন নি, যদিও তাঁর রচনা ছিল সর্বজন-আদরণীয়।

মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে শরৎ-ভাবনার প্রকাশ কাজী আবদুল ওদুদ ও জাহান-আরা বেগমকে লিখিত পত্র দুটিতে পাওয়া যায়। ওদুদ-এর 'মীর পরিবার' গ্রন্থের ভাষা-আলোচনায় তিনি বলেছেন উর্দু কথার আধিক্য গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, কারণ 'তা না হইলে পাঠক-পাঠিকা কখনই ইহাকে নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ' করত না। বলত, 'হিন্দুদের ভাষা, আমাদের নয়।' তাঁর মতে দু জাতির 'সাহিত্যের সংযোগের' এটাই 'সবচেয়ে ভাল উপায়।' (১৩।৪২২)। জাহান আরা চৌধুরীকে লিখিত পত্রে (১২ মাঘ ১৩৪২) বাংলা সাহিত্যকে 'হিন্দু সাহিত্য' নামে অভিহিত করার লোকপ্রচল অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন 'আক্ষেপের প্রকাশ ত যুক্তি নয়' (১১৯)। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত এই সত্য স্বীকার করে তিনি জানিয়েছেন :

> সাহিত্যের সেবক যাঁরা, তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি করে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচোতে হবে। (১২০)

অর্থাৎ, বাংলা সাহিত্যের এই দুর্বলতা দূর করবার দায়িত্ব মুসলমান কথা-সাহিত্যিকেরই। এই মন্তব্যে নিহিত সত্য আজও স্মরণীয়।

নাটক-প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে। নাটক রচনা সম্পর্কে তাঁর অনাগ্রহের কারণ ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন :

> নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভালো না হলে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি করতে হয় চরিত্র-সৃষ্টির জন্যেই। চরিত্র-সৃষ্টি দু রকমের হতে পারে :—এক হচ্ছে প্রকাশ অর্থাৎ পাত্রপাত্রী যা, তাই ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্তন দেখানো। ... উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই। ১০।৩৮৮-'৮৯

শরৎ-পত্রে সাহিত্যের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে দুভাবে ব্যক্তিবিশেষের রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে এবং শুধু নন্দনতাত্ত্বিক ধারণার প্রকাশে। কথাসাহিত্যের বিষয়ের জন্যে তিনি জোর দিয়েছেন লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপরে এবং প্রকরণের জন্যে ভাষার সংযমের প্রতি :

> আশ্রমে বাস করে সে বস্তু (সাহিত্যরচনা) কখনো হবে না। জীবনে

> যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের-মুখে-ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন জোগাবে ? ১০।৩৭৯
>
> অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা যায়। (১৫. ১১. ১৫) পৃ. ৯০
>
> লেখাই শক্ত নয়, না লেখার শক্তিও কম নয়। অর্থাৎ ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন করে না রাখি। অলিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ করে তোলবার অবকাশ প্রায় * * লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট করে দেয়। (৪ ফাল্গুন ১৩৩৭) পৃ. ১০।৩৭৮

প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্রে এই সংযমকে 'art to hide art' বলা হয়েছে (১৩।৪১৯)।

সাহিত্যে সত্য ও সুন্দরের মিলন ও বিরোধ নিয়ে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন একটি পত্রে। রবীন্দ্রনাথ ও কীটস্ এ-প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, শরৎচন্দ্র সমাধান খুঁজে পান নি, কিন্তু যে দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি প্রশ্নটিকে বিচার্য করে তুলেছেন তা অবশ্যই অনুপেক্ষণীয় :

> কলা-সাধনার মূল সূত্র হলো সত্য, শিব এবং সুন্দর। অথচ, সাহিত্য-সেবায় বহুদিন ব্রতী থেকে নিরন্তর অনুভব করি এখানে সত্য, এবং সুন্দরে বাধে পদে পদে বিরোধ। জগতে যা ঘটনায় সত্য, সাহিত্যে হয়ত সে সুন্দর নয়, এবং যা সুন্দর সে হয়ত সাহিত্যে একেবারে মিথ্যা। যাকে সত্য বলে জানি, তাকে মূর্তি দিতে গিয়ে দেখি সে হয়ে ওঠে বীভৎস কদাকার, আবার অসত্যকে বর্জন করেও পাইনে সুন্দরের রূপ। তেমনি মঙ্গল-অমঙ্গলও। ১০।৩৮৬

সাহিত্যে কোন বিশেষ রীতি বা নীতি পন্থী তিনি ছিলেন না। দিলীপকুমার রায়কে এ প্রসঙ্গে একটি পত্রে তিনি লিখেছেন :

> কতকটা তোমার মতই আমি ঐ বুলিগুলো মানিনে। যেমন Art for art's sake, ধর্ম for ধর্মের sake, truth for truth's sake ইত্যাদি। Art-এর উপলব্ধি সকলের এক নয়, ওটা ভিতরের বস্তু, ওর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে যাওয়া এবং তারই পরে একঝোঁকা জোর দেওয়া অবৈধ। ১১।৪৫৭

সাহিত্যের কোন সংজ্ঞা কোন নীতিতে তাঁর আস্থা ছিল না, কিন্তু রচনার রীতি সম্বন্ধে তাঁর একটি মত ছিল :

> মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না, ক্রিটিকও থাকে। বয়সের সঙ্গে এই ক্রিটিকই বাড়তে থাকে। তাই বেশি বয়সে লোক যখন লিখতে যায়, ক্রিটিকটি প্রতি হাতে তার হাত চেপে ধরতে থাকে। সে লেখা জ্ঞান, বিদ্যে, বুদ্ধির দিক দিয়ে যত বড় হয়ে উঠুক, বয়সের দিক দিয়ে তার তেমনি ত্রুটি ঘটতে থাকে। তাই আমার বিশ্বাস। যৌবন উত্তীর্ণ করে দিয়ে যে ব্যক্তি রসসৃষ্টির অয়োজন করে সে ভুল করে। (আষাঢ় ১৩৩৫ পৃ ১০১)

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বে 'উপাদান ও উপকরণের প্রাচুর্য', 'ঘটনার অসামান্যতা' এই কারণেই তিনি পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন এবং শরৎচন্দ্রের এই উপলব্ধি 'শেষ প্রশ্নে'র পাঠক সহজেই অনুভব করতে পারবেন।

শরৎচন্দ্রের চিঠির ভাষা অগোছালো, বক্তব্য এলোমেলো, ভাষায় অজস্র সাধারণ ব্যাকরণঘটিত ত্রুটি (সাধু-চলিতের মিশ্রণ, Syntax-এ, 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদিতে) থাকলেও তিনি সহজ, সরল কখনো সাবলীল ভাষায় তাঁর সাহিত্যভাবনাকে রূপ দিতে পেরেছেন। অবিমিশ্র শ্রদ্ধা বা নিন্দা সেখানে নেই, সমালোচনার সময় প্রীতি বা শ্রদ্ধা আসল কথাকে আচ্ছন্ন করে তোলে নি। একান্ত অন্তরঙ্গের ত্রুটি ঢেকে রাখা ও সাজানো কথায় সমালোচনা ভরিয়ে তোলা ছিল তাঁর চিন্তার বাইরে। রক্ষণশীলতা বা কালাপাহাড়ী মনোভাব কোনটাই তাঁর পথ নয়, 'চরিত্রহীন' প্রসঙ্গে ও আধুনিককথাসাহিত্যের সমালোচনায় তার পরিচয় আছে। সাহিত্যের একটি নীতিই তিনি স্বীকার করতেন, তা হবে জীবন-সম্বদ্ধ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা পর্যন্ত বর্ধিত; রীতিতে থাকবে সংযম, উদ্দেশ্য হবে রস-পরিবেশন কিংবা ব্যথিতের আর্তির বাহন। এই উদ্দেশ্যচালিত হওয়াতেই তাঁর রচনায় 'নারীর দৈহিক সতীত্ব ও মানবিক মহত্ত্ব সমার্থসূচক নয়'—এই সত্য বারবার উচ্চারিত। শরৎসাহিত্য-ভাবনার স্মরণীয় বিশিষ্টতা, এ-তাঁর একান্ত নিজস্ব ধারণা-জাত, এর জন্যে তিনি কারও কাছেই ঋণী নন; তিনি 'দশ বৎসর Physiology, Biology, and Psychology এবং কতক History পড়েছেন,[১৮] 'শাস্ত্রও কতক পড়েছেন, কিন্তু সাহিত্য-তত্ত্ব পাঠে দীর্ঘকাল কাটান নি।

১. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র 'তোমার পত্র পাইয়া জবাব লিখিতেছি। এমন ত হয় না। যে আমার স্বভাব জানে তাহার কাছে নিজের সম্বন্ধে এর বেশি জবাবদিহি করা বাহুল্য।' (২২ ৩ ১২)

২ কালিদাস রায়কে 'কবি নই, মনের মধ্যে কথা জমে উঠলেও তোমাদের মত প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাইনে গুছিয়ে বলা হয় না। তাই চিঠি হয়ে যায় আমার চির দিনই এলোমেলো।' (৫ ভাদ্র ১৩৩৮) ১০।৩৮৩

লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে (৯ আগস্ট ১৯২০) 'বই আমি যাই লিখি না কেন, এলোমেলো চিঠি লেখায় আমার সংরক্ষ হইতে পারে এরূপ ধ্যা্ত যথেষ্ট নাই।' ১৩।৪৩৪

রবীন্দ্রনাথকে (১৬ ফাল্গুন ১৩৩৪). আমার চিঠি লেখার ধরণটা বড় এলোমেলো —কোন কথাই প্রায় গুছিয়ে বলতে পারিনে।' ১৩।৩৬৭

দিলীপকুমার রায় (৩ মাঘ ১৩৪১) চিঠি লেখার ব্যাপারটা চিরকালই আমার কাছে জটিল। যেন কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারিনে। তাই যে-সব কথা বলা আমার উচিত ছিল অথচ বলা হলো না, সে আমার অক্ষমতার জন্যে, অনিচ্ছার জন্যে কখনো নয়। ১২।৩৫৭

৩ ফণীন্দ্রনাথ পালকে (২৮ ৩ ১৩) আমার এ চিঠিটি কাহাকেও পড়িতে দিবেন না। পৃ ৮৪।

রাধারাণী দেবীকে (১০ ১০ ২৭) ' একটা কথা তোমাকে বলি ই কারকে বোলো না। ১০।৩৮৮

৪ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে (১০ ১ ১৩) তুমি কাশীনাথ সমাজপতিকে দিয়ে ভাল কর নি।... ছাপান ত দূরের কথা, লোককে দেখান উচিত নয়।... সমাজ পতিকে লিখে দিয়ো 'কাশীনাথ যেন প্রকাশ না করে। যদি করে ত আমি লজ্জায় বাঁচব না। প ৫৪। ২৬ ৪ ১৩ ... একেবারে ইচ্ছা নয় চন্দ্রনাথ যেমন আছে তেমনি ভাবে ছাপা হয়'। প ৫৭

৫ প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র (৪ ৪ ১৯১৩)। দ্র: শরৎসাহিত্য সংগ্রহ দ্বাদশ খণ্ড পৃ ৩৮০

৬ ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে লিখিত পত্র (৪ জ্যৈষ্ঠ' ৩৮)। দ্র ১০।৩৮০

৭ ঐ ঐ । দ ১০।৩৮১

৮ ৩০ বৈশাখ ১৩৩৮। দ্র ১১।৭০৩

৯ দ্র ঐ । প ৪০৬

১০ ৩০ বৈশাখ ১৩৩৮। ১২।৩৫৫

১১ ১০ অক্টোবর ১৯২৭। ১০।৩৮৮-'৮৯

১২ 'পথনির্দেশ' এবং 'বামের সুমতি' সম্বন্ধে আমার অভিমত পথনির্দেশ'টাই ভাল ' উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে (১০. ৫. ১৯১৩) পৃ ৬১

'চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প,. কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে ফণীন্দ্রনাথ পালকে (৩. ৫. ১৩), পৃ. ৮০

'দেবদাস ভাল নয় প্রমথ, ভাল নয়' ১২।৩৭৪

দেবদাস' নিয়ো না, নেবার চেষ্টাও ক'রো না। ওটার জন্যে আমি নিজেই লজ্জিত। ওটা immoral বেশ্যা চরিত্র ত আছেই তাছাড়া আরও কি কি আছে বলে মনে হয় যেন'? প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ' ১৩।৩।১৬

১৩ দ্র পৃ ১০৬

১৪ প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে। দ্র. ১২।৩।১৪

১৫ তোমার নামে তো আর ওখানে টিকিট ছিল না যে সব হতে গেল। ব্যাস, আর না। এই পর পাবা মাত্র চলে আসবে। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার কথাটা শুনো। ১৩. ৬. ২৯। ১৩।৩।১৫

১৬ অবশ্য আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের প্রতি তার প্রীতিরও অভাব ছিল না। 'নবীন লেখকদের প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহ এবং টান আছে।' (১০. ১০. ২৭) ১০।৩৪৮

১৭. নিরুপমাকে দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি সত্যই লেখেন ভাল। অনেক সময়ে এবং বেশী ভাগ সময়ে আমার চেয়ে তার লেখা ভাল বলেই আমার মনে হয়।' (চৈত্র ১৩১৯) পৃ. ৭৮

১৮ দ্র প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র। ২২. ৩. ১২। পৃ ৬৬

প্রবন্ধটিতে শরৎ পত্রের উদ্ধৃতি 'শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ' (এম. সি. সরকার) এবং 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ) গ্রন্থ থেকে নেওয়া। প্রথমে খণ্ড সংখ্যা ও পরে পৃষ্ঠা সংখ্যা না থাকলে বুঝতে হবে উদ্ধৃতি শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

প্রসঙ্গ শরৎসাহিত্য ও সমকালীন সারস্বত সমাজ

অনির্বাণ রায়চৌধুরী

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পর আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা কথাসাহিত্যের উষর ভূমিতে তাঁর কুশলী লেখনী চালনায় যে ভূমিকর্ষণ ও বীজবপনের কাজ করে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুবিপুল প্রতিভাবলে তাতে জলসিঞ্চন করে ভূমির উর্বরতাশক্তি বাড়িয়ে অঙ্কুরিত বৃক্ষশিশুকে অসীম আকাশের ইশারা জানিয়ে দিয়েছিলেন; আর শরৎচন্দ্র তাকে যৌবনকালে উত্তীর্ণ করে দিয়ে পর্ণেপুষ্পে সুসজ্জিত করে তুলেছেন।

বাংলা সাহিত্যের পাঠক-সমাজ যখন একদিকে বঙ্কিমের উচ্চ আদর্শ-বাদিতা, রোমান্সসুলভ ঐতিহাসিক কল্পনাবিলাস এবং উচ্চবিত্ত সামাজিক জীবন ও চারিত্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জটিলকাহিনী বিন্যাসের কলাকৌশলে ক্লান্ত, অন্যদিকে যখন রবীন্দ্রনাথের শব্দজালজটিল আধুনিক সমস্যাসঙ্কুল ঘটনা ও চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সর্বোপরি উচ্চকোটির কল্পনা, ভাবসিদ্ধি ও নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশুদ্ধ গল্পরসপিপাসু পাঠকের মনকে তৃপ্ত করতে পারছিল না, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরীর লঘুহাস্যরস পাঠকহৃদয়ে গভীরভাবে সাড়া জাগাতে অপারগ হয়ে পড়েছিল, তখন সবার পরিচিত বাঙালী জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু, দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সমৃদ্ধ কাহিনীপ্রধান গল্প-উপন্যাস নিয়ে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব এবং অচিরেই বাঙালী পাঠক-সমাজের কাছে কিম্বদন্তীর পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় এক অভাবনীয় ঘটনা।

শরৎচন্দ্র তাঁর সমকালের চোখে তো বটেই, তাঁর পরবর্তী কালের চোখেও তিনি সমান বিস্ময়। তাঁর সাহিত্যচর্চা, জীবনযাপন, সামাজিকতা প্রভৃতি সমস্ত কিছুর মধ্যেই এই বিস্ময়ের বীজ নিহিত রয়েছে।

শরৎচন্দ্রের সমগ্র জীবন (জন্ম ১৫. ৯. ১৮৭৬ এবং মৃত্যু ১৬. ১. ১৯৩৮) অতিবাহিত হয়েছে বিচিত্র পরিবেশে। দেবানন্দপুরে গাঙ্গুলীবাড়ির বিরাট যৌথ পরিবারে আকৈশোর অবস্থিতি, ভাগলপুরে ভদ্র পরিবারের সাহিত্যিক পরিবেশ, এখানকার খ্যাতনামা উকিল শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্র

প্রতিষ্ঠিত 'আদমপুর ক্লাবে'র সাংস্কৃতিক আবহাওয়া, বন্ধু রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের ('শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ) উদ্দাম সাহচর্য, লেখক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সাহিত্য ও সঙ্গীতের সান্ধ্যবৈঠক, মজঃফরপুরে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, লেখিকা অনুরূপা দেবীর গৃহে এবং পরে স্থানীয় জমিদার মহাদেব সাহুর ('শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কুমার সাহেব) মজলিসী আবহাওয়া, রেঙ্গুনের প্রবাস-জীবনে ইরাবতীর নির্জনতা, বিশৃঙ্খল জীবন-যাপন, ভবঘুরে বৃত্তি, শিবপুরের শহরজীবনে সামাজিকতা, সাহিত্যিক-পরিবেশ, রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ, স্বদেশচেতনা এবং পানিত্রাসের পল্লীবাসে সামাজিক সঙ্কীর্ণতা, কু-সংস্কার, জাতিগত ভেদ-প্রবণতা প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার পরিধিকে প্রসারিত করেছে, এই সমস্ত অভিজ্ঞতায় তাঁর লেখক-চরিত্রটিও গড়ে উঠেছে।

শরৎসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন যদিও শরৎচন্দ্রের সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা উন্মেষে ভাগলপুরের ভট্ট পরিবারের প্রত্যক্ষ সাহায্যের গুরুত্বই বেশি, তবু এ-কথা স্বীকার করতেই হয় যে, তাঁর সাহিত্যিক পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলির সম্ভাব্য সমাপ্তি-চিন্তার অনুপ্রেরণাতেই শরৎচন্দ্রের জীবনে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। মামার বাড়ি দেবানন্দপুরে থাকার সময়ে গ্রামের জমিদার দত্তমুন্সীবংশের কৃতিসন্তান অতুলচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, উৎসাহ ও আগ্রহেও সম্ভবতঃ তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ভাগলপুরে টি. এন জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনেক আগেই এই দেবানন্দপুরেই তিনি 'কাকবাসা' শীর্ষক গল্প এবং প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালার সহপাঠী বন্ধু কাশীনাথের নামটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য সেই নামের অনুসরণে 'কাশীনাথ' বড় গল্পটি লিখেছিলেন। এ ছাড়া 'কোরেল গ্রাম' (পরে 'ছবি' নামে পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত) সুদীর্ঘ গল্পটিও এ-সময়কার রচনা।

এরপর ভাগলপুরে ভট্ট পরিবারের নিরুপমাদেবী (পরবর্তীকালে 'দিদি', 'শ্যামলী' প্রভৃতি উপন্যাসের খ্যাতনাম্নী লেখিকা), বিভূতিভূষণ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রতিবেশী মাতুল সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ প্রমুখের সাহিত্যচর্চার ফলে যে সাহিত্যসভার সৃষ্টি হয়, শরৎচন্দ্র তার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। এই সাহিত্যসভার মুখপত্র হাতেলেখা 'ছায়া' পত্রিকায় প্রধান আকর্ষণ ছিলেন তিনি। এই সময়কার সমস্ত রচনাই শরৎচন্দ্রের তিনখণ্ড 'বাগান' খাতার অন্তর্ভুক্ত এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই রচিত।

তারপর জীবনের বিভিন্ন পর্বে সাহিত্যচর্চার সূত্রে শরৎচন্দ্র এদেশের অনেক জ্ঞানীগুণী সাহিত্যরসিক মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন এবং ক্রমশঃ তাঁকে ঘিরে অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দের একটি বড়ো গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন 'বিচিত্রা'র প্রধান পুরোহিত, তেমনি শরৎচন্দ্রও হয়ে ওঠেন 'ভারতী'-গোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ। মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাবের অধিকারী বৃহত্তর পাঠকসমাজে শুধু নয়, শরৎচন্দ্রের প্রতিভা অবিসংবাদিত হয়ে উঠেছিল আপামর বাংলার সারস্বত সমাজে।

শরৎসাহিত্যের যে সমস্ত মণিমুক্তাকে উপলক্ষ করে সারস্বত সমাজের এত ঔৎসুক্য, এখন সেগুলির কিছু প্রাসঙ্গিক পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যভাবনার আশ্রয়—পরিবার ও পারিবারিক সমস্যা, এবং এই-ই ক্রমশঃ বৃহত্তর সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত সমস্যার অবলম্বন সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নরনারীর প্রেম। শরৎচন্দ্র আদর্শবাদী শিল্পী ও দরদী হৃদয়ের অধিকারী। সামাজিক কুশাসনে পিষ্ট নারীসমাজের প্রতি তাঁর সর্বাত্মক সহানুভূতি। তাঁর সাহিত্যে নিজস্ব গণ্ডী-বদ্ধ ব্যক্তিমানুষের চেয়ে সমাজের বিস্তৃত অঙ্গনে সাধারণ সামাজিক মানুষের দাবি বেশি এবং সমাজের তথাকথিত নীচুতলার শোষিত নরনারীর প্রতি সমবেদনায় তিনি অধিক আর্দ্রহৃদয়। এই সমবেদনা তাঁর আদর্শবাদ-বিরোধী নয়। তিনি বস্তুরসের কথাকার হলেও বস্তুতান্ত্রিক লেখক হওয়ার ঝোঁকে শুধু সমাজের ক্লেদ-গ্লানি-কুশ্রীতা উদঘাটনকেই সাহিত্যচর্চার একমাত্র লক্ষ্য বলে ভাবেননি। মোহিতলাল মজুমদারের মতও অনুরূপ।—তিনি লিখেছেন,

'শরৎচন্দ্র বস্তুতান্ত্রিক বা Realist নহেন। তিনিও একজন বড় Idealist,...বঙ্কিমের কল্পনায় ছিল একটা বড় Ideal এর Sentiment, রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় Real ও Ideal-এর সমন্বয় চেষ্টা। শরৎচন্দ্রের কল্পনা ঐ অতি Real-এর একটা emotional প্রতিরূপ।'
('শরৎচন্দ্র'/আধুনিক বাংলা সাহিত্য, পৃ ১৯৮-৯৯)।

শরৎচন্দ্রের আদর্শবাদিতার প্রমাণ তাঁর 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি। এটিকে ঘিরে সবাই যখন নীতির প্রশ্ন তুলছিল, তখন এই উপন্যাসটি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব অভিমত

'এটা একটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical Novel!' (যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত পত্রাংশ)।

শরৎচন্দ্রের মন বিপ্লব-মুখী নয়, সংস্কার-ধর্মী। সমাজের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও তিনি বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন নি, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি সামাজিক

সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। মননশীলতার অভাবও তাঁর চরিত্রগুলিকে সর্বদা প্রার্থিত সাফল্য দেয়নি।

তবু সংকীর্ণতা সত্ত্বেও শরৎ-সাহিত্যের সামাজিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁর সাহিত্যের বিস্তার। সমকালীন অন্যান্য লেখকদের তুলনায় শরৎ-সাহিত্যে সমাজ ও সমকালের দাবি অনেক বেশি।

'বড়দিদি', 'দেবদাস', 'পরিণীতা', 'কাশীনাথ', 'নববিধান', 'পথনির্দেশ', 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি উপন্যাসে শরৎচন্দ্র রোমান্সধর্মী হলেও সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে 'নিষ্কৃতি', 'মেজদিদি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি বড়গল্পে সহজ বাঙালী সংসার-জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাত ও মিলনমাধুর্যের ছবি, 'বিরাজ-বৌ', 'দেনাপাওনা', 'দত্তা', 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন', 'শেষপ্রশ্ন', 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজজিজ্ঞাসার পর্বান্তর। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সচেতন সমাজ-ভাবনার পরিচয় ফুটে উঠেছে 'চন্দ্রনাথ', 'পণ্ডিত মশাই', 'বামুনের মেয়ে', 'অরক্ষণীয়া', 'পল্লীসমাজ', 'শুভদা' প্রভৃতি উপন্যাসে ও 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' শীর্ষক দুটি ছোটগল্পে। পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্রের স্বাদেশিকতাবোধের রক্তাক্ত স্বাক্ষর 'পথের দাবী'।

এই সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির জন্যই শরৎচন্দ্র সমকালে বিদগ্ধ সারস্বত সমাজের প্রীতিধন্য হতে পেরেছিলেন।

২

গ্রন্থপ্রকাশের সূত্রে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সাহিত্যজীবন প্রায় আড়াই দশক। তাঁর জীবৎকালে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ 'বড়দিদি' (১৯১৩) এবং শেষ গ্রন্থটি 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)। তাঁর প্রথম জীবনের রচনা 'শুভদা' (১৯৩৮) ও শেষ জীবনের 'শেষের পরিচয়' (১৯৩৯) উপন্যাসটি ছাড়া শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের প্রধান রচনাগুলি সমস্তই তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত হয়েছে।

সমকালে দেশের অন্যান্য মনীষীদের যেমন, তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন শরৎচন্দ্র। বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎ-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক হিসাবে শরৎসাহিত্যের আলোচনা করেছেন। শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর যে বিশেষ আগ্রহ ছিল, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় কবিতা 'সাধারণ মেয়ে।' তাছাড়া, বিভিন্ন অভিনন্দনপত্রে, ভাষণে তিনি শরৎচন্দ্রকে বাংলা কথাসাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নি।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মন্তব্য :

'The latest of the leaders who through this path of liberation, has guided Bengali novels nearer to the spirit of modern world literature is Sarat Chandra Chatterjee...He has achieved the best reward of novelist : he has completely won the hearts of Bengali readers.' (শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'র দিলীপকুমার রায় কৃত ইংরেজী অনুবাদ "Deliverance"-এর ভূমিকাংশ)

এ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের এই কথাটাই সম্ভবতঃ শেষ কথা। শরৎচন্দ্র বাঙালী পাঠকের হৃদয়জয় করেছেন—এই সত্যটিই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন। বিশ্বসাহিত্যের একজন নিষ্ঠাবান পাঠক হিসাবেও। শরৎচন্দ্রের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা থাকার জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটকটি শরৎচন্দ্রের পঞ্চপঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁকে উৎসর্গ করে লিখেছেন,—

'তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামে একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষ ভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্বাদ সহ তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।' (১৬. ৯. ১৯৩২ তারিখে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত দেশবাসীর অভিনন্দনসভায় প্রেরিত বাণী)।

রবীন্দ্রনাথের মত সমকালীন মনীষীদের মধ্যে শরৎ-সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ, আচার্য অবনীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রমথ চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ফরাসী সাহিত্যিক রমাঁ রলাঁ প্রমুখ।

তাছাড়া, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দিলীপকুমার রায়, অনিলবরণ, সুভাষচন্দ্র বসু, মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সুধীবৃন্দ শরৎসাহিত্য ও ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা লাভ করেছিলেন।

এমন কি শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত নরেন্দ্রদেব সম্পাদিত 'শরৎবন্দনা' গ্রন্থটির লেখকসূচী দেখলে কিছুটা অনুমান করা যায়, সমকালীন সারস্বত সমাজে শরৎচন্দ্র কতখানি জনপ্রিয় ছিলেন। শরৎচন্দ্রের জীবৎকালে শুধু বাংলাদেশে নয়, প্রতিবেশী ও বিদেশী ভাষাতেও শরৎচন্দ্র

আলোচিত হযেছেন তাঁব সাহিত্যকৃতি ঐ সমস্ত ভাষায অনুবাদেব সূত্রে। প্রতিবেশী ভাষাব মধ্যে বিশেষ কবে গুজবাতী ভাষায শবৎচন্দ্রেব 'দত্তা' ('শ্রীমতী বিজযা' নামে, ১৯২১), 'চবিত্রহীন' ('প্রণবপুস্তক' নামে, ১৯২৪) 'অবক্ষণীযা' (১৯৩২), 'নববিধান' (১৯৩২), 'চন্দ্রনাথ' (১৯৩৩), 'স্বামী' (১৯৩৪), 'দেনাপাওনা' ('ভৈববী' নামে, ১৯৩৫), 'দেবদাস' (১৯৩৫), ১ম ও ২য পর্ব 'শ্রীকান্ত' (১৯৩৬), ৩য ও ৪র্থ পর্ব 'শ্রীকান্ত' (১৯৩৭ , 'বিপ্রদাস' (১৯৩৭), 'অনুবাধা' (১৯৩৮), 'শুভদা' (১ম ও ২য অংশ, ২য সং ১৯৩৮), প্রভৃতি, মালযালম্ ভাষায 'চন্দ্রনাথ' (১৯৩৩) এবং ইংবেজী ভাষায 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব, ১৯২২) 'বিন্দুব ছেলে' (মডার্ন বিভিউ, ১৯২৭), 'নিষ্কৃতি' (টাইপ কবা, ১৯৩৫), প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অনূদিত হযে খ্যাতিপ্রসবতা লাভ কবে। শ্রীকান্তেব প্রথম পর্বেব ডঃ কানাই গাঙ্গুলীকৃত ইতালীয অনুবাদ থেকে মনীষী বমাঁ বলাঁব প্রথম আগ্রহ জাগে শবৎসাহিত্য সম্পর্কে।

ববীন্দ্রনাথ ভিন্ন সমকালে শবৎচন্দ্রেব মত আব কোন বাঙালী লেখকেব বচনা এইভাবে প্রতিবেশী ও বিদেশী ভাষায অনূদিত হযে বিশ্ব সাহিত্য সমাজেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবতে পেবেছে বলে আমাদেব জানা নেই।

বহুপ্রীতিধন্য শবৎচন্দ্র সমসময়ে একখানি জনপ্রিযতা সত্ত্বেও কিছু বিরূপ সমালোচনা, নিন্দাবাদ ও আক্রমণেব শিকাব হযেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যাযেব সাক্ষ্য হল 'এক ববীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদেব সাহিত্যে আব কারুব অত বিরুদ্ধ ও মূর্খ সমালোচনা সহ্য কবতে হয নি।' (ভাবতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৭)

'পল্লীসমাজ' (১৯১৬) প্রকাশিত হবাব পব যতীন্দ্রমোহন সিংহেব একটি বচনায শবৎসাহিত্যেব বিরুদ্ধে রুচিব অভিযোগ এনে প্রচণ্ড আক্রমণ কবা হযেছে। এ সম্পর্কে শবৎচন্দ্র নিজেই একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, —'শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সিংহ মহাশয আমাব 'পল্লীসমাজে'ব বিধবা বমাকে তাঁব 'সাহিত্যেব স্বাস্থ্যবক্ষা' প্রবন্ধ পুস্তকে বিদ্রূপ কবে বলেছেন,

> "তুমি ঠাকুবাণী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধিবলে তুমি ব পিতাব জমিদাবী শাসন কবিতে পাবিলে আব তুমিই কিনা তোমাব বাল্যসখা পবপুরুষ বমেশকে ভালবাসিয়া ফেলিলে? এই তোমাব বুদ্ধি? ছিঃ।' এ ধিক্কাব আর্টেব নয, এ ধিক্কাব সমাজেব, এ ধিক্কাব নীতিব অনুশাসন (সাহিত্য ও নীতি, বঙ্গবাণী, পৌষ, ১৩৩১)

'কল্লোল' যুগেব অন্যতম লেখক বুদ্ধদেব বসু একটি প্রবন্ধে 'চবিত্রহীন' (১৯১৭) উপন্যাসের সাবিত্রী চবিত্রটি সম্পর্কে কটাক্ষপাত কবাব পব ক্ষুব্ধ শরৎচন্দ্র একটি চিঠিতে লেখেন, —

'...ব্র—লিখেছে, 'সাবিত্রীর মত মেসের ঝি থাকলে আমরা মেসে পড়েই থাকতুম। কিন্তু মেসে পড়ে থাকলেই হয় না—সতীশ হওয়া চাই, নইলে সাবিত্রীর হৃদয় জয় করা যায় না। সারাজীবন মেসে কাটালেও না, তাছাড়া ছেলেটি একটু বোঝে না যে সাবিত্রী সত্যিই ঝি শ্রেণীর মেয়ে নয়।'' (দিলীপকুমার রায়কে লেখা, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ তারিখের পত্রাংশ)

'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১) উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে নানা পত্র-পত্রিকায় এর বিরূপ সমালোচনা বার হয়। ঐ বছরেই ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথমবর্ষ প্রথম সংখ্যায় নীরেন্দ্রনাথ রায় শেষপ্রশ্নের একটি দীর্ঘ সমালোচনামূলক প্রবন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করার পর শরৎচন্দ্র এ-সম্পর্কে একটি পত্রে লিখেছেন,—

'পরিচয় বলে একখানা ত্রৈমাসিক অভিজাতশ্রেণীর কাগজ বেরিয়েছে। তাতে তোমার বন্ধু নী—শেষ প্রশ্ন নিয়ে সমালোচনা করেছেন। পড়েছো বোধ হয়? তাঁর 'মোদ্দা' কথাটা এই যে যে-হেতু [illegible] সাহেবের মেয়ে, সেইহেতু 'কমল' চরিত্র গোরার নকল ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ যে-হেতু নী-র চোখ দুটো কটা, সেইহেতু তার বুদ্ধি ঠিক বাঁদরের মতো।' (৬ই ভাদ্র, ১৩৩৮ তারিখে দিলীপকুমারকে লেখা পত্রাংশ)

'দেনা-পাওনা' (১৯২৩) উপন্যাসটির নাট্যরূপে 'ষোড়শী' (১৯২৭) প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানার জন্য একটি বই পাঠাবার পর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠিতে নাটিকাটির সমালোচনা করে লিখেছিলেন,—

'ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েচ এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুন্ন করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ... সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়।' (৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৪)

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'পল্লীসমাজ', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দেনা-পাওনা', 'পথের দাবী' ও 'শেষপ্রশ্ন' সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে শরৎচন্দ্রকে। 'চন্দ্রনাথ', 'অরক্ষণীয়া' ও 'বামুনের মেয়ে' লেখার জন্য কুলীন ব্রাহ্মণেরা শরৎচন্দ্রের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে ব্রাহ্মদের সম্পর্কে কটাক্ষপাত করা হয়েছে,—এই অভিযোগে ব্রাহ্মরা শরৎচন্দ্রের রচনাকে ভাল চোখে দেখতেন না। 'পথের দাবী' পড়ে কোন এক রায়সাহেব 'মানসী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে ('মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার ১৮বর্ষ, অগ্রহায়ণ পৌষ মাস, ১৩৩৩ তিনটি সংখ্যায় রায়সাহেব রাজেন্দ্রলাল আচার্যের লেখা প্রবন্ধ) অভিযোগ আনেন যে উপন্যাসটির মধ্যে কোথায় নাকি সোনাগাছির ইয়ারকি ছিল, তা তাঁর অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে গিয়েছে—এ কথা শরৎচন্দ্র নিজেই এক ভাষণে উল্লেখ করেন। যে 'মহেশ' গল্পটি শিল্পসৌকর্যে বিশ্বসাহিত্যের একটি অন্যতম ছোটগল্প ও নতুন কালের ভাবধারার দোসর বলে স্বীকৃত এবং শ্রীঅরবিন্দের মতে,—

'Wonderful style and a great and a perfect creative artist with a profound emotional power'—

এহেন গল্প প্রকাশের পর অনেক হিন্দু জমিদার ও শিক্ষিত মুসলমান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই লিখেছেন,

'...মুসলমান সম্পাদিত কাগজে এই গল্পটির.. বড়া আলোচনা করিয়েছিল।' (সাহিত্য সমাজ, বিচিত্রা, ভাদ্র, ১৩৪৩)

অন্নদাশঙ্কর রায় ছদ্মনামে (লীলাময় রায়) 'স্বদেশ' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৩৮) শরৎসাহিত্যের তীব্র সমালোচনামূলক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করার পর শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধচিত্তে দিলীপকুমার রায়কে এর উল্লেখ করে একটি চিঠি লিখেছিলেন (৪ঠা কার্তিক, ১৩৩৮)।

কেউ কেউ এমন অভিযোগও তুলেছিলেন যে, 'পাপের চিত্র' নাকি শরৎচন্দ্রের 'তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে!'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণী-চরিত্রের মৃত্যু সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ক্ষোভ ছিল। তাঁর মতে, নীতিবাগীশ বঙ্কিম সমাজের মুখরক্ষার জন্যই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে রোহিণীর মৃত্যু ঘটিয়েছেন তার অসতীত্বের অভিযোগে। ৫৫তম জন্মদিনে বঙ্কিম-শরৎসমিতিতে ভাষণ দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য করলে 'শনিবারের চিঠি' শরৎচন্দ্রকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে লিখেছিল,

'শ্রীকান্ত', 'বিরাজবৌ' এর শরৎচন্দ্র যদি শেষ প্রশ্ন নামক আস্তাকুঁড়ের জন্মদাতা হ'ন [illegible] পারেন তাহাকে বিষবৃক্ষের লেখক অ নন্দমঠ [illegible] উপর [illegible] হয় না। (আশ্বিন, ১৩৩৮।

'শনিবারের চিঠি' শরৎচন্দ্রকে একাধিকবার আক্রমণ করেছে 'শেষপ্রশ্ন' (১৩৩৮) প্রকাশের পর 'শেষশ্রাদ্ধ' নামে কার্টুন সহ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে এবং 'অনুরাধা' (ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪০) গল্পটি প্রকাশিত হলে। কার্টুন এঁকে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তীব্র আক্রমণ চালানো হয়। এমনকি, 'ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক-সম্প্রদায়' (বাতায়ন, ফাল্গুন, ১৩৩৪) একটি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র দরিদ্র লোকদের সপক্ষে সহানুভূতিপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশিত হলে 'শনিবারের চিঠি'তে একই পদ্ধতিতে সমালোচনা করা হয়। এবং 'ডি. লিট্' উপাধি নিতে ঢাকায় যাবার পর একটি সাহিত্যসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে মুসলিমসমাজকে নিয়ে তিনি একটি উপন্যাস লেখার কথা প্রকাশ করলে 'শনিবার চিঠি'-তে আবার শরৎচন্দ্রকে কটাক্ষ করে আলোচনা ছাপা হয়।

'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত দাস স্বনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন (কার্তিক, ১৩৩৪) 'সাহিত্যধর্ম প্রসঙ্গে' নামে

এই প্রবন্ধটির লক্ষ্যও শরৎচন্দ্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'সাহিত্যধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখার পর ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

তার বিরুদ্ধে একটি চিঠি প্রকাশ করলে 'বঙ্গবাণী' ও 'শনিবারের চিঠি'তে সপক্ষে ও বিপক্ষে নানান আলোচনা চলতে থাকে। এ সময় 'শনিবারের চিঠি' শরৎচন্দ্রের অভিমত বলে দাবি করে একটি রচনা প্রকাশ করে। তখন বাধ্য হয়ে শরৎচন্দ্র এই আলোচনায় জড়িয়ে পড়েন। এবং 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর নামে যা প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রতিবাদ করেন। সেই সূত্রেই সজনীকান্ত শরৎচন্দ্রের সমালোচনা করেন তাঁর প্রবন্ধে।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েকমাস আগে প্রবোধকুমার সান্যাল 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় শরৎসাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখার পর অনেকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিল। ঐ বছরেরই 'খেয়ালী' পত্রিকায় এর প্রতিবাদ করে প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল।

বিরুদ্ধ সমালোচনা ছাড়াও শরৎসাহিত্যের অসংখ্য গঠনমূলক আলোচনা শরৎচন্দ্রের জীবৎকালে প্রকাশিত হয়েছে। শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সমস্ত আলোচনায় শরৎসাহিত্যের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। যে সমস্ত সাময়িক-পত্র পত্রিকায় শরৎসাহিত্য সম্পর্কিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি হল, 'ভারতী', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' 'মানসী ও মর্মবাণী', 'স্বদেশী বাজার,' 'কালি-কলম', 'স্বদেশ', নবশক্তি,' 'বিচিত্রা,' 'প্রদীপ', 'পঞ্চপুষ্প', 'পুষ্পপাত্র', 'প্রচারক', 'মাসিক বসুমতী', 'পরিচয়', 'কল্লোল' এবং 'বাতায়ন'। সংখ্যার দিক থেকে 'বাতায়নে' প্রকাশিত রচনার সংখ্যাই সর্বাধিক।

পত্রিকার ক্রমানুসারে রচনাগুলির উল্লেখ করা হল:—

(১) ভারতী, ১৯২৪।
নারীর মূল্য (অন্নদাশংকর রায়)

(২) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩২৮।
শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র (আবদুল্লাহ আল আজাদ)
ঐ, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩২৯
পল্লীসমাজের খানিকটা (সুধীরকুমার সেন)

(৩) মানসী ও মর্মবাণী, ১৮, বর্ষ অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ১৩৩৩
'পথের দাবী' রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রলাল আচার্য, পুরাতত্ত্বরত্ন।

(৪) স্বদেশী বাজার, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৫
সম্পাদকীয় সহ মোট ১৬টি শরৎ-সম্পর্কিত রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল,—

শরৎচন্দ্র (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষত্ব (ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়), শরৎ-প্রতিভা (ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন), সাহিত্যে কলা-শিল্প (শিবপ্রসাদ রায়), শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তাবলী, শরৎচন্দ্রের পরিচয় (সত্যেন্দ্রনাথ বসু)। এ-ছাড়া স্মৃতিমূলক রচনা লিখেছেন, প্রমথ চৌধুরী, ফণীন্দ্রনাথ পাল, জলধর সেন, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (পত্র)।

ঐ, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৩৩৫

মোট ৪টি রচনা। এর মধ্যে উল্লেখ্য,—যুগপ্রকাশক শরৎচন্দ্র (বিপিনচন্দ্র পাল), শরৎ-প্রসঙ্গ (অবিনাশ ঘোষাল)।

(৫) কালি-কলম, ৩য় বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩৫

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসলিখনপদ্ধতি (সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়)

ঐ, ৩য় বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৫

৩টি রচনা। 'কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র' (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত), শরৎ [illegible] (কুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), শরৎসাহিত্য (কালিদাস রায়)।

(৬) [illegible], ১৩[illegible]

শেষ প্রশ্নের [illegible] ([illegible]

(৭) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৯

৫টি রচনা। —শরৎ-সাহিত্য (নীহাররঞ্জন রায়), ব্যথার পূজারী শরৎচন্দ্র (সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়), শরৎ-প্রতিভা (নলিনীকান্ত সরকার), বাঙালীর জীবন ও শরৎচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা (সত্যেন্দ্রনাথ বসু)। স্মৃতিমূলক রচনা—শরৎচন্দ্র (পরিমল গোস্বামী)।

(৮) বিচিত্রা, আষাঢ়, ১৩৩৯

চন্দ্রনাথ (অবনীনাথ রায়),

ঐ, ভাদ্র, ১৩৩৯

শেষ প্রশ্নের বৈঠক (কুমুদনাথ লাহিড়ী),

ঐ, ফাল্গুন, ১৩৩৯

শেষ প্রশ্ন (ঊষা বিশ্বাস),

ঐ, বৈশাখ, ১৩৪০

কমল চরিত্রের রূপায়ণ (কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়)।

(৯) প্রদীপ, ভাদ্র, ১৩৩৯

শরৎসাহিত্য (প্রিয়ম্বদা দেবী), শরৎচন্দ্র (অতুলচন্দ্র গুপ্ত)।

(১০) পঞ্চপুষ্প, ফাল্গুন, ১৩৩৯

শরৎ সাহিত্যে নারীচরিত্র (বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য)।

(১১) পুষ্পপাত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৯

শরৎচন্দ্রের সমাজ ও ধর্মের আদর্শ (হেমন্তকুমার চক্রবর্তী)।

(১২) প্রচারক, ৩য় বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৪০

কথাপ্রসঙ্গে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র (অতুলানন্দ রায়),

(১৩) মাসিক বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৪৩

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র (যামিনীকান্ত সেন)

ঐ, ১০ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৮

সাহিত্যিক মোরগের লড়াই (শ্রীভূষণ্ডি)

(১৪) পরিচয়, ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

শরৎচন্দ্র ও বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য (অচ্যুতানন্দ গোস্বামী)।

(১৫) বাতায়ন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩৮

মোট ১৪টি রচনা প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল - শরৎচন্দ্র (লীলাময় রায়- ছদ্মনামে অন্নদাশংকর), অপরাজেয় কথাশিল্পী (প্রবোধকুমার সান্যাল), শরৎসাহিত্যে নাটকত্ব (সূর্য-পাল), শরৎচন্দ্রের হাস্যরস (হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), শেষ-প্রশ্ন ও কমল (মৃণাল সর্বাধিকারী), শরৎচন্দ্র (বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য) এ ছাড়া, এ সংখ্যার অন্যান্য লেখক ছিলেন--নরেন্দ্র দেব, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ঐ, ২য় বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৩৯

শরৎচন্দ্র (অবিনাশ ঘোষাল)।

ঐ, ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

শরৎচন্দ্র ও শনিবারের চিঠি (অবিনাশ ঘোষাল)।

ঐ, ২য় বর্ষ, ১৯শ ও ২০শ সংখ্যা, মাঘ ফাল্গুন, ১৩৩৯

শরৎ-প্রসঙ্গ (মৃণাল সর্বাধিকারী)।

ঐ, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪০

৪টি রচনা। —শরৎচন্দ্র (বিভাস রায়চৌধুরী), শরৎচন্দ্র (অবনীন্দ্রনাথ রায়), রাজলক্ষ্মী, কমললতা ও শ্রীকান্ত (জগদীশ ভট্টাচার্য), শরৎচন্দ্রেব লিখনভঙ্গি ('শরৎ-বন্দনা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত)।

ঐ, ৩য় বর্ষ, ২৭শ ও ২৯শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪০
সাহিত্যপ্রসঙ্গ (ত্রিলোচন শর্মা)।

ঐ, ৩য় বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪১
শরৎপ্রসঙ্গ (অবিনাশ ঘোষাল)।

ঐ, ৩য় বর্ষ, ৪৩শ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪১
শরৎসাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ (আশীষ গুপ্ত)।

ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪১
শরৎচন্দ্র (বিশ্বনাথ ঘোষ)।

ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ২১শ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪১
আধুনিক নাটক ও বিজয়া (অবিনাশ ঘোষাল)।

ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ২·শ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪১
সাহিত্যপ্রসঙ্গ (ত্রিলোচন শর্মা)

ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২
শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব (সতীশচন্দ্র গুহ দেবশর্মাশাস্ত্রী),

ঐ, ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪২
শরৎচন্দ্র (অবনীনাথ রায)।

ঐ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৩
২টি রচনা।—শরৎচন্দ্র (হীরালাল দাশগুপ্ত),
শবৎচন্দ্র (শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী)।

ঐ, ম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৪
শরৎচন্দ্র (গোপাল ভৌমিক)।

এই সমস্ত পত্রপত্রিকা ছাড়া শরৎসাহিত্য সম্পর্কে সমকালে ইংরেজি ভাষাতেও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে Advance পত্রিকার দুটি সংখ্যায় (জানুয়ারি ও ডিসেম্বর, ১৯৩১) ন্যাথানিয়েল পি.কে.সরকার ও সুবোধ সেনগুপ্তের দুটি ও অবিনাশ ঘোষালের দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

Liberty পত্রিকার একটি সংখ্যায় (১৯৩১) ১০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। মুখ্য লেখক ছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শচীন সেন, সুকুমার দত্ত, বিনয়েন্দ্র চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু, লীলাময় রায়, অবিনাশ ঘোষাল প্রমুখ।

Forward পত্রিকায় এক সংখ্যায় (১৯২৮) বিজন সেনগুপ্তের একটি প্রবন্ধ ও অন্য এক সংখ্যায় (১৯৩৩) অবিনাশ ঘোষালের একটি প্রবন্ধ ছিল উল্লেখযোগ্য।

আর-একটি উল্লেখ্য বিষয়,—শরৎচন্দ্রের সমকালে শরৎসাহিত্য সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ রচিত হলেও পরবর্তীকালে যে সমস্ত রচনা গ্রন্থবদ্ধ হয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে, সেগুলি হল—শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র (মোহিতলাল মজুমদার), শ্রীকান্তের ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্ব (প্রমথনাথ বিশী), An Acre of Green Grass (বুদ্ধদেব বসু), বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), বাংলা উপন্যাসের ধারা (অচ্যুত গোস্বামী), শরৎচন্দ্র (সুবোধ সেনগুপ্ত) প্রভৃতি।

শরৎ-সমকালে প্রকাশিত শরৎসাহিত্য সম্পর্কিত এই সমস্ত রচনার উল্লেখে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, সমকালীন বাংলা সাহিত্যে ও সারস্বত সমাজে শরৎ-চন্দ্র বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। নিন্দাপ্রশংসার এমন গঙ্গাযমুনাসঙ্গম সমকালের আর কোনো কথাশিল্পীর জীবনে ঘটেনি। শরৎসাহিত্য সমা-লোচনার সূত্রেই প্রমাণিত হয়েছে, শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যের অনন্য পুরুষ।

৩

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, শরৎচন্দ্রের জীবনকালে শরৎসাহিত্যকে ঘিরে এদেশে একটি বৃহৎ সারস্বত সমাজ গড়ে উঠেছিল। আলোচনায় সমালোচনায় সমগ্র শরৎসাহিত্যকে আত্মস্থ করার ব্যাপক প্রয়াস শুরু হয়েছিল তখন থেকেই। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন সমকালীন বাংলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের মত বিতর্কিত লেখক আর কেউ ছিলেন না।

শরৎসমকালীন সারস্বত সমাজ কেমনভাবে শরৎসাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন, এখন আমরা তার একটু পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সমকালের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। 'কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (কালিকলম, ভাদ্র ১৩৩৫) তিনি শরৎচন্দ্রের 'উপন্যাসগুলির একটি দিক মাত্র' দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তা হল শরৎ-সাহিত্যের অভিনবত্ব কোন্ দিকে। বিস্তৃত আলোচনার প্রারম্ভে নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রানুজ লেখকদের সম্পর্কে লিখেছেন—

> 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বর্তমানের সাহিত্য। কিন্তু তাঁর চেয়ে অল্পবয়সের অনেক লেখক ও লেখিকা এখন কথাসাহিত্যে নূতন নূতন সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভারতীর অঙ্গশোভা বর্ধন করিতেছেন। এক হিসাবে তাঁহারা তাঁহার পরবর্তী যুগের। তাঁহাদের সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু বিচিত্রতা আছে।'

প্রবন্ধকারের মতে, শরৎসাহিত্যেও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রানুজ হয়েও প্রবন্ধকারের দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-পরবর্তী কেন ? এর উত্তরে নরেশচন্দ্র সমকালীন ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখকদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাঁরা নানা দিক দিয়ে কথা ও নাট্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছেন ও নতুন ভাবধারার জন্ম দিয়েছেন। আমাদের দেশের বর্তমানকালের বাঙালী লেখকেরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সব ভাবধারার সঙ্গে সুপরিচিত। তাঁদের কলাবিকাশ, আদর্শ, ভাবপ্রেরণা সমস্তই এদেশের লেখকদের ভেতরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করছে। স্বভাবতঃই একালের লেখকদের উপন্যাস রবীন্দ্রযুগ বা তৎপূর্ববর্তী যুগের বাংলা উপন্যাস থেকে আলাদা হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ? পাশ্চাত্ত্য লেখকদের এই পরোক্ষ প্রভাবের ফলেই একালের বাংলা উপন্যাস ও গল্প জীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এই সূত্রেই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের একটা আন্তরিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রানুজ সাহিত্যিকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র প্রধান ব্যক্তি হলেও তাঁর সাহিত্য কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় পুষ্ট নয়। প্রবন্ধকার লিখেছেন—

'তাঁর গল্পটা খাঁটি বাঙালীর প্রাণ, আর তিনি আঁকিয়াছেন খাঁটি বাঙালীর জীবন। বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের জীবন তাঁর মত আর কেহ আঁকিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।'

অতঃপর নরেশচন্দ্র একটি বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করেছেন। শরৎচন্দ্রের মূলদৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর সাহিত্যের লক্ষ্য সম্পর্কে প্রবন্ধকারের অভিমত এই যে, শরৎচন্দ্র আদর্শবাদী লেখক নন।

'সমাজকে কোন বিশিষ্ট আদর্শের দিকে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে লই। তিনি কোনও গল্প লেখেন নাই। তাঁর লেখার ভিতর সমাজের আলোচনা আছে, মাঝে মাঝে তীব্র ঝাঁঝাল সমালোচনা আছে; তাঁর কল্পিত মানব চরিত্রের ভিতর হইতে আমরা হয়তো অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারি, কিন্তু সে কেবল তাঁর চরিত্র-চিত্রগুলি সত্য বলিয়া।

প্রসঙ্গতঃ বঙ্কিমযুগের কথাসাহিত্যধারায় নতুন পথের দিশারী 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাধর্ম্য লক্ষ্য করে প্রবন্ধকার লিখেছেন—

'শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্র তারকনাথের চেয়ে বিস্তৃত, কেননা তিনি দেখিয়াছেন বেশী লিখিয়াছেন বেশী; কিন্তু ক্ষেত্রের মাটি তাঁদের এক—বাঙালীর সমাজ, বাঙালীর জীবন কিন্তু তারকনাথ যেখানে সেই ক্ষেত চষিয়া, নিপুণ পাচকের হাতে সুমিষ্ট ডাল ভাত তরকারী বঙ্গবাসীর পাতে পরিবেশন করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র সেখানে মাটি খুঁজিয়া বঙ্গভারতীর গলায় রত্নের মালা পরাইয়াছেন।'

প্রবন্ধকারের মতে, শরৎসাহিত্যের ওপর রবীন্দ্র-প্রভাব গভীর বটে, তবে তাঁর ভাষাব্যবহার, কাহিনীবিন্যাস শরৎচন্দ্রের নিজস্ব। এমনকি শরৎচন্দ্রের

চরিত্রগুলির মনোভাব বিশ্লেষণ রবীন্দ্রানুসারী হলেও সংলাপরচনার মধ্য দিয়ে এবং ঘটনা-উপস্থাপনার ভঙ্গিতে তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাত্রপাত্রীগুলির চরিত্রে শরৎচন্দ্রের স্বকীয় বিশেষত্বও ফুটে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের মৌল প্রবণতা সম্পর্কে নরেশচন্দ্রের অভিমত হল

—'তিনি সাধারণ জীবনের ভিতর অসাধারণত্বের উপাদান সন্ধান করিয়া মানুষের স্বাভাবিক অদ্ভুতত্বের পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিকের প্রতি অনুরাগের যুগপৎ পরিতৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছেন, সেইটাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচেষ্টার সবচেয়ে বড় ফল। তাঁহার এই কৃতিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর শ্রীকান্ত।

পরিচিত জীবনের মধ্য থেকে ও পরিচিত ঘটনাব মধ্য থেকে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করে সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে তিনি এমন একধরনের অসাধারণত্বের ভাব আনেন, যার ফলে তাঁর রচনা বারংবার পাঠেও ক্লান্তি আসে না—নতুন নতুন বিস্ময়ে মুগ্ধ হতে হয়। গল্প-উপন্যাসেব চরিত্রের মধ্যে এই অসাধারণত্বের উপাদান সন্ধান, প্রবন্ধকারেব মতে, একটি যুগলক্ষণ। তিনি লিখেছেন,

'সাধারণের ভিতর অসাধারণ ফুটাইয়া তোলা কেবল শরৎচন্দ্রের নিজস্ব নহে, বর্তমান যুগ-সাহিত্যের এটা একটা সুপরিচিত উপায়। বাংলা সাহিত্যে শরৎবাবু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিবার পূর্ব হইতেই এমন চেষ্টা দুই চারিটা হইয়াছে। সে সব চেষ্টার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয় শ্রীমতী নিরুপমাদেবীর 'দিদি' ও 'শ্যামলী'।

কিন্তু এই ক্ষমতা শরৎচন্দ্রেবই সর্বাধিক ছিল। ফলে, তাঁর 'বড়দিদি' থেকে 'দেনাপাওনা' এবং 'বিরাজ বৌ' থেকে 'চরিত্রহীন' পর্যন্ত সর্বত্রই সাধারণ ঘরোয়া-চিত্র অসাধারণ হয়ে উঠেছে—শরৎচন্দ্রের হার্দ্য হৃদয়ের স্পর্শে।

প্রবন্ধকারের মতে—

'বিন্দুর ছেলের বিন্দুটি অসাধারণ, 'রামের সুমতি'র রাম অসাধারণ, 'একাদশী বৈরাগী' অসাধারণ শরৎবাবুর প্রায় সমস্ত গ্রন্থই অসাধারণত্বে বোঝাই।

সাহিত্যিক নবেশচন্দ্র সেনগুপ্তের এই প্রবন্ধটি শরৎসমকালে শরৎসাহিত্যেব একটি বিশিষ্ট গঠনমূলক আলোচনা। লেখকের কিছুটা ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও তুলনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রবন্ধটি মূল্যবান। প্রবন্ধকারের মন্তব্যের সঙ্গে সর্বত্র মতের মিল না হলেও শরৎসাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবন্ধটি যথেষ্ট সহায়ক বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শরৎ-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানে যে, শরৎচন্দ্র করুণরসের আবেগময় শিল্পী। তিনি 'বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে বাণীর স্পর্শ' দিয়ে তাকে এক আবেগময়তার মধ্যে টেনে নিয়ে যান। বাঙালীর বেদনামিশ্রিত অশ্রুসিঞ্চিত

কাহিনী রূপায়ণে তাঁর জুড়ি আর কেউ নেই বাংলা সাহিত্যে। কিন্তু শরৎচন্দ্র শুধুই অশ্রুবিগলিত গল্পরসের স্রষ্টা নন, তাঁর এই বেদনাসিঞ্চিত কাহিনীর মধ্যেও মাঝে মাঝে চকিতে হাসির ঝিলিক দেখা যায়। হাস্যপরিহাস কিংবা ব্যঙ্গাত্মক পরিবেশ সৃজনেও তিনি দক্ষ ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের এই অনালোচিত দিকটি নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন কুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শরৎ-সাহিত্যের হাস্যরস' শীর্ষক প্রবন্ধে (কালিকলম, ভাদ্র ১৩৩৫) তিনি শরৎসাহিত্যে হাস্যরসের উপাদান কোথায়, তা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎ-সাহিত্যে হাস্যরসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে লিখেছেন,

'তাঁহার পরিহাস অট্টহাসি নয়, তাহা বালুর মধ্য দিয়া ফল্গুধারার ন্যায় বহিয়া যায়।'

প্রমাণস্বরূপে প্রবন্ধকার ক্রমান্বয়ে 'পল্লীসমাজ', 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', 'পণ্ডিতমশাই' 'পরিণীতা' প্রভৃতি উপন্যাসগুলির প্রাসঙ্গিক আলোচনা করে এদের মধ্যে কোন্ কোন্ চরিত্র ও ঘটনা হাস্যরসাত্মক—তার বর্ণনা দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট কয়েকটি হাস্যরসাত্মক চরিত্র—যথাক্রমে, 'পল্লীসমাজে'র সর্বদা মালাজপরতা মাসী, ১ম পর্ব 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অবিস্মরণীয় কয়েকবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করা মেজদা, কল্পিত বাঘের ভয়ে ভীত ও দুই ছেলেকে বগলদাবা করে চীৎকাররত পিসেমশাই, দর্জিপাড়ার এল. এ. পাশ নতুনদা, ২য় পর্ব 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নন্দমিস্ত্রী ও তার গৃহিণী জাত বোষ্টমের মেয়ে টগর, 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের হরিশ ভট্চাজ্জি প্রভৃতি। তাছাড়া, শরৎচন্দ্র কোনো কোনো উপন্যাসের চরিত্রকে স্নিগ্ধ কৌতুকের আলোয় উজ্জ্বল করে তুলেছেন। যেমন, 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের গোবর্ধন, 'পরিণীতা'র কালী, 'চরিত্রহীনে'র জগত্তারিণী, 'শ্রীকান্ত' (২য় পর্ব) উপন্যাসের মনোহর চক্রবর্তীর combined hand প্রভৃতি। এমন কি, নিজেকে নিয়েও 'শ্রীকান্তে'র রসিকতা স্মরণীয়। 'বৈরাগ্য ও সাধনার ফলে শ্রীকান্তের শুকনো কাঠে ফুল ধরিয়া গেল, —একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা দিল!'

শরৎচন্দ্রের হাস্যরসের বিশেষত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধকারের অভিমত হল এই,—

'ইহার গতি স্থির ও ধীর; বিবিধ অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে ইহা অতর্কিত আবির্ভূত হয় এবং নিমেষেই মিলাইয়া যায়। অনেক সময় শিল্পীর অতিরিক্ত গাম্ভীর্য ও অতিশয় সত্য বলিবার চেষ্টায় ইহা অন্তর্নিহিত থাকে। ইহা অনেক সময় রচনাপদ্ধতির বিশিষ্ট ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হয়।'

শরৎচন্দ্রের রচনায় হাসির পেছনেও আছে কারুণ্যের ইতিবৃত্ত। হাস্যরসের উৎস আচরণগত অসঙ্গতি—শরৎসাহিত্যেও এইটি কোথায় কোথায় ঘটেছে, তার বিস্তৃত বিবরণ না দিলেও প্রবন্ধকারের আলোচনার মধ্যে তারও ইঙ্গিত আছে। প্রবন্ধটি একপ্রকার সুলিখিতই বলতে হয়।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী শরৎ-সমকালের একজন খ্যাতনাম্নী কবি ও লেখিকা। তিনি শরৎ-সাহিত্যের যে একজন বিশিষ্ট পাঠিকা, তার প্রমাণ, তাঁর 'শরৎ-সাহিত্য' শীর্ষক আলোচনাটি (প্রদীপ, ভাদ্র ১৩৩৯)।

শরৎচন্দ্র যে নারীদরদী শিল্পী—একজন নারী হিসাবে লেখিকার এই সাক্ষ্য যথেষ্টই অর্থবহ।

শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে নারীসমাজের আত্মপ্রকাশের যে দাবি সোচ্চার হয়েছে, লেখিকা তার জন্য কৃতজ্ঞ। তিনি লিখেছেন,—

'শরৎচন্দ্র নারীর প্রতি সম্মান সর্বত্রই দেখিয়াছেন—পুরুষের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা তাঁর রচনার মধ্যে অজস্র—কাজেই নারীর মন তাঁর প্রতি স্বতঃই কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশে নারীসমাজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের দরদীমনের পরিচয় প্রসঙ্গে লেখিকা লিখেছেন,

'নারী এদেশে, এই বঙ্গীয় সমাজে কতদূর নির্মূল্য সে বেদনারও পরিচয় তাঁর রচনার মধ্যে পাই। পুরুষ তাকে পথে দাঁড় করিয়ে আর যে পোঁছে না সে দান নেয় নির্বিচারে, প্রতিদানের বালাই নেই সৌখীন তার বিলাসলালসা দুদিন জাগে, অবিলম্বে শেষ হয়, এ কথা ইতিপূর্বে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচারক' গল্পে দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্র এই সকল দুর্ভাগিনীর ব্যথার ব্যথী।'

লেখিকার মতে, শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজে'র অক্ষমতা, বেদনা ক্ষুদ্রতা যেমন অনুভব করেছেন, তেমনি 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে পুত্রহীনার ব্যথাও অনুভব করেছেন। ব্যক্তিক ও সামাজিক নানান সমস্যাকে তিনি ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে।

আলোচনার উপসংহারে লেখিকা শরৎসাহিত্য সম্পর্কে চিরায়ত দুর্নীতির প্রসঙ্গটি তুলে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছেন,—

'শরৎ গ্রন্থাবলী সম্পর্কে একটা অনুযোগ সর্বদাই শুনি। তিনি দুর্নীতির পোষকতা করেছেন—এ সম্বন্ধে আমার মত সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার বোধ হয় করা দূরে থাকুক, অত্যন্ত কঠোর শাস্তিবিধান করেছেন। দেবদাস, কিরণময়ীর জীবন ও মৃত্যু, তাদের সেই নিঃসহায় অনাথ অবস্থা সকলের মনেই গভীর বেদনার ছাপ রেখে যায়।'

শরৎসাহিত্য সম্পর্কে খুব গভীর বিশ্লেষণ না থাকলেও সমকালে মহিলা-লিখিত সমালোচনা হিসাবে রচনাটি উপভোগ্য।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত শরৎ-সমকালের একজন মনস্বী সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমালোচক। 'শরৎচন্দ্র' শীর্ষক তাঁর একটি প্রবন্ধের (প্রদীপ, ভাদ্র ১৩৩৯) সংক্ষিপ্ত পরিসরে যেমনভাবে তিনি শরৎ-সাহিত্যের মৌল গুণটি ধরার চেষ্টা করেছেন, তা সমালোচকের বস্তুজ্ঞান ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধের পরিচয় দেয়।

প্রবন্ধকারের মতে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যে সমস্ত চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, শরৎসাহিত্যের এমনই গুণ যে, মুহূর্তমধ্যে চরিত্রগুলি আমাদের আত্মীয় হয়ে উঠে। তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে আমাদের আত্মিক বন্ধন ঘটে যায়। যদিও তারা আধুনিক বাংলার নরনারী—নিজস্ব গণ্ডিতে বিচরণশীল, তবু তাদের চরিত্রের সঙ্গে আমাদের যে এই আত্মিক বন্ধন ঘটে, তার কারণ এই নয় যে, আমরা তাদের সমকালের মানুষ বলে ; লেখকের মতে, তার কারণ সম্ভবতঃ এই যে শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট প্রায় সমস্ত প্রধান চরিত্রেরই ভাবে, অনুভূতিতে ও তাদের প্রকাশে এমন এক ধরনের তীব্রতা আছে, যার ফলে তারা আমাদের আবেগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, সেইজন্য শরৎসাহিত্যের চরিত্রগুলিকে আমাদের এত সুপরিচিত মনে হয়।

প্রবন্ধকার লিখেছেন -

শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলির, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীচরিত্রগুলির, এই intensity বাঙালীর চিত্তকে শরৎচন্দ্রের লেখার দিকে প্রথম আকৃষ্ট করে, এবং তাঁর রচনার এটা একটা প্রধান আকর্ষণ। বাঙালীর জীবনের অন্তরতার মধ্যে ইন্দ্রনাথ কি ষোড়শী, রমা কি কিরণময়ীকে এনে শরৎচন্দ্র যে গতিবেগের সৃষ্টি করেছেন, তার আঘাত বাঙালী পাঠকের স্নায়ুমণ্ডলীকে সচকিত করেছে। এই তীব্রতার আনন্দ বাঙ্গালার বর্তমান সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দান। সমাজের বিধি-ব্যবস্থায় মানুষের যে দুঃখদুর্দশা, শরৎচন্দ্রের অনেক কাব্যেরই তা কথাবস্তু।

মানুষের এই দুঃখদুর্দশা বর্ণনায় শরৎচন্দ্র স্রষ্টার নির্বিশেষ গুণ —নিরাসক্ত মনোভঙ্গি সর্বদা রক্ষা করতে পারেননি ; প্রবন্ধকারের মতে, এর কারণ, শরৎচন্দ্র ছিলেন দরদী সামাজিক মানুষ। সমকালীন সমাজে নরনারী যে সব দুঃখে ও যন্ত্রণায় জর্জরিত হচ্ছে, শরৎচন্দ্র সেসব প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর হৃদয় এর ফলে আহত হয়েছে।

প্রবন্ধকার শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক বলেই শরৎচন্দ্রের এই গোপন কথাটি তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছে। তাই তাঁর অভিমত—

'এই দুঃখ দুর্দশায় সকরুণ যে মন শরৎচন্দ্রের কাব্যে তাঁর কবিচিত্তকে মাঝে মাঝে ছাপিয়ে উঠেছে, তাঁর মানবতা আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না। হোক না সে মনের প্রকাশ তাঁর কবিকর্মের একটু বিরোধী।'

শরৎসাহিত্যের মূল ভিত্তি যে নারীচরিত্র, তার স্বরূপ বিশ্লেষণে বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা 'শরৎ-সাহিত্যে নারীচরিত্র' (পঞ্চপুষ্প, ফাল্গুন ১৩৩৯) প্রবন্ধটি একটি উৎকৃষ্ট রচনা।

শরৎ-সাহিত্যের সমস্ত নারীচরিত্রের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার তাঁর আলোচনার প্রারম্ভেই লিখেছেন—

'যে তিনটি নারীচরিত্র শরৎসাহিত্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ভাবে সজ্জিত হয়েছে, মনে হয় তারা 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মী, 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী, আর 'বিন্দুর ছেলে'র বিন্দু। সৃষ্ট-চরিত্রের অদ্ভুত ঔদার্য্য, যৌক্তিকতার মাধুর্য্য, উন্নত চারিত্র্য ও মর্মস্পর্শী গুণ এবং স্রষ্টার নিজস্বতা, অসামান্য চরিত্রচিত্রণক্ষমতা এই তিন চরিত্রে অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

এ ছাড়াও অনেক উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র শরৎসাহিত্যে আছে—সে সম্পর্কেও লেখক সচেতন। তবু বিভিন্ন দিক থেকে এই তিনটি চরিত্রকে তাঁর শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্রের প্রতি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি শরৎচন্দ্রের আগে এতখানি গভীরভাবে কেউ দিয়েছেন বলে প্রবন্ধকার মনে করেন না—বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে রেখেও তিনি একথা বলেছেন।

'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—প্রাচীন শাস্ত্রকারদের এই কথা সকলেই যেন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। সমস্ত লেখকই তাই সর্বকালে মহৎ নারীচরিত্র সৃষ্টি করেও সর্বদা পুরুষের মুখাপেক্ষী করে রেখেছেন—পুরুষের মহত্ত্বের কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করিয়েছেন। প্রবন্ধকারের মতে, এ-কথা আমাদের দেশের ব্যাস-বাল্মীকি এবং পাশ্চাত্ত্যের হোমর-ভার্জিলের পক্ষেও প্রযোজ্য। মহীয়সী সীতার পাশে রাম, হেলেনের পাশে আকিলেস ও প্যারিস, পেনেলোপের পাশে ইউলিসেস-এর প্রতি দৃষ্টিনিবেশ করলেই এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে না।

প্রবন্ধকারের মতে, এর কারণ আমাদের দেশের তৎকালীন সমাজ ও সামাজিক প্রথা।

কিন্তু আমাদের সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এই সামাজিক প্রথাকে অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর সমস্ত উপন্যাসে তাই নারীচরিত্রের প্রাধান্য—এবং পুরুষচরিত্র অধিকাংশ স্থলে দুর্বল।

ব্যক্তিগত জীবনে ঘনিষ্ঠভাবে নারীচরিত্রকে প্রত্যক্ষ করার ফলেই শরৎচন্দ্র নারীর বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রবন্ধকার লিখেছেন,—

'নারীচরিত্রের তিনটি বিশেষ গুণ তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে বেশী এবং এই তিনটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিভিন্নরূপ ও আকার দেখানই হচ্ছে তাঁর আদর্শধারা। এই তিনটি হচ্ছে—নারীর মাতৃত্ব, নারীর প্রেম ও নারীর সেবাগুণ।'

বস্তুতঃ এই গুণগুলি নারীর সহজাত। কিন্তু এই তিনটি গুণের বিকাশ শরৎচন্দ্রের আগে আর কোনো বাঙালী লেখক নারীচরিত্রের মধ্যে নিবিড়ভাবে দেখাতে পারেন নি। নারীর এই তিনটি গুণে পূর্ণভাবে গুণান্বিতা রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী ও বিন্দু। প্রথম দুজন প্রেমিকা হয়েও সেবাগুণেই মহৎ আদর্শের দৃষ্টান্ত আর শেষজন দৃষ্টান্তস্থল পরিপূর্ণ মাতৃত্বের। তাই প্রবন্ধকারের অভিমত,—

'সমস্ত নারী-প্রকৃতিগত গুণের উপরেও তার মাতৃত্ব এমন সমুজ্জ্বল হয়ে আছে, যার দীপ্তশ্রী যে কোনও মেয়েকে মহীয়সী করে তুলতে পারে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের অত্যাদ্ভুত সৃষ্টি— মাতৃ-সম্বন্ধের এমন সুকুমার চিত্র বোধহয় জগৎসাহিত্যেও বিরল।'

শরৎচন্দ্রের সমস্ত নারীচরিত্রই সমাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাই সামাজিক অন্যায় রীতিনীতিতে পিষ্ট--নির্যাতিত। সমস্ত অত্যাচার সহ্য করার গুণ লক্ষ্য করে শরৎচন্দ্র যেমন মুগ্ধ হয়েছেন তেমনি বেদনার্ত হৃদয়ে তাদের প্রতি সর্বাত্মক সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

প্রবন্ধকার শরৎচন্দ্রের সমস্ত নারীচরিত্রকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে তাদের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই বিভক্তিকরণ নিম্নরূপ —

(১) মাতৃত্বমণ্ডিত চরিত্র—
'বিন্দুর ছেলে'র বিন্দু, 'রামের সুমতি'র নারায়ণী, 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী ও 'বৈকুণ্ঠের উইলে'র ভবানী।

(২) প্রেমমূলক চরিত্র—
(ক) 'পথনির্দেশে'র হেমনলিনী, 'দেবদাসে'র পার্বতী, 'শ্রীকান্তে'র রাজলক্ষ্মী, 'পল্লী-সমাজে'র রমা। (বিয়োগান্তক)
(খ) 'দেবদাসে'র চন্দ্রমুখী, 'আঁধারে আলো'র বিজলী, 'স্বামী'র সৌদামিনী, 'গৃহদাহে'র অচলা। (সমস্যামূলক)
(গ) 'দত্তা'র বিজয়া, 'পরিণীতা'র ললিতা। (মিলনাত্মক)
(ঘ) বিবিধ—'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ী, 'শেষ প্রশ্নে'র কমল, 'পথের দাবী'র ভারতী, 'চন্দ্রনাথের' সরযূ।

(৩) সেবাগুণ সমন্বিত চরিত্র—
'শ্রীকান্তে'র অন্নদাদিদি, 'গৃহদাহে'র মৃণাল, 'শেষ প্রশ্নে'র নীলিমা ইত্যাদি।

প্রবন্ধকার শরৎসাহিত্যের এই সমস্ত নারীচরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, প্রথমভাগে সমস্ত নারীচরিত্রই মা—

কিন্তু নিজের ছেলের সুবাদে নয়।

দ্বিতীয় ভাগের (ক শ্রেণীর) নারীচরিত্রগুলি প্রেমমূলক হয়েও 'ট্র্যাজিক'। —প্রার্থিতকে না পাওয়ার জন্য এই ট্র্যাজেডি।

'বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে'—বঙ্কিমচন্দ্র-নির্দেশিত এই অভিমত যেন দ্বিতীয় ভাগের নারীচরিত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছে।

উক্ত ভাগের (খ শ্রেণীর) নারীচরিত্রের প্রেম, তার সমস্যা—যাকে তারা জীবনে অস্বীকার করতেও পারেনি, আবার পরিপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করতেও পারেনি; চিত্তের এই দোলাচলমানতার মধ্যেই তাদের ট্র্যাজেডি।

(গ শ্রেণীর) নারীচরিত্রদুটি নিতান্তই দ্বন্দ্বমধুর রোমান্সরসের অবলম্বন।

বিবিধ শ্রেণীর নারীচরিত্রগুলি অত্যন্ত জটিল।

শরৎচন্দ্র-অঙ্কিত তৃতীয় শ্রেণীর নারীচরিত্রের প্রধান গুণ সেবাধর্ম। শুধু

তৃতীয় শ্রেণীর নারীর মধ্যেই এই গুণ নেই—পরন্তু শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নারী-চরিত্রের মধ্যেই অল্পাধিক এই গুণ বর্তমান।

প্রবন্ধকারের মতে, 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীর সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে 'শেষ প্রশ্নে'র কমল চরিত্রে। তাই চরিত্রটি শরৎচন্দ্র-অঙ্কিত সমস্ত নারীচরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

প্রবন্ধটির শেষে পত্রিকা-সম্পাদকের অভিমত যে, লেখকের মতের সঙ্গে সর্বত্র তাঁদের মিল নেই। সম্পাদকের এই মত সত্ত্বেও আমাদের মতে, 'পল্লী-সমাজে'র মাসী, কিংবা 'রামের সুমতি'র দিদিমা জাতীয় চরিত্রের আলোচনা বা শ্রেণীবিভাগ স্পষ্ট করে না দেখালেও সামগ্রিকভাবে প্রবন্ধটি একটি অত্যন্ত সুলিখিত রচনা।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে যে সমাজ ও ধর্মের আদর্শ স্বীকার করেছেন, তার একটি রেখাচিত্র দেবার চেষ্টা করেছেন হেমন্তকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'শরৎচন্দ্রের সমাজ ও ধর্মের আদর্শ' (পুষ্পপাত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৯) প্রবন্ধে।

'শাস্ত্রের বচন সত্য কিংবা মর্মের কাহিনী'—এই নিয়ে সাহিত্যে ও সমাজে আবহমানকালের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে শরৎচন্দ্র কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষে। হৃদয়ের ধর্ম ছাড়া তিনি অন্যকিছু স্বীকার করবেন না। লোকাচারে, সমাজের বিধিনিষেধে যে জীবন বাঁধা—শরৎচন্দ্র তার প্রতিই সহানুভূতিশীল। প্রবন্ধকার লিখেছেন,—

> হিন্দুর পৃথিবীর সেরা সনাতন, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশরের বিধিনিষেধ যেসব প্রাচীনসমাজ অন্তরের সম্পদ এবং সহজ সুনীতি সুরুচি হারাইয়া মনুষ্যত্বের কোন নিম্নস্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা তিনি অনেকস্থলে আলোচনা করিলেও বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন পল্লীসমাজে ও 'বামুনের মেয়ে'তে। ইহা সমাজের ব্যঙ্গচিত্র নয়। শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি ব্যবস্থার সার্কাসী কসরৎ কিংবা আচার ব্যবহারের চুলচেরা হিসাব ধর্মের মাপকাঠি হইতে পারে না।

শরৎচন্দ্র সমাজের বিধিবিধানের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি, কিন্তু সেই সমস্ত অনাচারের কুফল কী—তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

প্রবন্ধকার, তাঁর আলোচনায় 'শ্রীকান্ত' (২য়), 'দত্তা', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'পরিণীতা', 'অরক্ষণীয়া', 'বিলাসী' প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্প থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শরৎচন্দ্রের সমাজ ও ধর্মাদর্শের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

উদ্ধৃতির আধিক্য, কিছু কিছু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আমদানি ও আবেগের অতিরেক সত্ত্বেও প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, লেখক নানা যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করে, বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থিত করে শরৎসাহিত্য সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আলোচনা করেছেন।

শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসটি নিয়ে সমকালে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে রীতিমত আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তৎকালের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য দুটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। একটি শ্রীমতী ঊষা বিশ্বাস—এম. এ. বি. টি. লিখিত (বিচিত্রা, ফাল্গুন, ১৩৩৯) এবং অন্যটি খ্যাতনামা সমালোচক কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের রচনা। এই আলোচনাটির নাম 'কমলচরিত্রের রূপায়ণ' (বিচিত্রা, বৈশাখ, ১৩৪০)

'শেষ প্রশ্ন' পাঠে শ্রীমতী বিশ্বাসের মনে কতকগুলি প্রশ্ন জেগে উঠেছে—এই প্রশ্নগুলির সবিস্তার আলোচনা করেছেন তিনি। এই উপন্যাসের দুটি প্রধান চরিত্র—কমল ও আশুবাবু। এই চরিত্র দুটি ঘিরেই শরৎচন্দ্র সমস্যা তুলেছেন। ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে উজ্জীবিত এই সমস্যা সম্পর্কে সম্ভবত একমত না হলেও লেখিকা লিখেছেন,—

'শেষ প্রশ্নের লেখক যে সমস্যাগুলি আমাদের সামনে ধরেছেন, সেগুলি আমাদের চিরদিনের সংস্কারে ঘা দিলেও আমরা যেন সত্যকে গলা টিপে মারতে না চাই। তাঁর মতগুলি সুনীতিপূর্ণ কিনা সে প্রশ্নের জবাব দেবেন নীতিতত্ত্বের পূজারীরা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নৈতিক বিচার না হওয়াই শ্রেয় বলে মনে হয়।'

'কমল চরিত্রের রূপায়ন' আলোচনায় প্রবন্ধকার 'শেষপ্রশ্ন' সম্পর্কে দু দলের মত বিচার করেছেন। কমলচরিত্র অস্বাভাবিক অপসৃষ্টি—এই মতের বিরোধিতা করেই তিনি কমল চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, আমাদের সমাজে ও জীবনক্ষেত্রে এই সমস্যা আছে– যে সমস্যায় কমলচরিত্র কণ্টকিত। এবং এই চরিত্রটি স্বাভাবিকই হয়েছে। ঔপন্যাসিকের মননশীলতা এই চরিত্রটিকে ঘিরে আছে। প্রবন্ধকারের মতে তাই–

'কমল অসাধারণ হতে পারে,--অদ্ভুত অস্বাভাবিক মোটেই নয়।'

আখ্যানভাগের প্রথমে কমল একভাবে গড়ে উঠে শেষদিকে অন্যরূপ লাভ করলেও—এই পরিবর্তন আকস্মিক নয়—অস্বাভাবিক নয়। প্রবন্ধকার লিখেছেন'—

'কমলচরিত্র Static নয়, পরিবর্তনশীল, জীবন্ত। উপন্যাসের চরিত্র নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে পরিবর্তিত হবে এই হচ্ছে কথাশিল্পের চরিত্ররূপায়ণের মূল কথা। কমল চরিত্রে আমরা এদিক থেকে বিশেষ কোন ত্রুটি পাই না।'

এই দীর্ঘ আলোচনায় আমরা সম্ভবতঃ দেখাতে পেরেছি যে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন শরৎচন্দ্রের মতো আর কোনো কবি বা কথাকোবিদ সমকালীন বাংলার সারস্বত সমাজে এত গভীর আলোড়ন জাগাতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালে বিভিন্নমুখী এই আলোচনার ধারা এখনও অব্যাহত। শরৎচন্দ্রের সময়

থেকে আজকের সময়ের ব্যবধান অনেক। এর মধ্যে নানা সামাজিক পরিবর্তন ঘটে গেছে—জীবনবোধে পার্থক্যও প্রকট হয়ে উঠেছে; তবু শরৎসাহিত্যের আলোচনার ধারা থামেনি। যে গুণের জন্য শরৎসাহিত্যের এই আলোচনার ধারা অব্যাহত, শুধু সমাজসমস্যা নয়, নারীসমাজের প্রতি সহানুভূতি নয়, তা হল, শরৎসাহিত্যের বিস্ময়কর সামাজিকতা। সমকালের সারস্বত-সমাজে যেমন, আগামী যুগেও তেমনি তাঁর সৃষ্ট সমস্ত সমস্যাকে ছাপিয়ে বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই সামাজিকতাগুণেই তিনি সা'বে গৃহীত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।†

† প্রবন্ধটি লেখার সময় গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যসংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীরতনকুমার দাস।

শরৎচন্দ্রের শিল্পীমানস

ড. অমিয়কুমার সেন

•শরৎচন্দ্রের কোনো একটি বিশেষ চরিত্রের বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হলে তিনি নাকি বলেছিলেন, "আমি নিজে দেখেছি যে!" এটা অবশ্যই সাহিত্যিক অভিমান বা বিক্ষোভ। কিন্তু এটা ঠিক যে সাহিত্যিক যে চরিত্রকে নিজে দেখেছেন সেটাই পাঠকের কাছে বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয় না। পাঠক তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিতে চান। তাছাড়া, বাস্তব জীবনে এমন আদর্শ চরিত্র থাকে যাকে সাহিত্যের পাতায় পরিবেশন করলে তাকে অবাস্তব বলেই মনে হয়। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আত্মিক জীবনে অহিংসাকে নিবিড় ভাবে গ্রহণ করেছিলেন এমন একটি চরিত্রকে আমাদের মধ্যে বিচরণ করতে তো আমরা দেখেছি কিন্তু উপন্যাসের পাতায় তাঁকে বাস্তবরূপে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করা প্রায় দুরূহ। শরৎ-চন্দ্রের নায়ক-নায়িকার চরিত্রের বাস্তবতার রূপ কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে অন্য একটি সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে, তাঁরা তাঁর চোখের সামনে ছিলেন বলে নয়। সে-প্রসঙ্গে একটু পরে ফিরে আসছি।

সাধারণ পাঠকের কাছে শরৎচন্দ্রের বাস্তবতা কিন্তু তাঁর নায়ক নায়িকাকে অবলম্বন করে নয়। সেগুলির ভিত্তি হল তাঁর সৃষ্ট ছোটো ছোটো অপ্রধান চরিত্রগুলি। এ চরিত্রগুলি আমরা আমাদের আশেপাশে বহুবার বহু পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাই। দেখলেই চিনতে পারি। এগুলি যেন আমাদেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসে শরৎচন্দ্রের লেখনীকে অবলম্বন করে চিরস্থায়িত্ব লাভ করেছে। 'রামের সুমতি' গল্পের সেই যে রুগীটি যিনি ডাক্তারকে রামের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে অবহিত করেছিলেন কিন্তু থানায় সাক্ষী দেবার প্রস্তাবে যাঁর কান ভোঁ ভোঁ করছিল, রামের কোনো কথাই শুনতে পাননি, কিংবা 'পল্লী-সমাজে'র সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ যিনি মিষ্টি চাখতে এসে শেষে নাতি নাতনীকে অন্তরাল থেকে ডেকে পেট পুরে খাইয়ে দিয়েছিলেন এবং রমেশকে ভিয়েনের দিকে নজর রাখতে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, অথবা 'নিষ্কৃতি' গল্পের আপন-ভোলা গিরীশ যিনি ভাইপোর অপরাধে ভাইকে গালাগালি করেছিলেন, শ্রীকান্তের পিসেমশাই যিনি বহুরূপী দেখে আসল বাঘ মনে করে খাটের তলায় লুকিয়ে ছিলেন কিন্তু বাঘ শ্রীনাথ বহুরূপী বলে প্রকাশিত হওয়া মাত্র তার লেজ

কেটে দেবার হুকুম দিয়েছিলেন কিংবা টগর বোষ্টমী যিনি মিস্ত্রীর সঙ্গে বহু বৎসর ঘর করেও জাত দেননি, তাঁরা পাঠকের এত পরিচিত যে তাঁদের চরিত্র অপ্রধান হলেও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের বাস্তবতার ভিত্তি রচনা করতে তাঁরাই তাঁর প্রধান সহায় হয়েছেন। এরকম শত শত চরিত্র তাঁর গল্পে উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে।

মুখে যতই বিক্ষোভ প্রকাশ করুন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র একথা ভালোভাবেই জানতেন যে তাঁর দেখা বহু পরিমাণে আদর্শ চরিত্রগুলি সম্বন্ধে পাঠকের সংশয় নিরসন করতে তাঁকে কিছু সাহিত্যিক ছলাকলার আশ্রয় নিতে হবে। ছোটো ছোটো বাস্তব চরিত্রগুলি উপস্থাপন যেমন গল্পের অপরিহার্য অঙ্গ তেমনি সাহিত্যিক নৈপুণ্যেরও পরিচায়ক। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। অন্নদা দিদির নীরব ত্যাগদীপ্ত চরিত্র, এমন কি ইন্দ্রনাথ-এর উদ্দাম সহজাত আত্মত্যাগকে সরাসরি পাঠকের সামনে নিয়ে এলে তাঁরা সেগুলিকে গ্রহণ করবেন কিনা সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক সংশয় ছিল। তাই এগুলিকে নাটমঞ্চে নিয়ে আসার আগে অনেক বাস্তব ঘটনা এবং চরিত্রের মায়াজাল রচনা করতে হয়েছে। পাঠকের চোখে বাস্তবের মায়াঞ্জন লাগিয়ে দিয়ে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করে তারপর এসব চরিত্রকে আনতে হয়েছে। পিয়ারী বাঈজী বা রাজলক্ষ্মীকে উপস্থাপিত করার আগে শিকার-কাহিনীর বাস্তব পরিবেশ এবং জমিদারের মোসাহেবদের বাস্তব চরিত্র আঁকতে হয়েছে। কে উপন্যাসের নাটমঞ্চে প্রবেশ করানোর আগে জাহাজের নানা ঘটনা এবং ঝড়ের একটি অতিবাস্তব চিত্র পাঠককে উপহার দিতে হয়েছে। এত করেও তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল হয়তো এই চরিত্রগুলি পাঠকের মনে বাস্তব বলে প্রতীয়মান হবে না। হয়তো সেজন্যই এই চরিত্রগুলিকে সাধারণ পাঠকের অপরিচিত পরিবেশে স্থাপন করেছেন—কখনও বেদেদের ঘরে, কখনও বিহারের জঙ্গলে, কখনও বা সুদূর বর্মায়।

শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট প্রধান চরিত্র অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার বাস্তবতা আধুনিক সাহিত্যে চরিত্রবিশ্লেষণের রীতিকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে। ধ্রুপদী সাহিত্যের চরিত্রগুলি মহান্ কিন্তু তাঁদের মধ্যে বিভিন্নবৃত্তির দ্বন্দ্ব নেই। রাম যে সত্যনিষ্ঠ প্রজাপালক, সীতা যে সতীকুলশিরোমণি, যুধিষ্ঠির যে অসত্য-বিদ্বেষী, দুর্যোধন যে হিংসাকুটিল স্বার্থান্ধ—এ সম্বন্ধে পাঠকের মনে কোনো সংশয় নেই। তাঁদের অন্যান্য বৃত্তিগুলি সূচনা থেকেই তাঁদের চরিত্রে অনুপস্থিত। ভীম শুধু গদা আস্ফালন করবেন, তাঁর প্রতিশোধ-স্পৃহাকে কোনো ক্রমেই বিচলিত করা যাবে না। কিন্তু আধুনিক কালের চরিত্রগুলি বিভিন্ন

বৃত্তির সমন্বয়ে এবং সংঘাতে গঠিত। তারা মহান্ নয় কিন্তু বাস্তব। যে কাপুরুষ তার মধ্যেও একদিন সাহসিকতার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে কিন্তু কাপুরুষতার ভস্মাচ্ছাদন থেকে তার মুক্তি ঘটে না। যিনি জিতেন্দ্রিয় তিনিও স্খলনের প্রান্তে এসে একদা অমিতবলে নিজেকে সংযত করেন। বিভিন্ন বৃত্তির দ্বন্দ্বে সজীব এই চরিত্রগুলির উপরতলা দেখে আমরা তাদের চিহ্নিত করি। কিন্তু নীচের তলায় কত সংঘাত, কত—দ্বন্দ্ব তার খবর রাখি না। চরিত্রের এই দ্বন্দ্বই বাস্তবতা। আধুনিক চরিত্রবিশ্লেষণের এই রীতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিদ্যুৎশিখার মতো এক-একবার আত্মপ্রকাশ করেছে কিন্তু তাঁর সমাজকল্যাণ-কামনা এবং কিছু পরিমাণে সমসাময়িক রক্ষণশীলতা তাঁকে বেশি দূর এগোতে দেয়নি। রবীন্দ্রনাথের অনেক চরিত্রে, ছোটো গল্পে এবং উপন্যাসের বিশেষ করে বিনোদিনীর চরিত্রে এই বিশ্লেষণরীতির পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। শরৎচন্দ্র তাঁকেই অনুসরণ করে আরম্ভ করে পরে স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

অনেক সময় আধুনিক চরিত্রের দ্বন্দ্বের এক পক্ষ চরিত্রের বহির্ভূত হয়ে থাকে। পরিবার বা সমাজের পরিবেশ থেকে প্রতিপক্ষ তাকে আঘাত করতে থাকে। শরৎচন্দ্র পরিবার বা সমাজের সঙ্গে চরিত্রের অভিঘাতের কাহিনী অতি সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করেছেন। সমাজের রক্ষণশীলতা তথা যুগসঞ্চিত যুক্তিহীন নিয়ম ব্যক্তির প্রাণধর্মকে কিভাবে অবনমিত করে রাখে তার পরিপূর্ণ-তম চিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাস এবং ছোটোগল্পতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সমাজের সঙ্গে এই সংঘাতে কতো তাজা প্রাণ নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে, কত দ্বন্দ্ব কত স্ত্রীপুরুষকে তিলে তিলে অবধারিতরূপে নিঃশেষ করে দিয়েছে সেটা এত সহানুভূতির সঙ্গে এর আগে বাংলা সাহিত্যে আঁকা হয়নি। সমাজসংস্কারের আন্দোলনের সঙ্গে শরৎচন্দ্র যুক্ত ছিলেন কিন্তু আনুষ্ঠানিক আন্দোলনের থেকে তাঁর এই সাহিত্যিক প্রতিবাদ সমাজের অনেক কালব্যাধিকে দূর করতে সাহায্য করেছে বেশি।

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের, এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বে নারীরাই বেশি অসহায়। কারণ পুরুষস্বভাব স্বাধীন, প্রকৃতি তাকে এমন কতকগুলি সুবিধে দিয়েছে যে সে সহজেই পরিবার বা সমাজকে উপেক্ষা করতে পারে। এই নারী এই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে কিন্তু এই নিগড় থেকে মুক্তির উপায় তার নেই। সেজন্যই শরৎ-সাহিত্যে নারীদের প্রাধান্য। অন্নদা-দিদি, রাজলক্ষ্মী, রমা প্রভৃতি এই অত্যাচারিত দ্বন্দ্ববিক্ষত নারীসমাজের প্রতিনিধি ; ছোটো পরিবেশের মধ্যে বিন্দু, নারায়ণী, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতির চরিত্রও

এই দ্বন্দ্বে সজীব। নারীচরিত্রের প্রতি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক পক্ষপাতিত্ব, নারীর প্রতি অত্যাচারের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত বলেই তিনি ঘোষণা করেছেন। সে অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, নারীর স্খলন-পতন-ত্রুটিকে সমাজ বা পরিবার এতটুকু সহানুভূতি দিয়ে বিচার করে না। তাঁর সমাজের ছকে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করতে হয়। সে গণ্ডী পেরলেই সমাজ-রূপী রাবণ তাকে ধিক্কারে নিন্দায় পতিতাবৃত্তিতে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই নারী-সীতাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ প্রথমে প্রণতি জানিয়েছিলেন আর শরৎ-চন্দ্র তাঁদের ঘনিষ্ঠ সন্নিধানে এসে তথাকথিত স্খলনের ঊর্ধ্বে নারীর পবিত্র মাধুর্যের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। সমাজসেবীরা পতিতাকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র থেকে বাঙালি তথা ভারতবাসী তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি আহরণ করেছে।

সমাজের আরও কতগুলি বদ্ধমূল ধারণাকে শরৎচন্দ্র আঘাত করেছিলেন। আমরা সেদিন পর্যন্ত জানতাম বিমাতা সপত্নী-পুত্রকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেই পারে না, বৈমাত্রেয় ভাইরা বিবাদে লিপ্ত হবেই। কিন্তু শরৎসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য মাতৃচরিত্র নেই, আছে বিশ্বেশ্বরী, নারায়ণী, বিন্দু, হেমাঙ্গিনীর মতো পাতানো মায়েরা। তাঁর সাহিত্যে বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা নির্বিবাদে একে অন্যের প্রতি সহোদর ভ্রাতার মতো আকর্ষণ বোধ করে। তাছাড়া মানুষের একটি রূপ দেখে আমরা যে ভালো বা মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করে দিই, তার মধ্যেও যে সামাজিক কত অন্যায় পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে তার কথা তিনিই প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যিনি কুশীদ-জীবী আমরা জানি অর্থই তার মোক্ষ। কিন্তু তাঁর যে ভগ্নীর প্রতি অপত্য-স্নেহ থাকতে পারে, দরিদ্রা রমণীর প্রতি আর্থিক একবিন্দু অবিচারকে তিনি নিজের দিক থেকেও সমর্থন নাও করতে পারেন, সে-কথা আমরা প্রায়ই ভুলে থাকি। শরৎচন্দ্র সামাজিক দৃষ্টির এই অবিচার থেকেও অনেক নীরব অথচ ধিক্কৃত মানুষকে উদ্ধার করে এনেছিলেন।

বিভিন্ন বৃত্তির সমাবেশ এবং সংঘাতে চরিত্রগুলি সজীব হয়ে ওঠে, তারা একটিমাত্র বৃত্তিরই জীবনব্যাপী সাধনা করে না। এই সত্যটিই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক বাস্তবতার মূল কথা। তাঁর সাহিত্যের প্রধান নারীচরিত্র রাজলক্ষ্মী রমা ষোড়শী প্রভৃতির চরিত্রে এই দ্বন্দ্বকে তিনি নূতনতম রূপ দিয়েছিলেন। রাজলক্ষ্মী আপাত দৃষ্টিতে কুলত্যাগিনী, সমাজের চোখে ভ্রষ্টা। ষোড়শী বা রমারও সমাজের প্রতি বাহ্যিকবন্ধন কিছু ছিল না। কিন্তু দুজনের মনের মধ্যেই

একটি রক্ষণশীল সমাজের আদর্শ বাসা বেঁধেছিল। রাজলক্ষ্মীর তাঁকে উপেক্ষা করা অনেক সহজ ছিল কিন্তু তাঁর অন্তরের মধ্যে নিবিষ্ট সমাজবন্ধন তাঁকে বার বার বিরত করছে। নিজের উচ্ছল প্রাণধর্ম এবং বিদেহী সমাজের দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। রমা এবং ষোড়শীর দ্বন্দ্বের ধারাও প্রায় সমধর্মী। স্খলিতা নারীকে শরৎচন্দ্র যে শুধু মাধুর্যময়ী করেই এঁকেছেন তা নয়, তাঁদের সমাজকে উপেক্ষা করে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতেও দেন নি। তাঁদের মাধুর্য এবং সমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে তাঁদের অসহায় কারুণ্যকে এমন সহানুভূতির গাঢ় রঙে চিহ্নিত করেছেন যে পাঠককে স্বভাবতই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে হয়। তাদের দিয়ে সমাজবিধিকে অতিক্রম করালে সমাজের ব্যাধিকে এত প্রকট করে তোলা যেত কিনা সন্দেহ। এই রীতি তিনি পুরুষচরিত্রের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। শ্রীকান্ত ভবঘুরে যুবক, সমাজের সঙ্গে সকল বন্ধন সে স্বেচ্ছায় ছিন্ন করেছে, বা ঘটনার অভিঘাতে সে বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। রমেশও সমাজে পতিত, ইচ্ছে করলেই বিদেশে গিয়ে তার অব্যবহিত সমাজের চোখরাঙানি থেকে মুক্তি পেতে পারত। কিন্তু সমাজ অলক্ষ্যভাবে তাদের মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সে অলক্ষ্য সমাজবন্ধন আর সহজ প্রাণধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্বে তাদের বুকে অনেক রক্ত ঝরেছে বলেই তারা আমাদের অন্তরের বড়ো কাছাকাছি এসেছে। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে পাঠকের রক্ষণশীলতা উদ্রিক্ত হয়ে তাদের সে সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করত। এটা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের শিল্পচাতুর্যের নিদর্শন তথা সমাজের নানা অযৌক্তিকতার প্রতি অনুচ্চারিত প্রতিবাদ।

চরিত্রসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের আরও একটি চাতুর্য প্রকাশ পেয়েছে, আধুনিকতম চরিত্রবিশ্লেষণরীতিতে। ধ্রুপদী চরিত্রগুলি statuistic বা ভাস্কর্যের মতো। তাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ আছে, বেধ আছে। ইংরেজিতে যাকে বলে dimension, তার সবগুলিই আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বিভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু তারা ধরাছোঁয়ার মধ্যে। তাদের স্পর্শ দিয়েও অনুভব করা যায়। কিন্তু আধুনিক চরিত্রচিত্রণের রীতি ভাস্কর্যকে অবলম্বন করে না। তারা চিত্রশিল্পের মতো। একই সমতলের মধ্যেই তার দৈর্ঘ প্রস্থ বেধ ইত্যাদি dimension এর রূপকল্প আনা যায়। স্পর্শের মধ্যে এই dimensionগুলি ধরা পড়ে না। শরৎচন্দের রাজলক্ষ্মী সতী বা অসতী, শ্রীকান্তর প্রতি তার প্রেমের রূপই বা কি, এগুলি অব্যক্তই আছে। পাঠকের অব্যবহিত স্পর্শকে সে প্রতারিত করে কিন্তু তার চরিত্রে dimension-এর অভাব ঘটে না। শরৎসাহিত্যের অন্যান্য অনেক চরিত্রে অনুরূপ সাহিত্যশিল্পের

পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। চিত্রশিল্পের অনুকরণে তাঁর সাহিত্যশিল্পের সৃষ্ট এই চরিত্রগুলি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে একটি অতি-আধুনিক বাস্তবতা দিয়েছে। নিশ্চিত রূপের মধ্যে তাদের নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু তাদের বিচিত্রগামিতা পাঠকের শিল্পবোধকে পরিপূর্ণ করতে থাকে।

শরৎসাহিত্যে অনেক স্থানীয় রঙ (local colour) বা সাময়িক (topical) প্রসঙ্গ আছে। শরৎচন্দ্রের যুগ উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে সন্দেহ নেই। তাঁর সাহিত্যে ধৃত গ্রামীণ এবং শহরের পরিবেশও অনেক অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে। শরৎসাহিত্য এই স্থানীয় রঙ এবং প্রসঙ্গগুলি ঐতিহাসিক উপাদানে পরিণত হবে। হয়তো বা হতে আরম্ভও হয়েছে। কিন্তু চরিত্রচিত্রণের মধ্যে যে নূতনত্ব তিনি বহন করে এনেছিলেন, পূর্ববর্তীদের প্রভাব সত্ত্বেও যে চরিত্রচিত্রণপ্রতিভা তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়েই বাংলাসাহিত্যে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার ধারা পরবর্তীদের মধ্যে বহুকাল প্রবাহিত হবে। এক্ষেত্রে অগ্রগামীরূপে তাঁর সম্মান অক্ষয় হয়েই থাকবে, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

গ্রাম পানিত্রাস : এক নিঃসঙ্গ পথিক-শিল্পীর সঙ্গী

বীরেন্দ্র দত্ত

শিল্পী শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা অসাধারণ। কিন্তু ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের জীবন ও মন কি সেই জনপ্রিয়তার পাশাপাশি সুস্থিত ছিল? এই প্রশ্ন বার বার ওঠে, যখনই ভবঘুরে এই সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবনের প্রতি অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা, দৃষ্টি নানা দিক থেকে শরৎচন্দ্রের রক্তমাংসের অস্তিত্বকে ধরতে চায়। দেবানন্দপুরে জন্মমাত্র, এগারো-বারো বছর বয়সে, যে বয়স এক সদ্য-কৈশোরে-পা-ফেলা মনকে বিস্ময়ে চঞ্চল করে, অস্থির, উৎসুক এক কিশোর শরৎচন্দ্র সেই গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন অজানা জীবনের দুর্মদ স্বাদ নিতে।

দেবানন্দপুর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে সেই কিশোর ভাগলপুর, দেওঘর, কলকাতা, রেঙ্গুন, শিবপুর ইত্যাদি বহু জায়গা ঘুরে স্থায়ী হন পানিত্রাস গ্রামে। এই পানিত্রাস হয় তাঁর 'যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী'। যৌবন অর্থে লেখক-জীবনের ক্লাইম্যাক্স বলতে চাইছি। 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়েছে, শরৎচন্দ্র তখন জীবনস্বভাবে এক পথিক। এখানে ওখানে অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে এক জন্ম-ভবঘুরে শিল্পী মানুষের অনেক কাছের হয়ে পড়ছেন ক্রমশ।

এরই ঝোঁকে দিদি অনিলাদেবীর বিবাহ-সংক্রান্ত সম্পর্কের সূত্রে হঠাৎ-হঠাৎ পানিত্রাসে আসার সূত্রে শরৎচন্দ্র পানিত্রাসকে ভালবেসে ফেলেন। রূপনারায়ণের তীর, সবুজ মাঠ, ঘন গাছের নিবিড় পরিবেশ, অজস্র জানা অজানা পাখির ভিড়ে শরৎচন্দ্র- যিনি ছিলেন ভবঘুরে, যিনি ব্রত নিয়েছিলেন শুধু চলার, সেই পথিক শরৎচন্দ্র—আপন করলেন পানিত্রাসকে।

সাধারণ অর্থে ভবঘুরে মানুষ যেমন নিরাসক্ত, তেমনি হয় উদাস নিঃসঙ্গ। শরৎচন্দ্র সেই অর্থে নিঃসঙ্গ পথিক। কিন্তু পানিত্রাস গ্রাম এই নিঃসঙ্গ পথিক-শিল্পীকে কি সঙ্গ দিয়েছিল? গ্রাম সঙ্গী হয়েছে তাঁর লেখায়, তিনি কিন্তু ছিলেন নিঃসঙ্গ। ব্যক্তিজীবনে পানিত্রাস গ্রামের কাছে তিনি ক্রমশ নিঃসঙ্গই হয়ে পড়েছিলেন। হয়ত নিঃসঙ্গ বাইরে ও ভিতরে ছিলেন বলেই এমন করে এই গ্রামকে আপন করতে পেরেছিলেন তাঁর লেখায় অভিজ্ঞতার ব্যবহারের সূত্রে।

শরৎচন্দ্রের সময়ের বাংলাদেশের গ্রামের রূপ কী তা তাঁর উপন্যাস, গল্পে

চমৎকার চিত্রিত। এ চিত্র শরৎচন্দ্র নিজে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। পানিত্রাস গ্রামে তাঁর স্থায়ী হয়ে বসার প্রারম্ভের কাহিনী তা-ই স্পষ্ট করে। ব্যক্তিগতভাবে শরৎচন্দ্রেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এমন কিছু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ গ্রাম্য মানুষ আজও জীবিত আছেন পানিত্রাসে, যাঁরা তাঁদের যুবক বয়সে এক নিঃসঙ্গ শিল্পী শরৎচন্দ্রকে তাঁদের সঙ্গী করতে চেয়েছিলেন, কিছুটা পেরেছিলেন।

ব্যক্তি শরৎচন্দ্রকে ধরার জন্যেই আমি পানিত্রাস গ্রামে যাই। তাঁর শেষ ভৃত্য গোপাল হাজরা, তাঁর ভাগ্নী শ্রীমতী পারুললতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রামের সে সময়ের তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত, শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ঘোষাল, শ্রীব্রজদুর্লভ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি প্রবীণ মানুষগুলির সঙ্গে দেখা করি। এঁদের প্রত্যেকের স্মৃতিচারণ ও প্রায়-বিস্মৃত অভিজ্ঞতার খনি খুঁড়ে আসল যে জিনিসটি পেযেছি, অর্থাৎ শিল্পী শরৎচন্দ্রের অসম্ভব জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের বিশুদ্ধ নিঃসঙ্গতা এবং সেই সূত্রে গোপন অভিজ্ঞতা লাভ ও সাহিত্যে তার প্রয়োগের ব্যাপারে অকপট চারিত্র— তা মানুষটির অনেক অনালোকিত দিক আলোকিত কবে।

গ্রামের প্রবীণ স্কুল শিক্ষক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় একসময বলে-ছিলেন শরৎচন্দ্র কখনো বেশী মানুষের ভিড়ে থাকতেন না। দেউলটি স্টেশনে যখনি যেতেন সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হযে একা একা ঘুরতেন কলকাতা যাওযার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতেন। তার অর্থ এই নয় যে তিনি সাধারণ মানুষকে পছন্দ করতেন না। আসলে পানিত্রাস গ্রামের সে সময়ের সমাজপতিরা শরৎ-চন্দ্রকে এমনভাবে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে টেনে এনেছিলেন যে শরৎচন্দ্রকে সে সময়ে অবধারিতভাবে নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল।

আমার কথা হল, এই গ্রামের সে সমযের বয়স্ক প্রবীণ সমাজপতিদেব কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে শরৎচন্দ্র যে অভিজ্ঞতার সিন্দুক ভরেছিলেন সেকালে গ্রাম্য নিরক্ষর সমাজের, তাই তাঁকে আজও রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র ধারার এক উজ্জ্বল শিল্পী করে তুলেছে।

পানিত্রাসের মানুষ শরৎচন্দ্রকে একঘরে করতে চেযেছিলেন। উনআশি বছব বয়স্ক প্রফুল্লকুমার ঘোষালকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম, শরৎচন্দ্র সত্যি একঘরে হয়েছিলেন কিনা? উত্তরে তিনি অনেক নতুন তথ্য দিলেন। বললেন, 'মেল্লকের জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী তখন পানিত্রাস, গোবিন্দপুর, বড়াবাড়, সামতা ও মেল্লক—এই পাঁচটি গ্রামের সমাজপতি, ভাই গিরীন রায় চৌধুরী, কেশবলাল ঘোষাল আর পানিত্রাসের বেশ কিছু প্রবীণ ব্যক্তি তখন শরৎবাবুর

স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ওঁর জাত কী, ঠিকমত বিয়ে হয়েছে কিনা—এইসব সন্দেহ নিয়ে প্রশ্ন। তা থেকে ঝগড়া, একঘরে করার ব্যবস্থা। তবে একঘরে উনি হন নি, শেষ মুহূর্তে তা থেকে সরে এসেছিলেন সমাজপতিরা', বলেই থামলেন প্রফুল্লবাবু, একটু ভেবে বললেন, 'জান বীরেন, শরৎদা একদিন হঠাৎ আমাকে খুব দুঃখ করে বললেন, 'প্রফুল্ল, বোধ হয় আমাকে এই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতেই হবে।'

পানিত্রাসকে ভালবেসেই বাড়ি করেছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর খেদোক্তি বোঝায়, তিনি তাঁর শিল্পীমনের অকুণ্ঠ আকর্ষণের বিনিময়ে কী ভয়ংকর অস্থিরতা, অসহায়তা থেকে নিঃসঙ্গতায় নিমজ্জিত হচ্ছিলেন। একঘরে করার বিষয়ে বাহাত্তর বছর বয়সের সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছু প্রশ্ন করাতে উনি বলেন, 'শরৎবাবুকে একঘরে করার ব্যাপারে অগ্রণী ছিল পানিত্রাস আর মেল্লকের সমাজপতি ও বামুনরা। স্মৃতি থেকে বলতে বলতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুধাংশুকাকার শরৎবাবুর বলা একটি হিউমার। বললেন, 'একদিন আমি, সুরেন (ঘোষাল), রাম (ঘোষাল) ওঁর বাড়ি বসে আছি, শরৎদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন, দেখ, 'আমি তো আমার একঘরেই আছি, অনেকের ঘরে তো যাচ্ছি না। এর ওপর ওরা আবার আমাকে একঘরে করবে কী করে ?'

শরৎচন্দ্র এই একঘরে করার বিষয় নিয়ে যে বিশেষ চিন্তিত ও বিপর্যস্ত ছিলেন তাঁর রসিকতা ও রাগ, তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ ও প্রীতিস্নিগ্ধ ভাষণ থেকে বোঝা যায়। শরৎবাবুর ভাগ্নী, যাঁকে শরৎচন্দ্র একেবারে শিশুকাল থেকে মানুষ করেছেন, বিয়ে দিয়েছেন, সেই আটষট্টি বছর বয়স্কা পারুললতা দেবী আমাকে বললেন 'জান বীরেন, বড়মামার এইসব ব্যাপারে খুব রাগ ছিল। কাউকে গ্রাহ্য করতেন না। বড়মামা একদিন আমাকে বললেন, 'দ্যাখ পারু, ওরা বলে কী ? আমাকে টাকা দিয়ে সমাজে উঠতে হবে ?' সেই কথায় বড়মামার যে ঘৃণা ছিল, তা আজও ভোলা যায় না।

বাহাত্তর বছর বয়সের ভৃত্য গোপাল হাজরাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাবুকে একঘরে করার সময় কারা শরৎবাবুর পক্ষে ছিল, মনে পড়ে ?' বলল 'খুম্ মনে পড়ে বাবু। তখন সামতার বসন্ত ঘোষাল, রাম ঘোষাল, সুরেন ঘোষাল —এঁরা খুম্ বাবুকে বাঁচিয়েছিলেন !' রূপনারায়ণের তীরে গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা, এককালের শক্তসমর্থ চেহারার, (এখন রুগ্ন, অথচ তেজী) শরৎচন্দ্রের স্নেহধন্য হরি পাখিরাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'শরৎবাবুকে গাঁয়ের লোকেরা যে একঘরে করতে চেয়েছিল, তাতে তোমাকে কী বলেছিলেন এ ব্যাপারে ?' হরি পাখিরা এ কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বলল 'বাবু তো একদিন আমাকে

ডেকে বললে, 'হরে, আমাকে গাঁয়ের লোকেরা একঘরে করে দিলে। এবার মারবে বোধ হয়।' শুনেই আমরা গোবিন্দপুরের ছেলেরা সব মিলে পানিত্রাসের আটচালায় গেলুম। সব সময় শরৎবাবুকে ঘিরে ছিলুম। একটু থেমে বলল, 'বাবু, সে সময়ে শরৎবাবুর গায়ে হাত দেবার মত কোন লোক এ গাঁয়ে কেন, পাশের দশটা গাঁয়েও ছিল নি। ওঁকে দেখেই সব ভয় পেত।'

আমি এক সময়ে হরি পাখিরাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'শরৎবাবু এ গাঁয়ে কাদের সঙ্গে বেশী মিশতেন?'

হরি পাখিরার এখন বয়স কত ও নিজেই জানে না, বোধ হয় আশির কাছাকাছি। স্মৃতি খুঁড়ে অনেক ছোট ছোট অভিজ্ঞতার মধ্যে বলল, 'বাবু, শরৎবাবু গাঁয়ের ভদ্দর লোকদের সঙ্গে একদম মিশতেন না— দু-একজন ছাড়া। আমাদের এখানে আসতেন। দিনরাত এখানেই পড়ে থাকতেন। আমাদের ভালমন্দের খোঁজ নিতেন। আমার এখানে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করতেন, হৈ-চৈ করতেন। এমন অনেকদিন গেছে, গভীর রাতে বাড়ি ফিরেছেন, আমি হ্যারিকেন নিয়ে এগিয়ে দিয়ে এসেছি।'

পানিত্রাসে থাকতে থাকতে শরৎবাবু আসতেন শিবপুরের বাড়িতে, আসতেন বালিগঞ্জের বাড়িতেও। কিন্তু গ্রামে গেলে শরৎবাবু ছিলেন অন্য মানুষ। নিঃসঙ্গ, আত্মকেন্দ্রিক, বাউল স্বভাবের এক শিল্পী। অদ্ভুত গোপনতায় লেখার রসদ, যা লেখকের একমাত্র 'ক্যাপিট্যাল', তা সংগ্রহ করতেন। একঘরে করার ঘটনা ব্যক্তি শরৎচন্দ্রকে নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল ঠিকই, কিন্তু শিল্পী শরৎচন্দ্রকে ঠেলে দিয়েছিল দুলে, বাগদী, কাহার, জেলে—এদের মধ্যে, যেখানে বুদ্ধির যোগ নয়, হৃদয়ের যোগে মর্ত্যপ্রীতির সাধনা করা যায়, মানুষের শরীরের প্রাণের অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে নেওয়া যায়, নিঃসঙ্গতার মধ্যে এক অদ্ভুত সঙ্গী পাশে রাখা যায়।

সে সময়ের শরৎচন্দ্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ও শুভানুধ্যায়ী পঁচাত্তর বছর বয়স্ক সুরেন্দ্রনাথ ঘোষালকে জিজ্ঞেস করলাম, 'শরৎচন্দ্রকে একঘরে করার ব্যাপারে আপনি তো অনেক কিছু জানেন, কিছু বলুন।' বললেন বিস্তারিত করে, 'শরৎদার বিয়ের ব্যাপারটাই এই একঘরে করার ব্যাপারে প্রধান কথা ছিল। শরৎদা কিন্তু এ ব্যাপারে তেমন গুরুত্বই দিতেন না। গ্রামের কোন বুড়ো লোকের সঙ্গে মিশতেনও না।' বলতে বলতে একটু থেমে হাসলেন। 'এই ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা বলি তোমায়, বীরেন। একদিন সন্ধ্যেয় পদ গাঙ্গুলী, লক্ষ্মীনারায়ণ বাঁড়ুজ্যে, হারাধন গাঙ্গুলী, বঙ্কিম ঘোষাল এসে আমাকে বলে গেলেন, শরৎবাবুর বাড়ি আজ সিন্নির নেমন্তন্ন। কারণ পানিত্রাস,

গোবিন্দপুর আর বড়াবাড় গ্রামের লোকেরা তাঁকে সমাজে তুলতে চায়। এতে বাদ গেল সামতা মেল্লকের লোকেরা। আমি ঐ সন্ধ্যের অন্ধকারে হাতে হ্যারিকেনটা ঝুলিয়ে উপস্থিত হলাম। এলেন রমেশ ডাক্তারও, মুখুজ্জ্যেদের ছেলেরা শরৎদার টাকায় ভালই আয়োজন করে শরৎদাকে না জানিয়েই, দাদার পক্ষে আমি, রমেশ ডাক্তার আর মুখুজ্জ্যে বাড়ির ছোকরা ছেলেরা। আর এদিকে এসেছে আমার মাস্টারমশাই শশধরবাবু, পণ্ডিতমশায়, সুরেনবাবু, হরি মুখুজ্জ্যে, পঞ্চু চাটুজ্জ্যে, পঞ্চু গাঙ্গুলী, লক্ষ্মীনারায়ণ ধাড়ুজ্জ্যে, বঙ্কিম ঘোষাল, হাবু গাঙ্গুলীর মতন পনেরো-ষোলো জন ঝানু সমাজপতিরা। মজাটা হল কোথায়—শরৎদা কারোর সঙ্গে কথা বললেন না, কোন আপ্যায়নও করলেন না।

যখন সিন্নি ও প্রসাদ বিলোনো শেষ হয়ে গেল, তখন শরৎদা লক্ষ্মণ মুখুজ্জ্যেকে ডেকে বললেন, 'হ্যাঁরে, এঁরা সব এসেছেন কেন?' শরৎদার মধ্যে ভয় বলে কিছু ছিল না। সোজা অপমান! আর যায় কোথা! সামনে কিছু বললেন না ওঁরা, বেরিয়ে গিয়ে সে কী চেঁচানো! বলল, 'অভদ্র, অসামাজিক, ভদ্রলোকদের মানমর্যাদা রাখতে জানে না।' আসলে লক্ষ্মীনারায়ণ আর পঞ্চু গাঙ্গুলী চেয়েছিলেন, 'পানিত্রাস স্কুলের জন্যে ২০০ টাকা দিন আর সমাজে উঠুন।' এই কথা সর্বত্র প্রচার হতে সামতা মেল্লকের ছেলেছোকরাদের মনদা (মনমোহন ঘোষাল), সতীশদা (সতীশ ঘোষাল), প্রফুল্লকাকা, অমূল্য কাকা, (অমূল্য রায়), যতীন চাটুজ্জ্যে, রাম ঘোষাল সবাই মিলে সমাজপতি জ্ঞান রায় আর পানিত্রাসের জমিদার মোহিনী ঘোষালকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শরৎদাকে দলে আনেন। শরৎদার ভগ্নীপতি পঞ্চু মুখুজ্জ্যের কাছে শরৎদার বিয়ের ব্যাপারে সব খোঁজখবর নেন এবং যখন দেখেন যে রটনা সবই মিথ্যে, তখন শরৎদাকে সাদরে নেমন্তন্ন করেন মোহিনী ঘোষালের বাড়ি। তখন থেকে শরৎদা সামতা মেল্লকের প্রিয় হন। প্রতিষ্ঠা করেন 'শরৎচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়।'

আমার বাবা শ্রীপুলিনবিহারী দত্তের বয়স এখন আশি ছুঁয়েছে। শরৎ-চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাঁরও ভাগ্যে ঘটেছে। এই সান্নিধ্যের প্রসঙ্গেই কথা বলতে বলতে বাবা একটা ঘটনা বলে জানালেন, শরৎবাবুর যেমন ছিল ভদ্রতা-বোধ, তেমনি সূক্ষ্ম হাস্যরসবোধ। তবে তাঁর কাছে কিছুক্ষণ বসে গল্প করলেই বোঝা যেত মানুষটি গ্রামের সব খবর রাখতেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থেকেই।' বলেই ঘটনাটি বিস্তারিত করলেন, 'আমি তখন গ্রেট অ্যাথেরিয়ান ইন্সিওরেন্সের চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্টের পদে কাজ করছি। হঠাৎ একজন খবর

দিল, স্টেট্‌স্‌ম্যানে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, আমারই জায়গায় পাঁচজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-সহ একজন চিফ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট নেওয়া হবে। আমার চাকরি যাবে। বিজ্ঞাপনটা দেখার জন্য ছুটলাম শরৎচন্দ্রের বাড়ি। উনিই গ্রামের মধ্যে স্টেট্‌স্‌ম্যান রাখতেন। ওঁর বাড়ি গিয়ে দেখি, ফুলগাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত। আমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলেন, আসার কারণ জেনে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বসতে বললেন, কাগজটা এগিয়ে দিলেন। আমার সমস্ত ব্যাপারটা মন দিয়ে শুনলেন এবং এই চাকরি থেকে অন্যায়ভাবে সরানোর ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'দেখ পুলিন, যদি সত্যি তোমার এভাবে চাকরি যায়, তাহলে আমি স্টেটস্‌ম্যানে চিঠি লিখে এর প্রতিবাদ করব। আমাকে তুমি শুধু আগে-ভাগে খবরটা দিয়ে যেও।' মানুষটাকে তখনি বড় আপন মনে হল। আমি বসে থাকতে থাকতেই দেখলাম, উনি পরে পরে কয়েকটা ওষুধ খেলেন। বললাম, 'আপনি এত ওষুধ খান কেন? খুব খারাপ।' বললেন, 'তুমি জান না পুলিন, চল্লিশ পেরিয়ে গেলে ওষুধ একটু বেশীই খেতে হয়। কারণ শরীরে তখন ক্ষয় হয় অনেক, এই ওষুধ দিয়েই পূরণ করতে হয়।' একটু থেমে সেই নির্মল হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'পুলিন, চল্লিশের নীচে পর্যন্ত শরীর আমার নিজের কাছে থাকে, চল্লিশের ওপর গেলে ডাক্তার আর ভগবানে তখন টানাটানি করে। আল্টিমেট্‌লি জিতবে ভগবান, কিন্তু বেশ কিছুটা ডাক্তার আর ভগবানে দড়ি টানাটানির খেলা হয়।'

'সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারতেন শরৎচন্দ্র' বাবা বললেন, 'সেদিন সেই যে আমার সঙ্গে সকালের দিকে গল্পে বসলেন, উঠতে চাইলেন না। একবার জিজ্ঞেস করলাম, 'শরৎবাবু, আপনাকে কিন্তু খুব একা লাগে। গ্রামে কারোর সঙ্গে তেমন মেশেন না।' বললেন 'কেন, এই তো তোমার সঙ্গে মিশছি। একা আমি মোটেই নই।' তামাক টানতে টানতে বললেন, 'তবে কি জান, গ্রামে যত কম লোকের সঙ্গে মেশা যায় ততই ভাল। আমি বেশ থাকি। তোমাদের মত দু-তিনজন ছাড়া আমি মিশি না। গ্রামে বাস করার প্রথম অভিজ্ঞতা তো ভাল হয়নি। তাই।' বলেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। 'আমার এতে লাভই হয়েছে, পুলিন।'

বাবার অভিজ্ঞতা থেকে শরৎবাবুর স্বীকৃতি থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, শরৎচন্দ্র নিঃসঙ্গতাকে তাঁর দিনলিপির অন্যতম আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনের নিঃসঙ্গতা ছিল তাঁর সচেতন মনেরই একান্ত কাম্য দিক। কিন্তু অবচেতন শিল্পী মন—যা লেখার সময় সচল, জীবন্ত হয়, সেখানে এই ব্যক্তি-জীবনের নিঃসঙ্গতার কারণগুলিকে অভিজ্ঞতা করে গল্প-উপন্যাসে লিপিবদ্ধ

করে গেছেন, পল্লীসমাজ, দেনা-পাওনা, বামুনের মেয়ে, পণ্ডিতমশাই—এইরকম আরও অনেক উপন্যাসে সেই নিঃসঙ্গ জীবনের অভিজ্ঞতা প্রধান সঙ্গীর স্বরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

সারা পানিত্রাস গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক অনেক প্রবীণ মানুষের কাছে শুনেছি, শরৎচন্দ্র জাত মানতেন না। জাতিবিচারে মানুষকে হেয় করা তিনি আদৌ সহ্য করতে পারতেন না। এই অসামাজিক বিষয় ও সমস্যাকে তিনি স্পর্শ করেছেন তাঁর 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে, এঁকেছেন 'বামুনের মেয়ে' ইত্যাদি বহু উপন্যাসে। এই জাতসমস্যার প্রসঙ্গে আমার বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'শরৎবাবু আমাদেব বাড়িএসে প্রতিবেশী বিপিন বেরার হুঁকো টানতেও দ্বিধা করেন নি। তামাক খেতেন খুব। ওতেই ওঁর মেজাজ। বললেন, দেখ পুলিন, জাতবিচার আমি মানি না ঠিকই, কিন্তু কেউ যদি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে লোক বা সমাজকে ঠকায়, তাও আমি সহ্য করব না। যে কোনভাবে প্রবঞ্চনা করলে, যে করে সে যেমন ছোট হয়ে যায়, যাকে প্রবঞ্চিত করে তার ব্যক্তিত্বকেই ছোট করা হয়।' গ্রামের পুরনো ব্রাহ্মণদের প্রসঙ্গেই কথাগুলো বলেছিলেন শরৎবাবু।

সমাজের জাতবিচার মানুষকে সমাজ ও ব্যক্তিমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। শরৎবাবু তা করেননি তাঁর জীবনধর্মে, কোন সার্থক শিল্পী তা করতে পারেন না। কিন্তু অন্য অন্যায়কে সমর্থন না করতে পেবে পানিত্রাস গ্রামের একটি ঘটনায় তিনি একটি মানুষেব মিথ্যা ব্রাহ্মণের ধর্মকে চূর্ণ করতে গিয়ে যেমন তাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনি নিজেও একা হয়েছিলেন।

'শরৎচন্দ্র নিজে কোন জাতে বিশ্বাস করতেন না। নানান ব্যক্তিগত আচরণে তিনি তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর পরিচিতদের।' একথা বললেন সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কিন্তু তাই বলে তিনি শুদ্ধ ব্রাহ্মণত্বকে একেবারে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেন নি। কোন গোঁড়ামি নয়, রক্ষণশীলতা নয়, ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের ধারায় ব্রাহ্মণশ্রেণীর কৌলীন্যে একটু বা শ্রদ্ধাও ছিল। এই ব্যাপারেই সুরেনকাকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা কথা শুনলাম।

সুরেনকাকা বলেলেন, 'জান বীরেন, সে সময়ে সামতা মেল্লকে ব্রাহ্মণদের খুব দাপট। মিথ্যে আচারধর্ম ছিল যেমন, তেমান শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ দু-একজন ছিল বৈ কি! শরৎদার বাড়ি একদিন সকাল দশটা নাগাদ গিয়ে দেখি, তাঁর বাড়ির নীচের তলার দালান একেবারে গুলজার। শবৎদা তাঁর সেই পরিচিত ইজিচেয়ারে বসে। তাঁকে ঘিরে বসে আছে গ্রামের রমো ডাক্তার, শরৎদার

ছোটভাই প্রকাশদা, জীবন বাঁড়ুজ্জে, বসন্তকাকা, রাম ঘোষাল, বিভূতি চাটুজ্জে এবং আরও অনেকে। জীবনদা নাকি এক তাঁতীর বামুনকে নিয়ে কলকাতায় এক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণের বাড়ি দুর্গাপূজা করে এসেছেন। তাঁতী বামুনের নাম পুণ্য মুখুজ্জে, বোষ্টমপাড়ায় থাকত। ভদ্রলোকের ইচ্ছে ছিল সে সময়ের শুদ্ধ ব্রাহ্মণ যাঁরা, তাঁদের মধ্যে চালু হন। রমো ডাক্তার অনেক বুঝেও কেন যেন সমর্থন করেছেন তাঁকে, আর বসন্তকাকা তার তীব্র বিরোধী। এই নিয়ে কথাকাটাকাটিতে কী একটা ফোঁস কথা বলে ফেলেছেন তিনি। তাতেই চীৎকার, আমি সেই সময়ে গিয়ে হাজির। রাম তার দাদাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে ঠাণ্ডা করল। শরৎদা এবার কথা বললেন 'বেশ, তিনি তাঁতীর বামুন কিনা, ওঁর যেখানে আদি বাড়ি, সেই হুগলীর কোন গ্রামে লোক পাঠান হোক।' শরৎদা নিজেই বিভূতি চাটুজ্জে আর রামকে পাঠালেন, যথাসময়ে খবর এলো, হ্যাঁ, পুণ্য মুখুজ্জে যথার্থ অর্থে ব্রাহ্মণ নন, তাঁতী ব্রাহ্মণ। শরৎদা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন—একজন মিথ্যাচার করে ব্রাহ্মণসমাজে আশ্রয় নেওয়ায়। তিনি যে কোন ধরনের অন্যায়ের যেমন ঘোরতর বিরোধী, তেমনি তাঁর মুখে শুনেছি সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের শুদ্ধাচারের প্রতি শ্রদ্ধাবাণী। যেহেতু শরৎদা এর বিরোধী, ফলে গ্রামে মানুষ জোর পায়। পরে পুণ্য মুখুজ্জ্যে নিজে থেকেই বাসস্থান বিক্রি করে গ্রাম ছেড়ে কোথায় যেন চলে যায়। এই প্রসঙ্গে পরে একদিন শরৎদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'দাদা, পুণ্য মুখুজ্জ্যের ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনি কী ভাবলেন?' শরৎদা বললেন, 'দেখ সুরেন, কোন লোককে বাইরে থেকে দেখে কিছুতেই বোঝা যায় না সে ভাল কি মন্দ। তাই মাঝে মাঝে যাচাই করতে হয়।'

এই প্রসঙ্গ আবার তুলেছিলেন সুরেনকাকা শরৎবাবুর সামনে। 'শরৎদা বললেন, দেখ সুরেন, পুণ্য মুখুজ্জে গ্রামছাড়া হল এটা আমার কাছে ভীষণ লেগেছে। কিন্তু মিথ্যে বলে কেন তিনি নিজেকে এবং তোমাদের গ্রামসমাজকে ঠকাচ্ছিলেন, তাতেই আমি ক্ষুব্ধ। এতটা হবে আমি ভাবিনি। এসব ব্যাপারে আমাকে আর জড়াবে না। আমি বড় দুঃখ পাই।' সুরেনকাকা এসব কথা বলার পর জানালেন, 'শরৎদাকে দেখেছি, দূর থেকে গ্রামের মানুষকে দেখতে চাইতেন, কাছে গিয়ে জড়িয়ে পড়তেন না কখনো। এতে নানান ছোটখাটো ঘটনায় যেমন তিনি অস্থির বিপর্যস্ত হতেন, তেমনি অসহায় হয়ে পড়তেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'একা হওয়ার ব্যাপারটা কিরকম?' বললেন, 'ঠিক বোঝাতে পারব না।' তবে পুণ্য মুখুজ্জ্যের ব্যাপারটা আর তোলেন নি। শুধু এটা কেন, কোন ঘটনা যা তাঁকে কোন না কোন ভাবে আঘাত করেছে, আহত

করেছে, সেই ঘটনা কিছুতেই পুনরাবৃত্তি করতেন না। সুকৌশলে এড়িয়ে যেতেন।'

এটাই যথার্থ শিল্পীর স্বভাব। শরৎচন্দ্র মানুষটা ছিলেন সত্যিকারের দরদী। কিন্তু গ্রামের পুণ্য মুখুজ্জের ঘটনা, বা একঘরে করার ঘটনা তাঁকে যত দুঃখ দিয়েছে, তার বেশী দিয়েছে নিঃসঙ্গতা, সেই সঙ্গে মূল্যবান অভিজ্ঞতার বোধ। এই নিঃসঙ্গতা শিল্পীর নিঃসঙ্গতা। যন্ত্রণা থেকে জন্ম নিয়ে অভিজ্ঞতা-লালিত চরিত্র, তাদের এঁকেছেন নানা উপন্যাসে গল্পে।

শরৎচন্দ্রের জীবনে পানিত্রাস গ্রামের সম্পর্কে যে নিঃসঙ্গতার জগৎ, তা তাঁর অনেক খেদোক্তি প্রমাণ দেয়। সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় কথাপ্রসঙ্গে জানালেন, 'আমার অস্পষ্ট হলেও মনে পড়ছে বীরেন, কী এক প্রসঙ্গে একদিন শরৎবাবু আমাকে বললেন, সুধাংশু, আমি তো সকলকে চাই, ওঁরা যদি আমাকে না চান আমি কারোর বাড়িই যাবো না।' সত্যিই যেতেন না কারোর বাড়ি। মুখুজ্জেবাড়ি আত্মীয়তাসূত্রে, পুলিনবিহারী দত্তের বাড়ি, কাহার-দুলে-বাগদীদের বাড়ি--এইরকম কিছু নির্দিষ্ট বাড়ি ছাড়া কারোর বাড়ি শরৎচন্দ্র যেতেন না। পানিত্রাস গ্রাম এইভাবে তাঁর পথিক-মনে একটা নিঃসঙ্গতার পরিবেশ রচনা করে দিয়েছিল। সারা গ্রাম ঘুরে, বয়স্ক মানুষগুলির স্মৃতিচারণ ও আন্তরিক অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে শরৎচন্দ্রকে যাচাই করে যেটা স্পষ্ট হয়, তা হল, তিনি ভীষণ একা ছিলেন— থাকতেনও। বোধ হয় এই একাকিত্ব যেমন ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের কাছে পানিত্রাসের প্রবীণ গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে অভিনন্দনবর্ষণ, তেমনি শিল্পীর মনের কাছে দিল আশীর্বচন।

মনে পড়ে প্রাক্‌শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত হাওড়া জেলার বাগনান কলেজ ভবনের এক সভায় প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একটি ভাষা প্রয়োগ করে বলেন, 'এঁরা দুজন একই আকাশে সূর্য ও চন্দ্রের মত; আমি কোন সাহিত্যিক সমালোচনা বা দুই প্রতিভার তুল্যমূল্য বিচারে যাচ্ছি না, আমি বলছি, এই উপমায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—দুজনের চরিত্রনিহিত স্বাতন্ত্র্য বেশ স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

সত্যিই তো! এক আকাশেই রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একটু আগে, শরৎচন্দ্র পরে এই অর্থে শরৎচন্দ্র কনিষ্ঠ লেখক। কিন্তু দুজনের জীবনাচারে অত্যদ্ভুত বিভিন্নতা! রবীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছেন ঠাকুরবাড়ির ফিতেমাপা জীবনব্যবস্থায়, সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি সারা বিশ্বপরিক্রমায় তাঁর ব্যক্তিজীবন ও মনোজীবনকে নিয়োজিত করেন।

আর শরৎচন্দ্র ? তিনি এতদূর যাননি, কিন্তু এক ভবঘুরে যেভাবে জীবন কাটায়, এক বাউল যে ভঙ্গিতে একতারা হাতে উদাস পথপরিক্রমায় গতিপ্রাণ হয়, ঠিক সেইভাবে পথিকজীবন বেছে নিয়েছিলেন। সে জীবন সত্যিকারের কথাকারের জীবন।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে শরৎচন্দ্র পেয়েছেন রাজলক্ষ্মী, অভয়া, গফুর, সাহজী, ইন্দ্রনাথ, নতুনদা—এসব মানুষের সাক্ষাৎ। তারা জীবন্ত, দর্পণে বিম্বিত মূর্তির মত। বিখ্যাত ফরাসী লেখক স্তাঁদাল একবার বলেছিলেন, 'উপন্যাস হল, একটা লোকের বড় স্বচ্ছ একটা আয়না হাতে নিয়ে রাস্তা হাঁটার সময় যেমন সেই আয়নায় চারপাশ প্রতিবিম্বিত হতে হতে চলে যায়, সেই-রকম।' চমৎকার কথা। শরৎচন্দ্র ব্যক্তিজীবন, মন দিয়ে তাই করেছেন উপন্যাসে।

আমার কথা হল পানিত্রাস গ্রামের অভিজ্ঞতা তা-ই দিয়েছে লেখককে। নিষ্ঠুর বাস্তব জীবনে পানিত্রাস তাঁকে নিঃসঙ্গতায় নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু শিল্পীর অন্তরলোকে সেই পানিত্রাস হয়েছে সঙ্গী।

কিন্তু এ তো গেল পানিত্রাস গ্রামের কথা। শরৎচন্দ্র নিঃসঙ্গ ছিলেন তাঁর মনের এক অনালোকিত জায়গায়। 'অনালোকিত' অর্থ হল, গ্রামের অন্তরঙ্গ মানুষ ও শুভানুধ্যায়ীবা যাকে ছুঁতে পারেননি। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র বহু মানুষকে, বন্ধুকে ভালবাসতেন, তারা যেভাবে এসেছে সেইভাবে অকপটে নিজের বাড়িতে স্থান দিতেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিসম্পর্ক কারোর কাছে ভাঙতেন না। বোধহয় এও নিঃসঙ্গ শরৎচন্দ্রের মনে শিল্পের জারক রস সিঞ্চিত করত।

এরকম ব্যক্তিগত সম্পর্কের রহস্য পানিত্রাস গ্রামের মানুষ সে সময়ে উপলব্ধি করেছিলেন। 'একেবারে ব্যক্তিগত জীবন ও মনে শরৎচন্দ্রের অন্য অনেক রহস্যও ছিল', বললেন সুরেনকাকা। সুরেনকাকার বলা এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনাই তার প্রমাণ। সুরেনকাকা বললেন, 'একদিন দাদার বাড়ি সকাল নটা-দশটার সময় হঠাৎ গিয়ে দেখি—দাদা ইজিচেয়ারে বসে আছেন, আর পায়ের কাছে এক অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে পদসেবা করছেন। আমি যেতেই অপ্রস্তুতের মত হয়ে তাড়াতাড়ি দাদা পা সরিয়ে নিলেন, মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন। আমার কেমন খারাপ লাগল দাদার পা সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা। একটু পরে বললাম, 'দাদা, মেয়েটি কে ? এভাবে পা সরালেন কেন ? আমার খারাপ লাগছে।' দাদা কিছুতেই কিছু বললেন না, কেবল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে লাগলেন। শেষে শুধু বললেন, 'সুরেন তুমি বড় জ্বালাও। ওকথা ছাড়।' আমি জিদ ধরে আছি। বললাম, 'না বললে ছাড়ব না।' দাদা একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, 'ও প্রতুলের স্ত্রী, আগে বিধবা ছিলেন, এখন

সধবা হয়েছেন।' বলেই কথাটা এড়িয়ে গেলেন। আর কিছুতেই এই প্রসঙ্গে এলেন না। কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। আমিও আর কোনদিন এই প্রসঙ্গ তুলিনি। আমার কাছে আজও তা রহস্যময়।' কিন্তু আমরা জানি এই পরিচিত নারীর ব্যক্তিজীবনের রহস্য তাঁর শিল্পের সোনার কাঠি রুপোর কাঠির রহস্য রচনা করেছে অজ্ঞাতে, যা দিয়ে তিনি অবলীলায় চিরকালের পাঠকমন জয় করেছেন।

এই রকম রহস্যের কথা বলল গোপাল হাজরাও। বলল, 'বাবুর বাড়ি সব অদ্ভুত অদ্ভুত লোক হঠাৎ হঠাৎ আসতেন। একবার মানিকবাবু বলে এক ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী একমাস থেকে গেলেন। একমাস পরে হঠাৎ মানিকবাবুর মায়ের চিঠি : 'দাদা, মানিককে বাড়িতে স্থান দিয়ে খুব অন্যায় করেছেন। এখানে ওর স্ত্রী ছেলেমেয়ে আছে।' ব্যাস, সেই চিঠি পাওয়া, আর একদিনও বাবু মানিকবাবুকে থাকতে দিলেন না। দুজনকেই কলকাতায় পাঠিয়ে দেন।'

বস্তুত শরৎবাবুর অদ্ভুত সব যোগাযোগ ছিল। একদিকে সরল অনাড়ম্বর নিঃসঙ্গ জীবনযাপন, আর একদিকে রহস্যময় সব সম্পর্ক। ব্যক্তি শরৎচন্দ্র এই নিয়ে থাকতেন। কিন্তু তা থেকেই জীবনরস সঞ্চিত হত শিল্পী শরৎচন্দ্রের মনে। যেন ব্যক্তিমন থেকে মনের এক অলৌকিক ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়ে নানা জীবনরস ও অভিজ্ঞতা ছেঁকে এসে পড়ত শিল্পী শরৎচন্দ্রের মনের সযত্নরচিত পাত্রে। আর তা দিয়ে তিনি গ্রামবাংলার পটভূমিকায় যে কথা লিখে গেছেন, তা একান্তভাবে ঘনিষ্ঠ পানিত্রাসের জীবনচিত্র হলেও সারা বাংলাদেশের চিরকালের গ্রাম, সমাজ, মানুষ, তার সুখদুঃখের কথায় রূপ পেয়েছে। পানিত্রাসের জীবন তাই ব্যক্তি ও শিল্পী—দুই শরৎচন্দ্রেরই শেষ বয়সের বারাণসী, পানিত্রাস গ্রাম এক প্রতিষ্ঠিত কথাকারের প্রাজ্ঞধর্ম জীবনের জীবনবেদ রচনার সহচর।

বিশ্বসাহিত্যপরিক্রমা ও শরৎচন্দ্র

নীরেন্দু হাজরা

মোটামুটি ভিক্টোরীয় যুগের অবসান ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। নব-যুগের সূচনা ভিক্টোরীয় যুগের অবসানে। নতুন যুগে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলেছে। জীবনের সার্বিক গতি পরিবর্তিত হয়েছে, সার্বিক চেতনাবোধ শিল্পীচিত্তকে নাড়া দিয়েছে। সাহিত্য গড়ে উঠেছে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। সম্ভবত বিজ্ঞানের বাস্তব আঘাতে সামাজিক জীবনে বিরাট ভাঙন দেখা দিয়েছিল। মানুষের সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি পরিস্থিতিগুলির স্রষ্টা কে সে---বিধাতা, না সে নিজে--এই প্রশ্ন জেগেছিল।

তাই এই যুগেই বাস্তব জগতের সঙ্গে মানবমনের ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেছিল মনোবিজ্ঞান। ফলে সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়েছে আত্মানুসন্ধিৎসা, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত বস্তুর মত পরিবর্তনশীল। দার্শনিক মনন ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার সমন্বয়সাধন ঘটেছিল এ-যুগের সাহিত্যে। সুচারু মনোবিশ্লেষণের প্রয়াসও লক্ষণীয়। দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যে নতুনত্ব অনবদ্য। আবহকালের রাষ্ট্র-সমাজ-অনুশাসিত বেড়াগুলি ভেঙে মানুষের জয়গান ঘোষিত হয় এই আধুনিক যুগে,—বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

এই নবজাগ্রতবোধ মানবজীবনের তির্যক আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে, সাধারণ মানুষের মনে আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হয়েছে, যুগ-যুগান্তরের সংস্কারমুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সাধারণ মানুষ উদ্‌গ্রীব হয়েছে। সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তনের চিন্তায় মানুষ দুঃসাহসিক হয়ে উঠেছে। তারই ফলস্বরূপ ঔপন্যাসিকের শিল্প-স্বভাবের মূলে অপরিহার্যভাবে নিহিত হয়েছে যুক্তি বিচার সিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবং পরিবেশসচেতন বাস্তব জীবনবুদ্ধি। 'মানবচেতনাকে যুগোচিত ব্যাপ্তি ও গভীরতার সঙ্গে অন্বিত করার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা থেকেই এই উপন্যাসের উদ্ভব।' বিংশ শতাব্দীতে উপন্যাস একটি আধুনিক কলারূপ (art form)। আজকের উপন্যাসে জীবন-অনুভবের তীব্রতা অনিবার্য। এই উপন্যাসশৈলীর জন্মপ্রেরণার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করে Sir Ralph Fox যথাযথ মন্তব্য করেছেন বলে আমার বোধ হয়—"The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to take

the whole man and give him expression" বাস্তবিক তাই। একটি মানুষের সামগ্রিক জীবনের কথা জানতে হলে, তা উপন্যাসের মাধ্যমেই জানা যায়, যা ঔপন্যাসিকের শিল্পস্বরূপের গুণে মানুষের জীবনে প্রাণবন্ত হয়ে প্রকাশ পায়।

এই প্রসঙ্গে আমরা কবি ও কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করতে পারি। বিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রতবোধ রবীন্দ্রনাথের কাছে বিস্ময়কর বলে বোধ হয়েছে, নিজের দেশের নিরুপায় মানুষের কথা তাঁকে অনেক সময়েই পীড়িত করেছে। সে পীড়ন অসহনীয়। কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—

"শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।"

এই দুটিমাত্র পংক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব মানবপ্রীতির পরিচয় পেয়েছি। এই বোধ রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

২

বাস্তবিকই এই যুগেই আত্মনিরীক্ষা, আত্মসংশয়, আত্মপ্রত্যয়ের যুগ সূচিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) যুগ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগরণের ফলে বাংলা উপন্যাসে বৈচিত্র্য-বহুলতা অস্বীকার করার নয়। যৌনসমস্যা এই যুগের আরেকটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই যুগের আরেকটি লক্ষণ দেখা যায় গ্রামীণ জীবনের কাহিনী গ্রথিত করা। চতুর্থ লক্ষণ প্রকাশ পায়—রাজনীতি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উপন্যাস রচনা। এরই মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, শিক্ষিত মহল প্রথম মহাযুদ্ধের পর বামপন্থী চেতনায় অর্থাৎ মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণজীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমাজের শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিচার বিশ্লেষণ উপন্যাসের বিষয়বস্তুরূপে গণ্য হয়। এ যুগের সাহিত্যে সত্য ও বাস্তব (Reality and Real) নিয়ে তর্কের ঝড় ওঠে। কেউ কেউ বলেন—চরিত্রগুলি বাস্তবপ্রধান হবে, আবার কেউ কেউ বললেন—উপন্যাসের চরিত্রগুলি সবসময়েই বাস্তবসম্মত হবে, এমন কোন কথা নয়। তবে D.H. Lawrence উপন্যাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বললেন- The novel is the one bright book of life. কারণ দোষগুণমিশ্রিত মানুষের জীবনের ছবিই হবে উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বিখ্যাত সাহিত্যসমালোচক হাডসন উপন্যাসের করণীয় সম্পর্ক সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন। সবচেয়ে দুর্গম মানুষের জীবন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে অন্তরের সঙ্গে অন্তর মিশিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি

করাই ঔপন্যাসিকের কাজ। মানবজীবন সম্বন্ধে সবিশেষ উপলব্ধি, মানব-চরিত্র সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করে সাহিত্যরচনায় এগিয়ে যেতে হবে, নতুবা নয়। এই প্রসঙ্গে ড. অজিত ঘোষের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"উপন্যাসের বিচারে কেহ আদর্শবাদী, কেহ বা বাস্তববাদী দৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ জীবনবাদী সাহিত্যে বিশ্বাসী, আবার কেহ বা কলাকৈবল্যবাদই দৃঢ়তার সঙ্গে ধরিয়াছেন। কেহ সাহিত্যের বক্তব্য অনুযায়ী সাহিত্যেব মূল্য নিরূপণ করেন, এবং কেহ বা রসোত্তীর্ণতার দিক দিয়া তাহার দর যাচাই করেন। কেহ ঘটনা-সংস্থাপনার কৌশলের দিকে গুরুত্ব দেন, আবার কেহ বা চরিত্রসৃষ্টিকেই উপন্যাসের মুখ্য দিক মনে করেন। এমনিভাবে আমরা একই সাহিত্যকে আমাদের নিজস্ব রুচি, প্রবৃত্তি, মতবাদ ও রসবোধ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিচার করিয়া থাকি।"

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা মানুষেব প্রতি অবিশ্বাস থেকে, সে যন্ত্রণা জীবনেব প্রতি অনীহা থেকে, হৃদয়হীন মস্তিষ্কধর্ম থেকে। ফলে মানুষের মনোজগতে, আধ্যাত্মিক জগতে এক তুমুল তোলপাড় লক্ষ্য করা যায়। আচরণে, ব্যবহারে, সৌজন্যবোধে এক বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়, মানুষ-মানুষীর আচবণে এক অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, যা বিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম বলে মনে হয়।

এ সম্পর্কে A. C. Ward-এর বক্তব্য মনে পড়ে। তিনি বলেন—"No previous generation had shown so close an interest in mental and spiritual disturbance as to create a growing assumption that most men and women are cases to be diagnosed, that the world is a vast clinic and nothing but abnormality is normal.

বিংশ শতাব্দীর এই যন্ত্রণা বা যুগচেতনা তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয় বিশ্বসাহিত্যে, বিশেষ কথাসাহিত্যে। ইংরাজী, ফরাসী ও রাশিয়ান সাহিত্য তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সমাজের, রাষ্ট্রের মধ্যে যে ঘুণ ধরেছিল সেই ঘুণধরা সমাজের চিত্র ইউরোপীয়ান সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাটলার, স্টার্ন ও রিচার্ডসনের রচনা, বা টুর্গেনেভ, দস্তেয়ভস্কি ও টলস্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কী প্রমুখের রচনা বা মোপার্সাঁ, জোলা, টমাস মান এবং নরওয়ের নুট হামসুনের রচনায় যুগচেতনার চিত্র ধরা পড়ে। 'Modern World Fiction' পুস্তকে বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক এবিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেন। অসুস্থ সমাজ-জীবনের ছবি বিস্তৃতভাবে অঙ্কিত হয়েছে

এই সমস্ত ঔপন্যাসিকদের রচনায়। তথাপি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, উপরিউক্ত লেখকেরা কেবলমাত্র অসুস্থ সমাজ বা সমাজব্যবস্থার চিত্রলিপি অঙ্কিত করেই কর্তব্য শেষ করেননি, এবং এঁদের অনেকেই নব বাস্তববাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্য, শিবম, সুন্দরেব সাধনা করেছেন, যা শাশ্বত, সত্য এবং সুন্দরের।

এই যুগ-চেতনায় রবীন্দ্রনাথও দগ্ধ। তাঁর লেখার মধ্যে যুগযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে, কিন্তু ভাবতীয় জীবনসাধনায় তিনি প্রশান্ত, তাঁর বিদ্রোহ ছিল সবিনীত, তাই তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো,—তাঁর মতে, মহাপাপ। বিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বোধ কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে বিস্ময়কর। আধুনিক সভ্যতার রথচক্রতলে সাধারণ মানুষের জীবনেব যন্ত্রণা কী যে ভযাবহ, অপর দিকে পীড়নকারী অভিজাত সম্প্রদায়ের ভদ্রজীবন যাপনেব উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিচারহীন সমাজব্যবস্থার চিত্র, যা এযুগের সাহিত্যের বিষয়বস্তু, তা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সুস্পষ্ট। নিঃস্ব, রিক্ত, উপায়হীন মানুষের objective চেহারা ও তার প্রতিকার কিভাবে হতে পারে, তারো ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি। আত্মনিরীক্ষায়, আত্মনিষ্ঠায়, মানব-সংহতির চেতনায়, বিজ্ঞানের শিক্ষায় অনুশীলিত হয়ে মানুষ নিজের প্রতি আস্থাশীল হয়েছে। যুদ্ধের উন্মত্ততাকে এড়িয়ে সুস্থ, সুন্দর, পবিত্র জীবন-যাপনের জন্য উন্মুখ যে মানুষ, সেই মানুষের জয়যাত্রা ঘোষণা করলেন রবীন্দ্রনাথ। বিংশশতাব্দীর এ রূপরেখা তাঁর লেখায় ধরা পড়েছিল। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে শতাব্দীর যুগচেতনা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীর এই প্রভাব থেকে রবীন্দ্রভক্ত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও মুক্ত থাকতে পারেন নি। তিনিও এই নবযুগের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিলেন; কথাপ্রসঙ্গে, আলোচনায়, সভাসমিতিতে এবং লেখায় তার দৃষ্টান্ত মেলে। তিনি নিজেও অনেকবার তা স্বীকাব করেছেন, অবশ্য তা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ দিয়ে। তিনি বলেন— "বহুদিনেব পুঞ্জীভূত, নরনারীর বহুমিথ্যা, বহু কুসংস্কার বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হযে মিশে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হয়ে ওঠে, এর থেকে রেহাই দিতে সমাজ কাউকে চায় না।...

"এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে বুঝ

সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারে।"

বিশ্বসাহিত্যে নিজের স্থান করে নিতে যে সমাজমনস্কতার প্রয়োজন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র সে বিষয়ে সত্যিই সচেতন ছিলেন। এবং আমরা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করবো না যে শরৎচন্দ্র বিশ্বসাহিত্যে নিজের আসন করে নিয়েছেন। মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। "বিদেশের মানবতন্ত্রী কথাকারদের মত (যেমন টলস্টয়, গর্কি প্রমুখ) মানুষই ছিল তাঁর রচনার উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের নাগাল হয়তো তিনি ধরতে পারেন নি, হৃদয়সম্পদে এত বড় ধনী লেখক খুব কমই দেখা যায়। আর শরৎচন্দ্রের হৃদয়বৃত্তির আতিশয্যের জন্যেই হয়তো মানুষকে তাঁর সাহিত্য-সাধনায় চেষ্টা কিছু উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। কিন্তু এই কি সব! এই প্রসঙ্গে আমাদের ডিকেন্স ও হার্ডির কথা মনে পড়ে। ড. অজিত ঘোষ এ সম্পর্কে সুন্দর যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলেন —"হৃদয়াবেগের পূর্ণ প্রাবল্য দেখাইয়াও সাহিত্যকে কিরূপ উচ্চাঙ্গের শিল্পকলায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় ইংরেজী সাহিত্যে তাহার দৃষ্টান্ত হইলেন ডিকেন্স ও হার্ডি। ঐ দুইজন লেখকের হৃদয়রূপচিত্র সাহিত্যের সঙ্গে শরৎসাহিত্যের অনেকখানি মিল দেখা যায়। শরৎসাহিত্যে হৃদয়াবেগের যে প্রকাশ রহিয়াছে তাহাতে সাধারণতঃ দুর্দম প্রবৃত্তিলীলার উত্তেজনাজনক রূপ নাই, তাহাতে প্রধানত সূক্ষ্ম, শান্ত, কোমল অনুভূতির স্নিগ্ধ-করুণ রূপই রহিয়াছে।"

শরৎচন্দ্রের হৃদয়াবেগের দরুন সাহিত্যে যতই দোষত্রুটি থাকুক না কেন, "কিন্তু মানবমনের সুখদুঃখ ও অশ্রুবেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন স্নিগ্ধমধুর ও বেদনাবিধুর কাহিনী আর কেউ লিখতে পারেন নি।" শরৎচন্দ্র মানবতাবাদী ছিলেন। ডিকেন্সের মতই তিনি ভাবপ্রবণ, সমাজসমস্যা সম্পর্কে সচেতন, মানুষের দুঃখবেদনায় অশ্রুসজল। তবে শরৎচন্দ্রের রচনায় বাঙালীর নিজস্ব জীবনরূপ প্রত্যক্ষ হয় শান্ত, ধর্মমুখী, পারিবারিক, স্নেহপ্রীতিমুখর সাধারণ জীবনরূপ। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাস' প্রবন্ধে বলেছেন --"শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁহার চরিত্রগুলিকে বাঙালী বলিয়াই তাহাদের মধ্যে সুসঙ্গত প্রবর্তন করিয়াছেন--আধুনিক জীবনের সমস্যাকীর্ণ পথে তাহাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের ছাড়পত্র দিয়াছেন।"

৩

বিংশশতাব্দীর সমস্যাসঙ্কুল জীবনযাত্রা, দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, বিজ্ঞান-চেতনা, দেহজ

প্রণয়-আকর্ষণ, সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, যুদ্ধের প্রতি অনীহা, প্রভৃতি বিশ্বসাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল, যা শরৎসাহিত্যে বিদ্যমান। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরে জোলা, মোপাসাঁ, দস্তয়েভস্কি, গল্সওয়ার্দি, আনাতোল ফ্রান্স, টমাস মান, গোর্কী, স্ট্রিণ্ডবার্গ, হামসুন, জোয়ান বোয়ার প্রমুখ শিল্পীদের জীবনবোধে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিহিসাবে মানুষের একটা স্বতন্ত্রজগৎ আছে। মানুষের মন ও মনন পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, তা প্রমাণিত। শরৎচন্দ্রের একটা স্বতন্ত্র জগৎ ছিল। সেজন্য নব বাস্তবতার বিরুদ্ধে লড়াই নয় কিম্বা প্রকৃতি জগৎ নয় কিম্বা বাস্তব জগৎ নয়, এ জগৎ শরৎচন্দ্রের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য, মাটির কাছাকাছি মানুষের জগৎ, স্নেহসুধামাখা বাস-গৃহতল আপনার সে জগৎ। যে জগৎ দৈনন্দিন জীবনের রিক্তবিবর্ণ, ভাব-বাহী জগৎ থেকে মুক্তির জগৎ। সেই মুক্তির জগতে পৌঁছাবার জন্য স্বপ্নাতুর কিশোর পথে প্রান্তরে হন্যের মত ছুটেছে, ছন্নছাড়া উদাসীন যুবক গ্রামে গ্রামে দেশদেশান্তর ঘুরে বেড়িয়েছেন, দেশবিদেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, মনো-বিজ্ঞানীদের লেখা অসংখ্য বই পাঠ করেছেন, জীবনকে আকণ্ঠ পান করার জন্য বহু মানুষ-মানুষীর সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করেছেন। সেই জন্যেই "মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা তাঁর রচনার ছত্র ছত্রে ছড়িয়ে আছে। তিনি তার আকৈশোর ভ্রাম্যমাণ বাউণ্ডুলে জীবনে বিচিত্র চরিত্রের নরনারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, জীবনের মন্দ দিক্‌টাও বড় কম পরখ করে দেখেন নি।"

শরতের সমাজমনস্কতার আরেকটা হেতু আছে। তিনি যৌবনে ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন টলস্টয়ের রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। টলস্টয়ের Ressurrection-এর প্রভাব শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি তার প্রমাণ। ডস্টয়ভস্কি উনিশ শতকে মারা যান (মৃত্যু ১৮৮১)। কিন্তু তাঁর প্রভাব শরৎচন্দ্রের উপর বর্তেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যাদর্শ সে যুগে কিরূপ ছিল, তা তাঁর "The Brother Karamazov" উপন্যাসের একটি উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র দুর্নিবার ভালবাসাই সত্য, সুন্দরের প্রকাশ সাধনে সহায়তা করতে পারে, ভগবানের সৃষ্ট মানুষকে ভালবাসা-সে পাপীই হোক, আর তাপীই হোক, মানুষকে আনন্দদান করাই হলো সাহিত্যের কাজ। শরৎচন্দ্র তা থেকে মুক্ত নন। টলস্টয়ের ভূমি সংস্কার ও কৃষক উন্নতিচিন্তা তাঁর মনের আনাচ কানাচে উঁকি মেরেছিল। 'মহেশ' গল্পটি দারিদ্র্য-পীড়িত, বুভুক্ষিত, জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী' গঠনে, আঙ্গিকে, উপস্থাপনায়, একটি মহৎ সৃষ্টি। শ্রী অরবিন্দ গল্পটি পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। গোর্কীর প্রভাব শরৎচন্দ্রের উপর যে পড়েনি, এমন কথা

বলা যাবে না, যদিও শরৎচন্দ্র মার্কসীয় জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু তিনি গোর্কীর মত মুক্তিকামী ও প্রগতিবাদী ছিলেন। গোর্কীর 'মা' যেমন লেখকের সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে প্রচেষ্টার ফসল, ঠিক তেমনি শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ফসল। কংগ্রেসী হয়েও গান্ধী বাদে আস্থা ছিল না। তার কারণ শরৎচন্দ্র বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। 'পথের দাবী' উপন্যাসে বিপ্লব-প্রচেষ্টার কথা আছে, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব-আন্দোলনের প্রতি শরৎচন্দ্রের সমর্থন আছে। শরৎচন্দ্র যে মার্কসবাদ পাঠ করেছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর পানিত্রাসের লাইব্রেরি। সেই ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে মার্কস ও লেনিনের কতিপয় পুস্তক সংগৃহীত ছিল। শুধু তাই নয়, মার্কসবাদ ও রুশ বিপ্লব সংক্রান্ত কয়েকখানি বই-পুস্তকও ছিল। রাশিয়ার প্রভাব 'পথের দাবী' উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। 'পথের দাবী'র সব্যসাচী ভারতীকে যখন বলেন, জনকতক কুলিমজুরের ভাল করার জন্য এ সংগঠন তিনি সৃষ্টি করেননি, আসল উদ্দেশ্য স্বাধীনতা। সব্যসাচী বলেন— 'শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী। তাই, পাবে আমাকে কুলি-মজুর-কারিগরের মাঝখানে, কারখানায়, ব্যারাকে, কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়াগাঁয়ের চাষার কুটীরে' সব্যসাচীর উক্তি থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে সর্বহারা শ্রমিকরাই দেশের আসল শক্তি।

'পথের দাবী' উপন্যাসের অন্যতম বিপ্লবী চরিত্র—রামদাস তলোয়ার-কর। তাঁর বক্তৃতায় শ্রমিক-মজুর-কৃষক সংহতির আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, আবার একটা প্রচণ্ড প্রত্যাঘাতের কথা উচ্চারিত হয়েছে। তাতেই মনে হয় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। কৃষক-সমাজের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী 'মহেশ' গল্পে পেয়েছি, কৃষক-সমাজের প্রতিরোধের চিত্র পাওয়া যাবে তাঁর অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'জাগরণ'-এ। মনে হয়, এ সমস্তই রুশ সাহিত্য পাঠের ফলাফল। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের বহুসমালোচিত উপন্যাস। অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত। শরৎচন্দ্র খেদের সঙ্গে ঋষি টলস্টয়ের প্রসিদ্ধ উপন্যাস রিসারেকশনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন বন্ধুকে। Resurrection উপন্যাসে এক অভিজাত ব্যক্তির সন্তান কন্যাকে অপহরণ ও পরিত্যাগের কাহিনীকে অবলম্বন করে দেহজ কামনার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, নিজের কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা একটি পত্রে লেখেন যে, 'টলস্টয়ের রেজারেকসন পড়েছ কি? His best book একটা সাধারণ বেশ্যাকে নিয়ে।' অর্থাৎ পতিতারও জীবনের কাহিনী আছে তারাও রক্তে মাংসে

গড়া নারী, সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার অংশীদার। মানবস্বভাবের নিজস্ব নীতি ধর্মকে স্বীকৃতি দিতে শরৎচন্দ্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি; সাহিত্যের সত্যকে তিনি বরণ নিয়েছেন। সামাজিক নীতি-শাসনের কৃত্রিমতাকে strictly moral বলতে চাননি। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের দুটি চরিত্র—কিরণময়ী ও সাবিত্রী। কিরণময়ী সমাজের অনুশাসনকে মেনে নিতে পারেনি, প্রচলিত শাস্ত্রের বুলিকে পাত্তা দেয় নি, সতীত্বের প্রতি তার আদৌ আস্থা নেই, কিন্তু জীবনদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত, বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু কেন? এখানেই শিল্পীর জয়। Strictly moral অন্যদিকে সাবিত্রী। একটি মেসের ঝি, লম্পট ভগ্নীপতির পাল্লায় পড়ে গোল্লায় গিয়েছিল। ভগ্নীপতি তাকে বিয়ে করবে বলে বাড়ি থেকে ফুসলে নিয়ে আসে এবং পরে ত্যাগ করে। হয়তো পরিবেশের [illegible] সাবিত্রী নিজের দেহকে পবিত্র রাখতে পাবেন নি, তথাপি তার সংহত, সংযত, সর্বংসহা মূর্তিটি আমাদের ভুলবার নয় কারণ সে নিজেকে তিল তিল করে খুইয়ে মাতাল সতীশের জীবনে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। শরৎচন্দ্র যে কত বড় শিল্পী তা তাঁর শিল্পচেতনার গুণে প্রমাণিত হয়। ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স যে দরদ ও আবেগ নিয়ে 'এ টেল অফ টু সিটিস্' (A Tale of Two Cities) উপন্যাসে মাতাল অথচ মহৎ সিডনি কার্টনের অনুপম চরিত্রটি এঁকেছেন ঐরূপ দরদে ও আবেগে হীন পরিবেশের চরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ডিকেন্সভক্ত শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকারা মাতাল কিংবা পতিতা হলেও মহৎ। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক আরেকজন রাশিয়ান সাহিত্যিক আলেকজান্দার কুপরিনের কথা (১৮৭০-১৯৩৮)। গণিকজীবনের যে বাস্তবচিত্র তিনি সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন Yama the Pit উপন্যাসে। কুপরিনের দৃষ্টি ছিল শরৎচন্দ্রের মতই আবেগপ্রবণ ও সমবেদনা-পূর্ণ। তাঁর 'ইয়ামা' উপন্যাসে পতিতা চরিত্রগুলির ভালমন্দ সব দিক খুঁটিয়ে দেখবার যে চেষ্টা আছে, বাঙালী সামাজিক লেখক শরৎচন্দ্র ঠিক অনুরূপ চেষ্টা করেন নি; পক্ষান্তরে মনুষ্যত্ব বা মানবিক দিকগুলি অধিক উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। এখানেই শরৎন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। সমাজজীবনের বাসভূমিতে যে দুঃসহ গ্লানি ও পঙ্কিলতা পুঞ্জীভূত; কিংবা দেহগত ভোগলালসার ছবি তিনি অঙ্কিত করেননি, তিনি চেয়েছিলেন 'সমাজের অনাচার এবং অবিচারের রথচক্রতলে পিষ্ট মানব-মানবীর মর্মন্তুদ কাহিনী লিখে সমাজের শিষ্ট ও শিক্ষিত স্তরে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিলেন। এই অর্থে শরৎচন্দ্র নিশ্চয় নীতিবাদী বা পিউরিটান। কিন্তু তাই বলে তাঁর রচনাকে যদি অশ্লীলতা বলে নাক-সিঁটকানো হয় তাহলে অন্যায় হবে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের

মন্তব্যটি সবচাইতে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"মানুষের অন্তরতম যে আকাঙ্ক্ষা নীড় বাঁধিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার চেষ্টা মূঢ়তা। ··মানুষের ভ্রান্তি দুর্বলতার জন্য তাঁহার অফুরন্ত দরদ।" যদি নীতিবাগীশ puritanগণ এই মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদকে অশ্লীলতা দোষে অভিযুক্ত করেন, তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ শরৎচন্দ্র নিজেই ছিলেন একজন puritan.৫

শরৎচন্দ্র সচেতন শিল্পী ছিলেন। নানাগ্রন্থ অনুশীলন করে শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন সর্বযুগে এবং সর্বদেশে শক্তিশালী পুরুষ দুর্বল নারীকে কোন স্বাতন্ত্র্য দিতে চায়নি। সর্বকালেই দুর্বল নারী সবল পুরুষের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের নারীবিদ্রোহ সেই কারণেই।

কিরণময়ীর কথাবার্তায় স্পেন্সারের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে কারণ শরৎচন্দ্র স্পেন্সারের বিবর্তনবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। কিরণময়ী যখন বলেন —'আমরা যথার্থ অন্যায় তখনই করি, যখন কাহাকেও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করি। কিরণময়ী বিকারগ্রস্ত একজন নারী, জৈবাবেগ ও কামচেতনা দ্বারা জর্জরিত, মনে হয় বাইরে থেকে অদ্ভুত, কিন্তু বাস্তব। শরৎচন্দ্রের গভীর অন্তরদৃষ্টি ঠিক দস্তয়ভস্কির মত। ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দের যে প্রশ্নগুলি উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের মুখে ব্যক্ত হয়েছে, সেখানে স্পেন্সারের অধিকারের প্রশ্নগুলি একাত্মভাবে সম্পৃক্ত। শরৎচন্দ্রের বেদনাবোধ সেই সমস্ত নর-নারীর জন্যে, যারা মুহূর্তের ভুলে সব হারিয়েছে, যাদের হৃদয়কে কেউ দেখতে পায় না। মানুষ-মানুষীর মূল হৃদয়সত্তাকে বিচার করাই হয়তো সাহিত্যিকের কাজ। শরৎচন্দ্র তাই করেছিলেন। ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়—"He seems to have judged men and women by an original standard, a man is not great or good if he merely conforms to accepted standards but he is truly heroic, if he has a broad outlook and a sensitive heart."

বাংলা সাহিত্যে সমসাময়িক যুগে রুশসাহিত্যের ন্যায় ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। জোলা, মোপাসাঁ, ফ্লবের ফরাসী সমাজের কদাকার বাস্তব চিত্র বাংলা সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। অন্যতম ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রান্স ধর্মান্ধতা, সামাজিক অনাচার ও রাজনীতির কারসাজির চিত্র সাহিত্যে অবতারণা করেছিলেন। ফরাসী লেখক রোমাঁ রোলাঁ—যিনি ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন, তাঁর প্রভাব শরৎচন্দ্রের উপর পড়েছিল। তিনি শরৎসাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। রোমাঁ রোলাঁর অন্যতম

মহৎ উপন্যাস—'জঁা ক্রিস্তফ'। রোলঁার নিজস্ব চিন্তা, ধ্যান, ধারণা, ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের অন্যতম মহৎ উপন্যাস--'শ্রীকান্ত'। শ্রীকান্তের সঙ্গে 'জঁা ক্রিস্তফ'-এর বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে। 'শ্রীকান্তের' ইতালীয় অনুবাদ পাঠ করে তিনি শরৎচন্দ্রকে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলে মনে করতেন। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' এর বিশালতা, পরিধি, অসাধারণ বৈচিত্র্যমণ্ডিত এবং অনাগত নরনারীর আশ্চর্য প্রাণের সমাগম লক্ষিত হয় রোমাঁ রোলঁার—Jean Christopher উপন্যাসের মতো। 'শ্রীকান্তের' সমগোত্রীয় আরো কয়েকটি দীর্ঘ উপন্যাসের পরিচয় আমরা পাই। টমাস মানের 'Buddenbrooks', 'The Magic Mountain', রেমণ্টের 'Peasants' অধ্যাপক ও সমালোচক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তার বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন--

—"শ্রীকান্ত উপন্যাসের কাহিনী অসাধারণ বৈচিত্র্যমণ্ডিত এবং অগণিত নরনারী ইহাতে ভীড় করিয়াছে। ইহারা নিজেদের প্রয়োজনে আসিয়াছে আবার চলিয়া গিয়াছে, কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্পর্ক নাই। বর্তমানকালের দীর্ঘ উপন্যাস লেখার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। রোমাঁ রোলঁার Jean Christopher, Buddenbrooks, The Magic Mountain, ও রেমণ্টের Peasants প্রভৃতির কথা সকলেরই মনে আসিবে। শুধু পরিধির বিশালতা দিয়া বিচার করিতে গেলেও শ্রীকান্তের তুলনা বিরল। অথচ পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে গ্রন্থকার তাঁহার মূলসূত্র হারাইয়া ফেলেন নাই, কোন একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বা কোন একটি বিচ্ছিন্ন চরিত্র তাহার সীমা অতিক্রম করে নাই।"

শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক একজন প্রতিভাধর জার্মান সাহিত্যিক টমাস মান। সমাজবাদী পূর্ব জার্মানি ও ধনতান্ত্রিক পশ্চিম জার্মানির মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লেখক। 'বুড্‌ডেনব্রুকস ও ম্যাজিক মাউণ্টেন' এই দুটি উপন্যাসই বিশাল। প্রথমটি প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের গতি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে— 'এ নভেল অ্যাজ অ্যান আরকিটেকচার অফ আইডিয়াজ।' মানের আত্মজীবনীমূলক প্রথম অসামান্য উপন্যাস 'বুড্‌ডেনব্রুকস' খুঁজে পাওয়া যাবে দুটি দিক—তাঁর প্রবল বাস্তবতামুখী ও প্রবল কল্পনাপ্রবণ জীবনযাত্রা। সে পথে প্রান্তে দেখা যাবে ইউরোপীয় ক্যাথিড্রাল কিংবা দক্ষিণভারতের আকাশচুম্বী মন্দির, যার চত্বরে ভিড় করে রাজা, মহারাজা, জমিদার, চাষী, ভিখিরি। একদিকে যেমন সংবেদনশীল, অপরদিকে আত্মজিজ্ঞাসায় তীব্রতর। 'বুড্‌ডেনব্রুকস ও ম্যাজিক মাউণ্টেন'

যেমন একই অসাধারণ কল্পনা ও বাস্তব দৃষ্টিতে ঐশ্বর্য্যবান মানুষটির (টমাসমান) ছায়াপথ, 'শ্রীকান্ত' দরদী শরৎচন্দ্রের ছায়াপথ। শিল্পীর কৈশোর, যৌবন, ও বার্ধক্যের অনেক ঘটনা 'শ্রীকান্তের' বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে মিল আছে। "শুধু কেবল বাইরের ঘটনা ও চরিত্রের দিক দিয়েই যে শ্রীকান্তের কাহিনীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবন-কাহিনীর সাদৃশ্য রয়েছে তা নয়, মানসিকতা, জীবনবোধ ও সমাজভাবনার দিক দিয়ে বিচার করলেও শ্রীকান্ত ও শরৎচন্দ্রকে একই ব্যক্তি বলে মনে হয়। শ্রীকান্ত-সত্তার সঙ্গে মিলিত হয়ে যে শ্রীকান্ত-সত্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তা নয়, তার নিজস্ব ব্যক্তিসত্তাকেই শ্রীকান্ত-সত্তার সঙ্গে এক করে ফেলেছেন।"

ডিকেন্সের লেখায় অসৎ মানুষের সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায়। তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসে তাঁরই মত নিপীড়িত, অত্যাচারিত, অসহায়, উপায়হীন শিশুকে দেখতে পাই। 'ডেভিড কপারফিল্ড'-এর 'ডেভিড' এরূপ একটি চরিত্র। শিশুর দেখা জগৎ বয়স্কের দেখা জগৎ থেকে কম সত্য নয়। ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড' তারই দৃষ্টান্ত। বঞ্চিত ডিকেন্স আশৈশব। ডিকেন্সের বাস্তবতার ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত আত্মজীবনীমূলক অন্যতম উপন্যাস—'ডেভিড কপারফিল্ড'। শৈশবে ডিকেন্সকে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে হয়েছে। স্বপ্নাতুর ডিকেন্সের কৈশোরের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে। ঠিক যেমন মাত্র দশ টাকার জন্য কিশোর শরৎচন্দ্রের পরীক্ষায় বসা হয়নি, বর্ণাশ্রমভেদী সমাজের চাপে একঘরে হয়ে বাস করতে হয়েছে, তার পক্ষে realismকে গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। ডিকেন্সের লেখায় যেমন পাওয়া যায় অনাচারের প্রতি নির্মম প্রতিবাদ, সেই যুগের শিল্পবিপ্লব জর্জরিত রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে সেই প্রতিবাদ। শরৎচন্দ্র বর্ণাশ্রম-ভেদী বাঙালী হিন্দুসমাজের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ওপর আঘাত হেনেছেন। অভয়ার যে বিদ্রোহ, কমলের মতো অকপট নারী, যে নিজের জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে না, কিংবা অন্নদাদিদির মতো নারী যে কুলের মোহ অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে—তা একমাত্র বাঙলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির দর্পণে প্রতিভাত হয়েছে। সেই কারণেই তিনি ডিকেন্স এর সহমর্মী ও সহধর্মী। "আর যে সব ইউরোপীয় সমসাময়িক সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিলেন তাঁহারা হইলেন বোয়ার ও হামসুন। বোয়ারের 'Great Hunger' একখানি বহুপঠিত উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক লেখক হামসুনের 'Hunger'-এর মধ্যে তাহার দারিদ্র্যপীড়িত, বুভুক্ষিত জীবনকাহিনীই ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের মতই হামসুন ছিলেন শ্রী ও ছন্দহীন, ভবঘুরে ও ছন্নছাড়া।

দুইজনের মানসভঙ্গির মধ্যেও ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।" বোয়ার ও হামসুন নরওয়ের অতিবাস্তববাদী সাহিত্যিক ছিলেন।

ফরাসী সাহিত্যিক জোলার সহধর্মী শরৎচন্দ্র। জোলাব কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। রেঙ্গুনে থাকাকালীন কতকগুলি অসহায়, উপায়হীন, বঞ্চিত, দুর্বল, নর-নারীর সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। মদখোর পুরুষ, বেশ্যানারী, দরিদ্র মজুরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এই সমস্ত নরনারীব হৃদয-বেদনা শরৎচন্দ্রকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। জোলা জগৎকে দেখতে গিয়ে হাসপাতাল দেখিয়েছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ বাস্তবতার মধ্যে চোর, জুয়াচোর, মাতাল, বেশ্যা, যেমন একদিকে স্থান পেয়েছে, ঠিক অপর দিকে দরিদ্র মজুবশ্রেণীর দুঃখ, দৈন্য, হতাশা, যন্ত্রণা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি মানুষকে ভালবাসার জন্য সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। যে জোলার প্রত্যক্ষ বাস্তববাদ সমকালীন ও পরবর্তী বিশ্বসাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে। তাঁর Naturalism ও Realism এই দুটি ধারাই শরৎসাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়।

আর একজন শ্রেষ্ঠ ফবাসী সাহিত্যিক হলেন আনাতোল ফ্রান্স। ধর্মীয় অন্যায়, সামাজিক অবিচার ও ভণ্ডামি তিনি নির্মমভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে তুলে ধরেন। 'মহেশ' গল্পেব তর্করত্ন মহাশযের ও 'দত্তা' উপন্যাসের রাসবিহারী চরিত্রে ভণ্ডামির চিত্র পাই। বিংশশতাব্দীর যন্ত্রসভ্যতার দরুণ যেভাবে গফুরকে সাতপুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে, তা সত্যই অবিচার।

"ইংবেজী সাহিত্যের শ, গলসওযার্দি ও এচ্. জি. ওয়েলস ছিলেন সমসাময়িক বহুপঠিত ও বহু আলোচিত লেখক। ইঁহাদেব মধ্যে আবার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ছিলেন বার্ণাড্ শ। বার্ণাড্ শ-এর বৈপ্লবিক সমাজচিন্তা তখন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। শবৎচন্দ্র যে অন্তত 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে শ-এর বৈপ্লবিক সমাজচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

'শেষপ্রশ্ন' পাঠ করার পর মনে হয় শরৎচন্দ্রের লেখা একটি চিঠির কথা। 'পড়িয়াছি বিস্তর, প্রায় কিছুই লিখি নাই।' কারণ 'শেষপ্রশ্নে' যে প্রশ্ন তা বিশ্বদর্শন, সমাজনীতির প্রশ্ন। কমল এর চরিত্রে, ব্যক্তির যুক্তিতে তারই প্রকাশ। স্পেন্সার মার্কাস এর যুক্তিবাদ, অন্যদিকে সক্রেটিসের সোফিস্টবাদের মিলন ঘটেছে। নীলিমা কমলের প্রসঙ্গে বলেছিল,—'স্বাধীনতা তত্ত্ববিচারে মেলে না, ন্যায়ধর্মের দোহাই পেড়ে মেলে না,···কমলকে দেখলেই দেখা যায় এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে।" শরৎচন্দ্রেরই পঠনপাঠনের দার্শনিক উক্তি যা কমলের মুখে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর সত্ত্বকে প্রতিপন্ন বা

প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কমলের যুক্তি, যা হৃদয়হীন। বার্নাড শ এর মত সাহিত্য-প্রকার নীতির প্রবেশে বিশ্বাসী। শ নাট্যকার ছিলেন, নাটকের মাধ্যমে জনমত গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সমস্যাভিত্তিক উপন্যাসে এই প্রচার ধর্মিতার সম্ভাবনা কম। তবু গোলক চাটুজ্জে বা বেণী ঘোষালের মত হীন সমাজপতির বা শক্তিমান সামাজিক প্রভাবশালী ব্যক্তির হীনতা হতে সমাজের মুক্তি অবশ্য কাম্য এই ভাবসত্য 'বামুনেরমেয়ে', 'পল্লীসমাজ', 'দেনা-পাওনা' প্রভৃতি উপন্যাসে উপস্থিত করা হয়েছে। 'শেষপ্রশ্নে' কমলের মুখে সামাজিক সমস্যার কথা, সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। 'শেষপ্রশ্নে'র কমলের সঙ্গে খ্যাতিমান রুশ লেখক 'রুদিন' (Rudin) উপন্যাসের রুদিন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। কমল ও রুদিন (Rudin) চিন্তা-ভাবনায়, যুক্তিতে, বাগ্‌বৈদগ্ধে আধুনিকা এবং তর্কপ্রিয়। রাশিয়ার সাহিত্যের প্রভাব শরৎসাহিত্যে কি হারে অনুপ্রবেশ করেছিল, তার প্রমাণ কমল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশিয়ার আবেগ প্রবণ বুদ্ধিজীবী মনের ব্যর্থতা 'রুদিনের' মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। ঠিক কমলও যেন শরৎচন্দ্রের নায়িকা নারী নয়, সেও যেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তর্কপ্রিয়, সংগঠনহীন, চঞ্চল বাঙালী বুদ্ধিজীবী শাসনের প্রতীক।

হার্ডিরও প্রভাব শরৎচন্দ্রের মধ্যে লক্ষিত হয়। হার্ডি মূলত কবি, তথাপি গ্রাম্য কাহিনী ও পরিবেশ বর্ণনায় তাঁর সমকক্ষ সমকালীন লেখকের কেউ ছিল কিনা সন্দেহ আছে। শরৎচন্দ্রের মতো তিনিও গ্রামের লোক। গ্রামকে ভালবেসেছিলেন, গ্রামের মানুষকে ভালবেসেছিলেন। চিন্তাশীলতায় তিনি প্রগতিশীল যদিও তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান, যেমন শরৎচন্দ্রও মনেপ্রাণে প্রগতিপন্থী, চিন্তায় ভাবনায় সনাতনপন্থী, হার্ডির 'Jude the Obscure' উপন্যাসে জ্যুড্ দেহগত কামনা-বাসনায় অস্থির, জীবনের অবচেতন মনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য কোন এক মুহূর্তে সে মদ্যপানকে আশ্রয় করে, যেমন কিরণময়ী নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য দিবাকরের আশ্রয় নেয়। স্যু নতুন যুগের নারী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিবৃত্তিতে কিরণময়ী অভয়া কমল, সাবিত্রীর সঙ্গে তুলনা চলে।

৪

শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি, মানস গঠন, চিন্তার গভীরতা, ঊদার মানবতাবোধ, প্রচণ্ড অধ্যবসায় প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে আমরা বিশ্বের কয়েকজন সাহিত্যিকদের জীবনবোধের সাদৃশ্য খুঁজতে চেয়েছিমাত্র ; কারো সঙ্গে তুলনা করা নয়। কারণ শরৎচন্দ্র—শরৎচন্দ্রই। জীবনবোধ অনন্য এবং একক। হৃদয়সম্পদে পৃথিবীর যে কোন মহান কবি ও সাহিত্যিকদের মত ধনবান। কবি-অধ্যাপক

বুদ্ধদেব বসু যদিও বলেছেন- "No other Bengali author, not Rabindranath himself, has Saratchandra's measure of immediate success. Like Dickens he was the idol of his public. A heartcharmer he has been, a heartcharmer he will always be."

বাস্তবিক তাই, তিনি সাধারণ মানুষের হৃদয়রঞ্জন, সর্বকালের মানুষের হৃদয়রঞ্জন। আত্মার আত্মীয়।

শরৎচন্দ্রের শিল্পরীতি

হরপ্রসাদ মিত্র

পাপ নয়, পুণ্য নয়—শুধু এ দর্শন! এইরকম একটা লাইন বেজে ওঠে মনের মধ্যে। সাহিত্য-শিল্পের ব্যাপারে এরকম মনোভাব কোনো দেশে, কোনো কালে, কোনো রাষ্ট্রে, কোনো অর্থনীতিতে সমর্থনযোগ্য কি না কে বলবে? গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ও-রকম মুগ্ধতা কি সম্ভব? বাক্য ও অনুচ্ছেদের প্রবাহে বাহিত শব্দপরম্পরার মধ্য দিয়ে গল্প-উপন্যাসে যা প্রতি-ফলিত হয়, সে তো ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সমাজের এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের—এক নীতির সঙ্গে অন্য নীতির,—এক হৃদয়বোধের সঙ্গে অন্যান্য বস্তুপরি-স্থিতির সংঘর্ষ, মিলন, আকর্ষণ, প্রত্যাখ্যান।

বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্ব ব'লে কিছু কি সত্যিই কোথাও আছে? শিল্প কি 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' অভিব্যক্তি? শিল্প-রীতি কি বস্তু-পরিস্থিতি-বর্জিত ব্যাপার?

'গোঁড়ামি' আর 'প্রগতি'—এই দুটি বাংলা শব্দ হাত ধরাধরি ক'রে কাছে আসে। তারা সামনে দাঁড়িয়ে দুজোড়া করপল্লবে নমস্কার জানিয়ে শরৎ-চন্দ্রের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের স্মিতহাস্যের মানে কী? ফরাসী, কথাশিল্পী স্তাঁদালকে মনে পড়ে। আমাদের সদ্যলোকান্তরিত বুদ্ধদেব বসুকেও দেখতে পাই। এঁরা দুজনেই ছিলেন অতিমাত্রায় 'আমি'-ময়। বাংলা 'অহংকার' শব্দটার মানে অন্যরকম। ওঁরা সে-অর্থে অহংকারী ছিলেন না। সব লেখকই অবশ্য অল্পবিস্তর অহংকারী। কে নয়? শরৎচন্দ্রও ততোধিক ছিলেন না। এবং স্তাঁদাল বা বুদ্ধদেব বসুর মতন তিনি 'আমি'-ময়ও ছিলেন না। না, স্পর্শ-কাতর ছিলেন তিনি। তিনি কিছু আত্মস্মৃতিমূলক গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যের শিল্পরীতির আলোচনায় এসব কথা উঠছে কেন?

তিনি কি নারীর পরিত্রাতা ছিলেন? করুণাময় নাকি যথার্থ ভাবনেতা তিনি? তাঁর চরিত্রগুলি কি স্বা াবিক, সুগঠিত, সুপরিণত? তাঁর সমাজ-দৃষ্টি কি ভাবোচ্ছাসমুক্ত—সত্যিই অসংগতিবর্জিত? টমাস হার্ডি বা চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে তাঁর আবেদনের খুবই সাদৃশ্য পাওয়া যায়? বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরে তিনি কি সত্যিই আমাদের প্রথম বস্তুনিষ্ঠ কথাশিল্পী—যাকে বলে রিয়ালিস্ট?

শরৎসাহিত্যের শিল্পরীতি সম্পর্কিত ভাবনার ভূমিকায় এসব অংশতঃ

অবান্তর প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। এবং ওপরের অনুচ্ছেদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর হলো : 'না'। না—না—এবং না।

তাঁর একমাত্র শিল্পগুণ হোলো সহজ অনুভূতিগুণ। তাঁর ভাষা প্রথমদিকে বঙ্কিমচন্দ্রীয়,—অচিরেই স্বকীয়—স্থলে-স্থলে রবীন্দ্রধ্বনিত। শরৎচন্দ্রের 'শিল্প' তাঁর স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতা। তিনি প্রয়াসহীন বিকাশ।

তিনি নিজেই নিজের সম্বন্ধে কী কী বলে গেছেন দেখা যাক।

১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম পক্ষকালের মধ্যে রেঙ্গুন থেকে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের এক চিঠি থেকে জানা যায় যে, ছোট গল্প লেখবার আর তাঁর ইচ্ছে ছিল না ; তিনি প্রবন্ধ লিখবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধও আঁটসাঁট নয়—ছড়ানো।

সে যাই হোক, তাঁর ঘোষণাটি আন্তরিক ছিল বটে, তবে সেও তাঁর অভিমানেরই আন্তরিকতা ; তিনি অভিমান বোধ করেছিলেন, কারণ তাঁর মাতুল ও বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেও দুসপ্তাহের মধ্যে কোনো জবাব পাননি। অন্য মাতুল উপেন্দ্রনাথের ওপরেও বোধ হয় একটু অভিমান ছিল। কিন্তু সে-চিঠিতে সে-রকম কোনো মন্তব্য ছিল না। তবে সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সহোদর গিরীন্দ্রনাথ- যাঁর লেখা তিনি এক সময়ে সংশোধন করে দিয়েছেন, তাঁর কোনো বই না পেয়ে বেশ স্পষ্টভাবেই তিনি তাঁর আঘাতবোধটা জানিয়েছিলেন।

'শরৎচন্দ্রের শিল্পরীতি'—এই নামটির তাড়নাতেই বোধ হয় সেই ১৯১৩ সালের কথা মনে এলো। কারণ, 'শিল্প' ব্যাপারটি শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে যদিও প্রধানত সাহিত্যশিল্পই, তবু একথাও প্রাসঙ্গিক যে, তিনি ঐ সময়ে ছবিও আঁকতেন। সে কথা সেই চিঠিতেই উপেন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন—"আমার অসমাপ্ত মহাশ্বেতা (oil painting) আবার সমাপ্ত হবার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্চে।"

কিন্তু এই নিবন্ধের লক্ষ্য তাঁর সাহিত্যশিল্প সম্পর্কে একটু ভেবে দেখা। অতএব ছবির প্রসঙ্গ থাক। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস—গদ্যের এই তিন ধারাতেই তাঁর গতি ছিল অব্যাহত ; গল্পে তা সর্বাধিক অকুণ্ঠিত ; উপন্যাসে বেশ মসৃণ।

সেই ১৯১৩ সালের ১০ই মে তারিখে, অর্থাৎ এর আগে যে চিঠির উল্লেখ করা হয়েছে, তার ঠিক চার মাস পরে উপেন্দ্রনাথকে তিনি লেখেন—"পথনির্দেশ" এবং "রামের সুমতি" সম্বন্ধে আমার অভিমত "পথনির্দেশ"টাই ভাল। তবে এ গল্পটা একটু শক্ত। সবাই ভাল বুঝিবে না। আমিও

অনেকের অনেক রকম মত শুনিয়াছি। যাহারা নিজেরা গল্প লেখে তাহারা ঠিক জানে, "রামের সুমতি" যদিও বা লেখা যায় "পথনির্দেশ" লিখিতে কিছু বেশি বেগ পাইতে হইবে।" এইসব কথার ধারায় এই পথনির্দেশ গল্পটির যে খুব প্রশংসা হয়েছে, সেকথা জানান তিনি। এবং এক নিঃশ্বাসেই বলেন—"তবে, আমি আর বড় ছোটগল্প লিখিতে ইচ্ছা করি না। একটু বড় হয়েই যায়। তোমাদের মত বেশ ছোট করে যেন লিখতেই পারি না।"

অর্থাৎ শিল্পরীতির দিক থেকে নিজের প্রিয় ও পাঠকের প্রশংসিত গল্পেরও আয়তন সম্বন্ধে তাঁর উদ্বেগ ছিল এবং আরো সংক্ষেপে অথবা আরো সংহত রীতিতে তিনি গল্প বলতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের মনে হয়েছিল যে, প্রবন্ধ এবং উপন্যাস রচনায় তাঁর দক্ষতা সম্বন্ধে সে-সময়ে তিনি আরো প্রত্যয়ী ছিলেন। 'সব্যসাচী' কথাটা নিজের সম্বন্ধে সেই ১৯১৩ সালে নিজেই ব্যবহার করেছিলেন। লিখেছিলেন—"সমালোচনা, প্রবন্ধ, নভেল, গল্প, সব লিখলে আবার লোকে হয়ত সব্যসাচী বলে ঠাট্টা করবে।"

এবং গল্পের আয়তন যে একটা পূর্বনির্দিষ্ট ছাঁচ মাত্র নয়, সে-চিন্তাও তাঁর ছিল। তিনি একটু বড়ো মাপ, দরাজ জায়গা, ফাঁকা আকাশই পছন্দ করতেন। বিন্দুতে নিবদ্ধ না থেকে বিস্তারে ছড়িয়ে যেতো তাঁর মন। গল্পের 'শেষ' বল্‌তে তিনি 'পূর্ণতা' বুঝতেন ; পূর্ণতা মানে রবীন্দ্রনাথ যা বুঝতেন এ ক্ষেত্রে কি তাই-ই ? 'শেষ হয়ে না হইল শেষ'। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র লেখেন—"তোমার ক্রয়-বিক্রয় গল্পটা সত্যই ভাল। কিন্তু, আরো একটু বড় করা উচিত ছিল। এবং শেষটা সত্য সত্যই শেষ করা উচিত ছিল। অমন গল্পটি কেন যে তুমি অত তাড়াতাড়ি শেষ করলে জানিনা। একটা কথা মনে রেখো, গল্প অন্ততঃ ১২।১৪ পাতা হওয়া চাই এবং conclusion বেশ স্পষ্ট করা চাই।" কিন্তু তাঁর গল্পের শিল্পরীতিতে স্পষ্টতার দিকে এই ঝোঁক কি সর্বত্র উপাদেয় ?

এইভাবে শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রের মধ্যে অনেক জায়গায় তার নিজের মনে গল্প-উপন্যাসের শিল্পরীতি সম্বন্ধে কীসব ভাবনা ছিল, তার উল্লেখ বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ২২এ আগস্ট, ১৯১৩ সালে রেঙ্গুন থেকে লেখা আর-এক চিঠিতে 'যমুনা' পত্রিকায় উপেন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মীলাভ' গল্প পড়ে খুব খুশি হয়ে জানান—"অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই, লোকের দোষ দেখানো সংসারের দুঃখের দিকটা তুলিয়া ধরা ইত্যাদি কিছু নেই—শুধু একটি সুন্দর ফুলের মত নির্মল এবং পবিত্র।" এবং নিজে যে গল্প-উপন্যাসের শিল্পরূপটুকু রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কম বুঝতেন না, সেকথা উল্লেখ করেছিলেন এইভাবে—"আমার চেয়ে ভাল

সমঝদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই।” এবং সত্যই বিনয়বশে উপেন্দ্রনাথকে লেখেন- “তোমাদের লেখার styleটি বড় সুন্দর। আমি যদি এমনি সুন্দর ভাষা পেতাম, ভাষার ওপর এমনি অধিকার থাকত তাহলে বোধ করি আমার গল্প আরো ভাল হত।”

ছোটগল্পের আয়তন সম্বন্ধে ১০।১২ পাতা [পৃষ্ঠা না পাতা ঠিক জানা যায় না, কারণ সাধারণ মৌখিক কথায় পৃষ্ঠা অর্থেও ‘পাতা’-শব্দটির প্রযোগ ছিল এবং এখনো আছে] ফণীন্দ্রনাথ পালকে লেখা সেই ১৯১৩ সালের এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র লেখেন- “রামের সুমতি’ গল্পটির শেষ পাঠালাম···গল্পটা কিছু বড় হয়ে পড়েছে, বোধ করি একবারে প্রকাশ হতে পারবে না, কিন্তু হলে ভাল হয়।” অর্থাৎ গল্প যে এক আসনেই সমাপ্য, এই সীমাবোধে বিশ্বাস ছিল তাঁর।

নিজের ‘বোঝা’ প্রভৃতি গল্পের জন্যে তাঁরা সংকোচ ছিল। ঐ সব লেখা অপরিণত বলে তিনি নিজেই মনে করতেন। তিনি যে ‘পেশাদার’ লেখক হন নি এবং সে-সময়ে তা হতেও চান নি, তাও বলে গেছেন সেই চিঠিতে— আমি পেশাদার লিখিয়ে নই এবং কোন দিন হতেও চাই না। “চন্দ্রনাথ”, “দেবদাস” “পাষাণ’ ইত্যাদি এর আগেই লেখা হয়ে গেছে, কিন্তু সেগুলি সংশোধন করে পুনর্বার লিখতে চান উপেন্দ্রনাথকে লেখেন “দেবদাস” ও “পাষাণ” পাঠিয়ে দিয়ো আমি re-write করবার চেষ্টা দেখব।” ফণীন্দ্রনাথ পালকে লেখেন —“আপনি যদি ‘চন্দ্রনাথ’টা ক্রমশঃ প্রকাশ করতে চান, আমি নূতন করে লিখে দেব।”

সেই বছর যমুনার ফণীন্দ্রনাথকেই জানান

আমার তিনটে নাম।

সমালোচনা প্রবন্ধ প্রভৃতি —অনিলা দেবী

ছোটগল্প —শরৎচন্দ্র চট্টো

বড় গল্প—অনুপমা।

বাংলা হিসেবে সে ছিল ১৩১৯ সাল। সে-বছর চৈত্রের এক চিঠিতে আবার ‘চন্দ্রনাথ’-এর কথা পাওয়া যায়। ‘চরিত্রহীন’ এখনো ছাপা শুরু হয়নি। ‘কাশীনাথ’ হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র লেখেন “এক ‘কাশীনাথ’ লইয়া আমি যথেষ্ট লজ্জিত হইয়াছি আর যে বন্ধুবান্ধবদের নিকটে এই লইয়া লজ্জা পাই আমার ইচ্ছা নয়।···“চন্দ্রনাথ” বন্ধ থাক্। “চরিত্রহীন” জ্যৈষ্ঠ থেকে শুরু করুন। আর যদি “চন্দ্রনাথ” বৈশাখে সুরু হইয়াই গিয়া থাকে (অবশ্য সে অবস্থায় আর উপায় নাই) তাহা হইলেও আমাকে বাকিটা পরিবর্তন পরিবর্জন

ইত্যাদি করিতেই হইবে।" এবং ২৮ মার্চ ১৯১৩ তারিখের চিঠিতেও ছিল—"চন্দ্রনাথ ছাপাবেন না, কারণ যদি ছাপানই মত হয় ত একটু নতুন করে দিতে হবে।"

ঐ সময়ে 'চরিত্রহীন' আর 'চন্দ্রনাথ' সম্বন্ধেই তিনি বোধ হয় খুব বেশি ভাবছিলেন। ৩রা মে ১৯১৩ তারিখের এক চিঠিতে লেখেন—"চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলা অন্ততঃ প্রথম যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যখন হাতে পাইয়াছি তখন এটাকে ভাল উপন্যাসে দাঁড় করান উচিত। অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব।···এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, কোনরূপ—immorlity-র সংশ্রব নাই। সকলেই পড়িতে পারিবে। "চরিত্রহীন" art-এর হিসাবে এবং চরিত্র গঠনের হিসাবে নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু এ রকম ধরনের নয়।"

'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে সেই সময়েই আর-এক চিঠিতে লেখেন—"লোকে যতই কেন নিন্দে করুক না, যারা যত নিন্দা করিবে, তারা তত বেশি পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা artএর ধার ধারে না তারা হয়ত নিন্দা করিবে। কিন্তু নিন্দা করলেও কাজ হবে। তবে ওটা psychology এবং analysis সম্বন্ধে যে খুব ভাল তাতে সন্দেহই নেই। এবং একটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical Novel।"

শরৎচন্দ্রের গদ্যে দু-এক ক্ষেত্রে তখনো সাধু-চলিত ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের মিশ্রণ ঘটছিল—শেষোক্ত চিঠির ভাষাই তার উদাহরণ। এবং 'Scientific Ethical Novel' যে শিশুসুলভ না হোক বালসুলভ উক্তি, সে কথাও অস্বীকার করে লাভ নেই। ওরকম ইংরেজি, কেমন যেন মাস্টারি বুদ্ধির উদাহরণ। কারণ ওতে বিজ্ঞান ও নীতি ও উপন্যাস, এই ত্রিধারা যুক্তবেণীতে পরিণত হয়েছে। এই ইঙ্গিতটি লক্ষ করে ওটিকে উপন্যাস-শিল্পের পরাকাষ্ঠা বলা যায় না। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়। সেজন্যে বিশদ বিশ্লেষণ চাই।

তিনি সাহিত্য-সাধক হিশেবে পূর্ণ মনোযোগী হচ্ছিলেন ঐ সময়ে। তাঁর অনেক বাসনা ছিল। ভাল প্রবন্ধ, আদর্শ উপন্যাস, মধুর গল্প—সবই তিনি লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যতো সাধ ছিল, হয়তো ঠিক ততো সাধ্য ছিল না। নিজের শক্তি সম্বন্ধে কিছু সংশয়, কিছু প্রত্যয় দুইই কাজ করেছে। 'বিন্দুর ছেলে' সম্বন্ধেও সংশয় ছিল। তিনি ১৯১৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে সেকথা

জানান। এবং 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে সেই চিঠিতেই লেখেন—"এটা সুনীতি সঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়! টলস্টয়ের 'রিসারেকশন' তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। তা ছাড়া ভাল বই, যাহা art হিসাবে—Psychology হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকবে। কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই ?"

অর্থাৎ অন্তত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাউণ্ট লিও টলস্টয় তাঁর মনশ্চক্ষুতে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথাটা বিশেষভাবে ছিল হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা ১৯১৫ সালের ১৫ই নভেম্বরের চিঠিতে—এবং তাতে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সে-সময়ে প্রকাশিত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদের য়ুরোপ ভ্রমণের কাহিনী সম্বন্ধেও উল্লেখ ছিল। তিনি দেবপ্রসাদের "আত্মম্ভরিতা" দেখে বিজয়চাঁদ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটু তুলনা সূত্রে শেষোক্তদের প্রশংসা করেন এবং জানান—"রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার সফল চেষ্টা করিয়াছেন।"

সেই সূত্রেই অভিজ্ঞ শিল্পীর অনুসৃত রীতি সম্বন্ধে লেখেন—"অনেক বড় জিনিস বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।"

সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শ নানাদিক থেকে। শুধু 'জীবনস্মৃতি'র প্রশংসাতেই নয়, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'ও তাঁকে আকৃষ্ট করে। তিনি নিজেও একটি রচনায় হাত দিয়েছেন তখন—যেটি কমেডি হবে না ট্র্যাজেডি হবে তখনো সেই পরিণতিটা তাঁর নজরে আসেনি ঠিক তবে এটুকু নিজেই মেনেছেন যে—"এ গল্পটা 'গোরা'র পরেশবাবুর ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে অনুকরণ। তবে ধরবার যো নেই। সামাজিক পারিবারিক গল্প। আমার ত মনে মনে বড় উৎসাহ হয়েচে যে চমৎকার হবে।" এই সব মনে হওয়ার উত্তেজনা—কি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত সফলতায় পৌঁছেচে ?

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', 'গোরা' ইত্যাদি উপন্যাসে সমাজের প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর প্রতিবাদ যে লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান, তা লক্ষ ক'রে তিনি নিজের লেখা সম্বন্ধে সমাজের প্রতিবাদের জবাব দিতে গিয়ে একাধিক চিঠিতে উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন। একটি চিঠিতে 'চরিত্রহীন' প্রসঙ্গেই সেই ১৯১৩ সালের মে মাসে লেখেন—"রবিবাবুর 'চোখের বালি' ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যে

এমন কি অনাত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে---কেহ কথাটি বলে নাই! (কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীকে মনে পড়ে?) 'মানসী'তে প্রভাতবাবু (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) এক ভদ্র যুবার মুখে আর এক ভদ্র বিধবার সতীত্ব হরণের মতলব আঁটিতেছেন। সোনারহরিণ কত কি কীর্তিই সুরু করিয়া দিযাছে। (অবশ্য এটা বটতলার উপযুক্ত! Detective story ছাড়া তিনি কিছুই প্রায় লিখিতে পারেন না। 'ডাকাতে ঠান্‌দি' গোছের বই। যেমন নবীন সন্ন্যাসীর 'গদাই পাল যাব সেই মাগীটা তেমনি এও। কোন দোষ নাই, কেন না নাম 'রত্নদীপ' এবং লেখক প্রভাতবাবু)! আর আমার 'চরিত্রহীন' যত অপরাধে অপরাধী?"

সমকালীন প্রসিদ্ধ লেখক প্রভাতকুমার বা পূর্ববর্তী দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন এবং নিজে যে পাঠক-সমাজে আলোচিত হলেও বহুসমাদবে স্বীকৃত হচ্ছেন না তখনো, সেজন্যে অভিমান থাকা স্বাভাবিক। তাতে তাঁর রচনার শিল্পরূপ সম্বন্ধে আলোচনা প্রভাবিত বা সেসব চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার কথা নয়। কিন্তু এই তুলনাগুলি শুধু অভিমানের উদাহরণ নয়, একটি আদর্শের কথা তাঁর মনে জেগেছিল— সেটিই বিবেচ্য। ঐ চিঠিতে তিনি লেখেন—"যারা ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ কিংবা জার্মান নভেল পড়িয়াছে তাহারা অবশ্য বুঝিবে ইহা সত্যই immoral কিনা। তোমাদের "সুরজ কওর" সম্বন্ধে কেহ কথাটি বলিল না। টলস্টয়ের Resurrection বেস্ট বই।"

তাঁর সমালোচকদের মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকার সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ঐ চিঠির আগে থেকেই শরৎচন্দ্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কঠোব সমালোচনা কবছিলেন। কিন্তু গল্প বা উপন্যাসের শিল্পরীতি সম্বন্ধে সেকালে বাংলা সমালোচকরা খুব যে মনোযোগী ছিলেন তা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম বটেই। তিনি গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে ইতস্ততঃ যা-কিছু লিখেছেন তাতে শিল্পরূপের কথা ছিল। কিন্তু অন্যেরা বিষয় সম্বন্ধেই বেশি মুখর হন।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা ঐ ১৯১২ সালেরই বোধ হয় আর-একটি চিঠিতে পাওয়া যায়—

> "সত্যিই আজকাল কি গল্পই বার হয়! কেবল লোকের চেষ্টা কি ক'রে পাঠকের মনে কষ্ট দেয়! হয় অমানুষিক কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে, না হয় খুন-জখম ক'রে---আরে বাবু রাস্তায় কুকুর ঠেঙ্গান দেখলেও ত কান্না পায়—সেইটাই কি তবে দেখাতে হবে? না সেটা সাহিত্য?
> গল্প পারতপক্ষে tragedy করতে নেই। কুৎসিত ভাবগুলো দেখাতে নেই—ওসব সবাই জানে। দীনেন্দ্রবাবুর 'সাহিত্যে' "দাদা" পড়েছ? পড়ে

বাস্তবিক অভিভূত হয়ে গেল। গল্প শেষ করে যদি না পাঠকের মনে হয় 'আহা বেশ।' তবে আবার গল্প কি ? আমি এই লাইনে চলছি। রামের সুমতি, পথনির্দেশ, বিন্দুর ছেলে সব এই ছাঁচে ঢালা। শেষ করে একটা আনন্দ হয়—শেষ কবে মনের মধ্যে gloomy ভাব আসে না। "রামের সুমতির নারায়ণীর মত একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছা করে। এই সমালোচনাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা।"

'বড়দিদি' (১৯১৩), 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪),—'বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প' (১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪),—'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৪) —মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প (১৯১৫) বই হয়ে এই তিনটি উপন্যাস ও অনেকগুলি গল্প বেরিয়ে যাবার পরে তাঁর দুটি সুপরিচিত বই 'পল্লীসমাজ' উপন্যাস আর 'চন্দ্রনাথ' (এটিকে গল্প বলা যাবে নাকি উপন্যাস ?) বেরোয় ১৯১৬ সালে। সে বছরে গল্পের বই 'বৈকুণ্ঠের উইল' আর 'অরক্ষণীয়া'ও বেরিয়েছিল। তারপর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব, 'দেবদাস' উপন্যাস, —গল্পের বই 'নিষ্কৃতি' আর 'কাশীনাথ' এবং দীর্ঘকালের প্রবাহে কিছু-মূল-রচনায়-টিকে-থাকা কিছু সংস্কারে-সংশোধনে পরিমার্জিত হয়ে বহু-আলোচিত 'চরিত্রহীন' বেরোয়। তখন থেকেই শরৎচন্দ্র বিখ্যাত স্বীকৃত কথাসাহিত্যিক। তাঁর ছেলেবেলার রচনা—প্রধানতঃ যা 'কাশীনাথ' এইটিতে অনেক বিদ্যমান—'আলো ও ছায়া', 'মন্দির', 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম' ইত্যাদি—বেশ কাঁচা ছিল বটে, কিন্তু শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন এবং এগুলির আগে গল্পের মধ্যে 'রামের সুমতি', 'বড়দিদি' বা 'পল্লীসমাজ' উপন্যাস যিনি লিখে বই বের করে সুনামধন্য কথা-সাহিত্যিক হয়েছেন সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে তাঁর বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতি উভয় ক্ষেত্রেই অনেক ভেবে দেখেছেন, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজস্ব আদর্শে সাধ্যানুসারে আত্মস্থ হয়েছেন, সেকথা মানতেই হয়।

দেশের লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথই, তাঁর নিজের লেখক-মনে তাঁর প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বললে অন্যায় হয় না। তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সব যুগেই পরাক্রান্ত অতীতের বিরুদ্ধেই বর্তমানের যুদ্ধঘোষণা ঘটে থাকে। শরৎচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু সমসাময়িক অল্পশক্তি-মানদের বিরুদ্ধে তাঁর ঈর্ষ্যা ও তিরস্কার ছিল ; বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধেও কিছু অসংগত বিরোধিতা দেখা যায় ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তির্যক কটাক্ষ ও কটু কথা যতোই থাক্, তাঁর বিস্ময় যে আন্তরিক ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিদেশের লেখকদের মধ্যে টলস্টয়ের কথা তিনি একাধিক জায়গায় লিখে-ছেন। ডিকেন্সের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে আরো

কারো কারো নাম করেছেন; কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্প এবং উপন্যাস তিনি শিল্পরীতির দিক থেকে বিশেষ খুঁটিয়ে দেখবার স্বাস্থ্য বা অবকাশ পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর যতো সাধ ছিল, সংকল্প ছিল—ততো ফুরসত ছিল কি ?

অধ্যাপক সুকুমার সেন বেশ সরলভাবে গুছিয়ে এই স্বীকার্য মন্তব্য জানিয়েছেন যে—"শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই গল্প, আকারে না হোক্ প্রকারে। কিন্তু যেগুলি আকারে ছোট সেগুলির অধিকাংশে···ছোটগল্পের সম্পূর্ণ লক্ষণ লভ্য নয়। প্লট সংকীর্ণ ও সংহত নয়, ভাবাপ্লুতায় রস ফিকা হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যাশিত আনন্দময় পরিণতির খাতিরে উপসংহার ক্লাইমাক্স-বর্জিত। তবে লেখকের আন্তরিকতা অসন্দিগ্ধ এবং ভাষার অনায়াস মনোহারিতা প্রবল। এ আন্তরিকতা ও মনোহারিতা তাঁহার উপন্যাসগুলিতে অল্পাংশুর আছে।"

এই স্পষ্টোক্তি সুকুমারবাবুর স্বভাব যার ফলে মাঝে মাঝে তাঁকে খুবই রূঢ়ভাষী মনে হয়। তবে এক্ষেত্রে তিনি রূঢ়ভাষী নন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই তিনি শরৎচন্দ্রের গল্পে সর্বাধিক ব'লে অনুভব করেন।—

> "ভাষার অনুকরণ মাঝে মাঝে তো আছেই, প্লটের অনুকরণও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের 'ব্যবধান', 'অনধিকার প্রবেশ' প্রভৃতি গল্পের নারী-ভূমিকার ছায়া শরৎচন্দ্রের অনেক গল্পেই স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত। শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' গল্পের (১৩২১, কার্তিক প্রথম প্রকাশিত) কাদম্বিনী ও হেমাঙ্গিনী যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিকের মা ও 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালের ছাঁচে ঢালা। স্ত্রীর পত্র গল্পটি 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), রচনায় যে প্রেরণা যোগাইয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। 'বৈকুণ্ঠের উইল'এর (১৯১৬) আদর্শ যোগাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা'। শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' (প্রথম প্রকাশ 'নারায়ণ', শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩২৪) ঘরে-বাইরের অনুসরণে পরিকল্পিত।"

শরৎচন্দ্র ১৯১৩ সালের আগেকার গল্প-রচনায় মাঝে মাঝে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও জলধর সেনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, একথাও অধ্যাপক সুকুমার সেনের নজরে পড়েছিল। তিনি বললেন—

> "'অনুপমার প্রেম' গল্পের আরম্ভ প্রভাতকুমারের ধরনে এবং উপসংহার রবীন্দ্রনাথের। চন্দ্রনাথ-এর কাহিনী পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের 'ত্যাগ' ও প্রভাতকুমারের 'কাশীবাসিনী' গল্পের এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে' নাটকের অভ্রান্ত প্রভাব আছে। কোন কোন ভূমিকায়

জলধরের 'বিশুদাদা'র এবং রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'র কথা মনে হয়।"

"বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুকরণ করিয়াই শরৎচন্দ্র প্রথম জীবনে লেখা শুরু করিয়াছিলেন।"—এই মন্তব্যও সুকুমারবাবুর। তিনি বলেন—"সে প্রভাব কার্যকর ছিল ১৩০৮ সাল অবধি।" শরৎচন্দ্রের নিজের একটি উক্তি উদ্ধৃত ক'রে তাঁর প্রথম জীবনের বঙ্কিম-অনুরাগের স্বীকৃতি দেখিয়েছেন অধ্যাপক সেন।

"১৯০১ সালের পর হইতে অর্থাৎ চোখের-বালি প্রকাশের এবং গল্পগুচ্ছ প্রচারের পর হইতে—যখন শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনাবলী পাঠের সুযোগ পান তখন হইতে—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়িতে থাকে। তবে বঙ্কিমের প্রভাব কখনই লুপ্ত হয় নাই। বঙ্কিমের অনুসরণ শুধু সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস-গল্পেই আবদ্ধ। ইতিহাসের দিকে প্রসারিত হয় নাই।"—এই কথাগুলিও সুকুমারবাবুর। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনুকূল প্রতিকূল এ পর্যন্ত যতো আলোচনা চোখে পড়েছে, তার মধ্যে অধ্যাপক সেনের এই সমালোচনা উপস্থিত নিবন্ধকারের পক্ষে খুবই গ্রহণীয় মনে হয়। শরৎচন্দ্র যে বঙ্কিমের তুলনায় সমসাময়িক সমাজ-বন্ধন এক ইঞ্চিও বেশি ভাঙতে পারেন নি, সেকথা সুকুমার বাবু ঠিকই বলেছেন। বঙ্কিমের নীতিবোধ আমি অবশ্য সুকুমারবাবুর মতো "শাস্ত্র-শাসিত ও পাঠ্যপুস্তক-নির্ধারিত" বলতে রাজী নই। বরং বঙ্কিমকে পরিণামে শ্রেয়ের প্রতি একাগ্রচিত্ত বলতে ইচ্ছে হয়,—গভীর হৃদয়বোধ ও যুক্তিনিষ্ঠার সুসমন্বয় থেকেই সেই একাগ্রতার উদ্ভব ঘটেছিল। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো নির্দিষ্ট সমাজ-বন্ধনের মধ্যে বাস করবার সুযোগ পেয়েছিলেন কি—অন্তত তাঁর প্রথম ত্রিংশ-পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত? নিয়মিত যুক্তি-বিচারের বাধা মানতে-মানতে এবং ছাড়তে ছাড়তে তাঁকে কি এগিয়ে যেতে হয়েছিল? জীবনেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনি অদৃষ্টই ছিল তাঁর অভিভাবক, অনুভূতিই ছিল তাঁর দিগ্‌দর্শনী কম্পাস! কাজে-কাজেই জীবনশিল্পে তিনি ছিলেন ভাবের পটুয় এবং সাহিত্যশিল্পে তিনি ছিলেন ভাগ্যবান ভাবুক।

তাঁর প্রবলতা ছিল, সাবলীলতাও স্বীকার্য, কিন্তু সচেতন শিল্প-সাধনার পরিবর্তে বরং স্বভাবমাধুর্যই বিস্ময়কর বলা ভাল। সুকুমারবাবু লিখেছেন—"শরৎচন্দ্রের লেখায় গল্প-বলার সহজ, সরল, একটু বক্তৃতায়িত ভঙ্গিরই প্রকাশ। স্টিভেন্‌সনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা না করিয়াও বলিতে পারি ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যের "তুসিতালা"। শরৎচন্দ্রের গল্পে প্লট-রচনা মুখ্য নয়, বর্ণনাটাই মুখ্য।"

১৯২৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে সাহিত্য-সভায় শরৎচন্দ্র যে ভাষণ দেন, সেই ভাষণের এই উদ্ধৃতিটুকু অধ্যাপক সেন ঐ সূত্রে তুলে দেখিয়েছেন :—

> "প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নেই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটা জিনিস, তাহাতে প্লট কিছু নাই। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়।"

তাঁর গল্প-উপন্যাসের "সেন্টিমেণ্টাল আবেদন ও রোমান্টিক পরিমণ্ডল"—'চরিত্রচিত্রণ প্রায়ই অসম্পূর্ণ বা অতিশয়িত"—এসব লক্ষণ সকলেই দেখেছেন। সুকুমারবাবুও এসব বলেছেন এবং তিনি শরৎ-রচনাবলীর—অর্থাৎ প্রধান প্রধান গল্প-উপন্যাসের চারটি পর্যায়ভেদ দেখিয়ে শরৎচন্দ্রের শিল্পরীতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু আলোচকের সামনে একটি অনুচ্চারিত বিতর্কের প্রস্তাব রেখেছেন। সেই পর্যায়ভেদ এই রকম :

ক] নিখুঁতভাবে কালানুক্রমিক না হলেও দেবদাস (১৯১৭), পরিণীতা (১৯১৪), বিরাজ বৌ (১৯১৪), পল্লীসমাজ (১৯১৬), চন্দ্রনাথ (১৯১৬), দত্তা (১৯১৮), দেনা-পাওনা (১৯২৩) এবং পথের দাবী (১৯২৬)—এগুলিতে—"বঙ্কিমের উপন্যাসের রস যেন ইতিহাস-বর্জিত এবং কালোপযোগী পাত্রে পরিবেশিত।" এই সূত্রে "দেবী চৌধুরাণী'র আধুনিক ভাবরূপান্তর "দেনাপাওনা",—দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে দত্তার দুই ধনিকন্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সম্পর্কিত সাদৃশ্য, সুকুমারবাবুর এ চিন্তা একটু কষ্টকল্পনা মনে হলেও—"আনন্দ মঠ-এর সঙ্গে পথের-দাবীর মিল ভাবের দিক দিয়া দুর্লক্ষ্য নয়" মন্তব্যটি বাতিল করতে জোর পাবেন কে ?

খ] দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র-ভাবিত রচনাগুলি যেমন, মন্দির, বড়দিদি, —চরিত্রহীন, অরক্ষণীয়া, গৃহদাহ—এবং শেষপর্বের উপন্যাস বিপ্রদাস (১৯৩৫)। এই সঙ্গে আমার মনে হয় শেষের কবিতার দুর্বল ও আংশিক প্রতিধ্বনি 'শেষপ্রশ্ন'ও ধর্তব্য।

গ] তৃতীয় পর্যায়ে আত্মকথাশ্রিত শ্রীকান্ত চার পর্ব ও অংশতঃ চরিত্রহীন ধরা হয়েছে।

ঘ] 'শেষ প্রশ্ন'-কে তিনি চতুর্থ পর্যায়ে ধরেছেন এবং এই পর্বের নাম দিয়েছেন —'দিক্‌ভ্রান্ত'।

শিল্পরীতির কথায় এসব এসে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কোন্ এক চার্লস্ গার্ভিস-এর Leola Dale's Fortune-এর সঙ্গে 'দত্তা'র প্লটের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়। সুকুমারবাবু তাও উল্লেখ করেছেন। দেনাপাওনার মূলেও কোনো ইংরেজি প্লট ছিল বলে তাঁর সন্দেহ। আরো কেউ কেউ এরকম আরো সাদৃশ্য দেখাতে পারেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না, কারণ এই জগতে অতীত ও বর্তমানের আলো-হাওয়াই ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সার্থক করে যায়। যাঁর শক্তি আছে, তিনিই শ্বাসপ্রশ্বাসের বলে জীবিত ও বর্ধিত হন। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। তাঁর শিল্পরীতি সেই নিরন্তর চর্চা—ফুশফুশের বিরতিহীন ব্যায়াম—যা ফুশফুশ নিজেও জানে না।

সমালোচক ও প্রাবন্ধিক শরৎচন্দ্র

ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইউরোপে সাহিত্য-জিজ্ঞাসার উদ্ভব দার্শনিক প্লেটোর কয়েকটি তাত্ত্বিক প্রশ্নে। প্লেটোর বিষয় ছিল দর্শন আর প্রকাশ ছিল গদ্যে। কিন্তু তিনি তাঁর বিখ্যাত 'রিপাবলিক' গ্রন্থে কাব্যমূল্য সম্পর্কে যে কয়টি প্রশ্ন তুলেছিলেন তদ্দ্বারাই ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্র বা সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রপাত হয়েছে। প্লেটো তাঁর গ্রন্থে যে প্রধান তিনটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত করেছিলেন তা হচ্ছে এই: প্রথমতঃ, কাব্যকল্পনায় বিচারবুদ্ধির স্থান আছে কি? দ্বিতীয়তঃ, কাব্যের বিষয়বস্তু জীবন থেকে সংগৃহীত হলে তা জীবনের প্রতিচ্ছবি, না তা রূপান্তরিত হয়ে কাব্যে পরিবেশিত হবে? তৃতীয়তঃ, সাহিত্যের সঙ্গে ধর্ম বা নীতির সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে কিনা? পরবর্তী যুগে শিষ্য অ্যারিস্টটল প্লেটোর উত্থাপিত সমস্যার সমাধান ও বিপরীত মতগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। প্রথমতঃ, কবিপ্রতিভা যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা এবং তা যে যুক্তিতর্কের অধিগম্য নয় তা তিনি মেনে নিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, কবি যা সৃষ্টি করেন তা প্রত্যক্ষ বা কেবল অনুমানলব্ধ নয়, কিন্তু তাকে বিশ্বাসযোগ্য ও সম্ভাব্য করে তুলতে হয়। তৃতীয়তঃ, তিনি বলেছেন অনুচিকীর্ষা মানবের অন্যতম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি কাব্যসাহিত্যশিল্পকলাকে সৃষ্টি করেছে। সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, অঙ্কনবিদ্যা, কাব্য—সবকিছুই অনুকরণবৃত্তির অভিব্যক্তি। এই অনুকরণের আনন্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ, এই শিল্পচর্চা অন্যফলনিরপেক্ষ। চতুর্থতঃ, অ্যারিস্টটল অনুকরণশিল্পকে তিনভাবে দেখেছেন—অনুকরণের উপজীব্য বিষয়, অনুকরণের উপায় ও অনুকরণের ভঙ্গি। এর ফলে ইউরোপীয় শিল্পবিচারে দুটি প্রধান ভাগ দেখা গেল—উপজীব্য ভাব-বিষয় এবং তার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম আঙ্গিক, ইংরাজীতে যাকে বলে 'ফর্ম্' ও 'কনটেণ্ট'। এর থেকেই সমালোচনার দুটি শাস্ত্র গড়ে উঠলো—একটি সাহিত্যশাস্ত্র বা পোয়েটিক্স আর একটি অলঙ্কারশাস্ত্র ও রেটরিক।

আমাদের দেশে সংস্কৃত-সাহিত্যে যাঁরা সাহিত্যব্যাখ্যাতারূপে নিজেদের প্রকাশ করতেন তাঁদের বলা হোত টীকাকার; এ আলোচনার মূল বৈশিষ্ট্য বস্তুনিষ্ঠতা ও বিশ্লেষণধর্মিতা। এ ধারার শ্রেষ্ঠ টীকাকার হলেন মল্লিনাথ। কাব্য

বাস্তবের অনুগমন করে, না বাস্তবকে রূপান্তরিত করে—এ প্রশ্ন প্লেটো-অ্যারিস্ট-টলপ্রবর্তিত ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা। কিন্তু আমাদের দেশের সাহিত্যতত্ত্ববিদ বা অলঙ্কারিকগণ এ বিষয়ে পরিষ্কার করেই বলেছেন: কাব্যের আস্বাদ স্বসংবিদানন্দস্বরূপ অর্থাৎ—তা স্বীয় চিত্তে উদ্ভূত হয়েই পরিসমাপ্তি লাভ করে—এ ক্ষণজীবী। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়, লৌকিক ভাব অলৌকিক রসে নীত হয়, এগুলি রসাস্বাদের উপাদান। সাহিত্যের ব্যাখ্যাতারা এই উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করেছেন, সে কারণেই তাঁদের আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ হয়েছে। ভরত নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছেন, তিনি নাটকের শব্দবহির্ভূত আঙ্গিকেরও আলোচনা করেছেন। কিন্তু কাব্য লিখিত হয় শব্দের দ্বারা, নাটক দৃশ্যকাব্য হলেও কথোপকথনধর্মী কাব্য। অভিজ্ঞানশকুন্তলে পলায়মান মৃগের অঙ্গভঙ্গির অপরূপ বর্ণনা আছে, এবং সে সকল অঙ্গভঙ্গি বর্ণিত হয়েছে শব্দের মাধ্যমে। কাজেই আমাদের দেশের অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রধান বিষয় শব্দ ও অর্থের সৌন্দর্যময় সন্নিবেশ।

সমালোচনার পদ্ধতি নিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রে দুটি বহু-বিতর্কিত আইডিয়া—রোমান্টিক ও ক্লাসিকাল সমালোচনা। টি. এস. এলিয়ট এ প্রসঙ্গে বলেছেন, রোমান্টিক সমালোচক স্বীয় অন্তরাত্মার দ্বারা চালিত হন এবং ক্লাসি-কাল সমালোচক বাইরের নিয়মের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। রোমান্টিক সমা-লোচনার অন্তরালে আছে সত্যবিশ্বাস—কবির অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রতিভা, যা কাব্যের প্রতি অংশে—চরিত্রসৃষ্টিতে, কাহিনীগ্রন্থনায়, বাক্যগঠনে-ও শব্দসৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত। সমালোচকের অন্তরাত্মা অর্থাৎ উপলব্ধিশক্তি সেই প্রতিভার সঙ্গে মিলিত হয়ে রসাস্বাদন করে। এ হচ্ছে একরম সহৃদয়-হৃদয়সংবাদ। এ ধরণের সমালোচনা বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কবিপ্রতিভার অনুরূপ শক্তি। সেকারণে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা সৃজনধর্মী। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ভাষানুযায়ী এ ধরনের সমালোচনা স্বসংবিদানন্দোত্থ উল্লাস, কাব্য পড়ে পাঠকের স্বসংবিতে বা চৈতন্যে যে আনন্দ উত্থিত হয় তাইই বাক্যে উল্লসিত হয়। ক্ল্যাসিকাল সমা-লোচকের দৃষ্টি অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতি সমধিক এবং তাঁরা অনেকাংশেই নীতিবাদী।

উপরোক্ত সাহিত্যসমালোচনার তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্রকে উপস্থিত করা উচিত কিনা—এ বিষয়ে প্রথম থেকেই প্রশ্ন উঠবে যে শরৎচন্দ্র মূলতঃ ঔপন্যাসিক। তিনি প্রাবন্ধিক বা সমালোচক নন। কিন্তু তাঁর রচিত সাহিত্য-তালিকা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে 'নারীর মূল্য' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর পরে পর পর কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ ও সমালোচনাপুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে 'তরুণের বিদ্রোহ' এবং ১৯৩২

সালে 'স্বদেশ ও সাহিত্য'। এছাড়া কিছু চিঠিপত্রও সংগ্রহের আকার প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে। তাই পরবর্তী ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে অন্য দৃষ্টিতে দেখা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই দেখাটি হয়েছে দুভাবে—এক, শরৎচন্দ্রের প্রাবন্ধিক সত্তা; দুই, শরৎচন্দ্রের সমালোচক সত্তা। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যাঁরা সাহিত্যসমালোচনা ও প্রবন্ধের দ্বিবিধ ক্ষেত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, শরৎচন্দ্র তাঁদেব মতো না হলেও তাঁর নিজস্ব একটি ধ্যানধারণা বিভিন্ন গদ্যরচনায়, চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মধ্য থেকে শরৎচন্দ্রের প্রাবন্ধিক সত্তা ও সমালোচক সত্তার একটি পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধ বা সমালোচনার উপাদান হয়ত ক্ষীণ, কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে একটি বলিষ্ঠ মতবাদ এই রচনায় সর্বত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সমালোচক ও প্রাবন্ধিক শরৎচন্দ্রের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশের পূর্বে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি স্পষ্ট করা দরকার। কারণ সাহিত্যজিজ্ঞাসার স্বরূপ নির্ণয় করতে পারলেই তবে একজন প্রাবন্ধিক-সমালোচকের প্রকৃত পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। আমাদের দেশে সাহিত্যের সঙ্গে নীতির সম্পর্কটি অত্যন্ত সুপ্রাচীন। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও সাহিত্যের সঙ্গে নীতির ঘনিষ্ঠতাকে স্বীকার করা হয়েছে। ভারতবাসী হিসেবে আমাদের জীবনে ধর্মের প্রভাব খুব বেশি বলে সাহিত্যের মধ্যে আমরা চতুর্বর্গফললাভের সন্ধান করি। যদিও কাব্যের বাক্য কান্তাসম্মিত, তা হলেও কাব্যের আস্বাদকে আমরা ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর বলে মনে করি। য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রবক্তা মতামত দিয়েছেন যে কাব্যপাঠ সুস্থ জীবনযাত্রার পরিপন্থী। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক, তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্যে নীতিশিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ সেই হিসাবে নীতির কথা বলেন নি, কিন্তু নীতির বদলে কল্যাণের কথা উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সাহিত্যের কাজ জগতের হিতসাধন, রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য মঙ্গল। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যবিষয়ক ধারণার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি সাহিত্যকে স্বাবলম্বী করতে চেয়েছেন। তাঁর মত এই যে, কেবল সুনীতি দুনীতির প্রশ্নের দ্বারা সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হবে না। সুনীতি ও দুর্নীতি দুই-ই সাহিত্যে আছে এবং থাকবে। সুতরাং সাহিত্যে কেবল নীতির প্রশ্ন অবান্তর নয়, অপ্রয়োজনীয়। ১৩৩০ সালের ১৩ই আষাঢ় শিবপুর ইনস্টিটিউটের সাহিত্যসভায় 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' নামক যে প্রবন্ধটি পাঠ করে-ছিলেন তার মধ্যে তিনি সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি স্পষ্ট করে উপস্থিত

করেছেন: 'সেই ভালমন্দ, সেই উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন, শুধু এই উচিত-অনুচিতই রোহিণীকে গোবিন্দলালের লক্ষ্য করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল। যেখানে ভালবাসা উচিত নয়, সেখানে ভালবাসার অপরাধ যতই হউক,—বিশ্বাসহন্ত্রীর ঢের বড় অপরাধ মৃত্যুকালে হতভাগিনীর কপালে বঙ্কিমচন্দ্রকে দাগিয়া দিতেই হইল। এই অসঙ্গত জবরদস্তিই আধুনিক সাহিত্যিক স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না।' শরৎচন্দ্রের মতে জীবন যেরকম, সেই রকমই সাহিত্যে পরিবেশিত হওয়ার প্রয়োজন। Life as it is—এটাই হচ্ছে সাহিত্যের বড় কথা। আর তাকে অস্বীকার করে সমাজের আর নীতির দোহাই দিয়ে যদি আসল জীবনটাকেই অস্বীকার করা হয় তাহলে আর যাই হোক, তাকে সাহিত্য বলে না। তাই শরৎচন্দ্রের এই অভিমত, এই অসঙ্গত জবরদস্তি আধুনিক সাহিত্য কোনমতেই স্বীকার করতে পারে না। তা হলে কী হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে দ্বিধাহীন চিত্তে শরৎচন্দ্র ঘোষণা করেছেন 'ভাল-মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে। হয়ত থাকিবে। ভালকে ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ সে-ও বলে; মন্দের ওকালতী করিতে কোন সাহিত্যিকই কোন দিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক-দুর্নীতির মূলে হয়ত এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে সে, যে মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।'[১] এই 'মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন' করাটাই সাহিত্যের ধর্ম হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেছেন। সাহিত্য ভালর প্রচার করবে, না মন্দের নিন্দা করবে—এ প্রশ্ন সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবান্তর। আসলে সাহিত্য জীবনের সত্য ও স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করে পঙ্কের মধ্যে পদ্মের সৃজন দেয়, কয়লার মধ্যে হীরা আবিষ্কার করে। সাহিত্য সম্পর্কে এই হচ্ছে শরৎচন্দ্রের প্রথম ও শেষ কথা।

রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্রের মত শরৎচন্দ্র প্রবন্ধরচনার জন্য কখনও কলম ধরেন নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বেরিয়ে এসেছে বিতর্কের আকারে। সাহিত্য সম্পর্কে বা তাঁর লেখা নিয়ে যখন কোন বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তখনই শরৎচন্দ্র লেখনী ধরেছেন বিতর্কের জবাব দিতে বা তর্কযুদ্ধের আসরে অংশ নিতে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে কোন প্রবন্ধ, সমালোচনা বা সাহিত্যগুণান্বিত কোন চিঠিপত্র। তাই শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধ বা সমালোচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা বিতর্কমূলক। তাই তা অনেক সময় হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ, আর অত্যন্ত জোরালো এবং বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত স্পষ্ট। উদাহরণ হিসাবে 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামক প্রবন্ধটিকে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

এই প্রবন্ধটি লিখিত হয় ১৩৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'সাহিত্যধর্ম' নামক একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বস্তু-নিষ্ঠ বা বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্যের নিন্দা করেন। শরৎচন্দ্র এই প্রবন্ধের জবাব দেন ছমাস পরে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১১৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যায়। কৈফিয়ত হিসাবে-হাস্যপরিহাসের সঙ্গে নিজের অসহায় অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করেছেন প্রবন্ধের সূচনায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসরচনার আর্টের সঙ্গে প্রবন্ধরচনার আর্টের একটি মিল এখানে লক্ষ্য করা যাবে। সেটি হচ্ছে অত্যন্ত সহজভাবে শুরু করে গভীরে প্রবেশ করা। শরৎচন্দ্র বলেছেন —'উভয়ের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে প্রধানত আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতা লইয়া। ইতিমধ্যে আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধদলের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে আমার মতামত প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, ঢোক গিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া হাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া পিছাইয়া পলাইবার আর পথ রাখেন নাই। একেবারে বাঘের মুখে ঠেলিযা দিয়াছেন।'[২] বলা যেতে পারে এখানেই তাঁর সমালোচক-প্রাবন্ধিক সত্তার পূর্ণ-পরিচয় এই যে তিনি কোন দ্বিধার ভাব রাখেন নি। হাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করা, পিছনে পালিয়ে যাওয়া– এ সমস্ত তিনি জীবনে পছন্দ করতেন না। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর বক্তব্যের বলিষ্ঠতা আমরা যেমন লক্ষ্য করেছি, প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সমালোচনার আসরেও শরৎচন্দ্রের এই একই ভূমিকা—বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের ভূমিকা অত্যন্ত ঋজু, বলিষ্ঠ, স্পষ্ট এবং সংহত। শরৎ-চন্দ্রের প্রবন্ধের স্টাইল সম্পর্কে এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি প্রবন্ধরচনার বহু জায়গায় তাঁর উপন্যাসের গল্প-বলার ভঙ্গিকেই অনুসরণ করেছেন। এ রীতিটি হচ্ছে কথকের কথকতা করার ভঙ্গি—যা শরৎসাহিত্যের একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এই রীতি কেবল শ্রোতাকে আবিষ্ট করে রাখে না, সহজ আকর্ষণে বক্তব্যের গভীরে পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। যেমন 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধের সূচনাতেই তিনি বলেছেন যে মণিমাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেননা তা দুষ্প্রাপ্য। এ হিসাবে নারীর মূল্য বেশী নয়, কারণ সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্য নন। জল জিনিসটি নিত্য-প্রয়োজনীয়, অথচ এর দাম নেই। অথচ সময় অনুসারে পুরুষের কাছে নারী কখন কী অবস্থায়, কোন সম্পর্কে কতখানি প্রয়োজনীয়—তা স্থির করতে পারলে নগদ আদায় না হোক, অন্ততঃ কাগজে কলমে নারীর মূল্যের একটা হিসেব করা যেতে পারে। এর পরেই একটি উদাহরণ দিয়েছেন গল্পবলার ভঙ্গিতে, 'একটা উদাহরণ দিয়া বলি, সাধারণতঃ বাটীর মধ্যে বিধবা ভগিনীর অপেক্ষা

স্ত্রীর প্রয়োজন অধিক বলিয়া স্ত্রীটি বেশী দামী। আবার বিধবা ভগিনীর দাম কতকটা চড়িয়া যায়, স্ত্রীটি যখন আসন্নপ্রসবা—যখন রাঁধাবাড়ার লোকাভাব, যখন কচি ছেলেটাকে কাক দেখাইয়া বক দেখাইয়া দুইটা খাওয়ানো চাই।'[৩]

তৃতীয়তঃ প্রবন্ধসমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি বহু জায়গায় উপন্যাসের মত সংলাপ ব্যবহার করেছেন। এতে হাস্যপরিহাসের পরিধি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, সহজ সরল হয়েছে যেমন বক্তব্য, তেমনি নাটকীয় হয়ে উঠেছে প্রবন্ধ উপস্থাপনার ভঙ্গিতে। যেমন, 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে ভক্তদের উৎসাহ দান প্রসঙ্গে তিনি বলছেন :

"ভক্তরা বলে, আপনি ভীরু।

আমি বলি, না।

তাহারা বলে, তবে প্রমাণ করুন।

আমি বলি, প্রমাণ করা কি সহজ ব্যাপার। 'রস-সৃষ্টি' 'রসোদ্বোধন' প্রভৃতির রস বস্তুটির মত ধোঁয়াটে বস্তু সংসারে আর আছে না কি? এ কেবল রসরচনার দ্বারাই প্রমাণিত করা যায়,—কিন্তু সে সময় আপাততঃ আমার হাতে নাই।"

চতুর্থতঃ, সহজ হাস্যপরিহাসের সঙ্গে কোন বক্তব্যকে উপস্থিত করা শরৎ-প্রবন্ধের একটা আর্ট। এই হাস্যপরিহাসের ভঙ্গিতে কখনও ফুটে উঠেছে তীব্র শ্লেষ বা উজ্জ্বল বাক্‌চাতুর্য, কখনও বা নির্মল শুভ্রসংযত হাস্য। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের উত্তরে শরৎচন্দ্র কবির উপমাগুলি খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে উপমা যুক্তি নয়। সাহিত্যধর্মের আলোচনায় এগুলি বিভ্রান্তিকর। কিন্তু এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যকে উপস্থিত করেছেন ব্যঙ্গ ও হাস্যপরিহাসের ছলে। ফলে বক্তব্য সরল, সরস ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যথা : 'কবির হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে যে, সজিনা বক, কুমড়া প্রভৃতি কয়েকটা ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই। গোলাপজাম-ফুলও না, যদিচ সে, শিরীষ ফুলের সর্ববিষয়েই সমতুল্য। কারণ? না, সেগুলো মানুষে খায়! রান্নাঘর তাহাদের জাত মারিয়াছে। তাই উদাহরণের জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন গঙ্গাদেবীর মকরের কাছে। অথচ,— হাতের কাছে বাগেদবীর বাহন হাঁস খাইয়া যে মানুষ উজাড় করিয়া দিল, সে তাঁহার চোখে পড়িল না। কুমুদফুলের বীজ হইতে ভেঁটের খৈ হয়, এমন যে পদ্ম, তাহাও বীজ লোকে ভাজিয়া খাইতে ছাড়ে না। তিলফুলের সহিত ন্যাসিকার[৪], কদলী-বৃক্ষের সহিত সুন্দরীর জানুর উপমা কাব্যে বিরল নহে। অথচ, সুপক্ক মর্তমান রম্ভার প্রতি বিতৃষ্ণা অপবাদ কোন কবির বিরুদ্ধেই শুনি নাই।'[৫] সুতরাং বলা যেতে পারে শরৎসাহিত্যের সরসতা তাঁর প্রবন্ধ ও সমালোচনার মধ্যেও অনুপস্থিত

নাই। সরস সংলাপে, বাক্‌চাতুর্যে, পরিহাসরসিকতায়, কখনো বা ব্যঙ্গপ্রখরতায় তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধ অনবদ্যতায় ভূষিত হয়েছে।

এবার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি শরৎসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন। অনিলাদেবী ছদ্মনামে 'যমুনা' পত্রিকায় ১৩২০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়। বাংলা কথা-সাহিত্যের সূচনা থেকেই নারীচরিত্রের প্রাধান্য। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই বাঙালী নারীর জীবন-বেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। সমাজ-পরিবার-ব্যক্তিপুরুষ—এদের দ্বারা লাঞ্ছিত নারীর দুঃখবেদনার ইতিকথা রচনা করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। নারীর প্রতি সহানুভূতিবশতঃ আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যখন তিনি কাহিনী রচনা করেছিলেন, তখনই হয়তো নারীর পারিবারিক ও সামাজিক লাঞ্ছনার দিকটি সমাজ, ইতিহাস ও নীতির দিক থেকে চিন্তা করেছিলেন। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি রচনার প্রেরণা হয়তো সেখানেই নিহিত আছে। শোনা যায় রেঙ্গুনে বসবাসকালে শরৎচন্দ্র পতিতা নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নীতিগত দিকগুলি আলোচনা করার জন্য বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে নানা স্থান থেকে কুলত্যাগিনীদের যথার্থ ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা করে-ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে বলেছেন : 'বারো তেরো বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্রলোক এই বাংলা দেশের কুলত্যাগিনী বহু রমণীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাহাতে বিভিন্ন জেলায় বহু সহস্র হত-ভাগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতিপরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ ছিল।…আমি হিসাব করিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম যে, এই হতভাগিনীদের শতকরা সত্তর জন সধবা। বাকি ত্রিশটি মাত্র বিধবা। ইহাদের প্রায় সকলেরই হেতু লেখা ছিল, অত্যধিক দারিদ্র্য ও স্বামী প্রভৃতির অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন। সধবাদিগের প্রায় সবগুলিই নীচজাতীয়া, আর বিধবাগুলির প্রায় সবগুলিই উচ্চজাতীয়া।' সুতরাং এর থেকে বেশ অনুমান করা যায় যে, শরৎচন্দ্র নিজেই হয়ত এ ব্যাপারে লিপ্ত থেকে এই সংগ্রহকার্য চালিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র নারীচরিত্রের এই পরিণামের যথার্থ স্বরূপ ও হেতু বিশ্লেষণের অভিপ্রায়ে সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, নীতিবাদ ও আন্দোলন সম্পর্কিত যত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন, নানা উৎস থেকে যেভাবে তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাস করেছিলেন বস্তুগত ভিত্তিতে তাতে শরৎচন্দ্রকে নারীর ইতিহাস সংগ্রহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক বলে মনে হয়। সুতরাং 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজ ও ইতিহাসের বিবর্তনের দিক

দিয়া নারীর যথার্থ মূল্যটি বা স্থানটি নির্ধারণ করা তাই শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধের প্রথমেই পুরাতন পৃথিবীর ইতিহাস ও সমাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ইংরাজী chastity কথাটার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'সতীত্ব' এবং সেটা নিছক নারীরই জন্যে। আর প্রাচীনকালে এ সতীত্বের চরম দাঁড়িয়েছিলো সহমরণে। কবে এবং কি থেকে এর সূত্রপাত সে কথা ইতিহাস লেখে না। আফ্রিকার ও ফিজি দ্বীপের ভাগ্যে কীর্তিস্তম্ভের বালাই নাই, না হলে ওদেশগুলোর বোধ করি এতদিনে পা ফেলবার স্থানটুকুও থাকত না। নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য সহমরণ অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলন ছিল। এক-একটা ডাহোমি সর্দারের মৃত্যু উপলক্ষে তার শতাধিক বিধবাকে সমাধিস্থানের আশেপাশে গাছের ডালে ডালে ঝুলিয়ে দিত—অর্থাৎ পরলোকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতো। দ্বিতীয়তঃ, শরৎচন্দ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের সমাজে নারীর স্থান নির্ণয় করে বলেছেন যে আজ ইউরোপবাসীরা অহঙ্কার করে বলে, তারা যেমন নারীর dignity বোঝে এমন আর কেউ নয়। অথচ, নারীজাতিকে গত ১৩।১৪ শত বৎসর ধরে যেরূপ অসহ্য ঘৃণা করেছে, যত ক্লেশ দিয়েছে, যত অবনত করেছে, তত আর কোন জাতি করেছে কি-না সন্দেহ। ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জাহূত ওসিয়ার ক্রীশ্চান ধর্মসঙ্ঘে নাকি স্থির হয়েছিলো, স্ত্রীলোকের আত্মা নাই। তৃতীয় ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র আধুনিক ভারতীয় নারীর সামাজিক ও পারিবারিক স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : 'সেই জাতিভেদের অংশ সঙ্কীর্ণতা, বালিকা-বিবাহ, বিবাহ না দিলে জাত যাওয়া, বারো বছরের বিধবা মেয়েকে দেবী করার বাহাদুরী, পঞ্চাশ বছরের বুড়ার সহিত এগারো বছরের মেয়ের বিবাহ, ১০ তাহার বছর দুই পরেই তাহার গর্ভে সন্তান—এ সমস্তই বড় রকমের উত্তর। অথচ কথাটি বলিবার জো নাই। পণ্ডিতেরা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিবেন, "তুমি আমাদের মুনি-ঋষিদের চেয়ে বেশী বোঝ?" তাঁর মূল প্রামাণ্য বিষয় ছিল যে মধ্যযুগেই পুরুষের খেয়ালখুশিমত চলতে বাধ্য হয়েছে। তথ্য সহকারে তিনি দেখিয়েছেন যে 'একযুগে নারী ছিল গৃহপালিত পশুর সমান, বরং নীচে'—পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পরবর্তী যুগে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কারণে নারীর সংস্পর্শের কিছু অদল-বদল হলেও মানসিক দিক থেকে পুরুষ শাসিত সমাজ সেই একই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রইলো। সহমরণ, বৈধব্য ও পতিতাবৃত্তি—শরৎচন্দ্র নারীর দুর্গতি সম্পর্কের আলোচনার এই তিনটি দুর্গতিই প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির ফসল হিসাবে

শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি কেবল মূল্যবান তাই নয়, শরৎসাহিত্য পাঠের সহায়কও বটে।

এবার সাহিত্যসমালোচক শরৎচন্দ্রের স্বরূপ নির্ধারণ করা যেতে পারে। বিশ্বমানবের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, পরলোকের ব্যাপার আমি জানিনে, কিন্তু ইহলোকের মানবের জীবন-যাত্রাপথের যতদূরে দৃষ্টি চলে, দেখা যায়, বিশ্ব-মানব একটা বস্তু লক্ষ্য করে নিরন্তর চলেছে—তার তিনটে অংশ—art, morality এবং ধর্ম,—religion। সংসারের সমস্ত মারামারি, কাটাকাটি, একের রাজ্য অপরের কেড়ে নেওয়া, একজনের দুঃখের উপার্জন অন্যজনের ঠকিয়ে নেওয়া,—সর্ববিধ কাম ক্রোধ লোভ মোহ—এরা পথের জঞ্জাল, চলার কাঁটা, —কিন্তু মানবের যে বৃহত্তর প্রাণ তার লক্ষ্য শুধু ওইখানে। শরৎচন্দ্র যখন রোহিণীর প্রতি সহানুভূতির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন তখন সবাই মনে করেছিলেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সেকেলে নীতির সংকীর্ণতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সমালোচনা আরও সূক্ষ্ম। তিনি আপত্তি করেছিলেন এই উপন্যাসের নীতির বিরুদ্ধে নয়, এর রীতির বিরুদ্ধে। নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি এসেছে গৌণভাবে। তাঁর মতে, বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী-চরিত্রের যেভাবে রূপ দিয়েছেন তার প্রথমার্ধের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্ধের মিল নাই। নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র যাই মনে করুন না কেন, স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ দেখিয়েছেন। বিধবাবিবাহে বাধা আছে, গোবিন্দলালের স্ত্রী আছে। এর মধ্য দিয়েই গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর প্রেম পরিণতি লাভ করবে অথবা করবে না। কিন্তু বিধবা রোহিণী পরপুরুষের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। সমাজনীতির দিক দিয়ে গুরুতর অন্যায় শুধু নয়, অনপনেয় পাপ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বিশ্বাসঘাতিনী রূপে চিহ্নিত করে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন। এখানেই শরৎচন্দ্রের আপত্তি। তাঁর মতে, গোবিন্দলালকে রোহিণী অকৃত্রিমভাবে এবং অকপটেই ভালবেসেছিল,—সমস্ত হৃদয়প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছিল, এবং এ প্রেমের প্রতিদান যে সে পায় নি—তা'ও নয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের সে অধিকারী নয়, এ ভালবাসা তার প্রাপ্য নয়। সে পাপিষ্ঠা, তাই পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দিষ্ট নীতির আইনে বিশ্বাসঘাতিনী তার হওয়া চাই এবং হলও সে। তারপরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মিনিট পাঁচেকের দেখায় নিশাকরের প্রতি আসক্তি এবং পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু। এই মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের আপত্তি নয়, আপত্তি art-এর বিনষ্টিতে। তাই তাঁর অভিমত : মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ, অহেতুক জবরদস্তির অপমৃত্যুতে। হতভাগিনীর

অস্বাভাবিক মরণে পাঠক-পাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে, সমাজের বিধি ও নীতির convention সমস্তই বেঁচে গেল। সন্দেহ নেই, কিন্তু মল সে, আর তার সঙ্গে সত্য, সুন্দর, art। উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখরাঙানিতে তার মরা চলে না। শরৎচন্দ্রের মতে, রোহিণীর মৃত্যুতে কেবল নীতির জয় হোল না, হোল সুন্দরের ও আর্টের অপমৃত্যু আর উপন্যাসের উপর নীতির জবরদস্তি। এই সমালোচনার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র কেবল নীতি বা আর্টের কথাই বলেন নি, রচনারীতির প্রশ্ন তুলেছেন। তাই তাঁর বক্তব্য, "উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখরাঙানিতে তার মরা চলে না।" এখানেই শরৎচন্দ্রের মৌলিকত্ব। এই মৌলিক প্রশ্নটি যেমন নিজে তুলেছেন সে রকম প্রশ্নের উত্তরটি নিজেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপস্থিত করেছেন : ভালমন্দ সংসারে চিরদিন আছে,—ভালকে ভাল মন্দকে মন্দ বলায় কোন art-ই কোনদিন আপত্তি করে না। কিন্তু দনিয়ায় যা কিছু সত্যই ঘটে নির্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সত্য সাহিত্য হয় না। অর্থাৎ,—যা কিছু ঘটে না, অথচ, সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে ঘটলে—ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে।

সাহিত্যপ্রসঙ্গে এবং সাহিত্যে আর্ট এবং দুর্নীতির স্থান কোথায়—এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ১৩৩১ সালের 'মাসিক বসুমতী'র চৈত্র সংখ্যায় 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড় জিনিস একথা শরৎ দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে। কিন্তু তাঁর কথা এই যে সাহিত্যিক সমাজসংস্কারক যেমন নয়, তেমনি নীতিশিক্ষা দেওয়াও তার কাজ নয়। তাই তাঁর মত : বুড়ো ছেলেমেয়েকে যদি গল্পচ্ছলে এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয়, ত আমি বলি সাহিত্য না থাকাই ভাল। সাহিত্যবিচারে শরৎচন্দ্রের মত হচ্ছে যে আইডিয়ালিস্ট ও রিয়ালিস্ট কথা দুটি পৃথক করা চলে না। কারণ একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না, অন্ততঃ উপন্যাস যাকে বলে—সে হয় না। আর্ট অবান্তর বস্তু পরিহার করে এবং—তার দিক থেকে প্রয়োজনীয় বস্তুর সংযোজন করে। এখানে শিল্পী আইডিয়ালিস্ট। কিন্তু এই পরিবর্তন ও সংযোজনের উদ্দেশ্য হল বাস্তবের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা এবং এজন্যই আধুনিক এবং তথাকথিত গণতান্ত্রিক বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে। শরৎচন্দ্রের অভিমত হচ্ছে যে পূর্বের মত রাজারাজড়া-জমিদারের দুঃখদৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্য-সেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের

স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোসের কথা নয়।—এই প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের মতই শরৎচন্দ্র ঘোষণা করেছেন "বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যেদিন সে আর ও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে দিন—এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশ নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।"[৯]

উপন্যাসে যেমন শরৎচন্দ্র স্পষ্টবাদী—প্রবন্ধরচনার ক্ষেত্রেও সর্বত্র স্পষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধরচনায় তাঁর ভাষা অত্যন্ত ধারাল, যুক্তি খুবই তীক্ষ্ণ। শরৎচন্দ্রের মতে, 'মানবের সুগভীর বাসনা, নরনারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ' সাহিত্যিকদের প্রধান কাজ। 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধে তিনি বলতে চেয়েছেন যে শুধু বাস্তবের যথাযথ বর্ণনা দিলে অথবা খবরের কাগজের মত রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনার কথা বললেই সাহিত্য হবে না। চরিত্রায়ণই সবচেয়ে বড় কথা এবং চরিত্রসৃষ্টির দ্বারাই বাস্তব চিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত করতে হবে। বাজেশিবপুর থেকে ৭ই ভাদ্র, ১৩২৬ সালে জনৈকা লেখিকাকে তিনি বলছেন, "তারপরে গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দেবার দবকার নাই। যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়।"[১০] আর এই চরিত্রপ্রকাশের মাধ্যম হবে সমস্যা। মানুষের অন্তর্জীবনেও সমস্যা আছে এবং অনুভূতিও বুদ্ধি ও চিন্তাব উপর নির্ভর করে। তাই শরৎচন্দ্র বলেন, জগতের যা চিরস্মরণীয় কাব্য ও সাহিত্য, তাতেও কোন না কোন রূপে এ বস্তু আছে। রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, কালিদাসের কাব্যগ্রন্থে আছে, আনন্দমঠ দেবী চৌধুরাণীতে আছে, ইবসেন মেটারলিঙ্ক—টলস্টয়ে আছে, হামসুন বোয়ার ওয়েলসে আছে। কিন্তু তাতে কী? পশ্চিম থেকে বুলি আমদানি হয়েছে যে art for art's sake—এ সব যেন ওদের নখাগ্রে! গল্পের গল্পত্বই মাটি, কারণ চিত্তরঞ্জন হোলো না যে!

শরৎচন্দ্র সাহিত্যস্রষ্টা—সাহিত্যতাত্ত্বিক নন। তাই অনেক ক্ষেত্রেই আছে মতের স্ববিরোধিতা। তাই তিনি art for art's sake বা কলাকৈবল্যবাদ গ্রহণ না করেও সাহিত্যকে বন্ধনমুক্ত করতে চেয়েছেন, এমন কি 'অ-সত্য' এবং 'অ-মঙ্গল'ও যে সাহিত্যে প্রবেশ করে তাও তিনি বলেছেন। ১৭ই আশ্বিন ১৩৪১ সালে তিনি একটি পত্রে লিখেছেন . আচার্যগণ বলেন, কলাসাধনার মূলসূত্র হলো সত্য, শিব এবং সুন্দর। অর্থাৎ, সাধনা হয় যেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুন্দরের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার ফল যেন হয় মঙ্গলময়।

অথচ সাহিত্যসেবায় বহুদিন ব্রতী থেকে নিরন্তর অনুভব করি এখানে সত্য এবং সুন্দরে বাধে পদে পদে বিরোধ। জগতে যা ঘটনার সত্য সাহিত্যে হয়ত সে সুন্দর নয়, এবং যা সুন্দর সে হয়ত সাহিত্যে একেবারে মিথ্যা। যাকে সত্য বলে জানি তাকে মূর্তি দিতে গিয়ে দেখি সে হয়ে ওঠে বীভৎস কদাকার, আবার অসত্যকে বর্জন করেও পাইনে সুন্দরের রূপ। তেমনি মঙ্গল-অমঙ্গলও। সাহিত্যে এ-প্রশ্ন অবান্তর স্বীকার না করেও পারি নে।'[১১] এখানেই শরৎচন্দ্রের সার্থকতা। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর এই মত কেবল তত্ত্বগত ছিল না। তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্যেও যে তিনি এই মতকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর আর একটি পত্রে দেখতে পাওয়া যায়। চরিত্রহীন উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মেসের ঝি সাবিত্রী চরিত্রটি আঁকতে গিয়ে শরৎচন্দ্র অনেক নোংরা কদর্য পরিবেশ ও বর্ণনা ফুটিয়ে তুলতে হয়ে ছিল বলে অনেকে শরৎচন্দ্রকে নিন্দা এবং অভিযোগ করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে রেঙ্গুন থেকে ১৯১৩ সালের লেখা একটি চিঠিতে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছেন : 'তাহারা সাবিত্রীকে 'মেসের ঝি' বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত, এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কি ভাবে শেষ হয়, কোন কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য হীরা মাণিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না।'[১২] এটিই হচ্ছে সাহিত্যিকের কাজ, শরৎচন্দ্র তাঁর সমগ্র অমর কথাসাহিত্যে এবং প্রবন্ধ-সমালোচনায় একথাই বাব বার প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। শরৎশত-বার্ষিকের শুভমুহূর্তে একথা নূতন করে ভেবে দেখতে হবে যে একই মন নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন, আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাই ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক-সমালোচক শরৎচন্দ্রকে কোনমতেই আলাদা করে দেখা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়।

১। আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ। স্বদেশ ও সাহিত্য। পৃঃ ১০৪
২। সাহিত্যের রীতি ও নীতি। স্বদেশ ও সাহিত্য। পৃঃ ১০৫
৩। নারীর মূল্য। ৬ষ্ঠ মুদ্রণ। পৃঃ ১
৪। সাহিত্যের রীতি ও নীতি। স্বদেশ ও সাহিত্য। পৃঃ ১০৬
৫। সাহিত্যের রীতি ও নীতি। স্বদেশ ও সাহিত্য। পৃঃ ১০৮
৬। নারীর মূল্য। পৃঃ ৩০
৭। নারীর মূল্য। পৃঃ ৬৭

৮। সাহিত্য ও নীতি। স্বদেশ ও সাহিত্য। পৃঃ ৬৯
৯। সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি। স্বদেশ ও সাহিত্য। পৃঃ ৮৭
১০। শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী। ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত। পৃঃ ৮৬
১১। শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী। পৃঃ ১৫৩-৫৪
১২। শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী। পৃঃ ১০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

রতনকুমার দাস

১। অনুরাধা-সতী ও পরেশ। (গল্পসংকলন) কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৩৪। ১২৩ পৃ। ১.০০।

(৩টি গল্প : অনুরাধা' ১৩৪০ সালের চৈত্র-সংখ্যা ভারতবর্ষে, 'সতী' ১৩৩৪ সালের আষাঢ়-সংখ্যা বঙ্গবাণীতে এবং 'পরেশ' ১৩৩২ সালের ভাদ্রমাসে প্রকাশিত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত পূজা-বার্ষিক 'শরতের ফুলে' প্রকাশিত)।

২। অরক্ষণীয়া (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৬। ১৭৪ পৃ। .৫০। (১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত)।

৩। কাশীনাথ (গল্পসংকলন)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৭। ১৯২ পৃ। ১.৫০।

(৭টি গল্প : 'কাশীনাথ'—সাহিত্য ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯, 'আলো ও ছায়া' যমুনা আষাঢ়, ভাদ্র ১৩২৩ ; 'মন্দির'—কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ ; 'বোঝা' যমুনা কার্তিক-পৌষ ১৩১৯ ; 'অনুপমার প্রেম' সাহিত্য চৈত্র ১৩২৫ ; 'বাল্য-স্মৃতি' সাহিত্য মাঘ ১৩১৮ ; 'হরিচরণ' সাহিত্য আষাঢ় ১৩২১)

৪। গৃহদাহ (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯২০। ৫৩২ পৃ। ৪.০০।

(১৩২৩ সালের মাঘ-চৈত্র , ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ; ১৩২৫ সালের পৌষ-চৈত্র ; ১৩২৬ সালের আষাঢ়-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত)

৫। চন্দ্রনাথ (উপন্যাস)। কলিকাতা, রায় এম.সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৬। ১৫৭ পৃ। .৫০। (১৩২০ সালের বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা যমুনায় প্রকাশিত)।

৬। চরিত্রহীন (উপন্যাস)। কলিকাতা, রায় এম.সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৭। ৫৬৬ পৃ। ৩.৫০। (১৩২০ সালের কার্তিক-চৈত্র ও ১৩২১ সালের যমুনায় আংশিকভাবে প্রকাশিত)।

৭। ছবি (গল্পসংকলন)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯২০। ১০৪ পৃ। .৫০। (৩টি গল্প : ছবি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত

১৩১৬ সালের পূজাবার্ষিকী আগমনী; 'বিলাসী' ভারতী বৈশাখ ১৩২৫; 'মামলার ফল' ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'পার্বণী'। 'ছবি' গল্পটির প্রাক্ রূপ 'কোরেল গ্রাম', শারদীয় সংখ্যা 'দেশ' ১৩৭২-এ প্রকাশিত)

৮। ছেলেবেলার গল্প। কলিকাতা, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৩৮। ১২১ পৃ। (৭টি গল্প 'লালু' মৌচাক চৈত্র ১৩৪৪; 'ছেলে-ধরা' ব্রজমোহন দাশ-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী ছোটদের 'আহরিকা'; 'কলকাতার নূতন-দা' প্রেমেন্দ্র মিত্র স-পাদিত বার্ষিকী 'গল্পের মণিমালা' ১৩৪৪; 'লালু' নরেন্দ্রদেব ও রাধারাণী দেবী-স-পাদিত পূজা-বার্ষিকী সোনার কাঠি ১৩৪৪; 'বছর পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী' পাঠশালা আশ্বিন-কার্তিক ১৩৪৪; 'লালু' 'দেওঘরের স্মৃতি' ভারতবর্ষ আষাঢ় ১৩৪৪)

৯। তরুণের বিদ্রোহ (প্রবন্ধ)। কলিকাতা, সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৯১৯। ২৩ পৃ। '১৯ প।

(১৯১৯ সালে বঙ্গীর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির বক্তৃতা। ১৯৩২ সালে আর্য্য পাবলিশিং কোং পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ করেন, সত্য ও মিথ্যা-নামে একটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। এই প্রবন্ধটি ১৩২৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা নারায়ণে প্রকাশিত)

১০। দত্তা (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৮। ২৬৭ পৃ। ২.৫০।

(১৩২৪ সালের পৌষ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত)।

১১। দেনা-পাওনা (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯২৩। ৩০৭ পৃ। ২.৫০।

(১৩২৭ সালের আষাঢ়-আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র; ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক ও চৈত্র; ১৩২৯ সালের বৈশাখ-শ্রাবণ, আশ্বিন-কার্তিক ও মাঘ-চৈত্র; ১৩৩০ সালের বৈশাখ ও আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত)।

১২। দেবদাস (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৭। ১৫৬ পৃ। ১.২৫।

(১৩২৩ সালের চৈত্র ও ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত)।

১৩। নব-বিধান (বড়গল্প)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯২৪। ১৩৬ পৃ। ১.৫০।

(১৩৩০ সালের মাঘ-ফাল্গুন ও ১৩৩১ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত)।

১৪। নারীর মূল্য (প্রবন্ধ)। কলিকাতা, রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স, ১৩২৯। ১৩৩ পৃ। ১·০০।

(শ্রীমতী অনিলা দেবী ছদ্মনামে ১৩২০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় ও ভাঁদ্র-আশ্বিন সংখ্যা যমুনায় প্রকাশিত।

১৫। নিষ্কৃতি (বড়গল্প)। কলিকাতা, রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৭। ১২৫ পৃ। ·৫০।

(প্রথমাংশ 'ঘর-ভাঙ্গা' নামে ১৩২১ সালের বৈশাখ সংখ্যা যমুনায় ও সমগ্র অংশ ১৩২৩ সালের ভাদ্র, কার্তিক ও পৌষ ভারতবর্ষে প্রকাশিত)।

১৬। পণ্ডিত মশাই (উপন্যাস)। কলিকাতা। রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৪। ১৪৮ পৃ। ১·২৫।

(১৩২১ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত)।

১৭। পথের দাবী (উপন্যাস)। কলিকাতা, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৯২৬। ৪২৬ পৃ। ৩·০০।

(১৩২৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ; ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-কার্তিক, পৌষ-মাঘ ; ১৩৩২ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্তিক-ফাল্গুন ও ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত)।

১৮। পরিণীতা (বড়গল্প)। কলিকাতা, রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৪। ১১৫ পৃ। ·৬২।

(১৩২০ সালের ফাল্গুন সংখ্যা যমুনায় প্রকাশিত)।

১৯। পল্লীসমাজ। (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৬। ২৮০ পৃ। ·৫০।

২০। বড়দিদি (বড়গল্প)। কলিকাতা, ফণীন্দ্রনাথ পাল, ১৯১৩। ৭৯ পৃ। ·৫০।

(১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত)।

২১। বামুনের মেয়ে (উপন্যাস)। কলিকাতা, শিশির পাবলিশিং হাউস ১৯২০।

(শিশির পাবলিশিং হাউস প্রবর্তিত উপন্যাস সিরিজ-এর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম উপন্যাস)।

২২। বারোয়ারি উপন্যাস। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯২১। ২৪৪ পৃ। ২'৫০।

(ভারতীতে প্রকাশিত বারোজন সাহিত্যিকের লেখা এই বারোয়ারি উপন্যাসের ২১ ও ২২ অধ্যায় শরৎচন্দ্রের লিখিত)।

২৩। বিজয়া (নাটক)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৩৪। ১৭২ পৃ। ১'৫০। (দত্তা-উপন্যাসের নাট্য-রূপ)

(৬ পৌষ ১৩৪১ সালে স্টার রঙ্গমঞ্চে নব নাট্যমন্দির কর্তৃক অভিনীত)।

২৪। বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প (গল্পসংকলন)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৪। ২১১ পৃ। ১'৫০।

৩টি গল্প: বিন্দুরছেলে' শ্রাবণ ১৩২০; 'রামের সুমতি' ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯ 'পথ-নির্দেশ' বৈশাখ ১৩২০ সালের যমুনায় প্রকাশিত)

২৫। বিপ্রদাস (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৩৫। ৩২৫ পৃ। ২'৫০।

(১৩৩৯ সালের ফাল্গুন চৈত্র ; ১৩৪০ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, আশ্বিন-ফাল্গুন ; ১৩৪১ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ-ভাদ্র, কার্তিক-মাঘ সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত। বিচিত্রায় প্রকাশের পূর্বে ১০ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ৩য়-৫ম বর্ষের ১৩৩৬-৩৮ বেণুতে প্রকাশিত)।

২৬। বিরাজ-বৌ (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৪। ১৭৫ পৃ। ১'২৫। (১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত)।

২৭। বিরাজ-বৌ (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৩৪। ১৪৩ পৃ। ২'০০ (১২ শ্রাবণ ১৩৪১ সালে নব নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনীত)।

২৮। বৈকুণ্ঠের উইল (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৬। ১৩৮ পৃ। ১'০০(১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত।

২৯। মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প (গল্পসংকলন)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৫। ১৭১ পৃ। ১'২৫। (৪টি গল্প—'মেজদিদি', 'দর্পচূর্ণ', 'আঁধারে আলো' ও 'দেওঘরের স্মৃতি'। ১৩২১ সালের ভারতবর্ষে যথাক্রমে ভাদ্র, কার্তিক, মাঘ সংখ্যা ও আষাঢ় ১৩৪৪ সালে প্রকাশিত)।

৩০। রমা (নাটক)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯২৮। ১৪৪ পৃ, ১'০০। (পল্লীসমাজ উপন্যাসে-র নাট্যরূপ। ১৯ শ্রাবণ ১৩৩৫ সালে আর্ট থিয়েটার কর্তৃক স্টার মঞ্চে অভিনীত)।

৩১। রসচক্র। বারোয়ারি উপন্যাস। ১৩৪৩। ২২৯ পৃ। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাস-জ্যোতিতে ১৩২৭ আশ্বিন, বাড়ির কর্তা নামে প্রকাশিত হয়। পরে উত্তরা ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ মাসে রসচক্র নামে বারোয়ারি উপন্যাসের সূচনারূপ প্রকাশিত)।

৩২। শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ (প্রবন্ধ)। কলিকাতা, শ্রীহর্ষ কার্যালয়, ১৯৩৮। ৩০ পৃ। সম্পাদনা মুরারি দে। (বিভিন্ন সময়ে শরৎচন্দ্র ছাত্রদের অনুরোধে বিভিন্ন কলেজে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এই রকম সাতটি ভাষণ একত্রিত ক'রে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়)।

৩৩। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। ১—৭ খণ্ড। ১৯১৯—১৯৩৫। বসুমতী কার্যালয়।

১ খণ্ড (১৯১৯)—দত্তা, পরিণীতা, শ্রীকান্ত ১ পর্ব, অরক্ষণীয়া, একাদশী, বৈরাগী, মেজদিদি, মামলার ফল।

২ খণ্ড (১৯২০)—শ্রীকান্ত ২ পর্ব, দেবদাস, দর্পচূর্ণ, পল্লীসমাজ, বড়দিদি।

৩ খণ্ড (১৯২০)—স্বামী, বৈকুণ্ঠের উইল, পণ্ডিত মশাই, আঁধারে আলো, চন্দ্রনাথ, নিষ্কৃতি।

৪ খণ্ড (১৯২০)—চরিত্রহীন, ছবি, বিলাসী।

৫ খণ্ড (১৯২৩)—গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, মহেশ।

৬ খণ্ড (১৯৩৪)—শ্রীকান্ত ৩ পর্ব, নববিধান, ষোড়শী, হরিলক্ষ্মী, অভাগীর স্বর্গ।

৭ খণ্ড (১৯৩৫)—শ্রীকান্ত ৪ পর্ব, দেনা-পাওনা, রমা, নারীর মূল্য।

৩৪। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৫৪। ৪২০ পৃ। ৫'০০। পঞ্চাশজন সাহিত্যিকদের লেখা চিঠি সংকলিত সম্পাদনা গোপালচন্দ্র রায়।

৩৫। শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী। কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড লিমিটেড, ১৯৪৮। ১৬+১৯০ পৃ। ৩'০০। সাতাশজন সাহিত্যিকদের লেখা চিঠি সংকলিত। সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী। গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা। সঙ্কলক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৬। শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী। কলিকাতা, গুরু-

দাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৫১। ৩৮০ পৃ। ৫'০০। সঙ্কলক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্কলিত রচনা—'ক্ষুদ্রের গৌরব', 'নারীর লেখা', 'কান কাটা', 'সমাজ ধর্মের মূল্য', 'রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা উপলক্ষে মানপত্র', 'আসার আশায়', 'সধবার একাদশী', 'সত্য ও মিথ্যা', 'মহাত্মাজী', পুস্তক পরিচয়, আত্মকথা, দিনকয়েকের ভ্রমণকাহিনী, জাগরণ, বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, রস-সেবায়েৎ, প্রতিভাষণ—৫৩তম জন্মদিনে, সত্যাশ্রয়ী, যুব-সঙ্ঘ, নূতন প্রোগ্রাম, অভিভাষণ—৫৪তম জন্মদিনে, লাহোরের অভিভাষণ, ভাষণ—৫৫তম জন্মদিনে, চন্দননগরে আলাপসভায়, প্রবর্তক সঙ্ঘের অভিনন্দনের উত্তরে বাণী, রসচক্র, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে মানপত্র, প্রতিভাষণ—৫৭তম জন্মদিনে, বেতার সঙ্গীত, বাল্যস্মৃতি, সাহিত্যের মাত্রা, সাহিত্য সম্মিলনের রূপ, জলধর-সম্বর্ধনা, বাংলানাটক, বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, শুভেচ্ছা, ভাষণ—৫৯তম জন্মদিনে, সাহিত্যিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য, কবি অতুলপ্রসাদ, আগামীকাল, ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক-সম্প্রদায়, বাংলা বইয়ের দুঃখ, সাহিত্যের আর একটা দিক, আশুতোষ কলেজ সাহিত্য-সম্মেলনে বক্তৃতা, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, মুসলিম সাহিত্য-সমাজ, মুসলমান সাহিত্য, শরৎচন্দ্রের উভয় সঙ্কট, বাংলা সাহিত্য সমিতি প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা, বিদ্যাসাগর কলেজে বক্তৃতা, ৬২তম জন্মদিনে বেতার প্রতিষ্ঠানে সম্ভাষণ, মহাত্মার পদত্যাগ এবং অপ্রকাশিত খণ্ড রচনা।

৩৭। শরৎ-সাহিত্যসংগ্রহ। ১-১৩ খণ্ড। ১৯৫৮। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স।

১ম খণ্ড—শ্রীকান্ত ১ পর্ব, বড় দিদি, দত্তা, চন্দ্রনাথ।

২ খণ্ড—শ্রীকান্ত ২ পর্ব, পল্লীসমাজ, বিরাজ-বৌ, নববিধান।

৩ খণ্ড—শ্রীকান্ত ৩ পর্ব, অরক্ষণীয়া, দেবদাস, কাশীনাথ।

৪ খণ্ড—বামুনের মেয়ে, নিষ্কৃতি, বিজয়া, অপ্রকাশিত রচনাবলী।

৫ খণ্ড—দেনা-পাওনা, পরিণীতা, দর্পচূর্ণ, বোঝা, বাল্যস্মৃতি, পরেশ, হরিচরণ, আগামীকাল।

৬ খণ্ড—বিপ্রদাস, রমা, রামের সুমতি, আলো ও ছায়া, মন্দির, অপ্রকাশিত রচনাবলী।

৭ খণ্ড—গৃহদাহ, বিন্দুর ছেলে, অনুপমার প্রেম, অপ্রকাশিত রচনাবলী।

৮ খণ্ড—শুভদা, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, পথনির্দেশ, আঁধারে আলো, বিবিধ রচনাবলী, অপ্রকাশিত রচনাবলী।

৯ খণ্ড—শেষ প্রশ্ন, স্বামী, একাদশী বৈরাগী, নারীর মূল্য, অপ্রকাশিত রচনাবলী।

১০ খণ্ড—ষোড়শী, বৈকুণ্ঠের উইল, অনুরাধা, হরিলক্ষ্মী, সতী, মামলার ফল, বিলাসী, ছেলেধরা, লালু, কলকাতার নতুন-দা, অপ্রকাশিত রচনাবলী।

১১ খণ্ড—চরিত্রহীন, অভাগীর স্বর্গ, বিভিন্ন রচনাবলী।

১২ খণ্ড—শেষের পরিচয়, ছবি, বছর পঞ্চাশ পূর্বে একটা দিনের কাহিনী। বিভিন্ন রচনাবলী।

১৩ খণ্ড—পথের দাবী, মহেশ, দেওঘরের স্মৃতি, বারোয়ারি উপন্যাস, তরুণের বিদ্রোহ, অপ্রকাশিত রচনাবলী।

৩৮। শুভদা (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৩৮। ২৫৪ পৃ। ২.০০।

৩৯। শেষ প্রশ্ন (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৩১। ৪০০ পৃ। ৩.০০। ভারতবর্ষের ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ-কার্তিক, মাঘ-চৈত্র ; ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন ; ১৩৩৬ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন-চৈত্র ; ১৩৩৭ সালের চৈত্র ও ১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত)।

৪০। শেষের পরিচয় (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৩৯। ৪১৪ পৃ। ২.৫০। (১৩৩৯ সালের আষাঢ়-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন-চৈত্র ; ১৩৪০ সালের বৈশাখ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ; ১৩৪১ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্তিক, ফাল্গুন ও ১৩৪২ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত। শেষ অংশ রাধারাণী দেবীর রচিত)।

৪১। শ্রীকান্ত ১ম পর্ব (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৭। ২৪৩ পৃ। ১.৫০। (শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী নামে ১৩২২ সালের মাঘ-চৈত্র ও ১৩২৩ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত, লেখক শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা ছদ্মনামে)।

৪২। শ্রীকান্ত ২ পর্ব (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৬। ১৯২ পৃ। ১.৫০। (১৩২৪ সালের আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত)।

৪৩। শ্রীকান্ত ৩ পর্ব (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯২৭। ১৫৩ পৃ। ১.০০। (১৩২৭ সালের পৌষ-ফাল্গুন ও

১৩২৮ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত)।

৪৪। শ্রীকান্ত ৪ পর্ব (উপন্যাস)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৩৩। ২৪৬ পৃ। ১'৫০। (১৩৩৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র ও ১৩৩৯ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত)। পরবর্তীকালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং থেকে চারখণ্ড শ্রীকান্ত একত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

৪৫। ষোড়শী (নাটক)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯২৭। ১৫৩ পৃ। ১০'০০। দেনাপাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ। ২১ শ্রাবণ ১৩৩৪ সালে নাট্যমন্দির লিঃ কর্তৃক অভিনীত। ১ জুন ১৯২৭ তারিখের একপত্রে শরৎচন্দ্র শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়কে লিখিয়াছিলেন—"দু-এক দিন শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটারে ষোড়শীর রিহার্সাল দেখবো। (বইখানা ভারতীতে যখন বার হয় নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী। আমি আবার জাটখোল বদলে শিশিরের অভিনয়ের জন্য তৈরী করে দিয়েছি। বোধ হয় নেহাৎ মন্দ হয়নি।" (মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৪৪)।

৪৬। সত্যাশ্রয়ী (ভাষণ)। ১৯২৯। ১৩ পৃ। (১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ সালে মালিকান্দা অভয় আশ্রমে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীর অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ)।

৪৭। স্বদেশ ও সাহিত্য (প্রবন্ধ সংকলন)। ময়মনসিংহ, আর্য পাবলিশিং কোং। ১৯৩২। ১৫৬ পৃ। ২'৫০।

(ক) স্বদেশ—আমার কথা, স্বরাজসাধনায় নারী, শিক্ষার বিরোধ, স্মৃতিকথা ও অভিনন্দন।

(খ) সাহিত্য—ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য, গুরু-শিষ্য সংবাদ, সাহিত্য ও নীতি সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি, ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত, আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ, সাহিত্যের রীতি ও নীতি, অভিভাষণ, যতীন্দ্র-সংবর্ধনা, শেষপ্রশ্ন ও রবীন্দ্রনাথ।

৪৮। স্বামী (গল্পসংকলন)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৮। ৯১ পৃ। '৭৫। (২টি গল্প 'স্বামী' ১৩২৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা নারায়ণে, 'একাদশী বৈরাগী' ১৩২৪ সালের কার্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত)।

৪৯। হরিলক্ষ্মী (গল্পসংকলন)। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯২৬। ৯২ পৃ। ১'০০। (৩টি গল্প 'হরিলক্ষ্মী' ১৩৩২ সালের

শারদীয়া বসুমতীতে, 'মহেশ' ১৩২৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গবাণী এবং 'অভাগীর স্বর্গ' ১৩২৯ সালের মাঘ সংখ্যা বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়।

* বিশেষ সংযোজন *

৫০। *** কুড়ান মেয়ে। সওগাত, ফাল্গুন, ১৩২৫

৫১। *** আমার কথা ধূমকেতু, ১৬ই ভাদ্র, ১৩২৯

*** শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ, শবৎচন্দ্রেব গ্রন্থবিবরণী এবং অন্যত্র কোথাও এই রচনা দু'টির উল্লেখ নেই। সম্ভবত, সংকলকদেব দৃষ্টি এড়িয়ে এই রচনা দু'টি আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে বয়ে গেছে।

এ বিষয়ে আমি শরৎ-বচনা সম্ভার তথা শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ দু'টির সম্পাদকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বলা বাহুল্য, শরৎ অনুবাগী সুধীসমাজ এই রচনা দু'টির বিষয়ে অনুসন্ধান করলে এ দীন নিজেকে ধন্য মনে কবব।

বাংলাদেশে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জী

১। অনুপমার প্রেম। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫। ৫৮ পৃ। ১'৫০।

২। অনুরাধা, সতী ও পরেশ। ঢাকা, ক্লাসিক প্রেস, স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, ১৩৬ । ৯১ পৃ। ১ ২৫

৩। অরক্ষণীয়া। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫। ৮০ পৃ। ১'৭৫।

৪। কাশীনাথ। ঢাকা, ক্লাসিক প্রেস, ১৯৬২। ৬৫ পৃ। ১'৫০

৫। গৃহদাহ। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৮। ৩৩০ পৃ। ৬'০০।

৬। চরিত্রহীন। ঢাকা, ক্লাসিক প্রেস, স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, ১৩৬৮। ৪৪৯ পৃ। ৬'০০।

৭। ছবি। ঢাকা, ক্লাসিক প্রেস, স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, ১৩৬৮। ৭৬ পৃ। ১'৫০।

৮। দত্তা। ঢাকা, ক্লাসিক প্রেস, ১৯৬২। ৭১ পৃ। ১'০০।

৯। দর্পচূর্ণ। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫। ৮০ পৃ। ১'৭৫।

১০। দেবদাস। লাহোর, এ. কে. এম. সিরাজুল ইসলাম ভুইঞা, ১৯৬৮। ১১৮ পৃ। ২ ৬০।

১১। নববিধান। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫। ৭৩ পৃ। ১'৭৫।

১২। নারীর মূল্য। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫। ৬৭ পৃ। ১'৭৫।

১৩। নিষ্কৃতি। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫। ৬৮ পৃ। ১'৭৫।

১৪। পণ্ডিত মশাই। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫। ১১২ পৃ। ২'৫০।

১৫। পথনির্দেশ। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫। ৫১ পৃ। ১'৭০।

১৬। পল্লীসমাজ। শান্তিবাগ, ঢাকা, শামসুল ইসলাম, ১৯৫৫। ১৪০ পৃ। ৩'০০।

১৭। বড়দিদি। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫। ৬৪ পৃ। ১'৫০

১৮। বিন্দুর ছেলে। ঢাকা, ক্লাসিক প্রেস, স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, ১৩৬৮। ৭৫ পৃ। ১'০০।

১৯। বিরাজ-বৌ। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫। ১২৭ পৃ। ২'২৫।

২০। বৈকুণ্ঠের উইল। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫। ৫৭ পৃ। ১'২৫।

২১। মেজদিদি। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৭। ৬৩ পৃ। ১'৫০।

২২। রামের সুমতি। ঢাকা, ক্লাসিক প্রেস, স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, ১৩৬৮। ৫১ পৃ। ১'০০

২৩। শুভদা। করাচী, সৃজনী পাবলিকেশন, ৯৪ পৃ। ১'২৫।

২৪। শ্রীকান্ত। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স. ১৯৬৫। ৪ খণ্ড। প্রতিখণ্ড ৩'৭৫।

২৫। শ্রেষ্ঠ গল্প। বরিশাল, অরুণচন্দ্র মিত্র, ১৯৬৫। ২৯৩ পৃ। ৫'৫০

২৬। শেষ প্রশ্ন। ঢাকা, ক্লাসিক প্রেস, ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, ১৩৬৮। ৩২৯ পৃ। ৫'০০। ২৭। স্বামী। ঢাকা, ক্লাসিক প্রেস, ১৯৬২। ৬৪ পৃ। ১'২৫। ২৮। হরিলক্ষ্মী। লাহোর, ইউনিভার্সেল পাবলিকেশন্স, ১৯৬৪। ৫০ পৃ। ১'৫০

শুদ্ধিপত্র

(অনবধানবশতঃ গ্রন্থের মধ্যে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে, এর জন্য আমরা দুঃখিত। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করা হল।)

•পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দসংখ্যা	শুদ্ধ পাঠ
১০	৬	৭	সভা-সমিতিতে
৩৬	৩১	৬	বাধা
৩৭	৩২	৫	ব্যক্তিতে
৩৯	৩০	১	স্পেন্সারের
৪০	১	৭	ফ্রয়েডীয়
৪০	১১	৭	মূলে
৪১	৭	৬	production
৪২	২৩	১	উঠে
৪৪	২৮	৪	বর্ধিত
৪৭	১	১	মানব-জীবনের
৪৮	১	২,৭	চায়
৪৯	১৫	৫	জমিদারতন্ত্রের
৪৯	১৮	১	পুরুষের
৫০	১১	১	আকর্ষণীয়
৫৩	১৩	২	মাধ্যম
৭৯	৩১	৫	যাকে
৮৯	৭	৪	আত্মগোপনই
৯০	২৭	৩	জুড়ি
১২৬	৫	৩	শরৎস্মৃতিমন্দিরের
১৩১	৬	৫	উচ্চতর
১৩৬	২১	১	প্রযোজনায়
১৪৮	৭	১০	স্নেহে
১৬৩	১৮	৪	ক্লাশ
১৭২	১১	৫	হাজির
১৭৪	২১	১২	তথাপি
১৭৮	৯	৪	অপ্রকাশিত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দসংখ্যা	শুদ্ধ পাঠ
১৮০	১৩	২	কংগ্রেসে
১৮১	১৪	১০	অত্যন্ত
১৯৮	২১	১	বিবুদ্ধে
২০০	১৫	৫	মূলতঃ
২০১	২২	৬	উল্লেখযোগ্য
২০২	১৯	৯	হাল্কা
২০২	২৯	৯	দেখা
২১৩	৭	২	জেলে
২১৪	১৪	৩	পরাণ
২১৭	৬	১	কৃষ্ণপ্রিয়া
২১৭	২২	২	পণ্ডিতমশাই
২২৩	৪	১	শ্রীকান্তর
২২৮	১২	১	ভাঁটার
২২৯	৫	৪	বাড়ল
২৩২	৮	২	সে
২৩৩	১	৪	বাড়ল
২৩৩	৩২	৮	শম্ভু
২৩৫	১২	১২	বিজয়াকে
২৩৮	১১	১	পরাণ
২৩৮	২৪	৪	মেয়ে
২৪৬	৩	৯	চালে চলেন